www.Educationblog24.Com

স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের ইতিহাস

মুনতাসীর মামুন ■ মো. মাহবুবর রহমান

স্নাতক (সম্মান ও পাস) এর সকল বিভাগ/শাখার জন্য

www.Educationblog24.Com

www.Educationblog24.Com

www.Educationblog24.com

SUBARNA

www.Educationblog24.Com

স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের ইতিহাস

ড. মুনতাসীর মামুন
অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ড. মো. মাহবুবর রহমান
অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

www.Educationblog24.com

SUBARNA

www.Educationblog24.Com

www.Educationblog24.com

www.Educationblog24.com

স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের ইতিহাস

History of the Emergence of Independent Bangladesh by

Muntassir Mamoon & Md. Mahbubar Rahman

ষষ্ঠ মুদ্রণ : বৈশাখ ১৪২২ ❑ এপ্রিল ২০১৫
পঞ্চম মুদ্রণ : জ্যৈষ্ঠ ১৪২১ ❑ মে ২০১৪
প্রথম প্রকাশ : ২ পৌষ ১৪২০ ❑ ১৬ ডিসেম্বর ২০১৩
প্রকাশক : আহমেদ মাহফুজুল হক। সুবর্ণ। বুকস এন্ড কম্পিউটার কমপ্লেক্স। রুম নং-২৩৫
৩৮/৩ বাংলাবাজার ঢাকা-১১০০। কম্পোজ : পারফর্ম কম্পিউটার ১০৫ ফকিরাপুল ঢাকা
১০০০। মুদ্রণ : ঢাকা প্রিন্টার্স ৩৬ শ্রীশ দাস লেন ঢাকা ১১০০।
প্রচ্ছদ : আজিজ হাসান। গ্রন্থস্বত্ব : মুনতাসীর মামুন ❑ মো. মাহবুবর রহমান

মূল্য : পেপার ব্যাক : টাকা ২৫০.০০ ❑ বোর্ড বাঁধাই : টাকা ৩০০.০০

বিক্রয়কেন্দ্র : সুবর্ণ। বুকস এন্ড কম্পিউটার কমপ্লেক্স। ৩৮/৩ বাংলাবাজার ঢাকা ১১০০। ফোন : ৭১২২৪১৬

ISBN-978-984-90694-4-7

www.Educationblog24.Com

উৎসর্গ

অধ্যাপক হারুন-অর-রশিদ

শিক্ষাক্রমে স্বাধীন বাংলাদেশের
অভ্যুদয়ের ইতিহাস অন্তর্ভুক্ত
করার জন্য তিনি কার্যকর ভূমিকা রেখেছেন

www.Educationblog24.com

www.Educationblog24.Com

সূচী

ভূমিকা ❑ ১১

প্রথম অধ্যায়
দেশ ও জনগোষ্ঠির পরিচয় ❑ ২৩

দ্বিতীয় অধ্যায়
অখ- বাংলা গঠনের প্রয়াস ও উপমহাদেশের বিভক্তি ❑ ৪০

তৃতীয় অধ্যায়
পাকিস্তান : রাষ্ট্রীয় কাঠামো ও বৈষম্য ❑ ৫৯

চতুর্থ অধ্যায়
ভাষা আন্দোলন ও বাঙালির আত্মপরিচয় প্রতিষ্ঠা ❑ ৭৫

পঞ্চম অধ্যায়
সামরিক শাসন : আইয়ুব খান ও ইয়াহিয়া খানের শাসনামল ❑ ১৪৭

ষষ্ঠ অধ্যায়
জাতীয়তাবাদের বিকাশ ও স্বাধিকার আন্দোলন ❑ ১৬১

সপ্তম অধ্যায়
১৯৬৯-এর গণঅভ্যুত্থান ও ১১ দফা আন্দোলন ❑ ১৭৯

অষ্টম অধ্যায়
১৯৭০-এর নির্বাচন, অসহযোগ আন্দোলন ও বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতা ঘোষণা ❑ ১৮৮

নবম অধ্যায়
মুক্তিযুদ্ধ ১৯৭১ ❑ ২১২

দশম অধ্যায়
বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের শাসনকাল, ১৯৭২-১৯৭৫ ❑ ২৫৩

পরিশিষ্ট : ১
বর্তমান পাঠক্রমের সূচীপত্র ❑ ২৯৫

পরিশিষ্ট : ২
প্রস্তাবিত পাঠক্রমের সূচীপত্র ❑ ২৯৯

www.Educationblog24.com

www.Educationblog24.Com

www.Educationblog24.com

www.Educationblog24.Com

স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের ইতিহাস

www.Educationblog24.com

www.Educationblog24.Com

ভূমিকা

স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের ইতিহাসের পরিধি ও পাঠ্যসূচি

স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের ইতিহাস স্নাতক ও স্নাতক সম্মানের ছাত্রদের জন্য এই প্রথমবার অবশ্য পাঠ্য [২০১৩-২০১৪ থেকে কার্যকর] করা হয়েছে। বিষয়টির পূর্ণমান ১০০, ক্রেডিট সংখ্যা ৪। আমরা দীর্ঘদিন বিষয়টি অবশ্য পাঠ্য করার জন্য দাবি জানিয়েছিলাম। আমরা মনে করেছি জাতীয় ইতিহাস না পড়লে একজন শিক্ষার্থী দেশ সম্পর্কে প্রায় কিছু না জেনেই ডিগ্রি পাবেন। তিনি জানবেন না স্বাধীনতার পটভূমি, মুক্তিযুদ্ধে শহীদদের আত্মত্যাগ, মুক্তিযুদ্ধের গুরুত্ব। ১৯৭১ সালে ত্রিশ লক্ষের আত্মত্যাগ, প্রায় ছয় লক্ষ নারীর আত্মত্যাগের বিনিময়ে অর্জিত হয়েছিল একটি অসাম্প্রদায়িক, ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র। এই না জানার ফলেই গত তিন দশকে নতুন জেনারেশন মেনে নিয়েছে বর্তমান রাষ্ট্র ব্যবস্থা যেখানে অসাম্প্রদায়িকতা, ধর্ম নিরপেক্ষতা কয়েকটি শব্দ মাত্র। এবং এ কারণেই দেশে উদ্ভব হয়েছে জঙ্গি মৌলবাদের। বিরোধিতা করা হচ্ছে যুদ্ধাপরাধ বিচারের। তাছাড়া জাতীয় ইতিহাস না জানলে নতুন প্রজন্ম হয়ে পড়বে শেকড়হীন।

২০১৩ সালে শিক্ষা বিষয়ক সংসদীয় স্থায়ী কমিটি আমাদের [বাংলাদেশ ইতিহাস সম্মিলনী] দাবির পরিপ্রেক্ষিতে একটি শুনানী করে এবং কমিটির সব সদস্য একমত হন যে, জাতীয় ইতিহাস অবশ্য পাঠ্য জরুরি। কমিটির নির্দেশনার পরিপ্রেক্ষিতে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট ও একাডেমিক কাউন্সিলে বিষয়টি উত্থাপন করেন এবং তাঁর উদ্যোগকে সবাই সমর্থন জানান। এ পরিপ্রেক্ষিতে *স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের ইতিহাস* অবশ্য পাঠ্য হিসেবে ঘোষিত হয়।

এই ঘোষণার পরপরই জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় এই বিষয়ের পাঠক্রম তৈরির জন্য একটি কমিটি গঠন করে। কমিটিতে আমরা দু'জন ছাড়াও ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসের অধ্যাপক মেসবাহ কামাল, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক মোঃ সেলিম, বাংলা কলেজের অধ্যক্ষ অধ্যাপক মকফুর রহমান ও ইডেন বিশ্ববিদ্যালয় কলেজের অধ্যাপক ডালিয়া আহমেদ। সিলেবাস প্রণয়নের সময় স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের শুরুটা কবে থেকে হবে তা নিয়ে অনেক আলোচনা হয়েছে। অনেক বিতর্কের পর সিদ্ধান্ত হয় যে সিলেবাসটিকে কয়েকটি পর্বে ভাগ করা যেতে পারে। তৃতীয় অধ্যায় পর্যন্ত সর্বভারতীয় এবং অভিন্ন বাংলার পরিপ্রেক্ষিতে একটি পটভূমি। দ্বিতীয় পর্বে মুক্তিযুদ্ধের

www.Educationblog24.Com

পটভূমি। ১৯৪৭ সাল থেকে যার শুরু। চতুর্থ অধ্যায় থেকে দ্বাদশ অধ্যায় পর্যন্ত এর বিস্তৃতি। তৃতীয় পর্ব মুক্তিযুদ্ধ ও বঙ্গবন্ধুর শাসনকাল। এ সিলেবাসের শেষ ১৯৭৫ সাল। এর কারণ, দীর্ঘ লড়াইয়ের পর আমরা যে স্বাধীনতা অর্জন করেছিলাম, মুক্তিযুদ্ধের যে আদর্শে বঙ্গবন্ধু দেশ পরিচালনা করছিলেন তার সমাপ্তি ঘটে ১৯৭৫ সালে সপরিবারে বঙ্গবন্ধু হত্যার মাধ্যমে। মুক্তিযুদ্ধের সব অর্জন নস্যাৎ করার কাজ শুরু হয় বঙ্গবন্ধু হত্যার পর। দেশে ফিরিয়ে আনা হয় দ্বিজাতিতত্ত্ব। ১৯৪৭ সাল থেকে দ্বিজাতিতত্ত্ব নস্যাৎ করার যে লড়াই তার সমাপ্তি ঘটে ১৯৭১ সালে ১৬ ডিসেম্বর বিজয়ের মাধ্যমে। আমরা এটাকেই মনে করেছি ইতিহাসের মূল ধারা। ১৯৭৫ পরবর্তী শাসকরা প্রমাণ করতে চেয়েছেন, না এটি মূল ধারা নয়, মূলধারা দ্বিজাতিতত্ত্ব, ১৯৭১-৭৫ বিচ্যুতি। ১৯৭৫ সালেই আবার দেশ ফিরে এসেছে মূল ধারায়। কিন্তু আমাদের তা ইতিহাস বলে না।

সিলেবাস প্রণয়ন শেষ হলে আলোচনায় আসে এ পাঠক্রম সব শাখায়ই কার্যকর হবে। কলেজগুলোর অবস্থা, লাইব্রেরি, রেফারেন্স বইয়ের অভাব, শিক্ষক স্বল্পতা-সব কিছু এই শিক্ষাক্রমে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে পারে। তখন আলোচনার ভিত্তিতে মূল [অর্থাৎ প্রথমে প্রস্তাবিত] পাঠ্যক্রম থেকে কয়েকটি অধ্যায় বাদ দিয়ে বর্তমান পাঠ্যক্রম অনুমোদিত হয় [পরিশিষ্ট ১] যা সংযোজিত হয়েছে। কিন্তু আমরা এখনও মনে করি ১৪টি অধ্যায়ে আমরা যে পাঠক্রম তৈরি করেছিলাম তা যুক্তিযুক্ত [দেখুন পরিশিষ্ট-২]। ছাত্রদের সুবিধার জন্য আমরা দু'জন ও মেসবাহ কামাল এবং মোহাম্মদ সেলিম একটি রেফারেন্স বই লেখার সিদ্ধান্ত নিই। এই শিক্ষা বছর ধরার জন্য সময় ছিল কম। তবুও আমরা একটি ডেটলাইন ঠিক করি। অধ্যাপক কামাল ও অধ্যাপক সেলিম অন্যত্র ব্যস্ত থাকার জন্য কাজটি সম্পন্ন করতে পারেননি। ভবিষ্যতে কোন নতুন সংস্করণ হলে হয়ত তারা যোগ দেবেন। তাই আমরা বর্তমান সিলেবাস অনুযায়ী কাজটি সম্পন্ন করেছি। একটি অধ্যায় শুধু বেশি সংযোজন করেছি, ছাত্রদের যা পরীক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় না হতে পারে কিন্তু দেশের ইতিহাস জানার জন্য জরুরি। উল্লেখ্য, এ বিষয়ে আমাদের দু'জনের অনেক প্রকাশিত লেখা/বই ছিল। আমরা সে সব এখানে ব্যবহার করেছি। এখানে আরো বলা প্রয়োজন ভূমিকায় আমরা যে ধরনের পাঠক্রম চেয়েছিলাম সে আলোকেই বর্তমান [অর্থাৎ ১৪ অধ্যায়] আলোচনা করেছি। কিন্তু বইটি লেখা হয়েছে বর্তমান পাঠক্রম অনুসরণ করেই।

২

প্রথম অধ্যায়ে দেশ ও জনগোষ্ঠির পরিচয় তুলে ধরা হয়েছে। যে দেশের ইতিহাস আমরা পড়ছি অর্থাৎ বাংলাদেশের এবং বাঙালির, তার একটি পরিচিতি দরকার। এটি না জানলে নিজেকে জানা হয় না। এ অধ্যায়ে আমরা এ দেশের ভূপ্রকৃতির বৈশিষ্ট্য আলোচনা করেছি। যে বিষয়টিতে গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে তা হলো এই ভূপ্রকৃতি প্রাচীন কাল থেকে কীভাবে বিবর্তিত হয়েছে এবং কীভাবে তা বাঙালি মানস গঠনে প্রভাব ফেলেছে। আলোচিত হয়েছে বাঙালির নৃতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য ও ভাষা। আমাদের

www.Educationblog24.Com

জাতীয়তাবাদের একটি উপাদান বাংলা ভাষা। এ ভাষা কীভাবে বিবর্তিত হয়েছে এবং রাজনৈতিক একক হিসেবে কাজ করেছে তা আলোচনা করা হয়েছে।

বাঙালি মানস ধর্মীয় জঙ্গি মৌলবাদের বিপরীত। এর কারণ বাঙালির সংস্কৃতির সমন্বয়বাদিতা। বাঙালির প্রধান বৈশিষ্ট্য ধর্মীয় সহনশীলতা। এ বৈশিষ্ট্য এখনও বিরাজ করছে।

অভিন্ন বাংলার পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশের ইতিহাস আলোচনা করতে হবে না হলে তা হবে খন্ডিত ইতিহাস। ১৯৪৭ পর্যন্ত বর্তমান বাংলাদেশ অভিন্ন বাংলারই অন্তর্গত ছিল। ১৯৪৭ সালে তা দুটি মোটা দাগে বিভক্ত করা হয়। পশ্চিমবঙ্গ একটি রাজ্য হিসেবে ভারতে অন্তর্ভুক্ত হয়। বাংলাদেশ পূর্ববঙ্গ হিসেবে পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হয়। পরে এর নামকরণ করা হয় পূর্ব পাকিস্তান। তবে, পূর্ববঙ্গ, পূর্ববাংলা পূর্ব পাকিস্তানের সমার্থক হিসেবে প্রচলিত ছিল।

পশ্চিমবঙ্গ ও বাংলাদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ বাঙালি সংস্কৃতি ও ভাষার অন্তর্গত। কিন্তু, তা সত্ত্বেও অষ্টম শতক থেকে লক্ষ্য করি বর্তমান বাংলাদেশের স্বকীয় একটি সত্ত্বা বিকশিত হচ্ছিল। আলোচনাকালে পূর্ববঙ্গ/বাংলাদেশকে বাংলা থেকে একেবারে আলাদা করে বিচার করা যাবে না বা সমীচীনও হবে না। ভাষা এবং জাতি হিসেবে বাঙালির 'একত্বতা' গড়ে উঠলেও পূর্ব ও পশ্চিমবঙ্গের এমন কিছু আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য আছে যা দু'টি অঞ্চলকে স্বতন্ত্র করে রেখেছে। প্রকৃতিগত দিক থেকেও দুটি অঞ্চলে পার্থক্য আছে। সে বিষয়গুলিই এখানে আলোচনা করা হয়েছে। অন্য কথায় বলা যেতে পারে এ অধ্যায়টি হলো বাংলাদেশের আম পরিচিতি। এ অধ্যায়টি রচনা করেছেন অধ্যাপক মুনতাসীর মামুন।

আমরা যে পাঠক্রম প্রথমে তৈরি করেছিলাম তাতে দ্বিতীয় অধ্যায়টির শিরোনাম ছিল **বাংলার সামাজিক ও রাজনৈতিক বৈশিষ্ট্য**। নিজেদের সমাজ-সংস্কৃতির বিষয়টি জানলে সমাজকে বোঝা সহজ হয়। রাজনৈতিক বৈশিষ্ট্য বুঝলে রাজনীতির ধারা বোঝা সহজ হয়।

সামাজিক ধারার বিষয়টি দু'ভাবে আলোচিত হতে পারে। প্রথমে, লোকজ সামাজিক বৈশিষ্ট্য। কারণ, বাঙালির জীবনে বিশেষ ধর্মীয় আচারে লোকজ সংস্কৃতির একটি বিশেষ প্রভাব লক্ষণীয়। সমাজে আবার শ্রেণিগত প্রাধান্য বজায় রাখার স্বার্থে সময়ের ধারাবাহিকতায় সামাজিক কুসংস্কার, কলুষেরও সৃষ্টি হয়েছে। সে কারণে, বিভিন্ন সময় সামাজিক ধর্মীয় (যা সমাজের অন্তর্গত) সংস্কারের প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হয়েছে। উনিশ শতকে এ প্রচেষ্টা বিশেষ গুরুত্ব লাভ করে। উনিশ শতকে বিভিন্ন সমাজ সংস্কারের ফলে যে ঘাত-প্রতিঘাতের সৃষ্টি হয় তা-ই বাংলার আধুনিক যুগের সূত্রপাত করে।

বাংলাদেশে ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধ হঠাৎ শুরু হয়নি। এর একটি ধারাবাহিকতা আছে। বাঙালির রাজনৈতিক সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্য দ্রোহ যা আমাদের রাষ্ট্র গঠনেরও একটি উপাদান।

ঔপনিবেশিক শাসকের বিরুদ্ধে দীর্ঘদিন সমাজের বিভিন্ন শ্রেণি আন্দোলন করেছে।

www.Educationblog24.Com

প্রতিরোধের এই সংস্কৃতি পরিণতি লাভ করে ১৯৭১ সালে। মুক্তিযুদ্ধের পরও অপশাসনের বিরুদ্ধে মানুষ সব সময় আন্দোলন করে আসছে। সেইসব প্রতিরোধের বিশেষ কয়েকটি আলোচনার কথা ছিল উদাহরণ হিসেবে।

ভারতীয় তথা বাংলার রাজনীতিতে সাম্প্রদায়িকতাবোধ চরমে ওঠে বিশ শতকে। বিশেষ করে দ্বিজাতি তত্ত্বের উদ্ভবের কারণে। এটি আমাদের ইতিহাসে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, পরবর্তীকালের রাজনীতির মূল বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে দ্বিজাতিতত্ত্বের বিকাশ ও এর প্রতিরোধ প্রচেষ্টা। এই আলোকে আলোচনার কথা ছিল তৃতীয় অধ্যায়ে যার শিরোনাম **সাম্প্রদায়িক রাজনীতি ও দ্বিজাতি তত্ত্ব : উদ্ভব ও বিকাশ**।

১৯৪৭ সালেই যে সাম্প্রদায়িকতার উদ্ভব হলো তা নয়। ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক আমলে বৃটিশ শাসকরা সাম্প্রদায়িকতা বিভিন্ন ফর্মে আমদানি করেছিলেন। যেমন ব্রিটিশ সিভিলিয়ান ও ঐতিহাসিক আলফ্রেড লায়াল সবসময় ভারতীয় সমাজ কাঠামোর ভিত্তি হিসেবে বর্ণ ও ধর্মকে মাপকাঠি হিসেবে ধরেছিলেন। তাঁর মতে, ভারতীয় সমাজের চাবিকাঠি হলো ধর্ম। শুধু তাই নয় ব্রিটিশ শাসনের স্বার্থে এগুলিকে অক্ষুন্ন রাখা উচিত। তিনি আরো লিখেছিলেন (১৮৭২), ভারতের চব্বিশ কোটি লোক রক্ত বর্ণ ও ধর্মের ভিত্তিতে বিভক্ত। সুতরাং, এই বিভক্তি যা ব্রিটিশ শাসনের স্তম্ভ তা অটুট রাখাই শ্রেয় এবং ১৯৪৭ পর্যন্ত তারা তা রেখেছিলও।

উনিশ শতকের শেষার্ধে কংগ্রেস ও বিশ শতকের শুরুতে মুসলিম লীগের উদ্ভব। কংগ্রেস ক্রমেই ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামের ধারক বাহক হয়ে ওঠে, মুসলিম লীগ প্রথমে মুসলমানদের স্বার্থের ধারক বাহক হয়ে উঠলেও পরে দ্বিজাতি তত্ত্বের ভিত্তিতে পাকিস্তান আন্দোলনের অগ্রদূত হয়ে ওঠে। এর বিপরীতে আবার হিন্দুত্ববাদী সংগঠন সমূহের উদ্ভব হয়। বিশ শতকের গোড়ার দিক পর্যন্ত যা ছিল আপাতদৃষ্টিতে সরল রাজনীতি তা হয়ে ওঠে জটিল।

এ সময় রাজনীতির আরেকটি ধারা তরুণদের উজ্জীবিত করেছিল যা আমাদের ইতিহাস আলোচনায় সাধারণতঃ এড়িয়ে যাওয়া হয়। কিন্তু ভারতীয়/বাংলা/পূর্ববঙ্গের ইতিহাস আলোচনায় এই ধারা যা মার্কসবাদী বা বামধারা হিসেবে পরিচিত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তৎকালীন তরুণদের (রুশ বিপ্লবের পর) এই ধারা দারুণভাবে অনুপ্রাণিত করেছিল। এই ধারা কৃষক-শ্রমিক স্বার্থ সংহত করেছে, অসাম্প্রদায়িকতার ভিত্তি স্থাপনে সচেষ্ট থেকেছে। কিন্তু অন্তিমে কংগ্রেস ও মুসলিম রাজনীতির দ্বৈরথে এটি শক্তিশালী হয়ে উঠতে পারেনি। কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ সামগ্রিকভাবে এই ধারার আধিপত্যের বিরোধী ছিল। এই পর্বে উল্লেখযোগ্য ঘটনা ১৯৪০ সালে লাহোর প্রস্তাব যা পাকিস্তান প্রস্তাব হিসেবেও পরিচিত। এরপরই পাকিস্তান আন্দোলন জোরদার হয়ে ওঠে ও ভারত বিভক্ত হয়ে দুটিই রাষ্ট্রের সৃষ্টি হয়– ভারত ও পাকিস্তান।

আমাদের জাতীয় ইতিহাসে ১৯৪৭ সাল গুরুত্বপূর্ণ। আমাদের মুক্তিযুদ্ধের পটভূমি হিসেবে আমরা বিবেচনা করি ১৯৪৭ থেকে পরবর্তী ২৪ বছর। ১৯৪৭ সালে ভারত

www.Educationblog24.com

বিভক্ত হওয়ার সময় আরেকটি ঘটনা ঘটে তাহলো অভিন্ন বাংলাকে নিয়ে আরেকটি রাষ্ট্র গঠনের প্রস্তাব। এ বিষয়টি আমাদের ইতিহাসে প্রায় অনালোচিত। আমাদের পটভূমি রচনায় এই বিষয়টিকে আমরা বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছি। বাঙালির আলাদা রাষ্ট্র গঠনের এটিই প্রথম প্রস্তাব। এ প্রস্তাব গুরুত্বপূর্ণ এ কারণে যে কংগ্রেস নেতা শরৎ বসু ও মুসলিম লীগ নেতা শহীদ সোহরাওয়ার্দী যৌথভাবে এ প্রস্তাব করেছিলেন। কিন্তু কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের মূল নেতৃত্ব এই প্রস্তাব নাকচ করে দেয়। এ দুটি বিষয়কে আলাদা দু'টি অধ্যায় না করে বর্তমান পাঠক্রমে একটি অধ্যায়ে [দ্বিতীয় অধ্যায়ে] আনা হয়েছে। পাঠক্রমে চারটি উপ অধ্যায় থাকলেও আমরা মোটামুটি বিস্তারিত আলোচনা করেছি। এর একটি অংশ লিখেছেন মুনতাসীর মামুন বাকি অংশ লিখেছেন মো. মাহবুবর রহমান। অধ্যায়টির শিরোনাম **'অখণ্ড বাংলা গঠনের প্রয়াস ও উপমহাদেশের বিভক্তি, ১৯৪৭।'**

১৯৪৭ সালে সৃষ্টি হলো পাকিস্তানের। এক প্রান্তে পশ্চিম পাকিস্তান। তার থেকে ১২০০ মাইল দূরে পূর্ববঙ্গ/পূর্ব পাকিস্তান। দু'টি অঞ্চলের প্রকৃতি, মানুষ, ভাষা, সৃষ্টি সব আলাদা, বন্ধনের মূল উপাদান ধর্ম, ইসলাম ধর্ম। ধর্ম কখনও জাতীয়তার ভিত্তি হতে পারে না। এই সত্য পাকিস্তান আন্দোলনের নেতারা মানতে চাননি। ভারতের অন্যতম কংগ্রেস নেতা মৌলানা আবুল কালাম আজাদ ১৯৪৩ সালে ভবিষ্যৎবাণী করেছিলেন, পাকিস্তান টিকবে না, ২৫ বছরের মধ্যেই তা ভেঙে যাবে। কারণ, বাঙালি বহিরাগত নেতৃত্ব খুব একটা পছন্দ করে না। তারপর পাকিস্তানে শুরু হবে হানাহানি ও তা আন্তর্জাতিক শক্তিসমূহের ক্রীড়াক্ষেত্র হয়ে উঠবে। মওলানার প্রতিটি ভবিষ্যৎবাণী সত্য হয়েছে।

পাকিস্তানের রাষ্ট্রীয় কাঠামোর মধ্যেই নিহিত ছিল বৈষম্যের বীজ। শাসকরা ছিলেন অবাঙালি। তারা বাঙালিদের সর্বক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রণ করতে চেয়েছিলেন। তৎকালীন পূর্ববঙ্গের তারা বিকাশ বা উন্নয়ন চাননি। ব্রিটিশ আমলের মতোই পূর্ববঙ্গকে তারা কাঁচামালের আড়ত বা হিন্টারল্যান্ড হিসেবে বিবেচনা করেছিলেন।

বাংলাদেশ সৃষ্টির অন্যতম কারণ অর্থনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে বৈষম্য এবং অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে শোষণ। দমন-নিপীড়নের মাধ্যমে বাঙালিকে দমিয়ে রাখার চেষ্টা।

বাংলাদেশ কেন হলো তা বোঝার জন্য নতুন এই ঔপনিবেশিক শাসন ও শোষণের স্বরূপটি বোঝা জরুরি। সে কারণেই বর্তমান পাঠক্রমের তৃতীয় অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে **'পাকিস্তান রাষ্ট্রীয় কাঠামো ও বৈষম্য'**। এই অধ্যায়টি রচনা করেছেন অধ্যাপক মো. মাহবুবর রহমান।

এটা খুবই আশ্চর্য যে, যে সব তরুণরা পাকিস্তানের জন্য আন্দোলন করেছিলেন, সেই বাঙালি তরুণদের একাংশের ১৯৪৮ সালের মধ্যেই পাকিস্তান সম্পর্কে মোহভঙ্গ হয়েছে। ছাত্র নেতা শেখ মুজিবুর রহমান কলকাতা থেকে ফিরে এলেন ঢাকায়। কমরুদ্দীন আহমদ, তাজউদ্দীন আহমদ, অলি আহাদ প্রমুখ নতুন রাজনীতির কথা চিন্তা করতে লাগলেন। তরুণ লেখক, সাংবাদিক, শিল্পীরাও একত্রিত হতে লাগলেন।

www.Educationblog24.Com

পাকিস্তানী শাসকদের বৈষম্যমূলক আচরণ ইতোমধ্যে তারা অনুভব করেছিলেন। ১৯৪৭ সালে মুসলিম লীগই ছিল প্রধান রাজনৈতিক দল, একমাত্র দলও বলা যেতে পারে। ১৯৪৮ থেকেই মুসলিম লীগের অপশাসনের বিরুদ্ধে ক্ষোভ ঘনীভূত হতে থাকে। গঠিত হয় আওয়ামী মুসলিম লীগ। শেখ মুজিব প্রতিষ্ঠা করেন ছাত্রলীগের। সাংস্কৃতিক সংগঠনও গড়ে উঠতে থাকে। মুসলিম লীগের বিরুদ্ধে গণতান্ত্রিক রাজনীতির সংগ্রামের সূচনা হতে থাকে যার বর্হিপ্রকাশ ঘটে ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন।

১৯৪৭ পরবর্তী সব ধরনের আন্দোলনের মাতৃকা হিসেবে বিবেচনা করা হয় ভাষা আন্দোলন। এ আন্দোলন শুধু ভাষার আন্দোলনই ছিল না। শ্রমিক-মধ্যবিত্তের দাবি দাওয়ার বিষয়টিও জড়িত ছিল এর সঙ্গে। ভাষা আন্দোলনের শুরুটা ১৯৪৮ সালে। পাকিস্তানের অনেক নীতি নির্ধারক বলেছেন, যেদিন মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ বললেন, উর্দু একমাত্র উর্দুই হবে রাষ্ট্রভাষা এবং ছাত্ররা প্রতিবাদে বললেন, না, সেদিনই পাকিস্তানের ভাঙন সূচিত হয়েছিল।

বাঙালির জাগরণের কাল হিসেবে ১৯৪৮-৫২ সাল গুরুত্বপূর্ণ।

মুসলিম লীগের অপশাসনের বিরুদ্ধে প্রথম জন প্রতিবাদ ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন। এরপর বাঙালির ক্রোধ আরো বাড়তে থাকে। ১৯৫৪ সালের নির্বাচনকে সামনে রেখে রাজনৈতিক দলগুলি একত্রিত হতে থাকে। গঠন করা হয় যুক্তফ্রন্ট। ১৯৪৭ সালের পর এই প্রথম গণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা নেয়া হয়। আওয়ামী লীগ ছিল এর উদ্যোক্তা। নির্বাচনে মুসলিম লীগ সম্পূর্ণভাবে ধরাশায়ী হয়। এ ঘটনা বিচলিত করে তোলে কেন্দ্রীয় শাসকদের। তারা যুক্তফ্রন্ট পতনের জন্য নানা ষড়যন্ত্র শুরু করে এবং তার সঙ্গে শরিক হয়ে পড়ে কিছু বাঙালি রাজনীতিবিদও। যুক্তফ্রন্টের পতন হয়। নানা ঘাত-প্রতিঘাতের পর ১৯৫৬ সালে পাকিস্তানের প্রথম সংবিধান গৃহীত হয় যেখানে পাকিস্তানকে ইসলামী প্রজাতন্ত্র হিসেবে ঘোষণা করা হয়। সেই থেকে পাকিস্তানের রাজনীতিতে প্রবলভাবে ধর্মের ব্যবহার শুরু হয়। পূর্ববঙ্গের নাম বদলে রাখা হয় পূর্ব পাকিস্তান। এ পুরো সময়কালটা আমাদের *প্রস্তাবিত* পাঠ্যসূচিতে দুটি অধ্যায়ে [চতুর্থ ও পঞ্চম] বিভক্ত করা হয়েছিল। বর্তমান পাঠক্রমে তা একটি অধ্যায়ে অর্থাৎ চতুর্থ অধ্যায়ে বিধৃত হয়েছে। আলোচনাটি আমরা বিস্তারিতভাবে করেছি যদিও মূল অধ্যায়টি মাত্র চারটি উপ অধ্যায়ে ভাগ করা হয়েছে। বর্তমান পাঠক্রমে এ অধ্যায়ের শিরোনাম **'ভাষা আন্দোলন ও বাঙালির আত্মপরিচয় প্রতিষ্ঠা'**। এ অধ্যায় রচনা করেছেন অধ্যাপক মো. মাহবুবর রহমান।

পঞ্চম অধ্যায়ের শিরোনাম– **'সামরিক শাসন : আইয়ুব খান ও ইয়াহিয়া খানের শাসনামল।'**

সামরিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে পাকিস্তানের সেনাপতি মোহাম্মদ আইয়ুব খান ১৯৫৮ সালে ক্ষমতা দখল করে সামরিক আইন চালু করেন। সেই থেকে ১৯৭১ সাল পর্যন্ত পাকিস্তান ছিল সেনাবাহিনীর অধীন। উপমহাদেশে এ ধরনের ঘটনা প্রথম। আইয়ুব খান ক্ষমতা দখল করে পাকিস্তানের সমস্ত ব্যর্থতার দায়ভার রাজনীতিবিদদের ওপর চাপিয়ে দেন। প্রমাণ করেন রাজনীতিবিদরা দেশ চালাতে অক্ষম। সেনাবাহিনীই একমাত্র সক্ষম

www.Educationblog24.Com

শক্তি। সব সামরিক শাসকরাই এ ধরনের উক্তি করেন। রাজনৈতিক নিপীড়ন এ সময় প্রধান বৈশিষ্ট্য হয়ে দাঁড়ায়। আইয়ুব খান নতুন এক ধরনের 'গণতন্ত্র' প্রতিষ্ঠা করেন যার নাম দেয়া হয় 'মৌলিক গণতন্ত্র'। কোন আন্দোলন শুরু হলেই বলা হতো– ইসলামের বিরুদ্ধে আন্দোলন। আন্দোলনকারীদের বলা হতো ভারতীয় চর। বস্তুত এই সময় থেকে পাকিস্তানীরা প্রবলভাবে বাঙালি মুসলমানদের আধা হিন্দু ও ভারতীয় চর হিসেবে শুধু বিবেচনা নয় প্রচার করতে থাকে। ইসলামিকরণ হয়ে দাঁড়ায় সামরিক শাসকদের প্রধান কর্ম। পরবর্তীকালে বাংলাদেশের সামরিক শাসকরাও পাকিস্তানী কায়দায় এই ধোঁকাবাজি করেছে।

আইয়ুব খান নিপীড়নমূলক কর্মকাণ্ড চালিয়েও বাঙালিদের দমাতে পারেননি। তার শাসন বাঙালি ছাত্ররাই প্রথম চ্যালেঞ্জ করে। চ্যালেঞ্জ করে শিল্পী-সাহিত্যিকরা, তারপর রাজনীতিবিদরা। আইয়ুবের পতন হয় ১৯৬৮ সালে। এরপর নির্বাচনের পূর্ব পর্যন্ত ইয়াহিয়া খান একইভাবে শাসন চালিয়ে যান। এ সময় কালটুকুকে মুক্তিযুদ্ধের তাৎক্ষণিক পটভূমি হিসেবে বিবেচনা করা যেতে পারে। এ অধ্যায়টিও লিখেছেন অধ্যাপক মো. মাহবুবর রহমান।

১৯৫৮-৬৯ সময়টুকুকে উল্লেখ করেছি মুক্তিযুদ্ধের তাৎক্ষণিক কারণ হিসেবে। সামরিক শাসন দিয়ে বাঙালিকে দমিত করতে পারবেন বলে মনে করেছিলেন আইয়ুব খান। কিন্তু বাঙালি দমেনি। আইয়ুবি আমলে সাংস্কৃতিক শোষণ ও নিপীড়নের বিরুদ্ধে বাঙালি সাংস্কৃতিক কর্মীরা সবার আগে প্রতিবাদ করেন। বাঙালি সংস্কৃতির ইসলামিকরণ প্রচেষ্টার নানাবিধ কৌশল নেয়া হয় এ সময়। যেমন বাংলা বর্ণমালা পরিবর্তন, রবীন্দ্রনাথকে নিষিদ্ধ করা ইত্যাদি। সংস্কৃতির বিরুদ্ধে এই আগ্রাসন প্রতিরোধে এগিয়ে আসেন সংস্কৃতি কর্মীরা। সাধারণ মানুষও সমর্থন করেন তাদের। আইয়ুবের বিরুদ্ধে জনমত সংহত করণেও তারা এগিয়ে আসেন। বাঙালি সংস্কৃতির উজ্জীবনে ছায়ানটের মতো প্রতিষ্ঠা করা হয় অনেক সংগঠনের। বাঙালি রুখে দাঁড়াতে থাকে।

আমাদের জাতীয় ইতিহাসে এই গুরুত্বপূর্ণ ন্যারেটিভ বা বয়ানটি প্রায়ই উপেক্ষা করা হয়। আমরা মনে করি, রাজনীতিকে এভাবে বিযুক্ত করা যাবে না। সমাজ রাজনীতি সব কিছুই অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। সে জন্য প্রথমে পাঠক্রম তৈরি করেছিলাম তাতে এ বিষয়ে একটি অধ্যায় লেখার কথা ছিল যা বাদ গেছে বর্তমান পাঠক্রমে

বাঙালি সংস্কৃতির উজ্জীবন বাঙালি জাতীয়তাবাদকে পরিপুষ্ট করে। আর রাজনীতি তাকে এগিয়ে নেয়। আমাদের ইতিহাসেও তাই ঘটেছে। সংস্কৃতিরা যখন সাংস্কৃতিক আগ্রাসন প্রতিহত করছেন তখন রাজনীতিবিদরাও এগিয়ে এসেছেন। এ সময়কালে সবচেয়ে বড় ঘটনা শেখ মুজিবুর রহমানের ছয় দফা আন্দোলন ও আগরতলা মামলা।

ছয় দফা ক্রমে বাঙালির শ্লোগান হয়ে দাঁড়ায়। ব্যাপক আন্দোলন গড়ে উঠে ছয় দফাকে কেন্দ্র করে। শেখ মুজিবুর রহমান হয়ে ওঠেন বাংলাদেশের রাজনীতির প্রধান নায়ক। মূলতঃ তাকে দমানোর জন্যই করা হয় আগরতলা মামলা। শেখ মুজিবকে অন্তরীণ করে স্পেশাল ট্রাইব্যুনালে বিচার শুরু হয়।

www.Educationblog24.Com

কিন্তু এত কিছুও ছয়দফার গুরুত্বকে ম্লান করতে পারেনি। এ সময়টুকু বিধৃত হয়েছে বর্তমান পাঠক্রমের ষষ্ঠ অধ্যায়ে যার শিরোনাম–**'জাতীয়তাবাদের বিকাশ ও স্বাধিকার আন্দোলন।'** যৌথভাবে এ অধ্যায় লিখেছেন অধ্যাপক মুনতাসীর মামুন ও অধ্যাপক মাহবুবর রহমান।

বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক আন্দোলনে ভাষা আন্দোলন ও ছয় দফার পরই উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থানের স্থান। এ দেশের ইতিহাসে একটি মাইলফলক যা বাঙালিকে শুধু অনুপ্রাণিত নয় দু'বছর পর পশ্চিমা শাসকদের বিরুদ্ধে লড়াইতেও সাধারণকে উদ্বুদ্ধ করেছে।

আগরতলা মামলা শুরু হতেই গণ অসন্তুষ্টিই দেখা দেয়। আওয়ামী লীগের ছয় দফা তো ছিলই, ১৯৬৯ সালের আগে ছাত্ররা দেয় ১১ দফা এবং একই সঙ্গে শেখ মুজিবের মুক্তি দাবি ওঠে। মামলার কার্যক্রম যতই এগুতে থাকে, আন্দোলনও ততো ঘনীভূত হতে থাকে। মওলানা ভাসানী এই আন্দোলনে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। ক্রমে এই আন্দোলনে সমস্ত দেশ উত্তাল হয়ে ওঠে, একই সঙ্গে পশ্চিম পাকিস্তানেও আন্দোলন শুরু হয়। ২৪ জানুয়ারি ১৯৬৯ সালে কেন্দ্রীয় শাসন যেন রহিত হয়। আইয়ুব খান পদত্যাগ করেন। এই আন্দোলন গণঅভ্যুত্থান আখ্যা লাভ করে। কারণ, তা তৃণমূল পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ে। সরকারপক্ষীয়রা ছত্রখান হয়ে পড়ে। ১১ দফা আর ছয় দফা দাবিই হয়ে ওঠে মুখ্য বিষয়। এই পটভূমি সামরিক শাসক ইয়াহিয়াকে বাধ্য করে এক ইউনিট ভেঙ্গে দিয়ে সাধারণ নির্বাচন আহ্বান। এই একটি বিষয় বা ঘটনা ও এর তাৎপর্য নিয়ে বর্তমান পাঠক্রমের সপ্তম অধ্যায় **১৯৬৯ এর গণঅভ্যুত্থান ও ১১ দফা আন্দোলন** রচনা করেছেন অধ্যাপক মুনতাসীর মামুন।

(৩)

বর্তমান পাঠক্রমের অষ্টম অধ্যায় **১৯৭০ এর নির্বাচন অসহযোগ আন্দোলন ও বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতা ঘোষণা** আমাদের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। বলা যেতে পারে, মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসের শুরু এ সময় থেকেই। আলোচনাটি এভাবে সাজানো হয়েছে– সাধারণ নির্বাচন, আওয়ামী লীগের একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ, নির্বাচনের রায় মেনে নিতে সামরিক জান্তার অস্বীকৃতি। তারপরও বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে পশ্চিমা শাসক ও রাজনীতিবিদদের আলোচনা। তারপর আছে অসহযোগ আন্দোলন। কেন্দ্র ইতিবাচক আলোচনা না করে বরং দমন নিপীড়নের আশ্রয় নেয়। ১ মার্চ থেকে বঙ্গবন্ধুর আহ্বানে শুরু হয় অসহযোগ আন্দোলন। কার্যতঃ কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতা রহিত হয়। বঙ্গবন্ধু ও আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে দেশ চলতে থাকে। এ পরিপ্রেক্ষিতে বঙ্গবন্ধু তাঁর ঐতিহাসিক ৭ মার্চের ভাষণ প্রদান করেন যা ছিল প্রকারান্তরে স্বাধীনতা ঘোষণা। মানুষ স্বাধীনতার লড়াইয়ের জন্য মানসিকভাবে প্রস্তুত হয়ে ওঠে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব হয়ে ওঠেন বাংলাদেশের অবিসংবাদিত নেতা। ২৫ মার্চ রাতে ইয়াহিয়া ঢাকা থেকে পালান, ভুট্টোও। শুরু হয় 'অপারেশন সার্চলাইট' বা গণহত্যা। ২৫ মার্চ মধ্যরাতে বা ২৬ মার্চ

www.Educationblog24.com

বঙ্গবন্ধু ঘোষণা করেন স্বাধীনতার ঘোষণা। তারপরই তিনি গ্রেফতার হন। এরপর তার স্বাধীনতা ঘোষণা ও গ্রেফতারের বিষয় আলোচনা করা হয়েছে। এ অধ্যায়টি লিখেছেন অধ্যাপক মাহবুবর রহমান।

বলা যেতে পারে ২৫ মার্চ মধ্যরাত থেকেই মুক্তিযুদ্ধ শুরু হয়। একদিকে পাকিস্তানী সেনারা যেমন গণহত্যা, ধর্ষণে নেমে পড়ে, অন্যদিকে সাধারণ মানুষও স্বত:স্ফূর্ত প্রতিরোধ শুরু করে। মুক্তিযুদ্ধের পুরো সময়টা নবম অধ্যায়ে বিধৃত হয়েছে মুক্তিযুদ্ধ ১৯৭১ শিরোনামে। এখানে সব উপ-অধ্যায়গুলিও আলোচিত হয়েছে। তবে উপ অধ্যায়ের শিরোনাম দেয়া হয় নি। একটানা বিবরণ লেখা হয়েছে। এখানে উল্লেখ্য যে পাঠক্রম অনুযায়ী সব অধ্যায়েই উপ-অধ্যায়ের শিরোনাম দেয়া হয়নি। কারণ আলোচনা সব সময় একটি শিরোনামের অধীনে সীমিত রাখতে চাইনি গাইড বুকের মতো।

মাত্র নয় মাসের ঘটনায় কিন্তু ঐ সময় এত কিছু ঘটেছে যা একটি অধ্যায়ে আলোচনা করা দুঃসাধ্য। বিভিন্ন পাঠ্য পুস্তকেও এ অধ্যায় আলোচনা করার সময় গুরুত্বপূর্ণ কিছু বিষয় বাদ পড়ে গেছে। সে জন্য আমরা একটি রূপরেখা তৈরি করে তার আলোকে মুক্তিযুদ্ধ ১৯৭১ আলোচনা করেছি।

মুক্তিযুদ্ধের দুটি দিক আছে–

এক. গণহত্যা, নারী নির্যাতন যেখানে পাকিস্তানী হানাদার বাহিনীর সঙ্গে যোগ দিয়েছে রাজাকার, আলবদর, দালালরা। অন্যদিকে বাংলাদেশ সরকারের অধীনে একটি গনযুদ্ধ পরিচালনা। যে কারণে আমরা যে রূপরেখাটি তৈরি করেছি তা হলো এ রকম– গণহত্যা, নারী নির্যাতন, শরণার্থী; বাংলাদেশ সরকার গঠন ও স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র, প্রতিরোধ, প্রচার, জনযুদ্ধ; বৃহৎ ও ইসলামী রাষ্ট্রসমূহের ভূমিকা; দখলদার বাহিনী ও তাদের সহযোগীদের গণহত্যা নিপীড়ন; প্রবাসী বাঙালি, বিভিন্ন দেশের নাগরিক সমাজ ও ভারতের অবদান; সবশেষে যৌথ বাহিনী গঠন ও বিজয়।

একটি বিষয় আমাদের বারবার মনে করিয়ে দেয়া উচিত ও মনে রাখা উচিত যে, এ দেশটির জন্য ত্রিশ লক্ষ শহীদ হয়েছিলেন। শরণার্থীও কম মারা যাননি। এসব কিছু ধরলে শহীদের সংখ্যা ত্রিশ লাখ ছাড়িয়ে যাবে। নির্যাতিত নারীর সংখ্যা বলা হয় দু'লক্ষ। আমার গবেষণায় এটি ছয় লক্ষের কাছাকাছি। তারা যে রাষ্ট্রের জন্য শহীদ হয়েছিলেন, নির্যাতিত হয়েছিলেন সে রাষ্ট্রের চরিত্র বদলে ফেললে তা হবে তাদের অবমাননা ও এক ধরনের রাষ্ট্রদ্রোহিতা।

যুদ্ধ জয়ে মুক্তিযোদ্ধাদের অবদান সবচেয়ে বেশি, অর্থাৎ যারা সরাসরি লড়াই করেছেন। কিন্তু অবরুদ্ধ মানুষ নিয়ত সহায়তা করেছেন মুক্তিযোদ্ধাদের, বিদেশে বাঙালি ও বিদেশী নাগরিকরা বাংলাদেশের জন্য সংগ্রাম করেছেন। তারাও মুক্তিযুদ্ধের সহযোগী। আমাদের ঘৃণা থাকবে পাকিস্তানের সহযোগীদের প্রতি যারা কখনও বাংলাদেশ মেনে নেয়নি। তাদের এ দেশে রাজনীতি করার কোন অধিকার নেই যদিও আমরিক শাসকরা তাদের সে অধিকার দিয়েছিল। যুদ্ধাপরাধের বিচার সমর্থন করা তাই

www.Educationblog24.Com

ণপ্রেমিকের কর্তব্য। এই বিচার নিয়ে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করা, বিরুদ্ধাচরণ করা এক ধরনের
রাধ। আজ শহীদদের আত্মত্যাগের বিনিময়ে এ রাষ্ট্র যদি গঠিত না হতো তাহলে
মরা ক্রীতদাসই থাকতাম। এ কথা আমাদের সব সময় স্মরণ রাখতে হবে। এবং এ
রণেই আমরা জাতীয় ইতিহাস অবশ্য পাঠ্য করার জন্য দেড় যুগ ধরে আন্দোলন
রছি। যাতে নতুন প্রজন্ম জানতে পারে, স্বাধীনতা কেবল চারটি অক্ষরের সমাহার মাত্র
। এ অধ্যায়টি লিখেছেন অধ্যাপক মুনতাসীর মামুন।

সর্বশেষ অধ্যায় দশম অধ্যায় যেখানে **১৯৭২-থেকে ১৯৭৫ পর্যন্ত বঙ্গবন্ধুর** নকাল আলোচিত হয়েছে। বঙ্গবন্ধু তাজউদ্দীন আহমদের কাছ থেকে শাসনভার য়ছিলেন। ১৯৭৩ সালে নির্বাচনের পূর্ব পর্যন্ত ১৯৭১ সালের সরকারই কিন্তু লাদেশ শাসন করেছে।

বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশ আন্দোলন গড়ে তুলেছিলেন, তাঁর নামে তাজউদ্দীন আহমদের ত্বে যুদ্ধ হয়েছে, যুদ্ধে আমরা বিজয়ী হয়েছি। তিনি জাতির জনকে পরিণত ছেন। পাকিস্তানের বন্দীদশা থেকে ফিরে যুদ্ধ বিধ্বস্ত দেশটি তিনি পুনর্গঠন ছিলেন। আমরা ঐ জেনারেশনের তরুণ। আজকের তরুণ বর্তমান বাংলাদেশ দেখে না করতে পারবে না ১৯৭১ সালে হানাদার পাকিস্তানি বাহিনী ও তাদের দোসররা কী ছিল বাংলাদেশের। কিছুই ছিল না সে দেশে। বঙ্গবন্ধু সে দেশকে একটি শক্তভিত্তির র দাঁড় করিয়ে দিয়েছিলেন।

বঙ্গবন্ধুর সবচেয়ে বড় কৃতিত্ব মাত্র নয় মাসের মধ্যে দেশকে একটি সংবিধান দেয়া। কোন দেশে নয় মাসের মধ্যে কোন সংবিধান রচিত হয়েছে বলে আমার জানা নেই। ংবিধানের বিশেষত্ব ছিল চারটি মূলনীতি যার অন্যতম ছিল ধর্ম নিরপেক্ষতা যা দক্ষিণ য়ার কোন দেশে ছিল না। তিনি ধর্ম নিয়ে রাজনীতি নিষিদ্ধ করেছিলেন কারণ, ধর্ম । রাজনীতি এক ধরনের শোষণ যা আমরা পাকিস্তান আমলে দেখেছি। ধর্ম নিয়ে নীতি ধর্ম বিরুদ্ধও। সে কারণে, তিনি তা নিষিদ্ধ করেছিলেন যে সাহস তৎকালীন কেউ দেখাতে পারেননি।

বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশ সে সময় ছিল সমার্থক। মুক্তিযুদ্ধের মূল্যবোধগুলি সংযোজিত ছিল সংবিধানে। বৃহৎ রাষ্ট্র যেমন চীন, যুক্তরাষ্ট্র, ইসলামী রাষ্ট্রসমূহ যেমন সৌদি ব, বাংলাদেশ সৃষ্টিকে মেনে নিতে পারেনি। তাদের বিরোধিতা সত্ত্বেও বাংলাদেশের লড়াই করে বিজয় ছিনিয়ে এনেছিল যা তারা পছন্দ করেনি, অপমানিত বোধ ছে। দেশে স্বাধীনতা বিরোধী ও তাদের সহযোগী পাকিস্তানীমনারা ছিল। এদের ষড়যন্ত্রে বঙ্গবন্ধুকে সপরিবারে হত্যা করা হয়। কারণ বঙ্গবন্ধু ছিলেন বাংলাদেশ, যুদ্ধের মূল্যবোধের প্রতীক।

খুনিরা ক্ষমতায় গিয়ে সংবিধান সংশোধন করে, দেশকে ক্রমে পাকিস্তানের কাছি নেয়ার চেষ্টা করে। প্রায় তিন জেনারেশনকে বঙ্গবন্ধু ও মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে ত দেয়া হয়নি। মানসিকভাবে উদ্বাস্তু জেনারেশন তৈরি করা হয় যাতে তাদের নের ভিত্তি শক্ত হয়। সব শেষে পাকিস্তানের মতো ধর্মকে রাজনীতিতে নিয়ে আসা

www.Educationblog24.Com

হয় যার ফলে দেশে এক চরম অস্থিতিশীলতা বিরাজ করছে। আমাদের মনে রাখা উচিত ধর্মের রাজনীতিকরণের ফলে ১৯৭১ সালে পাকিস্তান শুধু বিভক্তই হয়নি এখন তার অস্তিত্বও হুমকির সম্মুখীন। এ অধ্যায়টি লিখেছেন অধ্যাপক মাহবুবর রহমান।

১৯৭৫ সাল সে জন্য একটি মাইলফলক। ১৯৭৫ সাল থেকে এখন পর্যন্ত লড়াইটা চলছে পাকিস্তানীকরণ থেকে বাংলাদেশকে মুক্ত করার লড়াই। আমাদের গ্রন্থের শেষও এখানে।

(৪)

প্রতিটি অধ্যায়ের জন্য বাংলা রেফারেন্স বই আছে। আমরা সব বইয়ের তালিকা না দিলেও প্রত্যেক অধ্যায়ের শেষে সহায়ক গ্রন্থের নামের তালিকা দেয়া আছে। উৎসাহী ছাত্র/পাঠক কৌতুহল মেটাবার জন্য সে সব বই পড়ে নিতে পারেন।

আমরা আগেই উল্লেখ করেছি, এই কোর্সের সিলেবাস প্রণয়নের সময় ধারণা করেছিলাম এ রকম একটি পাঠ্যসূচি হলে একজন ছাত্র/ছাত্রী মোটামুটি নিজ দেশ সম্পর্কে খানিকটা জানবে। সে কারণে বইটি সেই পাঠ্যসূচী মেনে লেখা হয়েছে।

পরবর্তীকালে আমাদের মনে হয়েছে, এ কোর্স শুধু মানবিক শাখার নয়, সব শাখাতেই অবশ্য পাঠ্য হিসেবে থাকবে। সে জন্য সব ধরনের ছাত্রছাত্রীদের কথা মনে রেখে পাঠ্যসূচি সংক্ষিপ্ত করে একাদশ অধ্যায়ে বিন্যস্ত করা হয়েছে। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় অনুমোদিত কোর্সের পাঠ্যসূচির সব কিছুই এ বইয়ে আছে। সুতরাং এ কোর্সের জন্য এ বই প্রয়োজনীয়।

এ বইটি ত্রিশ লক্ষ শহীদ, প্রায় ছয় লক্ষ বীরাঙ্গনা, অগণিত মুক্তিযোদ্ধা, বঙ্গবন্ধু, তাজউদ্দীন আহমদ, তাঁদের সহযোদ্ধাদের স্মরণ করে লেখা। আমরা তাঁদের কাছে ঋণী। সে ঋণ শোধ করা যাবে না, এ বইয়ের মাধ্যমে আমরা সে ঋণ শুধু স্বীকার করলাম মাত্র।

মুনতাসীর মামুন

ঢাকা
বিজয় দিবস
২ পৌষ ১৪২০
১৬ ডিসেম্বর ২০১৩

www.Educationblog24.com

www.Educationblog24.Com

প্রথম অধ্যায়
দেশ ও জনগোষ্ঠির পরিচয়

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর যখন লিখেছিলেন 'আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি', তখন তার মনে ছিলো আবহমান বাংলার রূপ। আর ঐ সময় সে-বাংলার সীমানা ছিলো দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর, উত্তরে তরাই। সেই ভৌগোলিক সীমানার বাংলা তো আর এখন নেই, প্রাচীনকালের মতোই আবার তা খণ্ডবিখণ্ড হয়ে গেছে। ১৯৪৭ সালে বাংলা ভাগ করে ইংরেজরা এক ভাগ (পশ্চিমবঙ্গ যার নাম) দিয়েছিলো ভারতকে, আরেক ভাগ (পূর্ববঙ্গ) পাকিস্তানকে। পাকিস্তানের ভাগে পড়া পূর্ববঙ্গ তারপর এক রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের মাধ্যমে পরিণত হয়েছিলো স্বাধীন সার্বভৌম একটি রাষ্ট্র-বাংলাদেশ-এ। কিন্তু এখনো আমরা যখন 'বাংলা' শব্দটি উচ্চারণ করি তখন আবহমান বাংলার রূপই ভেসে ওঠে আমাদের সামনে।

আবহমান যে-বাংলার কথা ভাবি আমরা, সময় সময় তার ভৌগোলিক সীমারেখাও কিন্তু বিভিন্ন সময় ছিলো বিভিন্ন রকম। প্রাচীন আমলে সেই বাংলা বিভক্ত ছিল সমতট, হরিকেল, তাম্রলিপ্তি, বঙ্গ, রাঢ়, পুণ্ড্র প্রভৃতি রাষ্ট্রে। নীহাররঞ্জন রায়ের মতে, প্রাচীন বাংলার বিভিন্ন জনপদের মধ্যে 'বঙ্গ' ও 'বাঙাল' ছিলো মাত্র দু'টি জনপদ। কিন্তু এ-দু'টি নাম থেকেই 'বর্তমান এবং মধ্যযুগীয় সমগ্র বাঙলাদেশ' নামটির উৎপত্তি। গৌড় নামের অধীনে যদিও বাংলাকে ঐক্যবদ্ধ করার চেষ্টা করেছিলেন শশাংক (আনুমানিক ৬০৬ খৃষ্টাব্দে গৌড়ের অধিপতি হয়েছিলেন তিনি) এবং পাল ও সেন রাজারা সে-চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু তা সফল হয়নি। 'সে সৌভাগ্য ঘটিল বঙ্গ নামের'। তবে তা পরিণতি লাভ করেছিলো আকবরের (১৫৫৬-১৬০৬) সময়, যখন সমগ্র বাংলা, 'সুবা বাংলা' নামে পরিচিত হয়েছিলো।

ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর সময় বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার সঙ্গে গভর্নর জেনারেল ও তাঁর কাউন্সিল দ্বারা শাসিত হতো। লেফটেনান্ট গভর্নরের অধীনে নতুন বাংলা প্রদেশের সূচনা করেছিলেন লর্ড ডালহৌসী (১৮৪৮-১৮৫৬), ১৮৫৪ সালে। বাংলা প্রদেশের উপবিভাগগুলো ছিলো– বেঙ্গল প্রপার, বিহার, উড়িষ্যা এবং ছোট নাগপুর। ঐ সময় বাংলা প্রদেশের ভৌগোলিক সীমানা ছিলো উত্তরে 'হিমালয় পর্বত শ্রেণী, পর্বতের উপত্যকায় নেপাল, ভুটান আর সিকিম রাজ্য, দক্ষিণে গর্জনমুখর বঙ্গোপসাগর, উপকূলে নোয়াখালী চট্টগ্রামের শ্যামল বন মেঘলা, পূর্বে আসাম গারো খাসিয়া জয়ান্তিয়া পাহাড়ের ধূসর দেয়াল আর পশ্চিমে বিহার আর উড়িষ্যার বনভূমি। এই ছিলো ইংরেজ আমলের বাঙলা, ৫টা বিভাগে ভাগ করা ২৮টা জেলার বাঙলা।'

১৮৭০ সালে বাংলা থেকে ব্রহ্মপুত্র উপত্যকা এবং সংশ্লিষ্ট পর্বত, কাছাড় ও সিলেট

www.Educationblog24.Com

আলাদা করে নিয়ে গঠন করা হয়েছিলো নতুন প্রদেশ আসাম। নতুন প্রদেশের শাসনকর্তা ছিলেন চিফ কমিশনার। ১৮৯৮ সালে আসামের সঙ্গে যুক্ত করা হয়েছিলো দক্ষিণ লুসাই পর্বত। ১৯০৫ সালে, মোটামুটি আজকের বাংলাদেশ ও আসাম নিয়ে গঠিত হয়েছিলো আবার পূর্ববঙ্গ ও আসাম প্রদেশ। পাকিস্তান আমলেও ১৯৫৬ সাল পর্যন্ত বর্তমান বাংলাদেশ পরিচিত ছিলো পূর্ববঙ্গ নামে (তারপর পূর্ব পাকিস্তান নামে), ১৯৭১ সালের রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের মাধ্যমে তা পরিণত হলো স্বাধীন বাংলাদেশে।

গোপাল হালদার সম্পাদিত *সোনার বাঙলা* গ্রন্থে সুন্দর একটি কথা আছে– "মানুষ মমতা দিয়ে গড়ে তার দেশকে আর দেশ আবার গড়ে সেই মানুষকে। মানুষ আর মাটির এই দেওয়া নেওয়া টানা পোড়েনেই রচিত হয় জাতির পতন-অভ্যুদয়-বন্ধুর-ইতিহাস–তার সাফল্যের দীপ্তি আর ব্যর্থতার কালিমা।"

বাংলাকে মমতা দিয়ে গড়েছে বাঙালি। প্রাচীনকালে যারা বাস করতেন এ ভূখণ্ডে তারা 'ভাষা আর সংস্কৃতির' বিশেষ ঐক্যবন্ধনে বিজড়িত 'বাঙালি' পরিচয় নিয়ে তখনও আত্মপ্রকাশ করেননি। এই 'ঐক্য বন্ধন'-এর প্রক্রিয়া শুরু হয়েছিলো মধ্যযুগে।

প্রাচীন বাংলা ইতিহাস বর্ণনা করতে গিয়ে নীহাররঞ্জন রায় লিখেছিলেন, একটি বিশেষ প্রাকৃতিক সীমার আবেষ্টনীর মধ্যেই জাতি ও ভাষার বৈশিষ্ট্য গড়ে ওঠে এবং "এই জন ও ভাষার একত্ব বৈশিষ্ট্য লইয়াই বর্তমান বাঙলাদেশ এবং সেই দেশ চতুর্দিকে বিশিষ্ট ভৌগোলিক বা প্রাকৃতিক সীমা দ্বারা বেষ্টিত। বর্তমান রাষ্ট্রসীমা এই প্রাকৃতিক ইঙ্গিত অনুসরণ করে নাই সত্য, কিন্তু ঐতিহাসিককে সেই ইঙ্গিতই মানিয়া চলিতে হয়, তাহাই ইতিহাসের নির্দেশ।"

পূর্ববঙ্গের জনগোষ্ঠির মানসিকতা তৈরি হয়েছে ভৌগোলিক অবস্থান এবং প্রাকৃতিক প্রভাবের ফলে। পূর্ববঙ্গ বা বাংলাদেশের কথা মনে হলেই চোখের সামনে ভেসে ওঠে নদী, নৌকা, সবুজ গাছগাছালি আর দিগন্ত বিস্তৃত সমতলভূমি। এই নিসর্গ বা প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্য কিভাবে প্রভাবিত করেছে পূর্ববঙ্গের মানুষের মন ও জীবনকে তাই নীচে আলোচনা করবো।

বাংলাদেশের ভূপ্রকৃতি বা যে কোন প্রসঙ্গ আলোচনা করতে গেলেই প্রথমেই নদী কথা আসবে। আবহাওয়া পরিবর্তন ও প্রাকৃতিক কারণে অনেক নদী মরে গেছে কিন্তু যা আছে তা এখনও আমাদের ভূ-প্রকৃতির বৈশিষ্ট্য নির্ণায়ক।

জনৈক ঐতিহাসিক লিখেছিলেন, 'বাঙলার ইতিহাস এক হিসেবে বাঙলার নদীর ইতিহাস।' কথাটা মিথ্যে নয়। নদী বাঙালির প্রাণ, সব সময় সে থাকতে চেয়েছে নদীর কাছে, ভালোবেসে নদীর নাম দিয়েছে মধুমতি, ইছামতি, দুধকুমার, কপোতাক্ষ, কর্ণফুলি বা বাঙালি। আমাদের শরীরের যেমন শিরা উপশিরা এ-দেশে নদীও তেমনি। নদী আমাদের মনে কিভাবে বহতা তা বোঝা যাবে সে-সব সাহিত্যিকদের রচনায় যাঁদের জন্ম পূর্ববঙ্গে। নদী তাঁদের রচনায় কোনো না কোনো ভাবে এসেছে ঘুরে ফিরে। এক্ষেত্রে উল্লেখ্য মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পদ্মা নদীর মাঝি' বা অদ্বৈত মল্লবর্মনের 'তিতাস একটি নদীর নাম'। নদী কিভাবে পূর্ববঙ্গ-বাসীর জীবন নিয়ন্ত্রণ করে তার একটি চিত্র পাওয়া

www.Educationblog24.Com

যাবে এ-উপন্যাস দু'টিতে। আর কবিতা? এক জীবনানন্দ দাশের নাম উল্লেখ করাই যথেষ্ট।

বিজ্ঞানীদের মতে, নদীর ব প্রদেশের বৈশিষ্ট্যই হচ্ছে উত্থানপতন। এবং "নদীর গতি হ্রাস, বৃদ্ধি বা পরিবর্তন এবং ব প্রদেশের উত্থান পতনের সঙ্গে বাঙালার বাণিজ্য, রাষ্ট্র ও কৃষ্টির বিশেষ সম্পর্ক।"

তাই দেখি বছরের পর বছর ধরে বাংলাদেশের নদী ও অঞ্চলকে এবং এর মানুষকে গড়েছে, ভেঙ্গেছে। তলিয়ে গেছে নদীর জলে অনেক লোকালয়, কীর্তি। এ-কারণেই বোধ হয় বাংলার মানুষ নদীর আরেক নাম দিয়েছে ভাঙ্গাগড়া দেখে একবার অবাক হয়ে লিখেছিলেন, "যেখানে সরোবর দেখিয়া গিয়াছিলাম, তাহা এখন সমভূমি, যেখানে গ্রাম দেখিয়া গিয়াছিলাম, তাহা এখন নদী-গর্ভস্থ অমল ধবল সৈকত ভূমি।"

বাংলাদেশের নদীপ্রবাহ অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য। আমাজান প্রবাহের পরই, মোট প্রবাহের পরিমাণের দিক থেকে পদ্মা-মেঘনার স্থান। এছাড়া বাংলাদেশে মাকড়শার জালের মত নদীনালা খালের দৈর্ঘ্য হবে কমপক্ষে পনের হাজার মাইল। এর মাঝে আছে খরস্রোতা, পার্বত্য নদী, শান্ত ক্ষীণকায়া উপনদী বা পদ্মা-মেঘনার মত উত্তাল নদী।

বাংলাদেশের নদী সংস্থানকে পাঁচ ভাগে ভাগ করা যেতে পারে–

১. গঙ্গা বা পদ্মা এবং এর বদ্বীপ
২. মেঘনা এবং সুরমা প্রবাহ
৩. ব্রহ্মপুত্রের শাখা-প্রশাখা
৪. উত্তরবঙ্গের নদীসমূহ
৫. পার্বত্য চট্টগ্রাম এবং সংশ্লিষ্ট সমতলভূমি নদী।

প্রতিটি নদী পূর্ব বা দক্ষিণ প্রবাহিনী। আর যে সময়টিতে নৌকা সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত হয় সে সময় বায়ু প্রবাহিত হয় পূর্ব এবং দক্ষিণে। সুতরাং বিনা আয়াসে বা পাল তুলে নৌকা চলতে পারে। কিন্তু প্রকৃতি-প্রদত্ত এ-সুবিধা না থাকলে বর্ষার দুকূল ছাপানো যমুনা বা মেঘনার নৌকা বাওয়াই মুশকিল হয়ে উঠতো, বন্ধ হয়ে যেতো নৌপথের সব ব্যবসা-বাণিজ্য।

প্রাকৃতিক প্রতিবন্ধকতার অভাবে বাংলার বিভিন্ন প্রদেশের বা অঞ্চলের সীমারেখা নির্ণয় করতো এই নদী। সুতরাং নদীর প্রবাহ বদলে গেলে সীমানা নির্ধারণের ব্যাপারে তা প্রভাব বিস্তার করতো। এ-পরিপ্রেক্ষিতে একটি উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে-হিউয়েন সাং (৬৩০-৪৩ খ্রীঃ) যখন বাংলায় এসেছিলেন তখন করতোয়া ছিলো এক বিশাল নদী বা পুন্ড্রবর্ধনকে (উত্তরবঙ্গ) আলাদা করে রেখেছিল কামরূপ (আসাম) থেকে। পরবর্তীকালে এ-প্রবাহ মরে গিয়েছিলো এবং যমুনা হয়ে উঠেছিলো উত্তরবঙ্গ ও আসামের সীমানা।

পূর্ববঙ্গের অধিবাসীদের অর্থনৈতিক অবস্থা নিয়ন্ত্রণ করছে নদী। নদী জল-নিঃসারক, জমির উর্বরতা বৃদ্ধিতে সহায়ক, মৎস্যের আধার, সস্তা ও সহজ জলপথ। এ প্রসঙ্গে রেনেলের (১৭৮১) উক্তি স্মতর্ব্য– "বাংলার নদনদী কমপক্ষে তিরিশ হাজার মাঝির অন্ন

www.Educationblog24.Com

যোগাচ্ছিলো।"

বাংলাদেশের নদীগুলোর প্রধান কাজ ভূমি নির্মাণ করা। কখনো কখনো কয়েকটি নদী একত্রিত হয়ে এ-কাজ শুরু করে। বহতা নদীর পলি সম্পূর্ণ করে ভূমির পরিবর্তন। তারপর এক জায়গায় কাজ শেষ হলে হয়তো দেখা যায় নদী মজে যাচ্ছে। তখন অন্যদিকে ঠিক একইভাবে কাজ শুরু হয়। নদী যে দিকে বয়ে যায় তার দুকূলে লোকে বসতি স্থাপন করে। নদী মরে গেলে খাত থেকে যায়, বসতিও হয়ত থাকে নয়ত নতুন প্রবাহের পাশে আবার স্থাপিত হয় বসতি। কিন্তু বাংলার সব নদনদীই পরিবর্তনশীল। একটি উদাহরণ দেয়া যাক–১৭৬৫ থেকে ১৭৭৩ সাল পর্যন্ত রেনেল উত্তর এবং উত্তর-পূর্ববঙ্গের নদীগুলো জরীপ করে এক মানচিত্র প্রণয়ন করেছিলেন। মাত্র পঁয়ত্রিশ বছর পর বুকানন হ্যামিলটন (১৮০৯) সে একই পথ পরিভ্রমণ করতে গিয়ে দেখেছিলেন, পুরনো প্রবাহ খুঁজে পাওয়াই দুষ্কর।

নদীর প্রবাহ বা খাত পরিবর্তন জনজীবনের ওপরও প্রভাব বিস্তার করে। খাত পরিবর্তনের অর্থ বর্ধিষ্ণু অঞ্চলের রূপান্তর শ্রীহীন অঞ্চলে। প্রাচীনকাল থেকেই এ রকমটি হয়ে আসছে। এক সময়, গঙ্গা যখন মেদিনীপুর অঞ্চল দিয়ে প্রবাহিত হতো তখন তাম্রলিপ্ত বা তমলুক হয়ে উঠেছিলো পূর্বভারতের প্রধান বন্দর, সমৃদ্ধিশালী এক অঞ্চল।

সপ্তগ্রামও ছিল মধ্যযুগের একটি নামী বন্দর। কিন্তু নদী মজে যেতে থাকলে সপ্তগ্রামও পরিণত হয়েছিলো শ্রীহীন অঞ্চলে। সতের শতকে রূপনারায়ণ পড়েছিলো নির্জীব হয়ে কিন্তু অন্যদিকে জেগে উঠেছিলো গড়াই, জরাঙ্গী আর মাথাভাঙ্গা। আঠারো শতকে প্রবল হয়ে উঠেছিলো তিস্তা, যমুনা এবং কীর্তিনাশা। "আজ ছ'শো বছর ধরে গঙ্গা নদী চলছে পূর্ব দিকে বয়ে–পুরনো বন্দর, শহর আর গ্রাম হয়েছে প্রাণহীন, এসেছে ধ্বংস আর পরিবর্তন।"

শুধু প্রকৃতিগত কারণেই নয়, অনেক সময় বাঁধ দেওয়ার ফলে বা অন্য কোনো কারণে নদীর প্রবাহে বাধার সৃষ্টি হলে নদীর খাত শুকিয়ে যায়। শস্য-শ্যামলা স্থান হয়ে ওঠে রুক্ষ। যেমন বাগেরহাটের কাছে খাল কাটার ফলে ভৈরব নদী গিয়েছিলো ভরাট হয়ে। এ-ছাড়া উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে পূর্ববঙ্গে যখন রেলওয়ের বিস্তার হচ্ছিলো, তখন রেল লাইন বসাবার জন্যে বাঁধ দিতে হয়েছিলো অনেক জায়গায়, ফলে তা বিঘ্ন সৃষ্টি করেছিলো অনেক নদী প্রবাহে। পশ্চিম এবং দক্ষিণের নদীগুলোর অহরহ পরিবর্তন এবং মৃতাবস্থার ফলে ঐ সব অঞ্চলে হ্রাস পেয়েছিলো কৃষি উৎপাদন ও জনসংখ্যা এবং হানি ঘটেছিলো জনস্বার্থের। নদীর ব্যবহারের সঙ্গে কৃষককে খাপ খাইয়ে নিতে হয় ফসল পরিবর্তন করে। যেমন, এসব অঞ্চলে আমন ধান উৎপাদনে নদীর পরিবর্তন বিষম প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছে।

নদী যেমন পলিমাটি দিয়ে জমি উর্বর করে তেমনি নদীর খাত সরে গেলে, সেই খাতে পানি জমে হয় বিল। নদীর মাঝে আবার অনেক সময় পলি ভরাট হয়ে সৃষ্টি করে চর বা দিয়াড়ার। সুতরাং নদীর সঙ্গে খালবিল চরের কথা প্রাসঙ্গিক, যার সংখ্যা পূর্ববঙ্গে নেহাৎ কম নয়।

www.Educationblog24.Com

সতীশচন্দ্র (১৯১৪) নদী আর বিলের প্রভেদ ও জনজীবনে এর প্রভাবের কথা বর্ণনা করেছেন সুন্দরভাবে। বিলের ভিতরে এবং খানিকটা বাইরে বর্ষার পর বেশ পানি জমে থাকে, সেজন্যে সেখানে ভালো আমন হয়। বর্ষাকালে পানি পেলে হয় আউস এবং কার্তিক অগ্রহায়ণে কলাই, সরিষা প্রভৃতি। ক্ষেতের পাশে কৃষকের বাড়ি, কাছে বিল, তাতে প্রচুর মাছ।

বিলের ধারে বসবাসরত কৃষক মোটামুটি সম্পন্ন। হাটের দিন বাজারে গিয়ে সে, "মাছের গল্প, ভূতের গল্প ও জমির গল্প দ্বারা সে উদর পূর্ণ ছিলো তাহা খালাস করিয়া আসে।" এর পিছে, বড় নদীর কূলে বাস করে সভ্য শিক্ষিত ধনীরা, তারা ভালো খায়, ভালো পরে, দেশ দশের খবর রাখে, ঋণ করে। "নদীর কূলে নিত্য নতুন মুক্ত সভ্যতার স্রোত, আর বদ্ধ বিলের পার্শ্বে সেই অনাড়ম্বর অপরিবর্তনীয় প্রাচীন পদ্ধতি। নদী ও বিলে-বাওড়ে এইটুকু প্রভেদ।"

নদীর যখন কূল ভাঙ্গে তখন বিনষ্ট হয় কৃষিক্ষেত্র, লোকজনকে ত্যাগ করতে হয় অনেক দিনের গড়ে তোলা বসতি। নদীর ভাঙ্গন থেকে উদ্ভব ঘটে চরের, আর চর মানে নতুন জমি, নতুন বসতি। নদীর ভাঙ্গন এবং আবার নতুন আশ্রয়ের খোঁজে পুরনো আশ্রয় ত্যাগ পূর্ববঙ্গের মানুষের কাছে বিস্ময় নয়। নদীর মধ্য ও নিম্নগতির পর্যায়েই চর পড়ে। মধ্যগতিতে দেশের অভ্যন্তর ভাগে এবং নিম্ন গতিতে উপকূলভাগে চরের সৃষ্টি করে। নিম্ন প্রবাহে উর্ধ্বগতি থেকে প্রাপ্তপলি, বালি, কাদা প্রভৃতি মোহনার মুখে নিক্ষেপ করে বিস্তৃত চরাঞ্চলের সৃষ্টি করে। এ-জন্যে বাংলাদেশের উপকূলে চরের সংখ্যা অধিক। বাংলাদেশের সজীব নদী অঞ্চলে এই চর বা দিয়াড়া এক বিশেষ বৈশিষ্ট্য। নদীতে চরের বিলুপ্তি কৃষিযোগ্য জমি হ্রাস করে আবার অন্যদিকে নতুন চরের উৎপত্তি সৃষ্টি করে নতুন বসতি, কৃষি এবং বাড়তি জনসংখ্যার আবাস ও মামলা মোকদ্দমার।

নাফিস আহমদ উল্লেখ করেছেন, যমুনা বা ধলেশ্বরী তীরবর্তী ঢাকা ও ময়মনিসংহ জেলার যে-কোনো থানা বা মৌজা এক ঋতুতে নদীর ভাঙ্গনের ফলে হয় কমপক্ষে দুশো থেকে তিনশো একর জমি হারায় অথবা ঐ পরিমাণ জমি (চর হিসেবে) লাভ করে। রেনেলে সময় যা ছিলো চরমাত্র, একশো বছর পর তাই হয়ে উঠেছিলো বরিশালের এক জনবহুল দ্বীপ ভোলা।

জমিই বাঙালির জীবিকার প্রধান নির্ভর এবং তা সীমিত। তাই চর মানেই নতুন জমি। ফলে প্রাচীনকাল থেকে চর নিয়ে বিবাদ বিসংবাদের শেষ নেই। বাংলাদেশে প্রবাদই আছে, 'জোর যার চর তার'। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত বিলোপের পূর্ব পর্যন্ত দেখা গেছে, নতুন চরের মালিক হচ্ছে সব সময়ই জমিদার এবং জোতদাররা। অর্থাৎ শক্তিমানরা। এখনও তার তেমন হেরফের হয়নি। এবং এখনও বাংলাদেশে চর দখলের আগে কৃষকরা পরিবার পরিজন থেকে বিদায় নিয়ে যায়। কিন্তু যারা চরের জন্যে প্রাণ দেয় চর তাদের ভোগে আসেনা বললেই চলে। সে জমি চলে যায় ধনী কৃষক বা জোতদারের দখলে। 'বিচিত্রা'র এক প্রবন্ধে উল্লেখ করা হয়েছে গত পনেরো বছর বাংলাদেশের চরাঞ্চলে সংঘর্ষে মৃত্যুবরণ করেছেন প্রায় পনেরো হাজার লোক।

www.Educationblog24.Com

চরে যারা বাস করে তাদের চরিত্র সমতলভূমির লোক থেকে একটু আলাদা। কারণ চর অহরহ ভাঙ্গে গড়ে। তাই চরের জীবন অস্থির। প্রকৃতির বিরুদ্ধে অনবরত সংগ্রাম এদের করে তোলে সাহসী এবং সংগ্রামী। এইভাবে অনবরত লড়াই করতে হয় বলে এরা হয়ে ওঠে, 'সরল, উদার সংঘবদ্ধ ও বহির্মুখী।' অন্যদিকে সমতল ভূমির মানুষ চরবাসীর তুলনায় খানিকটা নমিত এবং ততোটা বর্হিমুখী নয়।

সেজন্য, বাঙালির প্রধান সমস্যা 'জলের সঙ্গে স্থলের বিপ্লব।' বাংলাদেশের সমৃদ্ধি নির্ভরশীল নদীর সুষ্ঠু নিয়ন্ত্রণের ওপর। তবে নদীর চরিত্র বাঙালিকে যেমন করেছে উদার বিরাগী তেমনি করেছে সংগ্রামী। "নদীর মৃত্যু বা গতি পরিবর্তনের সঙ্গে বাঙালির মনের গূঢ় সম্পর্ক আছে। নদীই এনেছে অনেক সময় তার সমাজে ক্রান্তি, তার মনকে করেছে সচেতন ও দুঃসাহসী। ধ্বংসের মধ্য দিয়ে তার উদ্ভাবনী শক্তিকে প্রখর..." লিখেছেন প্রবোধচন্দ্র ঘোষ। এ প্রসঙ্গে রাধাকমল মুখোপাধ্যায়ের একটি মন্তব্যও স্মর্তব্য, "নদী যেখানে কীর্তিনাশা মানুষ সেখানে নিত্য নতুন কীর্তি অর্জন করে। তাই কোনো কীর্তিনাশা বাংলার নিজস্ব কীর্তিকে নষ্ট করিতে পারে নাই।... বার ভূঁইয়াদেরও স্বাধীনতা প্রিয়তাকে উদ্দীপতি করিতে পারিয়াছিল একমাত্র পদ্মা ও মেঘনার নির্মম ভাঙ্গাগড়া।"

প্রকৃতি ও নিসর্গের দিক দিয়ে পূর্ববঙ্গকে দু'টি প্রধান ভাগে ভাগ করা যেতে পারে–
(১) উত্তরপূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্বের পর্বতমালা এবং
(২) বিস্মৃত পলিমাটির সমতলভূমি।

১. উত্তরপূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্বের পর্বতমালা

পূর্বে সিলেট ঘিরে বা আরো নির্দিষ্টভাবে বলতে গেলে উত্তর এবং উত্তর পূর্বে আছে ছোট পাহাড় বা টিলা। উচ্চতায় এগুলো সাধারণত একশো থেকে দুশো ফুট। টিলা আছে কিছু সুরমা এবং কুশিয়ারার মাঝে গোপালগঞ্জ ও মধুগঞ্জের কাছে। কুশিয়ারার দক্ষিণে আছে দু'টি পাহাড়ের সারি যেগুলি সমুদ্র থেকে খুব বেশি হলে আটশো ফুট উঁচু। এগুলো হলো, পূর্ব থেকে পশ্চিমে পাথারিয়া, বাংলা, রাজকান্দি, কালিমারা, সাতগাঁও এবং রঘুনন্দন। নদী ও প্রশস্ত সমতলভূমির একঘেয়েমিতে বৈচিত্র এনেছে পার্বত্য চট্টগ্রাম। এখানে সবচেয়ে উচুঁ পাহাড় কিওক্রিডাংয়ের উচ্চতা ৪০৩৪ ফুট। এ দিকে আছে দশটি পর্বতমালা–বাসিতাং, মারাঙ্গা, কায়ানারাং, বিলাইছড়ি, ভাঙ্গামুরা, বাটি মইন, ধরকল, সিতা-পাহাড় এবং ফটিকছড়ি। এগুলো অধিকাংশই ঘন জঙ্গলে আবৃত, মাঝে মাঝে আছে ছোট ঝর্ণা বা ছরা। চট্টগ্রামের উপকূল ঘিরে আছে সীতাকুণ্ড ও চন্দ্রনাথ পাহাড়।

বাংলাদেশের পাহাড়ে এবং সমতলভূমিতে বসবাস করে, অনেক ক্ষুদ্র নৃতাত্ত্বিক গোষ্ঠি। এক সময় এরা উপজাতি হিসেবে পরিচিত ছিলেন সাধারণের কাছে। তারপর আদিবাসী। সম্প্রতি সরকার সংবিধান সংশোধন করে এদের নামকরণ করেছেন ক্ষুদ্র নৃতাত্ত্বিক গোষ্ঠি। যে নামেই অভিহিত করা হোক না কেনো বাংলাদেশে বসবাস করলেও জাতি হিসেবে বাঙালিদের থেকে তারা আলাদা। তাদের ভাষা ও সংস্কৃতি ভিন্ন। পার্বত্য চট্টগ্রাম বা সিলেটের একাংশে বাস করেন বিভিন্ন ক্ষুদ্র নৃতাত্ত্বিক গোষ্ঠি। সিলেটের প্রধান গোষ্ঠিগুলো হলো–খাসিয়া, মিথেরি, পাথর এবং ত্রিপুরা। পার্বত্য চট্টগ্রামের আছে মগ,

www.Educationblog24.Com

চাকমা, ত্যাংচাঙ্গা, ত্রিপুরা, শক, মুরং, গারো, খিয়াং বনযোগী, পাংখো এবং খাসি। এ ছাড়া ময়মনসিংহ ও দিনাজপুর অঞ্চলে আছে গারো এবং সাঁওতাল।

পাহাড়ের জগত আলাদা। প্রাকৃতিক প্রতিবন্ধকতা যেমন তাঁদের বাইরের আক্রমণ থেকে রক্ষা করেছে তেমনি নদীমাতৃক সমভূমি থেকেও তারা হয়ে পড়েছেন খানিকটা বিচ্ছিন্ন। কিন্তু তাই বলে যে পাহাড়ের অধিবাসীরা একেবারে স্বতন্ত্র জীবন যাপন করেন তা নয়। সমতলভূমির অধিবাসীদের মতই তারা গ্রামের বাসিন্দা। এদের অনেকে গ্রহণ করেছেন বৌদ্ধ, হিন্দু, খ্রীস্টান ধর্ম। যেমন ময়মনসিংহের গারোদের সঙ্গে বাঙালির সংস্কৃতিক পরিচয় অনেক দিনের। পার্বত্য চট্টগ্রামের চাকমারা বাংলার আরো নির্দিষ্টভাবে বলতে গেলে চট্টগ্রামের আঞ্চলিক বাংলায় কথা বলেন। বর্তমানে সমতলভূমির সঙ্গে ক্ষুদ্র নৃতাত্ত্বিক গোষ্ঠি আরো বেশি পরিচিত হচ্ছেন। তবে সমতলভূমিকে ভয়ের চোখে দেখেন পার্বত্য অধিবাসীরা। কারণ সমতলভূমি দ্বারা তারা শোষিত হয়েছেন। ব্রিটিশ শাসনের সময় পার্বত্য চট্টগ্রামকে প্রথমে একটি প্রশাসনিক এলাকা হিসেবে ধরা হয়েছিলো। তারপর থেকে হয় সমতলবাসীরা নয় পাহাড়িয়ারা পরস্পরের বিরুদ্ধে কখনো না কখনো অভিযান চালিয়েছে এবং এক সময় সমতলের সঙ্গে এদের সম্পর্ক দাঁড়িয়েছে শুধু খাজনা প্রদানের। আবার আলোচ্য সময়ের সমতলের লোকদের তেমন কোনো কৌতূহল ছিলো না পাহাড়ের অধিবাসীদের সম্পর্কে এবং এখনও যে আছে তেমন কথা জোর দিয়ে বলা যাবেনা। অন্তত সাহিত্যে এর কোনো ছাপ নেই।

ব্রদেল ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চল সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে সমুদ্র-তটবর্তী সভ্যতার সঙ্গে পার্বত্যবাসীদের সম্পর্কহীনতার কথা বলেছেন। পাবর্ত্যবাসীরা সবসময় নিজেদের স্বায়ত্তশাসিত দেখেছেন। পার্বত্য চট্টগ্রামের ক্ষেত্রেও তাই ঘটেছিলো এবং ব্রিটিশ সরকার কোনো সময় তাদের ওপর খুব বেশি প্রশাসন চাপিয়ে দিতে চায়নি। বলা যেতে পারে, পূর্ববঙ্গে বসবাসরত উপজাতিরা সমতলভূমিকে প্রভাবিত করতে পারেনি কিন্তু কোনো না কোনোভাবে সমতলভূমি দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন– এ কথা আগেই উল্লেখ করেছি।

২. সমতল ভূমি

পূর্ববঙ্গের বদ্বীপ সমভূমিকে তিনটি প্রধানভাগে ভাগ করা যেতে পারে :

ক. পশ্চিম বদ্বীপ সমভূমি (কুষ্টিয়া, যশোর, ফরিদপুরের উত্তরাংশ ও খুলনার উত্তরাংশ),

খ. পূর্ব বদ্বীপ সমভূমি (মধ্য ও দক্ষিণ ফরিদপুর এবং বাখরগঞ্জ)

গ. বদ্বীপে মোহনা বা সুন্দরবন এবং দক্ষিণ পশ্চিম বরিশাল।

নফিস আহমদ (১৯৫৮) লিখেছেন, যদি ফরিদপুর শহরের উত্তর থেকে সাতক্ষীরার দক্ষিণ পর্যন্ত দক্ষিণ-পশ্চিম বরাবর একটি কাল্পনিক রেখা টানা যায় তা'হলে এই রেখার উত্তর এবং পশ্চিম হবে মৃত ও মৃতপ্রায় নদীর এলাকা। কিন্তু পূর্বে আছে সজীব নদী দ্বারা গড়ে ওঠা অঞ্চল।

পদ্মা, যমুনা এবং মেঘনা পাশে সমতল ভূমি হলো ফরিদপুর, ঢাকা, ময়মনসিংহ, পাবনা, বগুড়া, রংপুর, কুমিল্লা এবং সিলেটের কিছু অংশ। আর উত্তরে পুরনো পাললিক এলাকায় পড়ে দিনাজপুরের কিছু অংশ, রংপুর, বগুড়ার কিছু অংশ এবং রাজশাহী।

www.Educationblog24.Com

বাংলাদেশের এই একঘেঁয়ে দিগন্ত-বিস্তৃত সমতলভূমিতে খানিকটা বৈচিত্র্য এনেছে তিনটি সুস্পষ্ট পুরনো এলাকা। এগুলো হলো– মধুপুর, বরেন্দ্র এবং লালমাই।

মধুপুরের আয়তন প্রায় ষোল হাজার বর্গ মাইল। এলাকার বিস্তৃতি ময়মনসিংহ জেলার কেন্দ্র থেকে ঢাকার উত্তরাংশ পর্যন্ত এবং এ অঞ্চলের মাটি রক্তিম। ময়মনসিংহের উত্তরাংশ, জয়বেদবপুর, শ্রীপুর, কালিয়াকৈর জুড়ে আছে দীর্ঘ গজারির জঙ্গল আর এর ধার ঘেঁষে আছে যমুনা, পুরনো ব্রহ্মপুত্র এবং ধলেশ্বরী।

বরেন্দ্রের আয়তন প্রায় ৩,৬০০ বর্গ মাইল। এই একই পরিমাণ জায়গা এখন পশ্চিমবঙ্গের অন্তর্গত। বরেন্দ্রের অন্তর্গত হলো রংপুরের দক্ষিণ-পশ্চিমাংশ, দক্ষিণ দিনাজপুর, বগুড়ার উত্তর-পশ্চিমাংশ এবং রাজশাহীর দক্ষিণ পশ্চিমাংশ। মাটি এখানকার হলদে থেকে লাল। এর মাঝে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে কিছু জলা জংলা আর বিশাল বৃক্ষ।

কুমিল্লার দক্ষিণ পশ্চিমাংশের অল্প কিছু জায়গা লালমাই-র অন্তর্গত। লালমাই পাহাড় নামে এলাকা পরিচিত, যদিও elevation কোথাও ২০ থেকে ৪০ ফুটের উঁচু নয়। মাটি এখানকার রক্তিম।

মানুষ সব সময় সমতলভূমি জয় করতে চেয়েছে, কারণ সমতলভূমির জয় মানুষের আজীবনের স্বপ্ন। কিন্তু বিনা আয়াসেই কি তা সম্ভব? বোধহয় নয়। ব্রদেল ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চল নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে দেখিয়েছেন, সমতল ভূমি মানেই প্রাচুর্য, সম্পদ আর স্বাচ্ছন্দ্য নয়। এ প্রসঙ্গে 'সোনার বাংলা' কিংবদন্তীর কথা উল্লেখ করতে হয়। এ কিংবদন্তী শুনে সমতল ভূমি সম্পর্কে আমাদের অন্য ধারণা জন্মাতে পারে। কিন্তু এটা ছিলো নিছকই কিংবদন্তী। খানিকটা অপ্রাসঙ্গিক হলেও উল্লেখ করছি, ইংরেজ সিভিলিয়ানদের রিপোর্ট, বই-পত্র, অনেক ঐতিহাসিকের রচনা বা লোকগাঁথা ইত্যাদি পড়লে মনে হবে, বাঙলার সমতলভূমির সাধারণ মানুষ অর্থাৎ কৃষকরা সুখেই কালাতিপাত করেছেন।

উদাহরণস্বরূপ, উনিশ শতকে ঢাকায় কৃষি বিষয়ক এ ধরনের একটি রিপোর্টের কথা উল্লেখ করা যায়, রিপোর্টে বলা হয়েছিলো ২৫ বিঘা জমির মালিক এক সম্পন্ন পরিবারের কথা। কিন্তু সরকারী পরিসংখ্যান বিশ্লেষণ করেই দেখেছি ঐ 'সম্পন্ন চাষীর' বাৎসরিক ঘাটতি ছিলো ৩৫ রুপি। সফিউদ্দিন জোয়ারদার রাজশাহীর ওপর এ-ধরনের রিপোর্ট বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন, ৫ বিঘা জমি আছে এমন কৃষকের বার্ষিক ঘাটতি ১০৬ রুপি। সরকারী রিপোর্ট অনুযায়ী সকালে এদের নাস্তা ছিলো ভাতের সঙ্গে বাসি ডাল বা তরকারী অথবা শুধু নুন বা লংকা, দুপুরে ও রাতে ভাত, তরকারী ও ডাল। ডিম বা মুরগি ছিলো বিলাসিতা।

১৯৪৭ সালের আগেও বাংলাদেশের অনেকাংশ ছিল জঙ্গলাকীর্ণ, পতিত। এর আগে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে-থাকা নানা গ্রামের আশেপাশে কিছু ক্ষেত খামার ছাড়া সমতলভূমির প্রায় অধিকাংশ ছিল জঙ্গলাকীর্ণ। ১৮৫০ সালের দিকেও চট্টগ্রাম থেকে কুমিল্লা হয়ে ঢাকা যাওয়ার রাস্তা ছিল জঙ্গলাকীর্ণ।

বাংলাদেশের মানুষকে এই সমতলভূমি জয় করতে অনেক লড়াই করতে হয়েছে।

www.Educationblog24.Com

প্রধান প্রতিবন্ধকতা ছিল বন্যা ও মহামারি। জমি উদ্ধার করেই বাঙালি কৃষক বাংলা/বাংলাদেশকে শস্য শ্যামল করে তুলেছিলেন। এখনও তা অব্যাহত।

আমাদের স্বাধীনতার আগেও কয়েকটি বড় শহর ছাড়া, অধিকাংশ জেলা শহর ও বর্ধিষ্ণু গ্রামের মধ্যে তফাত ছিল কম।

আবহমানকাল থেকে ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চল এবং সাগরপারের দেশ থেকে ইংরেজ, ওলন্দাজ, পর্তুগীজ, আরব, আর্মেনিয়া প্রভৃতি বিদেশীরা এসেছিলেন বাংলাদেশে। বসতি স্থাপন করেছেন কিন্তু কোনো সম্পর্ক গড়ে উঠেনি।

এ-ছিল এক ধরনের সহ অবস্থান মাত্র। বিদেশীদের সঙ্গে বা জমিদারের সঙ্গে সংঘর্ষ হলে সে গ্রাম ছেড়ে চলে এসে অন্য গ্রামে বসতি স্থাপন করেছে। চেয়েছে সংঘর্ষ এড়িয়ে চলতে। কিন্তু সে রুখে দাঁড়ায় মাত্র একটি কারণে, যখন তার নিজ জমির উপর কেউ হস্তক্ষেপ করে। কারণ, তার জীবিকার প্রধান অবলম্বন হচ্ছে জমি।

সরকারী প্রশাসন গ্রামীণ সমাজের ওপর তেমন নিয়ন্ত্রণ কখনও স্থাপন করতে পারেনি। গ্রামীণ সমাজ আত্মমগ্নভাবে নিজ পথেই চলেছে। এক ধরনের প্রশাসনের ভিত্তিতে চলেছে এ সমাজ। ঔপনিবেশিক প্রশাসন যে সমাজকে চূর্ণ করতে চায়নি তেমনভাবে বা পারেনি।

পূর্ববঙ্গের গ্রামে সোজাসাপটা বসতির ধারা কখনও গড়ে ওঠেনি। এর কারণ নদীর অনবরত ভাঙ্গন, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, জমিদার জোতদারের অত্যাচার। ফলে কোনো একটি নির্দিষ্ট গ্রামে কোনো একটি নির্দিষ্ট পরিবার বংশানুক্রমে ঘর বেঁধে থাকেনি। সে অনবরত বসতি বদলেছে। কোনো গ্রামে, একাদিক্রমে তিনচার পুরুষ ধরে কেউ একই বসত বাড়িতে বাস করেছে এমন দৃষ্টান্ত খুব কম। পূর্ববঙ্গের গ্রাম-বাসীরা তেমনভাবে শেকড় গেড়ে বসেনি কোথাও।

এ প্রসঙ্গে নিজের কথা উল্লেখ করতে পারি। ব্যক্তিগতভাবে, এ বিষয়ে নিজের গ্রামে খোঁজ নিয়েছি আমি। তিন পুরুষ আগে, ঐ গ্রামে আমাদের পূর্বপুরুষ বসতি স্থাপন করেছিলেন। কিন্তু তাঁরা কোন অঞ্চল থেকে কিভাবে এলেন সে বিষয়ে কোনো খোঁজ পাওয়া যায়নি। গত পঞ্চাশ বছরে এ পরিবারের বিভিন্ন শাখা মূল গ্রাম ত্যাগ করে আশেপাশের বিভিন্ন গ্রামে বসতি বেঁধেছে।

গ্রামের মানুষের জগত সীমাবদ্ধ নিজ গ্রামেই। সেখানে বা গ্রামীণ সমাজে বহিরাগতের কোনো স্থান ছিলো না। গ্রামের প্রায় প্রতিটি লোক বিভিন্ন মেল বন্ধনে আবদ্ধ। গ্রামের বাইরের জগৎ তার কাছে বিদেশ। সে যখন বলে, 'আমি দেশে যাচ্ছি', তার মানে সে নিজ গ্রামে ফিরে যাচ্ছে। এর প্রভাব দেখি আমরা এ অঞ্চলের পুঁথি সাহিত্যে যেখানে ফ্যান্টাসী, স্বপ্নের এক অদ্ভুত জগৎ তৈরি করা হয়েছে এবং যা এখনও অক্ষুন্ন। এবং এ ধরনের একেকটি আত্মমগ্ন গ্রামে বাস করতেন পূর্ববঙ্গের অধিকাংশ জনসাধারণ।

একটি মাত্র নরগোষ্ঠী থেকে উৎপত্তি হয়নি বাঙালির। কয়েকটি নরগোষ্ঠীর মিলিত ফল বাঙালি। বাঙালির আকার মাঝারি, তবে ঝোঁক খাটোর দিকে, চুল কালো, চোখের

www.Educationblog24.Com

মণি হালকা থেকে ঘন বাদামী, গায়ের রংও ঐ রকম, মুখ সাধারণত লম্বাটে, নাক মাঝারি। বা অন্যভাবে বলা যেতে পারে, আদি অস্ট্রেলীয় বা কোলিডদের দীর্ঘ মুণ্ড, প্রশস্ত নাক, মিশর এশীয় বা মেলানিডদের দীর্ঘ ও মাঝারি নাক এবং দীর্ঘ মুণ্ড ও অ্যালপাইন বা পূর্ব ব্রাকিডদের উন্নত নাক ও গোল মুণ্ডর সমন্বয়ে গঠিত হয়েছে বাংলার জনসমষ্টি। রক্তে মিশ্রণ ঘটেছে নিগ্রোবটু, মোঙ্গলীয় এবং আদি নডিক বা খাঁটি ইণ্ডিডের। নীহাররঞ্জন রায়ের মতে, 'এই বিচিত্র সংকরজন' নিয়েই 'বাঙলার ও বাঙালির ইতিহাসের সূত্রপাত।'

অতি প্রাচীনকালে, এসব নরগোষ্ঠী বাস করেছে কোমবদ্ধ হয়ে এবং একটি কোমের সঙ্গে অপরটির যোগাযোগ ছিল ক্ষীণ। সভ্যতার বিস্তৃতির ফলে, বিভিন্ন কোমের পরস্পরের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপিত হয়েছিলো। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কোমের সমন্বয়ে গঠিত হয়েছিলো বৃহত্তর কোম, যেমন বঙ্গ, রাঢ়া, পুণ্ড্রা প্রভৃতি। এই কৌমচেতনা প্রাচীন যুগে তো বটেই, মধ্যযুগেও ছিলো এবং এখনও বহমান।

দূরপ্রাচ্য ও দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার অধিবাসীদের সঙ্গে বাঙালিদের প্রধান খাদ্যের অমিল নেই। সমুদ্রশায়ী সমতলভূমির লোকেরা ভাতভূক। পূর্ববঙ্গের জলবায়ু ধান উৎপাদনে বিশেষ সহায়ক তাই ভাতই বাঙ্গালির প্রধান খাদ্য। ভেতো বাঙালি কথাটার উদ্ভব বোধ হয় সেখান থেকেই। যে-সব দেশের প্রধান উৎপন্ন দ্রব্য ধান, ধরে নিতে হবে তা আদি অস্ট্রেলীয় অষ্ট্রিক ভাষাভাষি জনগোষ্ঠীর 'সভ্যতা ও সংস্কৃতির দান'। এবং এই ভাত ধনী গরীব সবারই প্রধান খাদ্য। আবার ধানকে ভালোবেসে বাঙ্গালি নদীর মতই এর বিভিন্ন নাম দিয়েছে রূপশালী, কাটারীভোগ, বালাম ইত্যাদি।

কথায় বলে, মাছে ভাতে বাঙ্গালি। অর্থাৎ ভাতের পর মাছই তার প্রধান খাদ্য এবং এর একটি কারণ নদীনালা খালবিলে মাছের সহজলভ্যতা। তাছাড়া এটিও অষ্ট্রিক ভাষাভাষি আদি অস্ট্রেলীয় জনগোষ্ঠীর সভ্যতার দান। এই মাছ ধরার কৌশল বা হাতিয়ারের ব্যবহারের ক্ষেত্রেও পূর্ব-দক্ষিণ এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জের অধিবাসীদের সঙ্গে বাঙ্গালিদের তেমন কোনো পার্থক্য নেই।

বাঙ্গালিদের পোষাক সাধারণ। উনিশ শতকের প্রায় শেষার্ধ পর্যন্ত সবাই ধুতি বা কাছা দিয়েই কাপড় পরতেন। মেয়েরা পড়তেন একপেচে শাড়ি। ফারায়ীরাই প্রথম পূর্ব বাংলায় সাদা লুঙ্গি বা তহবন্দের প্রচলন করেছিলেন। রঙ্গীন লুঙ্গির আমদানী হয়েছিলো বার্মা থেকে। আবুল মনসুর আহমদের আত্মজীবনীতেই প্রথম উল্লেখ পাওয়া যায় যে, ফারায়ীরা এখানে প্রচলন করেছিলেন সাদা লুঙ্গির। এ ছাড়া প্রাচীন দু'একজনের সঙ্গেও আলাপ করে দেখেছি এবং তারাও এ বিষয়ে ভিন্নমত পোষণ করেননি।

প্রথম দিকে মুসলমানরাই লুঙ্গি পরা শুরু করেছিলেন, কিন্তু অন্তিমে তা হিন্দু-মুসলমান এক কথায় পূর্ববঙ্গের বাঙ্গালিদের সর্বজনীন পোষাকে পরিণত হয়।

ভাষা কাজ করে দু'ভাবে-সাংস্কৃতিক এবং রাজনৈতিক একক হিসেবে। পূর্ব ও পশ্চিম বঙ্গের ভাষা একটিই–বাংলা ভাষা। এ ভাষা সাংস্কৃতিক একক হিসেবে কাজ করেছে উভয় বঙ্গেই, কিন্তু রাজনৈতিক একক হিসেবে কাজ করেছে পূর্ববঙ্গেই। নীচের আলোচনায় আমি তাই দেখাবার চেষ্টা করব।

www.Educationblog24.Com

ভাষার প্রকাশ বিবিধ ঃ সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক মতাদর্শগত। পূর্ববাংলার ক্ষেত্রে যখন থেকে পূর্ববাংলা ঐতিহাসিক পর্যায়ে রাজনৈতিক একটি একক হিসেবে উদ্ভব লাভ করেছে, তখন থেকেই ভাষার মধ্যে দিয়ে, ভাষাকে কেন্দ্র করে পূর্ব বাংলার নির্দিষ্ট প্রকাশ হয়েছে সংস্কৃতিতে, সমাজে, মতাদর্শে। পূর্ব বাংলার বিভিন্ন সাহিত্যকর্মে জনগোষ্ঠীর মৌখিক ব্যবহারে, জীবন ধারণে, মতাদর্শে, প্রবাদে, ছড়ায় এই নির্দিষ্টতা সোচ্চার হয়েছে পশ্চিমবঙ্গ থেকে। এই নির্দিষ্টতার অন্যতম উপাদান ভাষার রাজনৈতিক একক হিসেবে ব্যবহার।

প্রাচীনকাল থেকেই অভিজাত এবং শাসকরা এ অঞ্চলে নিজেদের ভাষা চালু করেছিলেন। এভাবে সাধারণ মানুষের ভাষা থেকে শাসক শ্রেণীর ভাষা আলাদা হয়ে গিয়েছিলো যেমন সংস্কৃত, ফরাসী, ইংরেজী এবং কিছুদিন আগে উর্দু (১৯৪৭-৭১)। সাধারণ মানুষ শাসক শ্রেণীর ভাষার বিপরীতে, নিজেদের ভাষার মাধ্যমে সমাজের ঐক্য তৈরি করেছেন, সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যে মুগ্ধ হয়েছেন, অর্থনৈতিক একক হিসেবে কাজ করেছেন (শাসিত জনগোষ্ঠী কিংবা শ্রেণী হিসেবে) এবং ভাষাকে কেন্দ্র করে মতাদর্শ সৃষ্টি করেছেন। এসব বিভিন্ন উপাদান আবার শক্তি যুগিয়েছে। এই অঞ্চলের রাজনীতিতে, সেজন্য ভাষা রাজনৈতিক একক হিসেবে কাজ করেছে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে ও মতাদর্শ তৈরির পটভূমি হিসেবে। জাতীয়তাবাদী প্রেমের উপাদান হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে জনগোষ্ঠীর মৌখিক রীতি, পুথি পাঠ, পুথি পাঠের সমাজ বিন্যাস, নিম্নবর্ণের সাহিত্যিক ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড, মধ্যশ্রেণীর সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক প্রয়াস– সবকিছুই শাসকশ্রেণীর ভাষার বিপরীতে প্রতিবাদ, বিদ্রোহের বিভিন্ন রূপে উদ্ভাসিত হয়েছে। এই সমস্যার বিভিন্ন স্তর আমি বিশ্লেষণ করার প্রয়াস করবো।

গ্রীয়ারসন (১৯২৭) বাংলা ভাষাকে দু'টি প্রধান শাখা পূর্ব ও পশ্চিমে বিভক্ত করেছেন। পূর্বাঞ্চলীয় ভাষার কেন্দ্র হিসেবে তিনি উল্লেখ করেছেন ঢাকা জেলাকে। তাঁর মতে, এ অঞ্চলের ভাষার বৈশিষ্ট্য প্রথমে নজরে পড়ে খুলনা এবং যশোরে। গাঙ্গেয় বদ্বীপের পূর্বেও তা বিদ্যমান। তারপর তা প্রসারিত হয়েছে উত্তর পূর্বে। মাগধী, প্রাকৃত ও অপভ্রংশের রূপ চারটি– রাঢ়ী, বরেন্দ্রী, বাঙ্গালি ও কামরূপী। বাংলাদেশে প্রচলিত বাঙ্গালি ও বরেন্দ্রী। তবে এই চারটির মধ্যে আবার প্রধান হল রাঢ়ী ও বাঙ্গালি, কারণ ধ্বনিতে, শব্দগঠনে, শব্দভাণ্ডারে এবং বাগরীতিতে এই দুটি ছিলো সম্পূর্ণ আলাদা এবং এখনও তাই আছে। বরেন্দ্রীর ওপর প্রভাব বেশি বাঙ্গালির।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে, অঞ্চলভেদে বাংলায় মৌখিক ভাষার নানারূপ আছে। এবং এই আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্যই হচ্ছে উপভাষা। উপ-ভাষায় অত্যন্ত স্পষ্ট থাকে আঞ্চলিক জীবনধারা। তবে ভাষার ক্ষেত্রে পরিশীলনের জন্য নষ্ট হয় আঞ্চলিকতা। ভাষা গড়ে ওঠে একটি কৃত্রিম একক হিসেবে যেখানে ক্রমাগত তৈরি হতে থাকে শাসক-শ্রেণীর আধিপত্যবাদ। উপভাষায় ঐ আধিপত্যবাদের প্রভাব সামান্য এবং তাই এ ক্ষেত্রে টিকে থাকে আঞ্চলিকতা। পূর্ববঙ্গের উপভাষার ক্ষেত্রেও তাই ঘটেছে।

পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃত রীতির ওপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছিলো সাধুভাষা। আবার

www.Educationblog24.Com

এরই পাশে বর্তমানে গড়ে উঠেছে একটি ভাষা যা কলকাতার শিষ্ট জনের মৌখিক ভাষা।' এর বিপরীতে হচ্ছে পূর্ববঙ্গের মৌখিক ভাষার একক বা পূর্ববঙ্গে সকল সম্প্রদায়ের জীবনচর্চায় ছিলো সক্রিয়। বর্তমানেও তা সক্রিয় রাষ্ট্রিক সাহায্যে।

এ ভাবে আমরা দেখি, উভয় বঙ্গের ভাষা এক হওয়া সত্ত্বেও ভাষা ব্যবহারে দু'অঞ্চলের পার্থক্য বিদ্যমান। সতের শতকে পূর্ববঙ্গের কবি আবদুল হাকিম লিখেছিলেন–

"যে সব বঙ্গেত জন্মি হিংসে বঙ্গবাণী
সে সব কাহার জন্ম নির্ণয় না জানি
দেশী ভাষা বিদ্যা যার মনে না জুগায়
নিজ দেশ ত্যাগী কেন বিদেশ না যায়।"

উপরোক্ত পংক্তিগুলিতে ভাষাপ্রীতি থেকেও আরো সোচ্চার হয়ে উঠেছিলো শ্রেণীর আধিপত্যের বিরুদ্ধে ব্যঙ্গ প্রতিবাদ। ভাষা কাজ করে তখন রাজনৈতিক একক হিসেবে। এ-পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৪৭ সালে ভারত বিভক্ত হওয়ার পর পশ্চিম পাকিস্তান এবং পূর্ববঙ্গের কথা ধরা যাক। পাকিস্তান গঠিত হওয়ার পর, উর্দু ভাষী শাসক শ্রেণী ও তাদের সহযোগিরা বাংলাভাষার ইসলামীকরণের ওপর জোর দিয়ে সাংস্কৃতিক আধিপত্য চাপিয়ে দিতে চেয়েছিলেন। পূর্ববঙ্গের নবীন সাহিত্যিকরা পাল্টা জবাব দিয়েছিলেন তাঁদের সাহিত্যকর্মের মাধ্যমে। এই সাংস্কৃতিক আধিপত্যের বিরুদ্ধে ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ (১৮৮৫-১৯৬৯) বলেছিলেন, 'স্বাধীন পূর্ববাংলার স্বাধীন নাগরিকরূপে আজ আমাদের প্রয়োজন হয়েছে সর্বশাখায় সমৃদ্ধ এক সাহিত্য। ...ঐ সাহিত্য হবে মাতৃভাষা বাংলায়।' ১৯৫১ সালে তিনিই আবার বলেছিলেন, 'বাংলা ব্যতীত অন্য কোনো ভাষাকে পূর্ববঙ্গের ওপর চাপিয়ে দেওয়ার বিরুদ্ধে জোর প্রতিবাদই নয় প্রয়োজনবোধে বিদ্রোহ করতে হবে। কেননা এটা পূর্ববঙ্গের মানুষের জন্যে জেনোসাইড বা গণহত্যার সামিল।' ১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারী যখন ছাত্রদের ওপর গুলি চালিয়েছিল শাসক শ্রেণী, তখন তিনি তার কনিষ্ঠ পুত্রকে বলেছিলেন, 'নিজের মাতৃভাষার জন্যে যদি তোমার প্রাণও যেত আমার কোন দুঃখ থাকতো না।' এভাবে দেখি, ভাষা পূর্ববঙ্গে শুধু আর সাংস্কৃতিক একক হিসেবেই থাকে না, রূপান্তরিত হয় রাজনৈতিক এককেও এবং পূর্ববঙ্গের সাহিত্যে প্রকাশিত এই আশা আকাঙ্ক্ষাও কাজ করেছিলো ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের পিছে। ভাষা আন্দোলনে সাধারণ মানুষের অবদান তুচ্ছ করার মতো নয়। এবং তাই পরে প্রেরণা যুগিয়েছিলো স্বাধীন বাংলাদেশ স্থাপনে। ভাষার প্রতি যে কোনো আক্রমণ পূর্ববঙ্গের জনগণ গ্রহণ করেছেন চ্যালেঞ্জ হিসেবে। তাই সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক–দুই একক বিচার করলেও দেখব বাংলা ভাষা এ-অঞ্চলের জনগণকে বেঁধেছে এক কঠিন বাঁধনে যা ছিন্ন হবার নয়।

বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর ১৯৭২ সালের সংবিধানে প্রথম পাতায়ই লেখা হলো– 'প্রজাতন্ত্রের ভাষা হইবে বাংলা'। এ বৈশিষ্ট্যও খুব কম দেশের সংবিধানে আছে। সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা, এমনকী পশ্চিমবঙ্গের বাঙ্গালিরাও মনে করেন,

www.Educationblog24.Com

এখন বাংলা ভাষার কেন্দ্র বাংলাদেশ এবং সেই কেন্দ্রই অটুট থাকবে। দেশ গঠনে এই ভাষার বোধ প্রবল ভূমিকা পালন করেছে এবং এই পরিপ্রেক্ষিতেই দেখি, বাংলাদেশের মানুষ বাংলা ভাষার শ্রেষ্ঠ মানুষ যিনি বাংলাকে নতুন রূপ দিয়েছিলেন সেই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের গান বেছে নিয়েছে, দেশের জাতীয় সঙ্গীত হিসেবে। শুধু তাই নয়, বিবিসির জরিপে সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙ্গালি হিসেবে এই রাষ্ট্রের স্থপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের পরই সাধারণ মানুষ স্থান দিয়েছেন তাঁকে।

সংস্কৃতির সমন্বয়বাদিতা ধর্মীয় সহনশীলতার বিষয়টি এক সঙ্গেই আলোচনা করা যেতে পারে। ধর্ম ও সংস্কৃতি অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। আমাদের সংস্কৃতির সমন্বয়বাদিতা ধর্মের বিভিন্ন রিচ্যুয়ালে প্রভাব ফেলেছে।

বাঙালির মনের কেন্দ্রে আছে ধর্ম এবং তা অস্বীকার করার উপায় নেই। হিন্দু মুসলমান সব সম্প্রদায়ের জন্যই একথা প্রযোজ্য। এ বোধ থেকে বাঙালি কখনই মুক্তি পায়নি এবং মুক্ত চিন্তার ক্ষেত্রে তখনতো বটে, এখনও অনেক সময় বাধা হয়ে দাঁড়ায় প্রবল ধর্মবোধ।

প্রাচীনকালে তো এ ভূখন্ডে হিন্দু মুসলমান বা বৌদ্ধ ছিল না। ছিল অনার্য, জৈন, আজীবিক, বৌদ্ধ এবং তারপর বৈদিক প্যাগান ধর্মের আবির্ভাব হয়। নীহারঞ্জন রায় লিখেছিলেন, "প্রাক-আর্য নানা কৌম ধর্ম বিশ্বাস ও অনুষ্ঠান ব্রাহ্মণ্য-ধর্মের নানা মত, পথ ও অনুষ্ঠান, বৌদ্ধ ধর্ম, জৈন ধর্ম প্রভৃতি নানা আদর্শ ও আচার উচ্চ কোটি ও লোকায়তস্তরের বাঙালি জীবনে প্রচলিত ছিল।"

এ কারণে, এখনও দেখা যায় মাজারের প্রতি হিন্দু মুসলমানের একই বিশ্বাস। তন্তমন্ত্র, কবচ তাবিজে সব বাঙালিরই কম বেশি আস্থা আছে। হিন্দু মুসলমান সবার বিয়ের অনুষ্ঠানেই গায়ে হলুদ, আলপনা আছে। পহেলা বৈশাখের উৎসব জঙ্গিরা বোমা মেরে হত্যা করেও বন্ধ করতে পারেনি। এ হচ্ছে সংস্কৃতির সমন্বয়বাদিতা যার বন্ধন অত্যন্ত দৃঢ়।

ধর্ম নিয়ে বাদ-বিবাদও ছিল কিন্তু যা ছিল গুরুত্বপূর্ণ বা বৈশিষ্ট্য, তা হলো "রাজা বা রাজবংশের ব্যক্তিগত ধর্ম যাই হোক না কেন তাতে রাষ্ট্র বা রাষ্ট্রের নীতি, আদর্শ সংস্থার কোনও পরিবর্তন ঘটেনি। অন্তত পান পর্ব পর্যন্ত সে আদর্শ অক্ষুন্ন।" সেন যুগে বৈদিক ধর্মই শক্তিশালী হয়ে ওঠে রাজকীয় পৃষ্ঠপোষকতায় যাকে ব্রাহ্মণ্য ধর্মও বলা হয়।

এছাড়া অন্যান্য ধর্মমত যেমন বৈষ্ণব, শক্ত, সৌর, জৈব প্রভৃতির বিকাশ হয়েছিল। ব্রাহ্মণ্য ধর্মের প্রাধান্য থাকলেও সকল সংস্কৃতি/ধর্ম-এর প্রভাব এড়ানো যায়নি অন্তত সাধারণ স্তরে। এর পরে বিকশিত হয় ইসলাম। আবদুল করিম লিখেছেন, "বাংলায় শুধু স্থানীয় উপাদানই ইসলামে প্রবেশ করেনি, স্থানীয় ধর্মীয় ও সামাজিক ব্যবস্থাকেও ইসলাম গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিল।" এনামুল হকের মতে "বঙ্গে ইসলামের স্থায়িত্ব প্রাপ্তির ইতিহাস প্রধানত এই মৌলিক ইসলামেরই ইতিহাস।" সুফিবাদের প্রভাবের কথা সবাই উল্লেখ করেছেন। যে কারণে এ দেশে সাধারণ মানুষ ইসলাম যেভাবে পালন করেন অনেক ইসলামী দেশে সেভাবে তা পালিত হয় না। সব মিলিয়ে এ দেশের ইসলাম

www.Educationblog24.com

www.Educationblog24.Com

লৌকিক ইসলাম।

আবুল মাল আবদুল মুহিত এ প্রসঙ্গে সহজ করে লিখেছেন, "বাঙালি চরিত্র মোটামুটি ধর্ম নিরপেক্ষ। বাঙালি মুসলমান ব্যক্তিগত জীবনে পাকিস্তানীদের চেয়েও বেশি ধার্মিক কিন্তু তারা ধর্মান্ধ নয়। ধর্মকে রাজনীতিতে ব্যবহার তারা অপছন্দ করে। বাস্তবে বাংলাদেশের সমাজ অত্যন্ত উদার, সর্বগ্রাহী এবং এক হিসেবে সার্বজনীন।

এমনকি ধর্মীয় আচরণেও এক সম্প্রদায় অন্য সম্প্রদায়ের সঙ্গে ব্যাপক লেনদেন করে আসছে। ধর্ম নিরপেক্ষ রাষ্ট্রাদর্শ সুলতানী আমলের বাংলায় প্রতিষ্ঠা পায় এবং পরবর্তীকালে আরো শক্তি সঞ্চয় করে। বাংলাদেশে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সংমিশ্রণে যে সমাজ সহস্রাধিক বছরে গড়ে উঠেছে তা বস্তুত পক্ষে সংশ্লেষী (Synthetic) নয়, বরং যৌগিক (syncretic) সামাজিক এই বৈশিষ্ট্যও হয় জাতীয়তার অন্যতম উপাদান।"

বিভিন্ন ধর্মের মিলনস্থান বিভিন্ন অনুষ্ঠান ও উৎসবে। এবং সে সব অনুষ্ঠান, রীতিনীতি প্রভাবিত হয়েছে এ দেশের অনার্য সংস্কৃতি দ্বারা। সেটিকেই বলা যেতে পারে বাঙালি মানস যেখানে হিন্দু মুসলমান বৌদ্ধের চিন্তাচেতনা এক বা পরস্পর প্রভাবিত বা প্রবিষ্ট।

বাংলাদেশে মুসলমানরা সংখ্যাগরিষ্ঠ। তারপরেই হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান ও অন্যান্য ধর্মাবলম্বীরা। তবে প্রায়ই আমরা হিন্দু-মুসলমান দ্বন্দ্বের কথা বলি। সম্প্রতি যে জঙ্গিবাদের উদ্ভব তাও হুমকি সাধারণ মুসলমান ও অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের জন্য।

মুসলমান-হিন্দু দুটি ধর্মভিত্তিক সম্প্রদায় হলেও এরা প্রাক ঔপনিবেশিক, ঔপনিবেশিক এবং পাকিস্তান ঔপনিবেশিক আমলে পাশাপাশিই অবস্থান করেছে। ধর্মবোধ তাদের দুটি বিপরীতমুখী অবস্থান সৃষ্টি করেনি অন্তত সংখ্যাগরিষ্ঠের ক্ষেত্রে। বহিরাগত সংস্কারকরা বিশেষ করে ওহাবি সংস্কারকরা ওপর থেকে ইসলামের তত্ত্ব চাপিয়ে দিয়ে সাময়িক দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করলেও অন্তিমে তা ফেলতে পারেনি। বর্তমানে জঙ্গি মৌলবাদ ওহাবীদেরই নতুন সংস্করণ। দেশের রাজনৈতিক ও আন্তর্জাতিক প্রশ্রয় পেলেও সাধারণ মানুষ তা গ্রহণ করেননি। হিন্দু সংস্কারকরা মুলতঃ নিজেদের সামাজিক কুসংস্কারের বিরুদ্ধেই আন্দোলন করেছিলেন। হিন্দু-মুসলমানের ক্ষেত্রে বাঙালি পরিচয়টাই প্রাধান্য পেয়েছে বা এই পরিচয়ের ধারাবাহিকতা বিভিন্ন সময় এলিট বা রাষ্ট্র নষ্ট করতে চাইলেও পারেনি। এই বোধের কারণেই হিন্দু মুসলমানের মধ্যে বিভেদের বদলে বাঙালিত্বের বিভিন্ন উপাদান রক্ষার ব্যাপারে যৌথ লড়াই হয়েছে। এই উপাদানগুলিকে বরং সমন্বয় ধর্মীয় উপাদান বলা যেতে পারে। আবার এই বোধকে অনেকে ধর্মনিরপেক্ষতাও বলতে পারেন। তবে ধর্ম সহিষ্ণুতা বলাই বোধহয় শ্রেয় এবং বাঙালির জাতি রাষ্ট্র গঠনে তা এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।

উপরোক্ত আলোচনায় কয়েকটি বিষয় স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। বাঙ্গা ও বাংলাভাষা দু'টিই সংকর। কিন্তু এই ভাষার ভিত্তিতেই বাংলাদেশের জনসাধারণকে রাজনীতিগতভাবে আলাদা করে চিহ্নিত করা বা সংজ্ঞা দেয়া যায়। এছাড়া পূর্ববঙ্গের ভৌগোলিক অবস্থান,-- এবং বিশেষ করে নদী প্রবাহ উপমহাদেশের অন্যান্য অঞ্চল থেকে একে চিহ্নিত করেছে

www.Educationblog24.Com

আলাদাভাবে এবং নদী প্রবাহই নিয়ন্ত্রণ করে পূর্ববঙ্গবাসীর জীবন, নির্ধারণ করেছে তার চরিত্র। এ ছাড়া জীব চর্যা, শিল্পকলা প্রভৃতি একদিকে যেমন এ অঞ্চলে এক ধরনের ঐক্য সৃষ্টি করেছে তেমনি একে চিহ্নিত করেছে পৃথক সত্তা হিসেবে।

জলবায়ু ও প্রকৃতি বাংলাদেশবাসীকে কিছুটা আয়েসি করে তুললেও নদী ও সমুদ্র তাকে দিয়েছে আত্মরক্ষার সহজ প্রবণতা ও প্রতিরোধক্ষমতা এবং তার মনে সৃষ্টি করেছে এক ধরনের ভাবালুতা।

রাধাকমল মুখার্জী এ প্রসঙ্গে লিখেছেন, "বাঙালির এই রক্ত সংমিশ্রণ তাহার প্রধান গৌরব। ইহা হইতেই আসিয়াছে বাঙালির কোমলতা ও ঔদার্য।...তাহা ছাড়া বাঙ্গালার মাটির, বাঙ্গালার জলের, প্রতিবেশের প্রভাব খুব প্রত্যক্ষ, খুব নিবিড়। ...বাঙালি তাই সবক্ষেত্রে ভাবুক, উদার ও সেরা বিদ্রোহী। তাই আর্য্য সংস্কৃতি ও বেদ বিরোধী বৌদ্ধ ধর্ম্ম বাঙ্গালাতে প্রথম ও প্রধান আশ্রয় পাইয়াছিল।" কিন্তু উপরোক্ত আলোচনার ভিত্তিতে আমরা এও বলতে পারি যে, পূর্ববঙ্গবাসীদের মনে দু'টি পরস্পর বিরোধী সত্তার জন্ম হয়েছিলো।

ভৌগোলিক অবস্থান ও প্রাকৃতিক কারণ এ-অঞ্চলের জনগোষ্ঠীর মানসিকতা তৈরি করেছে। নদীর অনবরত ভাঙন, মহামারী, অত্যাচার ইত্যাদির ফলে এ অঞ্চলের সাধারণ মানুষ সব সময় বসতি বদলেছে। এই জায়গায় সে শেকড় গাড়তে পারেনি দৃঢ়ভাবে। সমাজের মেলবন্ধন শক্ত হতে পারেনি, তার দরুণ ব্যক্তি প্রবণতা শক্তিশালী হয়েছে। ফলে তার চরিত্রে সৃষ্টি হয়েছে নৈরাজ্যের।

আবহমানকাল থেকে বিদেশীরা এখানে এসেছে কিন্তু পূর্ববঙ্গবাসীর জন্য তা কখনও বড় রকমের সমস্যার সৃষ্টি করেনি। শাসক বিদেশী হওয়া সত্ত্বেও এক ধরনের সহ-অবস্থান ছিলো তাদের সঙ্গে পূর্ববঙ্গবাসীর। কিন্তু যখন কোনো সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে তখন সরাসরি কোনো সংঘাত বা সংঘর্ষের পরিবর্তে সে গ্রাম ছেড়ে চলে গেছে বা বসতি বদলেছে। ফলে সব কিছুকে এড়িয়ে যাওয়ার, কোনো কিছুর দায়িত্ব না নেয়ার এক ধরনের মানসিকতা তৈরি হয়েছে তার মনে।

কিন্তু প্রশ্ন উঠতে পারে তাহলে উনিশ শতকের পূর্ববঙ্গে এতো কৃষক বিদ্রোহ হয়েছিলো কিভাবে? এটা ঠিক পূর্ববঙ্গের কৃষক বিদ্রোহ করেছিলো কিন্তু যতক্ষণ সম্ভব সে সংঘাত এড়িয়ে চলেছে। সে রুখে দাঁড়িয়েছে তখন যখন অত্যাচার একেবারে চরমে উঠেছে বা তার জীবিকার অবলম্বন জমির উপর হস্তক্ষেপ করা হয়েছে। ঐ একটি কারণে এখনও বাঙালি রুখে দাঁড়ায়। এভাবে আমরা দেখি পূর্ববঙ্গের জনগোষ্ঠীর মধ্যে দু'টি পরস্পর বিরোধী সত্তার জন্ম হয়েছে। নীহাররঞ্জন রায় উল্লেখ করেছিলেন, উনিশ শতক পর্যন্ত বাংলাদেশে ও বাঙ্গালির বাস্তব সভ্যতার রূপ গ্রামীণ। কথাটি সর্বাংশে সত্য। আলোচ্য সময়ে দেখি, পূর্ববঙ্গে ছিলো তখন জলাজঙ্গল পরিস্কার করে আবাদ করার সময়। শহর যেগুলো ছিলো সেগুলো ছিলো যেন সমৃদ্ধিশালী গ্রামেরই বিস্তৃতি। গ্রামের সঙ্গে 'শহর-বাসীর' সম্পর্ক ছিলো অতি ঘনিষ্ঠ, দৃঢ়। বিশ শতকের দ্বিতীয়/তৃতীয় দশকেও দেখি আধুনিক উপন্যাসের শিক্ষিত নায়ক পূর্ববঙ্গ সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে বলছে,

www.Educationblog24.Com

পৃথিবীর সব মানুষ যখন এগিয়ে যাচ্ছে তখন আমাদের গ্রামের টোলপাঠশালায় মান্ধাতা আমলের কেতাব পড়ানো হচ্ছে। পৃথিবীব্যাপী যখন যন্ত্রশিল্পের যুগ আরম্ভ হয়েছে তখন গ্রামের ক্ষয়িষ্ণু জমিদাররা ভাসান গান বা কথকতা নিয়ে ব্যস্ত। 'নিতান্ত গ্রাম্য মানুষের গ্রাম্য সভ্যতা আমাদের। পূর্ব বাঙ্গালায় তাহার উপকরণ দৈন্য ছিল আরও সুস্পষ্ট প্রায় প্রিমিটিভ।' (গোপাল হালদার, 'স্রোতের দীপ')। এর একটি প্রধান কারণ, সম্পূর্ণ কৃষিভিত্তিক দেশ হওয়া সত্ত্বেও দীর্ঘ সময় ধরে এ অঞ্চলের উৎপাদন পদ্ধতির কোনো পরিবর্তন হয়নি।

কেন্দ্র থেকে পূর্ববঙ্গের অবস্থান ছিলো সব সময় দূরে। কেন্দ্রে শাসন করেছে বিদেশীরা। ফলে প্রত্যক্ষভাবে গ্রামীণ সমাজের সঙ্গে কোনো সম্পর্ক তৈরি হয়নি। পূর্ববঙ্গবাসী তার কৃষি ও গ্রামীণ সভ্যতার মধ্যে আবর্তিত ছিলো! এক ধরনের চলনসই প্রশাসনিক ব্যবস্থা ছিলো মাত্র তাদের ওপরে। সে কারণেই তারা কখনও বেশি প্রশাসনিক বাগাড়ম্বর বা প্রশাসন সহ্য করতে পারেনি। ঔপনিবেশিক কারণে পূর্ববাংলার সমাজ গঠনে শ্রেণীবিন্যাস তৈরি হয়েছিলো। কিন্তু সমাজবন্ধন শিথিল হয়নি। ফলে শ্রেণীবিন্যাসের বিপরীতে সামাজিক মেলবন্ধন লাভ করেছে অতিরিক্ত প্রাধান্য। একজন ব্যক্তি, একই সঙ্গে সমাজ ও শ্রেণীর সঙ্গে যুক্ত কিন্তু যুক্ততার আধিক্য সমাজের দিকেই বেশি। সেজন্যে সমাজের মধ্যে শ্রেণী সম্পর্ক নির্ধারণ প্রায় অসম্ভব হয়ে ওঠে, যখনই সেই ব্যক্তিটি বিভিন্ন জাতি, গ্রাম ও সমাজের মধ্যে আবদ্ধ হয়ে থাকে। তার দরুণ কখনও কখনও শ্রেণীবিরোধ তৈরি হলেও তা সামাজিক মেলবন্ধনে সম্পূর্ণ ভাঙন ধরাতে সক্ষম হয়নি।

পূর্ববঙ্গবাসীর মধ্যে এক ধরনের সাংস্কৃতিক ঐক্য ছিলো এবং আছে। কিন্তু এর কারণ, এখানকার কৃষিভিত্তিকতা যেখানে উৎপাদন পদ্ধতি প্রায় নিশ্চল। এই নিশ্চলতার দরুণ সমাজবিন্যাসে বহু স্তর সমান্তরালভাবে থেকে গেছে। এছাড়া কেন্দ্র থেকে দূরে অবস্থান এবং প্রতিটি অঞ্চলের ভৌগোলিক বিচ্ছিন্নতা আবার সৃষ্টি করেছে সামাজিক বিচ্ছিন্নতা ও সাংস্কৃতিক অসাম্যের। আর নিশ্চল উৎপাদন পদ্ধতি তাকে আরো জোরদার করে তুলেছে সৃষ্টি করেছে গতিহীনতা ও পুনরাবৃত্তির। আবার 'সমাজ কাঠামোর' অসম ঐক্য সংস্কৃতি প্রসারণের গতি রুদ্ধ করে দিয়েছে, সে জন্য আঞ্চলিকতা বাংলার গ্রামীণ সমাজের বৈশিষ্ট্য হিসেবে থেকে গেছে।

"বাঙালি সংস্কৃতির উৎস ও ভিত্তি ছিলো অষ্ট্রিক দ্রাবিড়-মোঙ্গলীয় জ্ঞান-বিজ্ঞান তত্ত্ব ও মনন। বাঙালির মননেও অধ্যাত্ম বুদ্ধি, সংখ্যা, যোগতন্ত্রের প্রভাব বারবার প্রবল রয়েছে।" এখনও দেখেছি চট্টগ্রামের বায়েজীদ বোস্তামীর দরগায় হিন্দু মুসলমান নির্বিশেষে গাছে সুতো বেঁধে মানত করছে। এখনও বাংলাদেশের হিন্দু মুসলমান পঞ্জিকা ঝাড়-ফুক ইত্যাদিতে বিশ্বাস করে। কিন্তু এর প্রধান কারণ সেই উৎপাদন পদ্ধতির নিশ্চলতা। বিভিন্ন সংস্কৃতির সমন্বয় সাধন যেমন হয়েছে ঐখানে তেমনি আবার "উৎপাদন পদ্ধতির নিশ্চলতার দরুণ ভৌগোলিক ও সামাজিক দূরত্ব বৌদ্ধ হিন্দু মুসলমান মতবাদ প্রয়াস ও দার্শনিক মনোভঙ্গি স্বতন্ত্র করে রেখেছে।"

www.Educationblog24.Com

উনিশ শতকে সম্পূর্ণভাবে কৃষিভিত্তিক পূর্ববঙ্গ পরিণত হয়েছিলো কাঁচামালের আড়ত হিসেবে। জনৈক ইংরেজ কর্মচারী লিখেছিলেন, পূর্ববঙ্গ ভারত সাম্রাজ্যের সবচেয়ে সুন্দর প্রদেশ হওয়া সত্ত্বেও ভালো প্রশাসন এর সীমানায় থেমে গেছে। ঐতিহ্য মতই একে উপেক্ষা করা হয়েছে। প্রশাসনিক দিক থেকে উপেক্ষিত হলেও কিন্তু অর্থনৈতিক দিক থেকে একে উপেক্ষা করা হয়নি। উনিশ শতকে দেখি পূর্ববঙ্গ পরিণত হয়েছিলো কলকাতা তথা বৃটিশ ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যের কাঁচামালের আড়ত বা পশ্চাদভূমি হিসেবে। পরবর্তী সময়ে পাকিস্তানী কেন্দ্রীয় শাসক শোষক পূর্ববঙ্গকে দেখেছে পশ্চাদভূমি হিসেবে এবং এই অবস্থা চলেছে ১৯৭১ সালে পূর্ববঙ্গ (বা তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান) স্বাধীন বাংলাদেশে পরিণত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত।

সহায়ক গ্রন্থ

নীহার রঞ্জন রায়, *বাঙালির ইতিহাস, আদি পর্ব*, কলকাতা, ১৯৮০।
গোপাল হালদার সম্পাদিত *সোনার বাংলা*, প্রথম খণ্ড, কলকাতা ১৯৫৬।
প্রবোধ চন্দ্র ঘোষ, *বাঙালি*, কলকাতা, ১৯৬৩।
রাধাকমল মুখার্জি, *বিশাল বাঙ্গালা*, কলকাতা, ১৩৫২।
আহমদ শরীফ : *বাঙালি ও বাংলা সাহিত্য*, ঢাকা, ১৯৭৮।
পার্বতীচরণ ভট্টাচার্য, *বাংলা ভাষা*, কলকাতা, ১৯৭৬।
রমাকান্ত চক্রবর্তী, *বাঙালির ধর্ম, সমাজ ও সংস্কৃতি*, কলকাতা, ২০০২
আব্দুল করিম, *বাংলার মুসলমানদের সামাজিক ইতিহাস* (মোকাদ্দেসুর রহমান অনূদিত), ঢাকা, ১৯৯৩।
আবুল মাল আবদুল মুহিত, *বাংলাদেশ : জাতি রাষ্ট্রের উদ্ভব*, ঢাকা, ২০০০।
হারুন-অর-রশিদ, *বাঙালির রাষ্ট্র চিন্তা ও স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়*, ঢাকা, ২০০৩।
মুনতাসীর মামুন, *উনিশ শতকে পূর্ববঙ্গের সমাজ*, ঢাকা, ২০১৩ (চতুর্থ সং)।
মুনতাসীর মামুন, *বাংলাদেশ : বাঙালি মানস, রাষ্ট্র গঠন ও আধুনিকতা*, ঢাকা।
সালাহউদ্দিন আহমেদ, *বাঙালির সাধনা ও বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ*, ঢাকা, ১৯৯২

প্রবন্ধ

আবু মহামেদ হবিবুল্লাহ, 'বাংলার মুসলমান', *সমাজ সংস্কৃতি ইতিহাস*, ঢাকা, ১৯৭৪
বোরহানউদ্দিন খান জাহাঙ্গীর, 'পূর্ব পাকিস্তানের সংস্কৃতি' *স্বদেশ ও সাহিত্য*, ঢাকা, ১৯৬৯
অসীম রায়, *'মুসলিম বাংলার ইতিহাসে সমন্বয়ধর্মী সংস্কৃতির ভূমিকা'*,
সালাহউদ্দিন আহমদ প্রমুখ সম্পাদিত, *আবু মহামেদ হবিবুল্লাহ স্মারক গ্রন্থ*, ঢাকা, ১৯৯১
সফিউদ্দিন জোয়ারদার, *'ইসলাম ও আধুনিকতা ঃ প্রাসঙ্গিক ভাবনা,*
সালাহউদ্দিন আহমেদ প্রমুখ সম্পাদিত, *আবু মহামেদ হাবিবুল্লাহ স্মারক গ্রন্থ*, ঢাকা-১৯৯১।
বোরহানউদ্দিন খান জাহাঙ্গীর, 'রাজনৈতিক সংস্কৃতি, জাতীয়তাবাদ ও সাম্প্রদায়িকতা, *পাক্ষিক জনকণ্ঠ*, ঈদ সংখ্যা, ২০০৩।

www.Educationblog24.com

www.Educationblog24.Com

দ্বিতীয় অধ্যায়
অখণ্ড বাংলা গঠনের প্রয়াস ও উপমহাদেশের বিভক্তি, ১৯৪৭

বাংলায় দু'টি সম্প্রদায় দীর্ঘদিন ধরে একসঙ্গে বসবাস করেছে। প্রাচীন বা মধ্যযুগে যে রাজা শাসন করেছেন তার ধর্ম স্বাভাবিকভাবেই গুরুত্ব পেয়েছে কিন্তু অন্য সম্প্রদায়কে এমন উৎপীড়ন করা হয়নি যা প্রবল সাম্প্রদায়িকতার সৃষ্টি করতে পারে।

ভারতবর্ষ বিভক্ত বিভিন্ন ধর্ম, বর্ণ, ভাষায়। সেখানেও ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসন পর্বের আগে ধর্ম নিয়ে প্রবল বিরোধ বা প্রবল সাম্প্রদায়িকতা দেখা দেয়নি।

উনিশ শতকে ঔপনিবেশিক শাসনের সময় ব্রিটিশ শাসন কর্তারা সাম্প্রদায়িকতাকে শাসনের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার শুরু করলেন এবং তখনই আজ যে সাম্প্রদায়িকতা দেখছি তার উদ্ভব ও বিকাশ শুরু হয়। ব্রিটিশ সিভিলিয়ান আলফ্রেড লায়াল লিখেছিলেন– ভারতীয় সমাজের চাবিকাঠি হলো ধর্ম। শুধু তাই নয়। ব্রিটিশ শাসনের স্বার্থে এগুলিকে অক্ষুন্ন রাখা উচিত। অর্থাৎ ভারতের লোক রক্ত বর্ণ ও ধর্মের ভিত্তিতে বিভক্ত। সুতরাং এই বিভক্তি যা ব্রিটিশ শাসনের স্তম্ভ তা অটুট রাখাই শ্রেয়।

উনিশ শতকে মুসলমানরা রাজ ভাষা না শিখে ভুল করেছিল। ফলে, অনুন্নত একটি সম্প্রদায়ে তারা পরিণত হয়েছিল। হিন্দুরা ইংরেজি শিখে সম্প্রদায়গতভাবে এগিয়ে গিয়েছিল। কারণ, সেই সময় ইংরেজি শিক্ষা ছিল বিত্ত ও মর্যাদার চাবিকাঠি। এই অসম উন্নয়ন দু'সম্প্রদায়ের মধ্যে দ্বন্দ্বের সৃষ্টি করেছিল। ঔপনিবেশিক শাসকরা প্রয়োজনমত একেক সম্প্রদায়কে গুরুত্ব দিতেন বা বিভক্তির সৃষ্টি করতেন যাতে শাসনের সুবিধা হয়।

কংগ্রেসের পর এ কারণেই রাজনৈতিক দল হিসেবে মুসলিম লীগের উদ্ভব হয়। মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর দ্বি-জাতি তত্ত্ব বা টু-নেশন থিওরি ক্রমেই মুসলমানদের মধ্যে জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। বিশ শতকে একদিকে যেমন হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গা বাড়তে থাকে, সাম্প্রদায়িকতা মানস জগত আচ্ছন্ন করতে থাকে, ধর্ম ব্যবহৃত হতে থাকে রাজনীতির হাতিয়ার হিসেবে। অন্যদিকে পুরনো সমন্বয়বাদী ধারা বা সিনক্রেস্টিক ধারা অন্তত বাংলার রাজনীতিতে ফিরিয়ে আনার চেষ্টাও লক্ষণীয় এবং গুরুত্বপূর্ণ।

ঔপনিবেশিক আমলে দু'টি সম্প্রদায়ের মধ্যে ক্রমাগত দ্বন্দ্ব ও উত্তেজনার সৃষ্টি সবার জানা এবং এর কারণও যে ঔপনিবেশিক সরকারের প্রশ্রয় তাও জানা। হিন্দু সম্প্রদায়ের বর্ণজাত সমস্যা ও শ্রেণী দ্বন্দ্বও এর কারণ, বিশ শতকে লেখা বিভিন্ন আত্মজীবনীতেও যার উল্লেখ আছে। কমিউনিস্ট নেত্রী মণিকুন্তলা সেন লিখেছিলেন, এক গরীব মুসলমান, এক সম্পন্ন হিন্দুর বাড়ির উঠোনে চলে এলে বাড়ির কর্তা জাত গেল বলে তাকে জুতা পেটা করে। গরীব মানুষটিই তখন কাঁদতে কাঁদতে বলে, "কর্তা,

ওহান দিয়া তো আপনাগো কুকুরডাও যায়, ভাতের হাঁড়ি কি তাতে ফেলা যায়? মুই তো এট্টা মানুষ কর্তা।" আর ছিল "জমিদারের জুলুম। শতকরা ৮০ ভাগ মুসলমান নিয়ে যেখানে বাস, সেখানে জমিদারের মধ্যে হিন্দু জমিদাররাই সংখ্যায় বেশী ছিল। মুষ্টিমেয় মুসলমান জমিদারও ছিল। কিন্তু চাষীদের শিক্ষা দিতে উভয়েরই ছিল একই পদ্ধতি। আর স্বভাবতই মুসলমান চাষীরাই ছিল সংখ্যায় বেশী।"

১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সময় অনেকের মতে, এই দুই সম্প্রদায়ের দ্বন্দ্ব প্রকট হয়ে ওঠে। কিন্তু সে দ্বন্দ্ব যতোটা ছিল হিন্দু-মুসলিম এলিটদের মধ্যে ততটা গরীব বাঙালির নয়। এ বিষয়টি গত একশো বছরে কলকাতাকেন্দ্রিক ও ঔপনিবেশিক সরকারের প্রচারের কারণে উঠে আসেনি। তা'হলো এ অঞ্চলের বাঙালি বঙ্গভঙ্গের বিরোধিতা জোরালোভাবে করেনি। এ অঞ্চলের অধিকাংশ মুসলমান ছিলেন চাষী আর হিন্দু চাষীদের ৯০% ছিলেন নমশূদ্র। এরা বঙ্গভঙ্গ বিরোধিতা কেন করবেন? বরং এরা বঙ্গভঙ্গের পক্ষে কাজ করেছেন। বাখরগঞ্জে নমশূদ্রদের এক সভায় ঘোষণা করা হয়েছিল, ব্রাহ্মণদের ঘৃণা ও অপছন্দ এবং কায়স্থ ও বৈদ্যদের কারণে বিরাট এই নমশূদ্র সম্প্রদায় পশ্চাৎপদ। অথচ মুসলমান ও তাঁরাই পূর্ববঙ্গে সংখ্যাগরিষ্ঠ, সুতরাং এই সম্প্রদায়ের বিন্দুমাত্র ইচ্ছে নেই তাদের সঙ্গে কাজ করার বরং তারা হাত মিলিয়ে কাজ করবেন তাদের মুসলমান ভাইদের সঙ্গে। ব্রাহ্ম গিরিশ চন্দ্র সেন লিখেছিলেন, বঙ্গভঙ্গ তিনি সমর্থন করেন কারণ, এর ফলে পশ্চাৎপদ পূর্ববঙ্গের উন্নতি হবে এবং এ কথা ভেবে তার 'আহলাদ হইয়াছে।' ১৯০৮ সালে মাদ্রাজ কংগ্রেসে বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে প্রস্তাব পাশ হলে নওয়াব আলী চৌধুরী এক বক্তৃতায় বলেছিলেন, "পুরনো প্রশাসনে ব্রহ্মপুত্র, পদ্মা, মেঘনা অববাহিকা ছিল অবহেলিত। বর্তমানে নতুন প্রশাসন চালু হওয়ায় পূর্ব বঙ্গ ফিরে পেয়েছে নতুন প্রাণ। কলকাতার হাত থেকে মুক্তি পাওয়ায় যেন সুন্দর জীবন ফিরে এসেছে। ...যদি পূর্ববঙ্গে ১০০ ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট এবং সম সংখ্যক সাব-ডেপুটি মুনসেফ এবং সাব-রেজিস্ট্রার নিযুক্ত হন, তা'হলে তাঁরা হবেন এ দেশের মাটির হিন্দু মুসলমান ছেলে মেয়েরা।" তিনি এক্ষেত্রে ইংল্যান্ড আয়ারল্যান্ডে যে সমস্যা, পূর্ববঙ্গ কলকাতার সমস্যাটিকেও সেভাবে দেখেছেন।

১৯০৫ থেকে ১৯৪৭ পর্যন্ত মুসলিম লীগের উত্থান ও বিকাশ গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। মুসলিম লীগের উদ্ভব ঢাকায় কিন্তু অচিরেই এর কর্তৃত্ব চলে যায় উত্তর ভারতে। ভারতীয় এলিটরা এর কর্তৃত্ব গ্রহণ করে এবং ১৯৪৭ এর আগে ভারতের মুসলমান নেতৃবৃন্দ সামাজিক সংগঠিত সমাবেশ ঘটানোর জন্য ইতিহাসের সূত্রগুলি তুলে ধরতে চেয়েছেন। তারা জোর দিয়েছেন মুসলমান নৃপতিদের ওপর যারা ছিলেন শৌর্যে বীর্যে তাদের ভাষায় অতুলনীয় এবং মনে করিয়ে দিতে চেয়েছেন ভারতীয় মুসলমানরা তাদেরই বংশধর। ইসলামী শাসনের যুগ স্বর্ণযুগ। ব্রিটিশ ও হিন্দুদের [কংগ্রেস] চক্রান্তে আজ তারা হীনবস্থায়। এই হীনবস্থা থাকবে না যদি মুসলমানদের জন্য আলাদা ব্যবস্থা হয়। ইতিহাসের এই ব্যবস্থা মুসলমান তরুণদের সংগঠনে ভূমিকা রেখেছে এবং 'পাকিস্তান মানসিকতা' তৈরি করেছে। ব্যাপারটা এমন দাঁড়িয়েছিল যে পাকিস্তান : মুসলমান।

www.Educationblog24.com

www.Educationblog24.Com

ভারত: হিন্দু। এই মানসিকতা গঠন খুবই তীব্র এবং শিক্ষিত মুসলমান মধ্যবিত্তের পক্ষে তা কাটিয়ে ওঠা দুরূহ। এটা ঠিক পূর্বাঞ্চলের মানুষদের বিশেষ করে সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমানদের এই প্রচার কিছুটা আচ্ছন্ন করেছিল। এবং এটি মুসলমান মানস বা মুসলমানদের বিচ্ছিন্নতার উদাহরণ হিসেবে দেখানো হয়। তবে, ১৯৭১ এর পটভূমিকায় দাঁড়িয়ে মনে হয়েছে, সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ যারা কৃষিজীবী তাদের এই মিথ প্রভাবিত করেনি যতটা করেছে অর্থনৈতিক বঞ্চনা। পাকিস্তান তাদের মনে হয়েছিল বঞ্চনা থেকে মুক্তি দেবে। কিন্তু, ভারত বিভাগের দায় বর্তেছে মুসলিম লীগ ও পূর্বাঞ্চলের মুসলমানদের ওপর।

ভারত ভাগের পর ঐতিহাসিকরা এই তত্ত্বই প্রচার করেছিলেন বা যে তত্ত্ব প্রাধান্য বিস্তার করেছিল বা আছে তা'হলো ভারত বিভাজনের জন্য মুসলমান বা মুসলিম লীগই দায়ী। এর সমালোচনা যে খানিকটা হয়নি তা' নয়। তবে, দল হিসেবে কংগ্রেস ও কংগ্রেসের আদর্শে বিশ্বাসীরা এই তত্ত্ব বেশি প্রচার করেছেন যাতে ভারত বিভাগের দায়িত্ব তাদের ওপর না পড়ে। বাংলা বিভাগের ওপর গবেষণা করতে গিয়ে জয়া চ্যাটার্জী দেখিয়েছিলেন যে, এর সবটাই সত্য নয়। তিনি লিখেছেন, ১৯৮০ সালে যখন তিনি গবেষণা শুরু করেন, "তখন একটা সাধারণ ও অনুকূল ধারণা প্রচলিত যে ভারত বাংলার বিভক্তি মুসলমানদের কাজ। হিন্দুরা তাদের মাতৃভূমির অখণ্ডতাকে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করতে কোনো কিছুই করে নি। ঐ সময়ে প্রচলিত দৃষ্টিভঙ্গি ও ধারণায় প্রকাশ পায় যে, স্বাভাবিক ঐতিহ্যগতভাবে হিন্দুত্বের বৈশিষ্ট্য হলো সহনশীল এবং বহুত্ববাদী তাই হিন্দুত্বে, সংকীর্ণ সাম্প্রদায়িকতার সুযোগ নেই।... ঐ গবেষণায় প্রকাশ পায় যে, বাঙলার হিন্দু ভদ্রলোকদের (elites) ক্রম-ক্ষুয়িষ্ণু ক্ষমতা, ধন সম্পদ ও মর্যাদা হুমকীর সম্মুখীন হওয়ায় তারা সামাজিক অবস্থান অক্ষুণ্ন রাখার লক্ষ্যে কূট-কৌশল অবলম্বন করে এবং নিজেদের কাজের যৌক্তিকতা হিসেবে বিভিন্ন ভাবাদর্শকে ব্যবহার করে। সত্যিকার অর্থে ঐ কূট কৌশলকে একমাত্র সাম্প্রদায়িক হিসেবেই আখ্যায়িত করা যায়।" গত শতকের শেষ দশক থেকে ভারতে আবার হিন্দুত্ববাদের বা রাজনীতির প্রবল প্রতাপ, তাতে, জয়া জানাচ্ছেন, তাঁর যুক্তিগুলিই "কত বিতর্কিত ও প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠেছে।"

পাকিস্তান আমলে পূর্ববঙ্গ থেকে যারা উদ্বাস্তু হয়েছেন তাদের একটা বড় অংশ ছিলেন মধ্য বা নিম্ন মধ্যবিত্ত। কিন্তু, কৃষক বা নমশূদ্ররা সেভাবে দেশ ত্যাগ করেছেন কী না সন্দেহ। অর্থনৈতিক বঞ্চনাই ছিল প্রধান। তাই ১৯৪৭ এর পর দেখি, মুসলিম তরুণরা মুসলিম লীগ আরোপিত ইতিহাস ঝেড়ে ফেলছে এবং সেই অর্থনৈতিক বঞ্চনাই মূল প্রতিপাদ্য হয়ে উঠেছে। ১৯৭১ সালে পাকিস্তান বিভক্তির সেটিই মূল কারণ হয়ে দাঁড়ায়। পরাজিত হয় দ্বিজাতি তত্ত্ব এই পূর্ববঙ্গেই, 'অতীতের ইতিহাসের ধারাবাহিকতায়।

যারা বাংলাদেশের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন তারা ছিলেন মুসলিম লীগের তরুণ তুর্কী। তা'হলে এটি সম্ভব হলো কীভাবে? এ বিষয়ে হারুন-অর-রশিদ তাঁর *বাংলা বিভাগ* ও

www.Educationblog24.com

অভিন্ন বাংলা প্রস্তাব সম্পর্কে বিস্তৃত গবেষণার পর সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন, বাঙালি মুসলিম লীগের কাছে 'দ্বিজাতিতত্ত্ব' ছিল ভিন্ন ভিন্ন স্বার্থ, কৃষ্টি, ঐতিহ্যে বিভক্ত মুসলমানদেরকে তাদের সাধারণ রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বী কংগ্রেস বা হিন্দুদের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন পরিচালনার একটি 'স্ট্রাটেজি' মাত্র। তাঁরা বিশ্বাস করতেন, ভারতে দ্বিজাতি নয়, বহুজাতি সত্তা রয়েছে।...বাংলার এই নেতৃত্বের নিকট 'পাকিস্তান' ছিল লাহোর প্রস্তাব বাস্তবায়নের লক্ষ্যে পরিচালিত একটি আন্দোলনের নাম, একটি একক রাষ্ট্রের রূপরেখা নয়। প্রাক ১৯৪৭ সালে, এ ভূখণ্ডে বাঙালি জাতীয়তাবাদ গড়ে ওঠা তার কাছে মনে হয়েছে দুরূহ ছিল। এবং "বাঙালির জাতি রাষ্ট্র গঠনের এ পর্বে এটাই ছিল গুরুত্বপূর্ণ সীমাবদ্ধতা। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর হিন্দু-আধিপত্যের ভীতি বাঙালি মুসলমানের মন থেকে কেটে গেলে বাঙালি-অবাঙালি দ্বন্দ্বটি প্রাধান্য লাভ করতে থাকে। পূর্ব বাংলার হিন্দুরা এবার পূর্ব বাংলার মুসলমানদের সাথে ঐক্যবদ্ধ হয় তাদের সাধারণ রাজনৈতিক শত্রু–পশ্চিম পাকিস্তানীদের শাসন, শোষণ ও আধিপত্যের বিরুদ্ধে।"

উপর্যুক্ত বিবরণের উদ্দেশ্যে একটি। তা'হলো প্রথাসিদ্ধ ভাবে আমরা এ ভূখণ্ডের জনসমষ্টিকে প্রধানত দু'ভাগে ভাগ করে (হিন্দু ও মুসলমান) দেখাবার চেষ্টা করি যে, দু'সম্প্রদায়ের মানসভূবন আলাদা এবং ধর্ম সেখানে একটি বড় ভূমিকা রেখেছে সম্প্রদায়গত বিভাজনে। এবং এই মানসগঠন সমস্যার সৃষ্টি করেছে। এর চেয়ে সমন্বয়ধর্মীর যে ব্যাপারটি ছিল উনিশ শতক পর্যন্ত সেটিই ছিল ভালো। আসলে চিন্তাটা করা হয়েছে এই বোধ থেকে যে, প্যাগানিজমই উত্তম। তা লৌকিকে পরিবর্তিত হয়েছে এবং এতে ধর্ম বোধের সমস্যা কম। এবং হিন্দু ধর্মকে তার সঙ্গে মিলিয়ে ফেলে তার পরিপ্রেক্ষিতেই ইসলামকে বিচার করা হয়েছে যা ফ্যালাসী মাত্র। কিন্তু, আলোচনায় দেখা যায় দু'টি ধর্মভিত্তিক সম্প্রদায় হলেও এরা প্রাক ঔপনিবেশিক, ঔপনিবেশিক এবং পাকিস্তান ঔপনিবেশিক আমলে পাশাপাশিই অবস্থান করেছে। ধর্মবোধ তাদের দু'টি বিপরীতমুখী অবস্থান সৃষ্টি করেনি অন্তত সংখ্যাগরিষ্ঠের ক্ষেত্রে। বহিরাগত সংস্কারকরা, বিশেষ করে মুসলমান ওহাবী সংস্কারকরা ওপর থেকে ইসলামের তত্ত্ব চাপিয়ে দিয়ে সাময়িক দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করলেও অন্তিমে তা প্রভাব ফেলতে পারে নি। হিন্দু সংস্কারকরা মূলতঃ নিজেদের সামাজিক কুসংস্কারের বিরুদ্ধেই আন্দোলন করেছিলেন। হিন্দু-মুসলমানের ক্ষেত্রে বাঙালি পরিচয়টাই প্রাধান্য পেয়েছে বা এই পরিচয়ের ধারাবাহিকতা বিভিন্ন সময় এলিট বা রাষ্ট্র নষ্ট করতে চাইলেও পারেনি। এই বোধের কারণেই হিন্দু মুসলমানের মধ্যে বিভেদের বদলে বাঙালিত্বের বিভিন্ন উপাদান রক্ষার ব্যাপারে যৌথ লড়াই হয়েছে। এই উপাদানগুলিকে বরং সমন্বয় ধর্মীয় উপাদান বলা যেতে পারে। আবার এই বোধকে অনেকে ধর্মনিরপেক্ষতা বলতে পারেন। তবে ধর্ম সহিষ্ণুতা বলাই বোধ হয় শ্রেয়। বাঙালির জাতি রাষ্ট্র গঠনে তা এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।

এ পরিপ্রেক্ষিতে, পুরনো আলোচনার সূত্র ধরে বলতে পারি হিন্দু-মুসলমানের একত্রে বসবাসের ঐতিহ্য ধরে রাখার প্রচেষ্টাও লক্ষণীয়। ড. হারুন-অর-রশিদ এ প্রসঙ্গে লিখেছেন–

www.Educationblog24.com

"প্রচ্ছন্নভাবে হলেও সর্বভারতীয় সাম্প্রদায়িক রাজনীতির ধারামুক্ত হিন্দু-মুসলমান সম্মিলিত প্রয়াসে বাঙালি জাতিসত্তাভিত্তিক রাজনীতিকে এগিয়ে নেয়ার চেষ্টা হয়। লক্ষ্মৌ চুক্তি (১৯১৬), খিলাফত-অসহযোগ আন্দোলন (১৯১৯-১৯২২), সি.আর দাসের 'বেঙ্গল প্যাক্ট' (১৯২৩), ফজলুল হকের নেতৃত্বাধীন প্রজা-আন্দোলন ও কৃষক-প্রজাপার্টি (১৯৩৬), বাংলার হিন্দু-নেতৃবৃন্দদের অন্তর্ভুক্ত করে এ কে ফজলুল হকের দ্বিতীয় মন্ত্রিসভা (১৯৪১-১৯৪৩) গঠন, ফজলুল হক কর্তৃক উত্থাপিত লাহোর প্রস্তাবে (১৯৪০) 'স্বাধীন রাষ্ট্রসমূহ' গঠনের সুপারিশ। ১৯৪৬ সালের নির্বাচন উত্তর কংগ্রেসকে সঙ্গে নিয়ে বাংলায় হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর, কোয়ালিশন মন্ত্রিসভা গঠনের প্রয়াস এবং দেশ বিভাগের প্রাক্কালে সোহরাওয়ার্দী আবুল হাশিম, শরৎ বসু, কিরণ শঙ্কর রায়ের 'অখন্ড স্বাধীন বাংলা রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ ইত্যাদি ঘটনা তার সাক্ষ্য।"

এ পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায়, অন্তিমে দ্বিজাতি তত্ত্ব আর কার্যকর থাকেনি। ১৯৭১ সালে স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয় এর প্রমাণ।

লাহোর প্রস্তাব, ১৯৪০

১৯৪০ সালের লাহোর প্রস্তাব পাকিস্তান আন্দোলনকে জোরদার করে। এর ভুল ব্যাখ্যা দিয়ে মুসলমান নেতৃবৃন্দ জিন্নাহর দ্বি-জাতি তত্ত্বকে এগিয়ে নেন। জিন্নাহর এক বক্তব্যে এই তত্ত্বের ব্যাখ্যা পাওয়া যায়–

> `We maintain and hold that Muslims and Hindus are two major nations by any definition or text of a nation. We are a nation of a hundred million and, what is more, we are a nation with our own distinctive culture and civilisation, language and literature, art and architecture...customs...history and traditions. aptitudes and ambitions. In short, we have our own distinctive outlook on life and of life.

অর্থাৎ, "আমরা দৃঢ়ভাবে মনে করি, জাতিতত্ত্বের যে-কোনো সংজ্ঞা বিচারে ভারতের হিন্দু ও মুসলমান দুটি প্রধান ভিন্ন জাতি। ভারতের দশ কোটি মুসলমান জাতি রয়েছে নিজস্ব স্বতন্ত্র সংস্কৃতি ও সভ্যতা, ভাষা ও সাহিত্য, শিল্প ও স্থাপত্য, রীতি-নীতি, ইতিহাস ও ঐতিহ্য এবং এক ও অভিন্ন জীবন-পদ্ধতি।' [অনুবাদ : হারুন-অর-রশিদ]

বিশ শতকের ত্রিশ চল্লিশ দশকে মুসলিম লীগের নেতৃত্ব ছিল অবাঙালিদের হাতে। ফজলুল হক, সোহরাওয়ার্দী বা আবুল হাশিম সর্বভারতীয় নেতা হলেও মুসলিম লীগের নেতৃবৃন্দ কখনও তাদের হাই কমান্ডের অন্তর্ভুক্ত করেননি। বাংলার স্থানীয় নেতা হিসেবেই তাদের কর্মকাণ্ড পরিচালনা করতে হয়েছে। তবে সর্বভারতীয় রাজনীতিতে তাদের উপেক্ষা করাও সম্ভব ছিল না। 'লাহোর প্রস্তাব তার প্রমাণ।

১৯৪০ সালে লাহোরে মুসলিম লীগের একটি সম্মেলন হয়। সেখানে এ কে ফজলুল হক একটি প্রস্তাব আনেন যা পরবর্তীকালে লাহোর প্রস্তাব হিসেবে পরিচিতি লাভ করে। প্রস্তাবটি ছিল এরকম–

> 'Resolved that it is the considered view of this session of the All India Muslim League that no constitutional plan would be workable in this country or acceptable to Muslims unless it is designed on the following basic

www.Educationblog24.com

principles, viz., that geographically contiguous units are demarcated into regions which should be so constituted, with such territorial readjustments as may be necessary, that the areas in which the Muslims are numerically in a majority as in the North-Western and Eastern Zones of India should be grouped to constitue 'Independent States' in which constituent units shall be autonomous and sovereign....This Session further authorise the working committee to frame a scheme of constitution....providing for the assumption finally by the respective regions of all power such as defense, external affairs. communications, customs and such other matters as may be necessary.

অধ্যাপক হারুন-অর-রশিদ লিখেছেন বিষয়টি ব্যাখ্যা করে–

"প্রস্তাবের মূল বক্তব্য বা বৈশিষ্ট্য ছিল নিম্নরূপ :

১. ভৌগোলিক দিক থেকে সংলগ্ন এলাকাগুলোকে পৃথক অঞ্চল বলে গণ্য করতে হবে।

২. এ সকল অঞ্চলের ভৌগোলিক সীমানা প্রয়োজনমতো পরিবর্তন করে ভারতবর্ষের উত্তর-পশ্চিম ও পূর্বাঞ্চলের যে-সকল স্থানে মুসলমানরা সংখ্যাগরিষ্ঠ সেখানে 'স্বাধীন রাষ্ট্রসমূহ' (Independent States) প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

৩. এ-সমস্ত স্বাধীন রাষ্ট্রের অঙ্গরাজ্য হবে সার্বভৌম ও স্বায়ত্তশাসিত।

৪. ভারতের ও নবগঠিত মুসলিম রাষ্ট্রের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের সাংস্কৃতিক, শাসনতান্ত্রিক ও অন্যান্য অধিকার ও স্বার্থ সংরক্ষণের কার্যকর ব্যবস্থা করা হবে।

৫. মুসলিম লীগের ওয়ার্কিং কমিটি এমন একটি ভবিষ্যৎ শাসনতান্ত্রিক পরিকল্পনা প্রণয়ন করবে যাতে 'স্বাধীন রাষ্ট্রসমূহ' নিজ নিজ অঞ্চলের প্রতিরক্ষা, বৈদেশিক সম্পর্ক, যোগাযোগ, রাজস্ব এবং অন্যান্য সকল ক্ষমতা আপন কর্তৃত্বাধীনে তুলে নিতে সক্ষম হয়।

লাহোর-প্রস্তাবের ব্যাখ্যা নিয়ে এক সময় বিভিন্ন জনের ভিন্ন ভিন্ন মত থাকলেও, আজ এটা স্বীকৃত যে, 'স্বাধীন রাষ্ট্রসমূহ' (Independent States) দ্বারা উল্লিখিত দুটি অঞ্চলে বস্তুত দুটি পৃথক স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার কথা বলা হয়েছে। সবারই জানা যে, এই প্রস্তাব উত্থাপন করেছিলেন বাংলার তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী এ.কে ফজলুল হক। তিনি কখনো জিন্নাহর দ্বিজাতিতত্ত্বে বিশ্বাসী ছিলেন না। লাহোর-প্রস্তাবের কোথাও 'দ্বিজাতিতত্ত্বের' উল্লেখ নেই। এই প্রস্তাবের কোথাও 'পাকিস্তান' শব্দটিরও উল্লেখ নেই, যদিও তা দ্রুত 'পাকিস্তান প্রস্তাব' হিসেবে পরিচিতি লাভ করে।"

সোহরাওয়ার্দী বা আবুল হাশেম বা ফজলুল হক এই দ্বিজাতি তত্ত্ব মানতে পারেননি দেখে অখন্ড বাংলা রাষ্ট্র গঠনের প্রস্তাব দেন। কারণ, তাদের মনে হয়েছিল তারা লাহোর প্রস্তাব অনুযায়ী কাজ করছেন। কিন্তু মুসলিম লীগ হাইকমান্ড তাদের এই চিন্তা গ্রহণ করেনি। হাইকমান্ড মনে করেছে লাহোর প্রস্তাব অনুযায়ীই পাকিস্তান করতে হবে।

১৯৪৭ সালের ২২ মার্চ লর্ড মাউন্টব্যাটেন ভারতের ভাইসরয় হয়ে আসেন। তাঁর সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য ছিল ভারতে ক্ষমতা হস্তান্তরের ব্যাপারে বাস্তব পদক্ষেপ গ্রহণ করা। তিনি

www.Educationblog24.Com

যখন ভাইসরয় হয়ে ভারতে আসেন তখন এখানকার রাজনৈতিক ও শাসনতান্ত্রিক অবস্থা ছিল ভীষণ জটিল। কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের মধ্যে মতানৈক্যের ফলে ভারতের কেন্দ্রীয় সরকার কার্যত তখন অকেজো; দেশের বিভিন্ন জায়গায় ঘটছিল মারাত্মক সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষ। ফলে তখন এটা স্পষ্টত প্রতীয়মান হয় যে ভারতের অখণ্ডতা আর কোনোক্রমেই রক্ষা করা সম্ভব নয়। এমনি পরিস্থিতিতে দেশের রাজনৈতিক ও শাসনতান্ত্রিক সংকট দূর করে ভারতীয় জনগণের নিজস্ব ইচ্ছা অনুসারে ভারত বিভাগ করার উদ্দেশ্যে লর্ড মাউন্টব্যাটেন ব্রিটিশ সরকারের নিকট এক পরিকল্পনা পেশ করেন। তার এই পরিকল্পনাটি 'মাউন্টব্যাটেন পরিকল্পনা' নামে অভিহিত। ১৯৪৭ সালের ৩ জুন ব্রিটিশ সরকার এক বিবৃতির মাধ্যমে এই পরিকল্পনা প্রকাশ করেন।

অখণ্ড স্বাধীন বাংলা রাষ্ট্র গঠনের উদ্যোগ, ১৯৪৭ ও পরিণতি

মাউন্টব্যাটেন তাঁর পরিকল্পনা প্রকাশের পূর্বে বাংলার বিষয়টি কংগ্রেস ও লীগ নেতৃত্বের গোচরীভূত করেন। বাংলার ভবিষ্যৎ প্রশ্নে আলোচনার জন্য তৎকালীন অবিভক্ত বাংলার মুখ্যমন্ত্রী হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী ১৯৪৭ সালের ২৭ এপ্রিল দিল্লিতে মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর সঙ্গে আলোচনা করেন। উক্ত আলোচনায় মি. জিন্নাহ কী অভিমত ব্যক্ত করেছিলেন তা আজো অজ্ঞাত। তবে ঐ আলোচনার পরপর দিল্লিতে অনুষ্ঠিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে সোহরাওয়ার্দী 'স্বাধীন বাংলা' পরিকল্পনা ঘোষণা করেন। এই পরিকল্পনায় বলা হয় যে, বাংলায় এক নতুন মন্ত্রিপরিষদ গঠন করা হবে যার প্রধানমন্ত্রী হবেন একজন মুসলমান। মন্ত্রিসভার অন্য সদস্যদের শতকরা পঞ্চাশভাগ মুসলমান ও পঞ্চাশভাগ অমুসলমান থাকবেন। এরপর প্রাপ্ত বয়স্কদের সরাসরি ভোটে পরিষদ নির্বাচিত হবে। বাংলাদেশ স্বাধীন সার্বভৌম থাকবে, না পাকিস্তানে যোগদান করবে, কী ভারতে করবে সে বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে উক্ত পরিষদ। তাৎক্ষণিকভাবে বাংলার হিন্দু-মুসলমান নেতৃবৃন্দ যুক্ত বাংলার সপক্ষে অভিমত ব্যক্ত করেন। বঙ্গভঙ্গ রোধ এবং স্বাধীন সার্বভৌম বাংলার গঠন কাঠামো কী ধরনের হবে সে প্রসঙ্গে হিন্দু-নেতৃবৃন্দের সঙ্গে আলাপ-আলোচনার জন্য প্রাদেশিক মুসলিম লীগের কার্যকরী পরিষদের ৩০ এপ্রিল ১৯৪৭ তারিখের সভায় (মওলানা আকরাম খাঁর সভাপতিত্বে) একটি সাবকমিটি গঠন করা হয়। এই সাবকমিটির সদস্য ছিলেন হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী, হাবিবুল্লাহ বাহার, হামিদুল হক চৌধুরী, ইউসুফ আলী চৌধুরী, ফজলুর রহমান ও নূরুল আমীন (আহবায়ক)।

প্রাদেশিক মুসলিম লীগের উদ্যোগের প্রতি বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেসের প্রধান সুরেন্দ্রমোহন ঘোষ, কংগ্রেস পার্লামেন্টারি দলের কিরণশঙ্কর রায় এবং ফরওয়ার্ড ব্লক নেতা শরৎচন্দ্র বসু আশানুরূপ সাড়া দেন। ২৮ এপ্রিল থেকে ১২ মে পর্যন্ত বাংলার হিন্দু-মুসলমান নেতৃবৃন্দ যুক্তবাংলা প্রশ্নে বিভিন্ন বৈঠকে মিলিত হন। সে সময় গান্ধীজি কলিকাতায় অবস্থান করছিলেন। যুক্তবাংলার বিষয় নিয়ে আলোচনার উদ্দেশ্যে ৯ মে শরৎবসু একাই, ১০ মে শরৎবসু ও আবুল হাশিম, ১১ মে সোহরাওয়ার্দী ও ফজলুর রহমান এবং ১২ মে সোহরাওয়ার্দী, বগুড়ার মোহাম্মদ আলী এবং আবুল হাশিম

www.Educationblog24.Com

গান্ধীজির সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। ভারতীয় রাজনীতিতে গান্ধীজি তখন এক গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব। তাই বাঙালি জাতীয়তাবাদে বিশ্বাসী নেতৃবর্গ তাঁর কাছে এসেছিলেন তাঁর সমর্থন আদায়ের উদ্দেশ্যে। কিন্তু গান্ধীজি সেদিন যা করেছিলেন তার ফলাফল ছিল শূন্য। তিনি রাজনৈতিক প্রজ্ঞা দিয়ে স্বাধীন বাংলার বিষয়টি সুচতুরভাবে এড়িয়ে যান। তবে শরৎবসুকে একটি চিঠি লিখে আশ্বাস দেন যে, তিনি কংগ্রেসের কার্যনির্বাহী কমিটিতে তাঁদের প্রস্তাব পৌঁছে দেবেন।

গান্ধীজির পক্ষ থেকে সুস্পষ্ট কোনো আশ্বাস না-পেয়ে শরৎচন্দ্র বসু ১৯৪৭ সালের ১২ মে একটি ছয় দফা নীতিমালা ঘোষণা করেন। নীতিমালায় উল্লেখিত হয় যে:

১. বাংলা হবে একটি সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র;
২. সংবিধান প্রণয়নের পর বাংলার আইন পরিষদ গঠিত হবে প্রাপ্ত বয়স্কদের ভোটে যৌথ নির্বাচনের মাধ্যমে;
৩. এভাবে নির্বাচিত আইন পরিষদ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে যে, অবশিষ্ট ভারতবর্ষের সঙ্গে বাংলার সম্পর্ক কী হবে;
৪. বর্তমান মুসলিম লীগ মন্ত্রিপরিষদ বিলুপ্ত করা হবে এবং তদস্থলে একটি সর্বদলীয় মধ্যবর্তী মন্ত্রিপরিষদ গঠন করা হবে;
৫. বাংলার পাবলিক সার্ভিস বাঙালি দ্বারা গঠিত হবে এবং সেখানে হিন্দু-মুসলমানের সমান প্রতিনিধিত্ব থাকবে;
৬. সংবিধান প্রণয়নের জন্য একটি অস্থায়ী গণপরিষদ গঠন করা হবে যার সদস্য সংখ্যা হবে ৬১ (৩১ জন মুসলমান এবং ৩০ জন অমুসলমান)।

শরৎবসুর এই নীতিমালার অনুরূপ আরেকটি ঘোষণা সোহরাওয়ার্দী কর্তৃক ঘোষিত হয়েছিল তা আগেই উল্লিখিত হয়েছে। ১২ মে থেকে ২০ মে পর্যন্ত সোহরাওয়ার্দী ও শরৎবসুর প্রস্তাবসমূহ নিয়ে বাঙালি হিন্দু-মুসলমান নেতাদের মধ্যে আলোচনা চলতে থাকে। এসব আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন মুখ্যমন্ত্রী সোহরাওয়ার্দী, মুসলিম লীগের প্রাদেশিক সেক্রেটারি আবুল হাশিম, বগুড়ার মোহাম্মদ আলী (মন্ত্রী), ঢাকার ফজলুর রহমান (মন্ত্রী), বঙ্গীয় কংগ্রেস নেতা কিরণশঙ্কর রায়, সত্যরঞ্জন বখশী ও ফরওয়ার্ড ব্লক নেতা শরৎচন্দ্র বসু। নেতৃবৃন্দ ২০ মে শরৎচন্দ্র বসুর বাসায় এক সম্মেলনে বসে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলার শাসনতান্ত্রিক কাঠামোর খসড়া রচনা করেন। এই খসড়া চুক্তির শর্তসমূহ ছিল নিম্নরূপ :

১. বাংলা হবে একটি স্বাধীন, সার্বভৌম রাষ্ট্র। ভারতের অন্য অংশের সঙ্গে তার সম্পর্ক কী হবে তা এই স্বাধীন রাষ্ট্র স্থির করবে;
২. হিন্দু ও মুসলমান জনসংখ্যার অনুপাতে আসন সংখ্যা বন্টন করে প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটে যৌথ নির্বাচনের মাধ্যমে বাংলা আইন পরিষদ গঠিত হবে। জনসংখ্যার অনুপাতে হিন্দু ও তফসলি সম্প্রদায়ের মধ্যে আসন-সংখ্যা বন্টন করা হবে; অথবা তারা যেভাবে মেনে নেন সেভাবে আসন-সংখ্যা নির্ধারণ করা হবে।
৩. স্বাধীন বাংলার এরূপ পরিকল্পনা ব্রিটিশ সরকার মেনে নিলে, বা বাংলাভাগ করা

www.Educationblog24.com

www.Educationblog24.com

হবে না এরূপ ঘোষণা দিলে, বাংলার বর্তমান মন্ত্রিসভা ভেঙে দেয়া হবে এবং সেস্থলে একটি অন্তবর্তীকালীন মন্ত্রিসভা গঠন করা হবে। এই অন্তবর্তীকালীন মন্ত্রিসভার প্রধানমন্ত্রীর পদ বাদে বাকি সদস্যপদ হিন্দু (তফসিলসহ) ও মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে সমান বণ্টন হবে। এই মন্ত্রিসভার প্রধানমন্ত্রী হবেন একজন মুসলমান এবং স্বরাষ্ট্র হবেন একজন হিন্দু।

৪. নতুন সংবিধান অনুযায়ী আইন পরিষদ ও মন্ত্রিসভা গঠন না-হওয়া পর্যন্ত পুলিশ ও সেনাবাহিনীসহ সকল চাকুরি বাঙালিদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হবে এবং চাকুরিতে সমানসংখ্যক বাঙালি হিন্দু ও মুসলমান নিয়োগ করা হবে।

৫. বাংলার ভবিষ্যৎ সংবিধান রচনার জন্য যে গণপরিষদ গঠিত হবে, সেই গণপরিষদে মোট ৩০ জন সদস্য নির্বাচিত হবেন। তন্মধ্যে ১৬ জন মুসলমান ও ১৪ জন হিন্দু সদস্য হবেন। বর্তমান আইনসভার হিন্দু ও মুসলমান সদস্যগণই উক্ত গণপরিষদের সদস্য নির্বাচন করবেন। গণপরিষদের সদস্য নির্বাচনকালে বর্তমান আইনসভার ইউরোপীয় সদস্যগণের কোনো ভোটাধিকার থাকবে না।

এই দলিল প্রচারিত হবার পর বাঙালি-মনে মিশ্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। বঙ্গীয় মুসলিম লীগের একটি গ্রুপ প্রকাশ্যে স্বাধীন অখণ্ড বাংলা প্রস্তাবের বিরোধিতা শুরু করে। এই গ্রুপে ছিলেন মওলানা আকরাম খাঁ, নূরুল আমীন, হামিদুল হক চৌধুরী প্রমুখ। তারা ঘন ঘন দিল্লি যাতায়াত শুরু করেন। লাহোর প্রস্তাবের দোহাই দিয়ে পত্রিকায় সোহরাওয়ার্দী ও হাশিম গ্রুপের বিরুদ্ধে নানারকম অপপ্রচার শুরু করা হয়।

অন্যদিকে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটিও 'যুক্তবাংলা' প্রশ্নে বিপাকে পড়ে। বাংলা কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দ সর্দার বল্লভ ভাই প্যাটেলের সঙ্গে আলোচনা করতে গেলে তিনি 'যুক্তবাংলার' বিরোধিতা করেন। তিনি যুক্তি দিয়ে বলেন যে, যেহেতু বিভাগ পরিকল্পনায় কলকাতাসহ পশ্চিমবাংলা ভারতের অন্তর্ভুক্ত হওয়া নিশ্চিত প্রায়, অতএব যুক্তবাংলার খপ্পরে পড়া হিন্দু-নেতৃবর্গের উচিত হবে না। ফলে শেষপর্যন্ত যুক্তবাংলা পরিকল্পনার প্রতি শরৎবসু এবং কিরণশঙ্কর রায় ব্যতীত কোনো হিন্দুনেতার সমর্থন রইল না। *অমৃতবাজার পত্রিকা* প্রকাশ্যে যুক্তবাংলার বিরোধিতা শুরু করে। হিন্দু মহাসভা বাংলা বিভাগের দাবিতে আন্দোলন শুরু করে।

এমতাবস্থায় কেবল মুসলিম লীগ আন্দোলন করে বাংলা বিভাগ রোধ করতে পারত। কিন্তু কেন্দ্রীয় লীগ হাই কম্যান্ড বাংলা প্রশ্নে এক নিশ্চুপ ভূমিকা পালন করতে থাকে। মুহম্মদ আলী জিন্নাহ বাংলার ভবিষ্যৎ বিষয়ে সোহরাওয়ার্দী-হাশিম গ্রুপের পরিকল্পনার প্রতি মৌন সমর্থন দিলেও কেন্দ্রীয় লীগের একটি গ্রুপ বাংলা লীগের মওলানা আকরাম-নাজিমউদ্দীন গ্রুপকে স্বাধীনবাংলা পরিকল্পনা বানচাল করার প্ররোচনা দিতে থাকে।

কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের এহেন নীতির কথা বুঝতে পেরে চতুর মাউন্টব্যাটেন তাঁর ৩ জুনের পরিকল্পনায় ঘোষণা করেন যে, কেবল কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের মধ্যে ঐকমত্য স্থাপিত হলেই তিনি বঙ্গভঙ্গ রোধ করবেন, অন্যথায় নয়।

www.Educationblog24.Com

পাকিস্তান সৃষ্টি, ১৯৪৭

১৯৪৭ সালে কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের সম্মতিতেই উপমহাদেশ বিভক্ত হয় যার প্রক্রিয়া আগেই শুরু হয়েছিল। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে আপাতত দ্বিজাতি তত্ত্ব জয়ী হয়।

পাকিস্তান রাষ্ট্রের বৈশিষ্ট্য ছিল ভৌগোলিক আকৃতি। ভারতের দু'দিকে ছিল এর সীমানা। অর্থাৎ একদিকে ছিল পূর্ব পাকিস্তান অন্যদিকে পশ্চিম পাকিস্তান, মাঝখানে ১২০০ মাইলের ব্যবধান। এ ধরনের রাষ্ট্রগঠন ছিল বিরল। পাকিস্তানের এই দুই অংশের মানুষজনের মধ্যে ভাষাগত, সাংস্কৃতিক, নৃতাত্ত্বিক কোন মিল ছিল না। সেই সময় কংগ্রেস নেতা মওলানা আবুল কালাম আজাদ বলেছিলেন, এ রাষ্ট্র ২৫ বছরের মধ্যে ভেঙ্গে যাবে। তাঁর ভবিষ্যতবাণী সফল হয়েছিল।

এখানে অখণ্ড বাংলা কীভাবে ভাগ করা হয়েছিল এবং তার সীমানা কী ভাবে চিহ্নিত করা হয়েছিল তা বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

মাউন্টব্যাটেন পরিকল্পনানুযায়ী বাংলার হিন্দু ও মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ জেলাসমূহের সংসদ-সদস্যগণ ১৯৪৭ সালের ২০ জুন পৃথক পৃথক বৈঠকে বসেন। মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ জেলাসমূহের প্রতিনিধিবর্গ ১০৬: ৩৫ ভোটে অখণ্ড বাংলার প্রতি সমর্থন জ্ঞাপন করেন। অপরপক্ষে হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ জেলাসমূহের প্রতিনিধিবর্গ বর্ধমানের মহারাজার সভাপতিত্বে মিলিত হয়ে ৫৮ : ২১ ভোটে বাংলার বিভক্তির পক্ষে মত ব্যক্ত করেন। ফলে বাংলা পূর্ববাংলা ও পশ্চিম বাংলা এই দুই অংশে বিভক্ত হয়। পূর্ববাংলার প্রতিনিধিবর্গ ১০৭: ৩৪ ভোটে পাকিস্তানে যোগদানের পক্ষে এবং পশ্চিম বাংলার প্রতিনিধিবর্গ ৫৮: ২১ ভোটে ভারতবর্ষে যোগদানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। পূর্ববাংলার যে ৩৪ জন বাংলা বিভক্তির পক্ষে এবং পাকিস্তানে যোগদানের বিপক্ষে কিন্তু ভারতে যোগদানের পক্ষে ভোট দেন তারা সকলেই ছিলেন কংগ্রেস দলীয় সদস্য। এদের মধ্যে কিরণশঙ্কর রায় অন্যতম। অপরপক্ষে পশ্চিম বাংলার যে ২১ জন বাংলা বিভক্তির বিপক্ষে ভোট দেন তারা সকলেই ছিলেন মুসলিম লীগ দলীয় সদস্য। হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী এই দলভুক্ত ছিলেন। এখানে উল্লেখ্য যে, এ. কে. ফজলুল হক ভোটাভুটিতে অংশ নেননি।

ঢাকায় পূর্ববঙ্গের রাজধানী স্থাপন

বঙ্গভঙ্গের ভোটাভুটি সম্পন্ন হওয়ার পর সোহরাওয়ার্দী মন্ত্রিসভা কলিকাতা ত্যাগ না-করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। মন্ত্রিসভার সদস্য বগুড়ার মোহাম্মদ আলী এক বিবৃতিতে দাবি করেন যে, কলিকাতা পূর্ববঙ্গের অন্তর্ভুক্ত করতে হবে এবং কলিকাতা থেকেই পূর্ববঙ্গ শাসন করা হবে বলে তিনি দৃঢ় অভিমত ব্যক্ত করেন। তবে কলিকাতা ত্যাগ করতে হলে তার বিনিময়ে উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ প্রদান করতে হবে বলে তিনি দাবি করেন। কিন্তু বাংলা মুসলিম লীগে তখন ক্ষমতা দখলের লড়াই চরমে উঠেছে। কলিকাতা পূর্ববাংলার অন্তর্ভুক্ত করা কিংবা কলিকাতার বিনিময়ে ক্ষতিপূরণ আদায়ের সংগ্রাম যখন গতিশীল হচ্ছিল ঠিক সে-সময় ২৭ জুন প্রাদেশিক মুসলিম লীগের ওয়ার্কিং

www.Educationblog24.Com

কমিটির এক জরুরি সভায় মাত্র ৬ জন সদস্যের উপস্থিতিতে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, ঢাকায় পূর্ববঙ্গের রাজধানী স্থাপিত হবে।

এভাবে বাংলা বিভক্তির ক্ষেত্র প্রস্তুত হলে ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ ১৮ জুলাই (১৯৪৭) এর 'ভারত স্বাধীনতা আইনে' বাংলাকে দ্বিখণ্ডিত করে পশ্চিম বাংলাকে ভারতের অন্তর্ভুক্ত এবং পূর্ববাংলাকে পাকিস্তানের অংশ বলে ঘোষণা করে। এভাবেই স্বাধীন বাংলার স্বপ্ন ধূলিসাৎ হয়।

অখণ্ড বাংলা প্রতিষ্ঠার প্রয়াসের ব্যর্থতার কারণ

ক. কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের কেন্দ্রীয় হাই কমান্ড অখণ্ড বাংলাকে কখনই সমর্থন করতে পারেনি। সংগঠন দুটির বাংলা শাখায় যারা কেন্দ্রীয় হাইকমান্ডের অনুসারী ছিলেন তারা প্রথমদিকে অখণ্ড বাংলার দাবি সমর্থন করলেও শেষাবধি হাইকমান্ডের ভয়ে এর চরম বিরোধিতা করেন। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, বাংলা মুসলিম লীগের অন্যতম নেতা মওলানা আকরম খাঁ একপর্যায়ে হুঙ্কার ছেড়ে বলেছিলেন যে কেবলমাত্র বাংলার মুসলমানদের লাশের উপর দিয়েই বাংলা ভাগ হতে পারে-অথচ তিনিই পরবর্তীতে এর চরম বিরোধিতা করেন।

খ. দীর্ঘ ১০ বছর ধরে (১৯৩৭ থেকে) বাংলার ক্ষমতায় মুসলমান সরকার অধিষ্ঠিত থাকায় বাঙালি হিন্দু রাজনীতিবিদের মনে একটা আতঙ্ক সৃষ্টি হয় যে, অখণ্ড বাংলা হলে হিন্দুরা কখনও ক্ষমতা যেতে পারবে না; সুতরাং তারা অখণ্ড বাংলা সমর্থন করেননি। কলিকাতার সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাও হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে সন্দেহ, অবিশ্বাস ও দূরত্ব সৃষ্টি করে।

গ. বাংলায় হিন্দু-মুসলমান বসতি এমনভাবে গড়ে উঠেছিল যে পূর্ববাংলায় মুসলমানরা ছিল সংখ্যাগরিষ্ঠ এবং পশ্চিম বাংলায় হিন্দুরা সংখ্যাগরিষ্ঠ। স্বভাবতই একটা বিভক্তি যেন প্রাকৃতিকভাবে হয়েই ছিল। বাংলার সকল মিল-কলকারখানা এবং কলিকাতা শহর পশ্চিম বাংলার সীমানায় ছিল। স্বভাবতই বাংলা বিভক্ত হলে পশ্চিম বাংলার ক্ষতি ছিল না; বরং সেখানে হিন্দুদের পক্ষে চিরকাল প্রাদেশিক সরকার গঠন সম্ভবপর। সুতরাং হিন্দু-নেতৃবৃন্দ বাংলা বিভক্তির পক্ষে কথা বলেননি।

ঘ. সময়ের স্বল্পতাও একটি কারণ ছিল। ১৯৪৭ সালের এপ্রিলে অখণ্ড বাংলার বিষয়টি উত্থাপিত হয়। দেশ বিভাগের ঘটনা ঘটে আগস্টে। সুতরাং দুই বা তিন মাসের মধ্যে একটা সমঝোতায় উপনীত হওয়া সম্ভব ছিল না। সিলেটের মতো বাংলা বিভক্তির প্রশ্নে গণভোট করা যেত। কিন্তু তারও সময় ছিল না।

ঙ. মুসলিম লীগ কিংবা কংগ্রেসের কেন্দ্রীয় হাই কমান্ডে বাংলার উপযুক্ত প্রতিনিধিত্ব ছিল না। ফলে পশ্চিমা মুসলমান ও উত্তর ভারতের হিন্দু-নেতৃত্ব তাদের নিজ নিজ স্বার্থে বাংলা বিভাগের বিষয়টি বিবেচনা করেন। বৃহত্তর স্বাধীন বাংলা ভারতের হিন্দু পুঁজিপতি গোষ্ঠীর জন্য মাথাব্যথার কারণ ছিল। কলিকাতা ছিল হিন্দু পুঁজিপতি গোষ্ঠীর নাভীকেন্দ্র। গোটা বাংলা ও সারা ভারতের পুঁজি সংগঠক হিসেবে ঈঙ্গ-মার্কিন ও মাড়োয়ারী গোষ্ঠী বিরামহীন গতিতে কাজ করেছে তৎকালীন কলিকাতা শহরকে কেন্দ্র করে। সুতরাং বাংলা স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে

www.Educationblog24.Com

আত্মপ্রকাশ করলে ইঙ্গ-মার্কিন ও মাড়োয়ারী পুঁজি বাঙালিদের হাতে যাবে এটা প্রায় নিশ্চিতভাবেই অবাঙালি দেশী-বিদেশী পুঁজি সংগঠকরা বুঝতে পারে এবং সে-কারণেই তারা বাংলাকে ভারতের দুই অংশের পরাধীন ভূমিতে রূপান্তরিত করার ষড়যন্ত্র করে।

অপরপক্ষে মুসলিম লীগের পশ্চিমা নেতৃবৃন্দ মুসলিম- অধ্যুষিত পূর্ববাংলাকে উপনিবেশ হিসেবে শোষণ করার উদ্দেশ্যে ঐ এলাকা পাকিস্তানের অংশ হিসেবে চেয়েছিলেন। তাদের এই অসৎ উদ্দেশ্যকে সহযোগিতা করেন পূর্ববাংলার খাজা নাজিমউদ্দীন, নূরুল আমিন, মওলানা আকরাম খাঁ প্রমুখ নেতৃবৃন্দ। এরা ভালো করেই জানতেন যে অবিভক্ত বাংলা হলে তাদের পক্ষে সোহরাওয়ার্দী গ্রুপকে ডিঙিয়ে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হওয়া সম্ভব হবে না। তাই তারা কেবলমাত্র ক্ষমতার লোভেই খণ্ডিত বাংলাকে স্বাগত জানান।

১৯৪৭ সালের বাংলার সীমানা চিহ্নিতকরণ

লর্ড মাউন্টব্যাটেনের পরিকল্পনার পরিপ্রেক্ষিতে বাংলা বিভক্তির সিদ্ধান্ত গৃহীত হলে পূর্ব ও পশ্চিম বাংলার মধ্যকার সঠিক সীমানা নির্ধারণ করার জন্য একটি সীমানা কমিশন গঠন অপরিহার্য হয়ে পড়ে।

সীমানা কমিশন গঠন

প্রাথমিক চিন্তায় বাংলা ও পাঞ্জাবের জন্য দুটি ভিন্ন কমিশন গঠনের এবং প্রতি কমিশনে মুসলিম লীগ ও কংগ্রেস থেকে সমান সংখ্যক প্রতিনিধি অন্তর্ভুক্ত করার বিষয় বিবেচিত হয়। কিন্তু সীমানা চিহ্নিতকরণ বিষয়টি ছিল অত্যন্ত জটিল। মুসলিম লীগ ও কংগ্রেসের প্রতিনিধিবর্গ সীমানা নির্ধারণে স্ব স্ব সম্প্রদায়ের স্বার্থকে প্রাধান্য দেবেন এটাই স্বাভাবিক ছিল। এমতাবস্থায় লর্ড মাউন্টব্যাটেন উভয় দলের নেতৃবৃন্দের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করে উভয়ের নিকট গ্রহণযোগ্য একটি নীতি প্রণয়নের সিদ্ধান্ত নেন। এরই পরিপ্রেক্ষিতে তিনি ৮ জুন ১৯৪৭ তারিখে মি. জিন্নাহ এবং অন্যান্য মুসলিম লীগ নেতৃবৃন্দের সঙ্গে আলোচনায় বসেন। জিন্নাহ বাংলা ও পাঞ্জাব প্রদেশের সীমানা কমিশনের প্রতিটিতে প্রিভি কাউন্সিলের বিচারবিভাগীয় কমিটির তিনজন সদস্য অন্তর্ভুক্ত করার প্রস্তাব করেন। কিন্তু তাঁরা বৃদ্ধ বয়সে ভারতবর্ষের গরম সহ্য করতে পারবেন না– এই অজুহাতে মাউন্টব্যাটেন উক্ত প্রস্তাব নাকচ করলে জিন্নাহ বিকল্প প্রস্তাব হিসেবে জাতিসংঘের মাধ্যমে প্রতি কমিশনে তিনজন করে অভারতীয় বিশেষজ্ঞকে নিয়োগের সুপারিশ করেন। কিন্তু এই পদ্ধতিতে কমিশন গঠন সময়সাপেক্ষ ব্যাপার এবং যেহেতু ১৫ আগস্ট ১৯৪৭-এর পূর্বেই সীমানা চিহ্নিতকরণের কাজ সমাপ্ত করতে হবে তাই জিন্নাহর দ্বিতীয় প্রস্তাবও নাকচ করা হয়।

১০ জুন ১৯৪৭ তারিখে লর্ড মাউন্টব্যাটেন কংগ্রেস-নেতৃবৃন্দের সঙ্গে আলোচনায় বসেন। এই বৈঠকে জিন্নাহর দ্বিতীয় প্রস্তাব নিয়ে আলোচনা হয় এবং সময়ের স্বল্পতার কথা বিবেচনা করে তা নাকচ করা হয়। কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ প্রস্তাব করেন যে, প্রতি কমিশনে ২ জন মুসলিম লীগ ও ২ জন কংগ্রেসের প্রতিনিধি এবং উভয় কমিশনের জন্য

www.Educationblog24.Com

একজন নিরপেক্ষ চেয়ারম্যান নিয়োগ করা হোক। কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ নিরপেক্ষ চেয়ারম্যানের নাম প্রস্তাব করবে। কমিশনের সদস্যবৃন্দ হবেন বিচার বিভাগীয়।

১২ জুন নেহেরু মিশনের 'টাইম অব রেফারেন্স' কী হওয়া উচিত তার খসড়া গভর্নর জেনারেলকে প্রদান করেন। অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত উক্ত খসড়ায় নেহেরুর প্রস্তাব ছিল নিম্নরূপ:

ক. বাংলার দুই অংশের সীমানা মুসলমান ও অমুসলমানগণ যে-সকল সংলগ্ন এলাকায় সংখ্যাগরিষ্ঠ তা নির্ণয়ের ভিত্তিতে নির্ধারণ করতে হবে। এভাবে সীমানা নির্ধারণ করার সময় অন্যান্য বিষয় (Other factors) ও বিবেচনায় রাখতে হবে।

খ. সিলেটে গণভোটের ফলাফল যদি উক্ত জেলার পূর্ব বাংলার সংযুক্তির পক্ষে হয় তাহলে বাংলার সীমানা কমিশনই সিলেটের ও সিলেট সংলগ্ন জেলাসমূহের মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ নির্ধারণের মাধ্যমে সীমানা চিহ্নিত করবেন।

২৩ জুন মাউন্টব্যাটেনের সঙ্গে আলোচনার সময় জিন্নাহ এই টার্মস অব রেফারেন্সে সম্মতি দেন। বাংলা সীমানা কমিশন এই টার্মস অব রেফারেন্সের ভিত্তিতেই কাজ করে।

১৩ জুন ১৯৪৭ মাউন্টব্যাটেন লীগ ও কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের যৌথ সভা আহবান করেন। নেহেরু, প্যাটেল, কৃপালিনী, জিন্নাহ, লিয়াকত আলী খান, সরদার আবদুর রব নিশতার ও বলদেব সিং উক্ত বৈঠকে যোগদান করেন। বৈঠকে উভয় দল একটি সমঝোতায় উপনীত হন এবং নিম্নলিখিত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়:

ক. প্রতি সীমানা কমিশন একজন নিরপেক্ষ সভাপতি এবং মুসলিম লীগ ও কংগ্রেসের ২ জন করে মোট ৪ জন সদস্য সমন্বয়ে গঠিত হবে।

খ. সদস্যবৃন্দ বিচার বিভাগীয় হবেন।

গ. পাঞ্জাব কমিশনে কংগ্রেসের প্রতিনিধিত্বদের একজন শিখ প্রতিনিধি থাকবেন।

ঘ. জিন্নাহ ও নেহেরু স্ব স্ব দলের প্রতিনিধিত্বদের নাম গভর্নর জেনারেলের নিকট জমা পদবেন।

ঙ. প্রতি সীমানা কমিশনের সদস্যবৃন্দ বৈঠকে বসে একজন নিরপেক্ষ সভাপতির নাম সুপারিশ করবেন। তারা এ-কাজে ব্যর্থ হলে লীগ ও কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ যৌথ বৈঠকে তা ঠিক করবেন।

চ. টার্মস অব রেফারেন্স সংক্রান্ত ইতিপূর্বে পেশকৃত নেহেরুর খসড়া রিপোর্টটি ভারতীয় নেতৃবৃন্দ বিবেচনা করে তাদের মতামত গভর্ণর জেনারেলকে অবহিত করবেন।

কমিশনের চেয়ারম্যান নিয়োগ প্রসঙ্গে জিন্নাহসহ ২৩ জন গভর্নর জেনারেলের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে অভিমত ব্যক্ত করেন যে একজন ব্রিটিশ বিচারক বাংলা ও পাঞ্জাব এই উভয় কমিশনের চেয়ারম্যান নিযুক্ত হতে পারেন এবং তিনি Arbitration Tribunal-এরও চেয়ারম্যানের দায়িত্ব পেতে পারেন। এই প্রস্তাবের উত্তরে গভর্নর জেনারেল জিন্নাহকে অবহিত করেন যে, Arbitration Tribunal-এর চেয়ারম্যান হিসেবে স্যার সিরিল র‍্যাডক্লিফের নাম ভারত সচিব কর্তৃক প্রস্তাবিত হয়েছে। জিন্নাহ এর পরদিন র‍্যাডক্লিফকেই বাংলা ও পাঞ্জাব কমিশনের চেয়ারম্যান হিসেবে গ্রহণের জন্য মুসলিম

Educationblog24.com

লীগের সম্মতির কথা গভর্নর জেনারেলকে জানিয়ে দেন। গভর্নর জেনারেল ২৬ ও ২৭ জুন অনুষ্ঠিত অন্তবর্তীকলীন কেবিনেট সভার বিশেষ বৈঠকে উপস্থিত লীগ ও কংগ্রেস নেতৃবৃন্দকে জিন্নাহর সুপারিশ অবহিত করেন। উভয় দলের নেতৃবৃন্দ র‍্যাডক্লিফকে বাংলা ও পাঞ্জাব কমিশনের চেয়ারম্যান হিসেবে গ্রহণ করেন। ইতোমধ্যে জিন্নাহ এবং নেহেরু কমিশনের স্বীয় দলের সদস্য-প্রতিনিধির নাম ভাইসরয়ের নিকট জমা দেন। বাংলা সীমানা কমিশনের মুসলিম লীগের মনোনীত সদস্যরা ছিলেন:

১. কলিকাতা হাইকোর্টের জাস্টিস আবু সালেহ মোহাম্মদ আকরাম এবং
২. পাঞ্জাব হাইকোর্টের জাস্টিস এস. এ. রহমান।

কংগ্রেসের মনোনীত সদস্যরা ছিলেন :

১. জাস্টিস সি. সি. বিশ্বাস এবং
২. জাস্টিস বিজন কুমার মুখার্জী। উভয়ই কলিকাতা হাইকোর্টের।

এই সময় আসামের গভর্নর সিলেটের পূর্ববাংলায় অন্তর্ভুক্তির সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে আসাম সীমানা কমিশন গঠনের প্রস্তাব পেশ করেন। কিন্তু বাংলা সীমানা কমিশনই আসাম-সিলেট অঞ্চলের সীমানা চিহ্নিত করবেন-ইতিপূর্বে গৃহীত কংগ্রেস-লীগের এই সিদ্ধান্তের আলোকে আসাম গভর্নরের প্রস্তাব নাকচ করে দেয়া হয়।

লর্ড মাউন্টব্যাটেন ৩০ জুন ১৯৪৭ তারিখে বাংলা ও পাঞ্জাব কমিশনের সদস্যদের নাম সরকারিভাবে ঘোষণা করেন। ঘোষণায় উল্লেখ করা হয় যে, বাংলা কমিশন পূর্ববাংলা ও আসামের সীমানা চিহ্নিত করবেন। ৪ জুলাই ভাইসরয় বাংলা ও পাঞ্জাব কমিশনের চেয়ারম্যান হিসেবে স্যার সিরিল র‍্যাডক্লিফের নাম ঘোষণা করেন। স্যার র‍্যাডক্লিফ ৮ জুলাই দিল্লি পৌঁছেন এবং অনতিবিলম্বে ভাইসরয়, কমান্ডার ইন চিফ, এবং লীগ ও কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করেন এবং এই ধারণা পান যে ১৫ আগস্ট ১৯৪৭-এর মধ্যেই সীমানা চিহ্নিতকরণের কাজ শেষ করতে হবে। ১০ জুলাই অনুষ্ঠিত পার্টিশন কাউন্সিলের সভায় র‍্যাডক্লিফ এই মর্মে এক সিদ্ধান্ত পাস করিয়ে নেন যে, সীমানা চিহ্নিতকরণের ব্যাপারে কমিশনের চেয়ারম্যান হিসেবে তার সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত। ২২ জুলাই অনুষ্ঠিত পার্টিশন কাউন্সিলের সভায় লীগ ও কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের উপস্থিতিতে র‍্যাডক্লিফ আরো পাস করিয়ে নেন যে তার কোনো সিদ্ধান্তকে চ্যালেঞ্জ করা যাবে না এবং কমিশন যেরূপ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে লীগ ও কংগ্রেস তা হুবহু মেনে নেবে। ফলত কমিশনের চেয়ারম্যান হন সর্বেসর্বা। প্রকৃতপক্ষে সদস্যদের কোনো ক্ষমতাই ছিল না।

বাংলা সীমানা কমিশনের কার্যাবলি

স্যার সিরিল র‍্যাডক্লিফ দিল্লিতে বসেই সীমানা চিহ্নিত করার সিদ্ধান্ত নেন। তিনি শুধু একবার কলিকাতা ঘুরে যান। তিনি নিয়ম করেন যে, কমিশনের সদস্যগণ কলিকাতা ও লাহোর থেকে প্রত্যহ প্রয়োজনীয় কাগজপত্র তাঁর নিকট দিল্লিতে প্রেরণ করবেন এবং তিনি সেখানে সেগুলো পর্যালোচনা করবেন। কলিকাতায় বাংলা কমিশনের পক্ষ থেকে আগ্রহী বিভিন্ন দলকে সীমানা সংক্রান্ত দাবিনামা পেশ করার

www.Educationblog24.Com

আহবান জানান। জনমত যাচাইয়ের উদ্দেশ্যে বাংলা কমিশন ১৬ জুলাই থেকে ২৪ জুলাই আগ্রহীদের সাক্ষাৎকার নেন। কংগ্রেস, বাংলা প্রাদেশিক হিন্দু মহাসভা এবং মুসলিম লীগের পক্ষ থেকে বিভিন্ন দাবিনামা পেশ করা হয়।

১৯৪৭ সালের ৬ থেকে ৭ জুলাই সিলেটে অনুষ্ঠিত গণভোট অনুযায়ী সিলেট জেলা পূর্ববাংলার সঙ্গে একীভূত হওয়ার সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে সেখানকার সীমানা চিহ্নিত করার লক্ষ্যে কমিশন ৪ থেকে ৬ আগস্ট কলিকাতায় এক বৈঠক আহবান করেন। বৈঠকে আসাম সরকার ও পূর্ববাংলা সরকারের প্রতিনিধিবৃন্দ, আসাম প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটি ও আসাম প্রাদেশিক হিন্দু মহাসভার প্রতিনিধিবর্গ এবং পূর্ববাংলার প্রাদেশিক মুসলিম লীগ ও সিলেট জেলা মুসলিম লীগের প্রতিনিধিগণ যোগদান করেন।

কংগ্রেসের পক্ষ থেকে যে দাবিনামা পেশ করা হয় তাতে বাংলার মোট ৭৭,৪৪২ বর্গমাইল এলাকার মধ্যে ৪০,১৩৭ বর্গমাইল দাবি করা হয়। দাবিকৃত এলাকার জনসংখ্যা ছিল অবিভক্ত বাংলার মোট জনসংখ্যার ৪৫%, তন্মধ্যে মুসলমান জনসংখ্যা ৩২% এবং বাকিরা অমুসলমান। কংগ্রেস যে সমস্ত এলাকার দাবি করে সেগুলো হচ্ছে গোটা বর্ধমান বিভাগ, নদীয়া, যশোর ও খুলনা জেলাসমূহের সামান্য অংশ বাদে গোটা প্রেসিডেন্সি বিভাগ, রাজশাহী বিভাগের দার্জিলিং ও জলপাইগুড়ি জেলা, রংপুর জেলা থেকে ডিমলা ও হাতিবান্ধা থানা, দিনাজপুর জেলার পশ্চিমাংশ এবং নবাবগঞ্জ মহকুমা বাদে মালদহ জেলা, ঢাকা বিভাগের বরিশাল জেলা থেকে গৌরনদী, নজীপুর, স্বরূপকাঠি এবং ঝালকাঠি থানাসমূহ, ফরিদপুর জেলার গোপালগঞ্জ মহকুমা ও রাজৈর থানা। ভারত ভূ-খণ্ডের সঙ্গে আসামের রেল-যোগাযোগ অক্ষুণ্ন রাখার উদ্দেশ্যে কংগ্রেস রংপুর জেলার মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ থানা ভুরুঙ্গামারীও দাবি করে বসে। কংগ্রেস কলিকাতা শহর পশ্চিম বাংলার অন্তর্ভুক্ত করার দাবি পেশ করে। তাদের দাবির স্বপক্ষে তারা যুক্তি দেখায় যে, ১৯৪১-এর আদমশুমারি অনুযায়ী কলিকাতা শহরে মুসলমান জনসংখ্যা মাত্র ২৩.৫৯% (মোট ২,১০৮,৮৯১ এর মধ্যে ৪,৯৭,৫৩৫), কর প্রদানকারী মুসলমানদের সংখ্যা মাত্র ১৪.৮% (৬৮,৫৬৭ এর মধ্যে ১০,১৪৯) এবং কলিকাতা শহরের ৮১,১৫৯টি বাড়ির মধ্যে মুসলমান বাড়ির সংখ্যা মাত্র ৬,৮৬৩(৮.৪৫%)। কংগ্রেস আরো উল্লেখ করে যে, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রাপ্ত বেসরকারি সাহায্যের মধ্যে মুসলমানদের দান মাত্র ১% (প্রায় ১ কোটি ৩০ লাখের মধ্যে মাত্র ১ লাখ)। কংগ্রেস আরো যুক্তি দেখায় যে কলিকাতার আশেপাশে যে ১১৪টি পাটকল আছে তার সবগুলির মালিক অমুসলমান ব্যক্তিবর্গ। সুতরাং সম্প্রদায়গত সংখ্যাগরিষ্ঠতার ভিত্তিতে বাংলা বিভক্ত করলে কলিকাতা পশ্চিমবাংলারই অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। আর কলিকাতা শহর ও এর অধিবাসীদের প্রয়োজনে (রসদ সরবরাহ নিশ্চিত করতে, নদী, সড়ক ও রেল যোগাযোগ নির্বিঘ্ন রাখতে, প্রভৃতি) মুর্শিবাদবাদ, মালদহ, নদীয়া, যশোর জেলাসমূহ মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ হওয়া সত্ত্বেও জেলাগুলিকে পশ্চিম বাংলার অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

অপরপক্ষে, মুসলিম লীগের পক্ষ থেকে ঢাকা, চট্টগ্রাম ও রাজশাহী বিভাগ,

www.Educationblog24.Com

প্রেসিডেন্সি বিভাগের বেশিরভাগ অংশ এবং বর্ধমান জেলাভুক্ত হুগলি ও ভাগীরথীর পূর্বাংশ পূর্ববাংলার অন্তর্ভুক্ত বলে দাবি করা হয়। মুসলিম লীগের দাবিতে বলা হয় দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি ও পার্বত্য চট্টগ্রাম হিন্দু-সংখ্যাগরিষ্ঠ জেলা হওয়া সত্ত্বেও ভৌগোলিক অবস্থানের বিচারে এবং পূর্ববাংলার অর্থনীতির প্রয়োজনে এই জেলাগুলি পূর্ববাংলাভুক্ত হওয়া বাঞ্ছনীয়। সপক্ষে যুক্তি দেখানো হয় যে, উত্তর বাংলার অর্থনীতিতে তিস্তা নদী ও এর শাখানদীর ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু এ নদীগুলি জলপাইগুড়ি জেলার ভিতর দিয়ে প্রবাহিত। তাছাড়া পূর্ববাংলার রেলপথ সংরক্ষণের একমাত্র উৎস হচ্ছে জলপাইগুড়ি এবং দার্জিলিং-এ অবস্থিত পাহাড়ের পাথর। পূর্ববাংলার কাঠের চাহিদা মেটানো হত জলপাইগুড়ি জেলার বনজঙ্গল থেকে সংগৃহীত কাঠ থেকে। সুতরাং মুসলিম লীগ দার্জিলিং ও জলপাইগুড়ি জেলাদ্বয় পূর্ববাংলার অন্তর্ভুক্ত করার জোর দাবি পেশ করে। পূর্ববাংলায় ভবিষ্যতে হাইড্রো-ইলেকট্রিক শক্তি উৎপাদনের জন্য কর্ণফুলী নদীর অধিকার আবশ্যক। এজন্য পার্বত্য চট্টগ্রামকে পূর্ববাংলার অন্তর্ভুক্ত করার জোর দাবি পেশ করে। পূর্ববাংলায় ভবিষ্যতে হাইড্রো-ইলেকট্রিক শক্তি উৎপাদনের জন্য কর্ণফুলী নদীর অধিকার আবশ্যক। এজন্য পার্বত্য চট্টগ্রামকে পূর্ববাংলার অন্তর্ভুক্তির দাবি করা হয়।

মুসলিম লীগ কলিকাতা শহর পূর্ববাংলার অন্তর্ভুক্ত করার জন্য জোর দাবি পেশ করে। মুসলিম লীগ যুক্তি পেশ করে যে, কলিকাতা শহরটি গড়ে উঠেছে মূলত পূর্ববাংলার সম্পদ দিয়ে। পৃথিবীর ৮০% পাট পূর্ববাংলায় উৎপাদিত হয় এবং ঐ পাট দিয়েই কলিকাতার আশেপাশের পাটকল চলে। তাছাড়া কলিকাতা ছিল বাংলার একমাত্র সমুদ্র বন্দর। উক্ত বন্দরে কর্মরত শ্রমিক, কর্মচারী নাবিকরা মূলত পূর্ববাংলার লোক। অতএব কলিকাতা পূর্ববাংলারই প্রাপ্য।

এইভাবে কংগ্রেস ও লীগের দাবিদাওয়ার মীমাংসা করা সীমানা কমিশনের জন্য কঠিন হয়ে পড়ে। স্যার সিরিল র‍্যাডক্লিফ ব্যক্তিগতভাবে এই সকল দাবিদাওয়া বিষয়ে কোনো পক্ষকে সাক্ষাৎকার দেননি। তিনি বুঝতে পারেন যে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে সীমানা চিহ্নিত করা সম্ভব হবে না। তাই তিনি নিজের ইচ্ছেমতো সীমানা নির্ধারণের সিদ্ধান্ত নেন। সীমানা চিহ্নিত সংক্রান্ত তিনি কতগুলি মৌলিক প্রশ্নের উদ্ভাবন করেন যেমন:

ক. বাংলার কোন অংশকে কলিকাতা শহর প্রদান করা উচিত? এই শহরকে দ্বিখণ্ডিত করে উভয় অংশকে খুশি করা কি সম্ভব?

খ. সমগ্র কলিকাতা কোনো একটি অংশকে প্রদান করার পিছনে নদীয়া কিংবা কুলাট নদী ব্যবস্থাকে গুরুত্ব দেওয়া উচিত কি না।

গ. টার্মস অব রেফারেন্সে উল্লেখিত 'সম্প্রদায়গত সংলগ্ন এলাকার' নীতিকে উপেক্ষা করে মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ জেলা যশোর ও নদীয়া পশ্চিম বাংলায় অন্তর্ভুক্ত করা যথার্থ হবে কি না।

ঘ. মালদহ ও দিনাজপুর জেলা মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ হলেও কিছু অংশ হিন্দু

www.Educationblog24.Com

সংখ্যাগরিষ্ঠ। এই হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ এলাকা কি পূর্ববাংলার অন্তর্ভুক্ত করা ঠিক হবে?

ঙ. দার্জিলিং ও জলপাইগুড়ি ভৌগোলিক অবস্থানের বিচারে পূর্ববাংলার অন্তর্ভুক্ত করা বাঞ্ছনীয় কিন্তু জেলাদ্বয়ের মুসলমান জনসংখ্যা অত্যন্ত কম (১৯৪১-এর আদমশুমারি অনুযায়ী দার্জিলিং-এ মাত্র ২.৪২% ও জলপাইগুড়িতে ২৩.০৮%।) সুতরাং এই জেলাদ্বয় কোন অংশে অন্তর্ভুক্ত করা উচিত?

চ. পার্বত্য চট্টগ্রামে মুসলমান জনসংখ্যা মাত্র ৩% হলেও জেলাটি চট্টগ্রাম জেলার অর্থনীতির সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। সুতরাং এই জেলাটি কোন ভূখণ্ডে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে?

মাউন্টব্যাটেনের ৩ জুন পরিকল্পনায় যদিও 'সম্প্রদায়গত সংখ্যাগরিষ্ঠতা এবং এলাকার সংলগ্নতা' (Majority and Contiguity Principles)-এর ভিত্তিতে সীমান চিহ্নিত করার কথা বলা হয়েছিল কিন্তু র‍্যাডক্লিফ উক্ত নীতি এবং লীগ-কংগ্রেস-সীমানা চিহ্নিত করার কথা বলা হয়েছিল কিন্তু র‍্যাডক্লিফ উক্ত নীতি এবং লীগ-কংগ্রেস এর সমঝোতা নীতিকে উপেক্ষা করে নিজের বিচারবুদ্ধিমতো সীমানা চিহ্নিত করেন। জনসংখ্যা, ভৌগোলিক অবস্থান, যোগাযোগ ব্যবস্থা প্রভৃতি চুলচেরা বিশ্লেষণ করে সীমানা নির্ধারণ করলে অন্তত কয়েক মাস সময়ের প্রয়োজন ছিল। কিন্তু র‍্যাডক্লিফ তার দিল্লির অফিসে বসে টেবিলের উপর ভারতবর্ষের মানচিত্র রেখে মাত্র ১ সপ্তাহের মধ্যে হাজার হাজার মাইলের সীমানা চূড়ান্ত করেন। এই কাজ করতে তিনি মাউন্টব্যাটেন কর্তৃক প্রভাবান্বিত হয়েছিলেন বলে তথ্য পাওয়া যায়। সর্দার বল্লভ ভাই প্যাটেল ১৫ জানুয়ারি ১৯৫০ সালে কলিকাতার এক জনসভায় উল্লেখ করেন যে, 'আমরা ভারত বিভাগে রাজি হওয়ার পূর্বশর্তস্বরূপ কলিকাতা শহর যেন ভারতভুক্ত থাকে তার নিশ্চয়তা চেয়েছিলাম। আমাদেরকে সে নিশ্চয়তা দেয়া হলে আমরা ভারত বিভক্তিতে সম্মত হই। মাউন্টব্যাটেন যেভাবেই হোক কলিকাতা ভারতকে দেবেন বলে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিলেন। সম্ভবত সেজন্যেই তিনি সীমানা কমিশনে প্রিভি কাউন্সিলের সদস্য কিংবা জাতিসংঘের মনোনীত প্রতিনিধি অন্তর্ভুক্ত করা সমর্থন করেননি।

যাহোক, র‍্যাডক্লিফের ঘোষণায় কলিকাতা পশ্চিমবাংলাভুক্ত করা হয়। নদীয়া মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ (৬১% মুসলমান) জেলা হওয়া সত্ত্বেও এর ২/৩ অংশ এলাকা পশ্চিম বাংলাকে দেন। সম্পূর্ণ মুর্শিদাবাদ (৫৬.৬% মুসলমান) পশ্চিম বাংলাভুক্ত করা হয়। মালদহ (৫৭% মুসলমান) থেকে কেবল নবাবগঞ্জ মহকুমা পূর্ববাংলাকে দেয়া হয়, বাকি অংশ (মালদহের প্রায় ২/৩ অংশ) পশ্চিম বাংলাভুক্ত করা হয়। দিনাজপুরকে দুই অংশে বিভক্ত করে পশ্চিম দিনাজপুর জেলার সৃষ্টি করে তা পশ্চিম বাংলাভুক্ত করা হয়। যশোর জেলার বনগাঁও (৫৩% মুসলমান) ও গৌহাটা পশ্চিম বাংলাভুক্ত হয়। খুলনা (৪৯.৩৬% মুসলমান) পূর্ববাংলাকে দেয়া হয়। জলপাইগুড়ি জেলার তিনটি মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ থানা ও দুটি অমুসলমান গরিষ্ঠ থানা পূর্ববাংলাভুক্ত করা হয়। মুসলমান অধ্যুষিত মালদহ, মুর্শিদাবাদ, নদীয়া প্রভৃতি এলাকা ভারতকে প্রদানের ক্ষতিপূরণ স্বরূপ পার্বত্য চট্টগ্রাম পূর্ববাংলাকে দেয়া হয়। অবশ্য পার্বত্য চট্টগ্রাম গ্রহণের ব্যাপারে

www.Educationblog24.Com

কংগ্রেসের ততটা আগ্রহ ছিল না।

আসামের সীমানা চিহ্নিতকরণ সম্পর্কিত টার্মস অব রেফারেন্সের বিষয়ে সীমানা কমিশনের হিন্দু ও মুসলমান সদস্যবর্গ ভিন্ন ভিন্ন ব্যাখ্যা দেন। মুসলমান সদস্যরা দাবি করেন যে, পূর্ববাংলার সংলগ্ন আসামের সকল মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চল পূর্ববাংলায় অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। অন্যদিকে হিন্দু-সদস্যগণ মত প্রকাশ করেন যে, কমিশনের ক্ষমতা কেবল সিলেট জেলা সংলগ্ন আসামের সীমানা নির্ধারণের মধ্যে সীমাবদ্ধ। কমিশনের চেয়ারম্যান হিন্দু-সদস্যদের মত সমর্থন করেন।

সিলেট জেলার ৩৫টি থানার মধ্যে মাত্র ৮টি থানায় অমুসলমানরা সংখ্যাগরিষ্ঠ; তার মধ্যে ২টি থানা শল্লা ও আজমিরীগঞ্জ-চারদিকে মুসলমান থানা দ্বারা সীমাবদ্ধ ছিল। বাকি ৬টি থানা সিলেটের দক্ষিণ প্রান্ত দিয়ে একটানা অবস্থিত ছিল-তবে মূল সিলেটের সঙ্গে থানাগুলির কোনো সংযোগ ছিল না। অপরদিকে কাছার জেলার হাইলাকান্দি মহকুমা ছিল মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ এবং তা সিলেটের মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ বদরপুর ও করিমগঞ্জের সংলগ্ন ছিল। কিন্তু এই এলাকা পূর্ববাংলার অন্তর্ভুক্ত করলে সিলেটের দক্ষিণের ৬টি অমুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ থানার সঙ্গে আসামের কোনো সংযোগ থাকে না, আবার ৬টি থানাই আসামের অন্তর্ভুক্ত করলে সিলেটের সঙ্গে পূর্ববাংলার রেল-যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। এমতাবস্থায় কমিশনের চেয়ারম্যান মনে করেন যে, কিছু মুসলমান এলাকা ও হাইলকান্দি মহকুমা অবশ্যই আসামের অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। সুতরাং দক্ষিণ সিলেটের ও করিমগঞ্জ মহকুমার ৬টি অমুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ থানা পূর্ববাংলার অন্তর্ভুক্ত করে তার বিনিময়ে পাথরকান্দি, বাটাবাড়ি, করিমগঞ্জ এবং বদরপুর–এই চারটি মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ থানা আসামের অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

যদিও ১৫ আগস্টের পূর্বেই সীমানা কমিশনের রিপোর্ট প্রকাশ ও বাস্তবায়নের কথা ছিল কিন্তু স্বাধীনতা দিবসের কোনো কর্মসূচি যাতে সীমানা সংক্রান্ত ক্ষোভের কারণে ব্যাহত না হয় সেজন্য মাউন্টব্যাটেন তা ১৬ আগস্ট প্রকাশের সিদ্ধান্ত নেন। যথারীতি ১৬ আগস্ট বিকেল ৫ টায় ভাইসরয়ের বাড়িতে পার্টিশন কাউন্সিলের সভা আহবান করা হয়। উক্ত সভায় পাকিস্তানের ও ভারতের প্রধানমন্ত্রীদ্বয় যথাক্রমে লিয়াকত আলী খান ও পণ্ডিত জওহারলাল নেহেরু এবং সরদার বল্লভ ভাই প্যাটেল, সরদার বলদেব সিংহ, আবদুর রব নিশতার, চৌধুরী মোহাম্মদ আলী ও ভি.পি. মেনন উপস্থিত হন। সভার শুরুর তিন ঘণ্টা পূর্বে সীমানা কমিশনের রিপোর্ট প্রতিনিধিবর্গের মধ্যে বিতরণ করা হয়। এই রিপোর্ট কংগ্রেস, মুসলিম লীগ এবং শিখ প্রতিনিধিদের কাউকে সন্তুষ্ট করতে পারেনি। দুই ঘন্টা ধরে সভায় হট্টগোল এবং বাদ-প্রতিবাদ চলে। তবে শেষপর্যন্ত সকলেই স্বীকার করেন যে, যেহেতু সীমানা কমিশনের সিদ্ধান্তে কেউই খুশি হতে পারেননি, তার অর্থ প্রত্যেক পক্ষ কোথাও-না কোথাও কিছু সুবিধা লাভ করেছে যা অন্য পক্ষকে অসন্তুষ্ট করেছে। শেষ পর্যন্ত সকল পক্ষ সীমানা কমিশনের সিদ্ধান্ত গ্রহণে সম্মত হয় এবং তা শান্তিপূর্ণভাবে বাস্তবায়িত করার ঐক্যমত ঘোষণা করে।

বাংলা সীমানা কমিশনের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী নবগঠিত পূর্ববাংলা অবিভক্ত বাংলার

www.Educationblog24.Com

মোট আয়তনের ৬৩.৮০% এবং মোট জনসংখ্যার ৬৪.৮৬% লাভ করে। বৃহত্তর বাংলার মুসলমান জনসংখ্যার ৮৩.৯৪% এবং অমুসলমান জনসংখ্যার ৪১.৭৮% পূর্ববাংলাভুক্ত হয়। নবগঠিত পূর্ববাংলার মুসলমান ও অমুসলমান জনসংখ্যার অনুপাত হয় ৭০.৮৩: ২৯.১৭। নবগঠিত পশ্চিম বাংলার মুসলমান ও অমুসলমান জনসংখ্যার অনুপাত হয় ২৫.০১%: ৭৪.৯৯%।

বাংলার সীমানা কমিশনের সিদ্ধান্ত অনেক মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ এলাকার মুসলমানদেরকে অবাক ও বিস্মিত করে। মালদহ, মুর্শিদাবাদ, নদীয়া প্রভৃতি এলাকার মুসলমান ১৪ আগস্ট পাকিস্তানের পতাকা উড়িয়ে আনন্দ উৎসব করে, অথচ পরবর্তীতে তারা জানতে পারে যে, তারা ভারতভুক্ত হয়েছে। সরেজমিনে তদন্ত না করে দিল্লির অফিসকক্ষে বসে মানচিত্রের উপর সীমানা চিহ্নিত করায় সীমানা কোনো ক্ষেত্রে একটি গ্রামকে দ্বিখণ্ডিত করে, কোথাও তা বাড়ির আঙিনার মাঝখান দিয়ে যায়। কোনো ক্ষেত্রে দেখা যায় কারো ঘরের দরজা পড়েছে পাকিস্তানে, তো জানালা পড়েছে ভারতে। সীমানা কমিশনের সিদ্ধান্ত হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে সাময়িক ক্ষোভ সৃষ্টি করলেও ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ চাপা পড়ে যায় দেশত্যাগ, দাঙ্গা ও লুটপাটের ঘটনার যাঁতাকলে।

সহায়ক গ্রন্থ

Nicholas Mansergh (editor-in-chief), *The Transfer of Power*, 19427. Vol. XI, The Mountbatten Viceroyalty London: 1981.

G.W. *Choudhury, Constitutional Development in Pakistan*. London: 1969

Harun-or-Rashid. *The Foreshadowing of Bangladesh*, Dhaka, 1987.

Latif Ahmed Sherwani (ed), *Pakistan Resolution To Pakistan, 1940-1947. A Selection of Documents Presenting the Case for Pakistan*, Karachi. 1969.

অমলেন্দু দে, *স্বাধীন বঙ্গভূমি গঠনের পরিকল্পনা: প্রয়াস ও পরিণতি*, কলিকাতা: রত্না প্রকাশন, ১৯৭৫

হারুন-অর-রশিদ, *বাঙালির রাষ্ট্রচিন্তা ও স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়*, ঢাকা, ২০০৩

www.Educationblog24.com

www.Educationblog24.Com

তৃতীয় অধ্যায়
পাকিস্তান : রাষ্ট্রীয় কাঠামো ও বৈষম্য

১৯৪৭ সালের ১৪ আগস্ট পাকিস্তানের জন্ম হয়। এই নতুন রাষ্ট্র তার জন্মলগ্ন থেকেই অসংখ্য সমস্যার সম্মুখীন হয়। ব্রিটিশ আমলে ভারতের মুসলমানেরা হিন্দুদের চেয়ে শিক্ষাদীক্ষা, প্রশাসনিক দক্ষতা, ব্যবসাবাণিজ্য প্রভৃতি সকল ক্ষেত্রে অনেক পিছিয়ে ছিল। বিভিন্ন ক্ষেত্রে যাঁরা দক্ষ ছিলেন তাঁরাও ভারতের বিভিন্ন অংশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিলেন। ভারত উত্তরাধিকার সূত্রে কেন্দ্রীয় রাজধানীর সকল সুযোগ সুবিধা এবং সারাদেশ জুড়ে বিস্তৃত একটি সুষ্ঠু ও সুশৃঙ্খল প্রশাসনিক কাঠামো লাভ করে। অপরপক্ষে পাকিস্তানকে নতুন করে রাজধানী প্রতিষ্ঠা করতে হয়, কেন্দ্রীয় সচিবালয় স্থাপন করতে হয় এবং নতুনভাবে প্রশাসনিক অবকাঠামো গড়ে তুলতে হয়। এমতাবস্থায় ভারত থেকে অনেক মূল্যবান ফাইলপত্র না-পাওয়ায়, এবং অনেক নথিপত্র ভারত থেকে আনয়নকালে দাঙ্গাকারীদের হাতে বিনষ্ট হওয়ায় প্রশাসনিক জটিলতা দেখা দেয়। ভারত থেকে বিপুল সংখ্যক বাস্তুহারা বা রিফুজি আগমনের ফলেও প্রশাসনিক পুনর্বিন্যাস কাজে অনেক বিঘ্নের সৃষ্টি হয়। স্বাধীনতা লাভের অব্যবহিত পূর্বেও উপমহাদেশের বিভিন্ন স্থানে যে ভয়াবহ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা সংঘটিত হয় তার ফলে ভারত বিভক্তির সঙ্গে সঙ্গে অজস্র মুসলমান পরিবার তাদের পৈতৃক ভিটেমাটি, বাড়িঘর ছেড়ে পাকিস্তানে চলে আসে। রিফুজি আগমনের চাপ পশ্চিম পাকিস্তানে বেশি পড়ে। ১৯৫১ সালের সেনসাস রিপোর্ট অনুযায়ী প্রায় ৭২ লক্ষ রিফুজি ভারত ত্যাগ করে পাকিস্তানে আগমন করে, তার মধ্যে পশ্চিম পাকিস্তানে আসে ৬৫ লক্ষ। সেখানে প্রতি ৫ জন লোকের মধ্যে একজন ছিলেন রিফুজি। পাকিস্তানের আগত লক্ষ লক্ষ মানুষকে তাৎক্ষণিক ভাবে বাসস্থান ও খাদ্যের ব্যবস্থা করা এবং পুনর্বাসন নিশ্চিত করা নতুন সরকারের জন্য কঠিন পরিস্থিতির সৃষ্টি করে। উপরন্তু, যে প্রায় ৩৫ লক্ষ হিন্দু ও শিখ পাকিস্তান ছেড়ে ভারত গমন করেছিল তাদের জীবন ও সম্পদ রক্ষার এক কঠিন দায়িত্বও সরকারকে পালন করতে হয়।

এ সময় নতুন রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক অবস্থাও ভালো ছিল না। পাকিস্তানের অর্থনীতি ছিল কৃষিনির্ভর। এখানে উল্লেখযোগ্য কোনো প্রাকৃতিক সম্পদ ছিল না। কলিকাতা, কিংবা দিল্লির মতো কোনো ব্যবসাকেন্দ্র, কিংবা শিল্প-কলকারখানাও পাকিস্তান উত্তরাধিকার সূত্রে পায়নি। স্বাধীনতা ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে মানুষের দেশত্যাগ এমন ত্বরিত ঘটে যে, ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে সম্পদের ভাগ-বণ্টনের বিষয়টি চাপা পড়ে যায়। উপরন্তু ১৯৪৭ সালের অক্টোবরে অনুষ্ঠিত কাশ্মির সংঘর্ষের সূত্র ধরে ভারত তার পূর্বপ্রতিশ্রুত এক হাজার কোটি টাকার সম্পদ পাকিস্তানকে দিতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করে। পাকিস্তানের প্রাপ্য সামরিক ও বেসামরিক সরঞ্জামাদির অংশ দিতেও সে

www.Educationblog24.Com

অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করে।

এমনি পরিস্থিতিতে পাকিস্তানের দুই অংশের জনগণের মধ্যে সংহতি ও ভ্রাতৃত্ববোধের প্রয়োজনীয়তা ছিল। পাকিস্তানের অখণ্ডতার জন্য প্রয়োজন ছিল রাষ্ট্রক্ষমতায় দুই অংশের জনগণের সমানুপাতিক অংশগ্রহণ। উভয় অংশের সমস্যার সমাধান সমান দৃষ্টিতে করা এবং উভয় অংশের উন্নয়ন প্রচেষ্টা হওয়া উচিত ছিল বৈষম্যহীনভাবে। শিক্ষা, চাকুরি, ব্যবসা প্রভৃতি ক্ষেত্রে দুই অংশের জনগণের জন্য সমান সুযোগ সৃষ্টি করার আবশ্যকতা ছিল। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত তা হয়নি।

১৯৪৭ সালে পাকিস্তানের দুই অংশের আর্থ-সামাজিক কাঠামো

পাকিস্তান ছিল এক অস্বাভাবিক রাষ্ট্র। বিশাল ভারতবর্ষের পূর্ব ও পশ্চিম দুই প্রান্তে হাজার মাইলের ব্যবধানে দুই ভিন্ন ভূখন্ড নিয়ে পাকিস্তান গঠিত হয়। জন্মলগ্নে এর পূর্ব অংশ 'পূর্ববাংলা' নামে অভিহিত হয়। ১৯৫৫ সালে এর নাম পরিবর্তিত হয়ে হয় পূর্ব পাকিস্তান। ১৯৪৭ সালে পাকিস্তানের পশ্চিমাংশে ৪টি প্রদেশ (পাঞ্জাব, সিন্ধু, বেলুচিস্তান এবং উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ) এবং ৫টি দেশীয় রাষ্ট্র (বেলুচিস্তান রাজ্য, ভাওয়ালপুর রাজ্য, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ রাজ্য, খয়েরপুর রাজ্য ও জুনাগড় রাজ্য) এবং কিছু উপজাতি এলাকা ছিল। ১৯৫৫ সালে পশ্চিমাংশের সবগুলো প্রদেশ এবং দেশীয় রাজ্য এক ইউনিটে এনে একটি প্রদেশ করে তার নামকরণ হয় পশ্চিম পাকিস্তান। পাকিস্তানের দুই অংশের জনগোষ্ঠীর মধ্যে কেবলমাত্র ধর্মীয় মিল ছাড়া ভাষা ও সংস্কৃতিগত আর কোনো মিল ছিল না। এর দুই অংশের আর্থসামাজিক কাঠামোতে ছিল ভারসাম্যের অভাব। পাকিস্তানের মোট ভূখণ্ডের শতকরা ৮৪.৩ ভাগ আয়তন ছিল পশ্চিম পাকিস্তানের এবং মাত্র ১৫.৭ ভাগ আয়তন ছিল পূর্ব পাকিস্তানের, অথচ মোট জনসংখ্যার শতকরা ৪৩.৭ ভাগ লোকের বাস ছিল পশ্চিম পাকিস্তানে এবং ৫৬.৩ ভাগ লোক ছিল পূর্ব পাকিস্তানের। পূর্ব পাকিস্তানে উচ্চবিত্তের অস্তিত্ব ছিল না। ব্রিটিশ আমলে পূর্ববাংলার উচ্চবিত্তরা ছিলেন জমিদারগোষ্ঠী–তাদের বাস ছিল কলিকাতায়। ১৯৪৭-এর দেশভাগের পর তারা ভারতে চলে যান এবং তাদের সম্পত্তি ভারতে স্থানান্তর করেন। উপরন্তু ১৯৫০ সালে পূর্ববাংলায় জমিদারি প্রথা বিলুপ্ত করা হলে এখানকার মুসলমান জমিদারদের পতন ঘটে। এমনি পরিস্থিতিতে ১৯৪৭ থেকেই 'পূর্ববাংলায় রাজনীতি ছিল মূলত মধ্যবিত্ত ও নিম্নমধ্যবিত্ত শ্রেণীর নিয়ন্ত্রণে এবং গ্রামীণ জনসাধারণ ছিলেন তাদের সমর্থন ও সাফল্যের মূল ভিত্তি। অপরদিকে, পশ্চিম পাকিস্তানে সামন্ততান্ত্রিক ভূমি ব্যবস্থা বিদ্যমান থাকায় সেখানে মধ্যবিত্তশ্রেণী ছিল প্রায় অনুপস্থিত। সেখানে নেতৃত্ব প্রায় পুরোপুরি সামন্তবাদী বড় জমিদারশ্রেণী দ্বারা গঠিত ছিল। পাকিস্তানের জন্মলগ্নে পশ্চিম পাকিস্তান পূর্ব পাকিস্তানের তুলনায় অধিক সচ্ছল ছিল। 'পূর্ব পাকিস্তানের তুলনায় সেখানে ছিল অপেক্ষাকৃত উন্নত শিল্পকাঠামো, ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের অবস্থান, বৃহৎ বন্দর এবং সমৃদ্ধ কয়েকটি শহর'। পক্ষান্তরে, পূর্ব পাকিস্তান উত্তরাধিকার সূত্রে কোনো উল্লেখযোগ্য শিল্প কারখানা পায়নি। ব্রিটিশ আমলে পূর্ববাংলা

www.Educationblog24.Com

পাটচাষের জন্য বিখ্যাত থাকলেও সমস্ত পাটকল গড়ে ওঠে কলিকাতার আশেপাশে।

স্বাধীনতা লাভের সময় পাকিস্তান উত্তরাধিকার সূত্রে যে সেনাবাহিনী লাভ করে তাতে উচ্চপর্যায়ের বাঙালি অফিসার একজনও ছিলেন না। পাক সেনাবাহিনীর প্রায় পুরোটাই গঠিত ছিল পাঞ্জাবি, পাঠান ও বেলুচদের নিয়ে। পাক সিভিল সার্ভিসেও বাঙালি মুসলমান ছিল না বললেই চলে। পাকিস্তানের যাত্রালগ্নে এর সমগ্র আমলাতন্ত্র গঠিত ছিল পশ্চিম পাকিস্তানী এবং ভারত থেকে আগত মোহাজেরদের নিয়ে। এমনকি পূর্ববাংলার প্রশাসনে হিন্দুদের আধিক্য ছিল। উকিল, মোক্তার, ডাক্তার, শিক্ষক প্রভৃতি পেশাতেও হিন্দুরাই ছিল সংখ্যায় বেশি। সুতরাং দেশ বিভাগের পর পূর্ববাংলা থেকে বেশিরভাগ হিন্দু ডাক্তার, উকিল-মোক্তার, শিক্ষক, বিভিন্ন অফিস-আদালতের কর্মকর্তা-কর্মচারী ভারতে গমন করলে এই প্রদেশে দক্ষ প্রশাসন ও পেশাজীবী শ্রেণীর অভাব দেখা যায়। পূর্ববাংলার প্রশাসনের শূন্যস্থান দখল করে ভারত থেকে আগত বাঙালি-অবাঙালি রিফুজিরা এবং পাঞ্জাবি আমলাবৃন্দ। এ প্রসঙ্গে খালিদ বিন সাইদ মন্তব্য করেছেন:

All the key positions in the Wast Bengal administration were held by either Punjabi civil servants or Urdu-speaking Muslim civil servants who had migrated from India.

ভারত থেকে পূর্ববাংলায় বিভিন্ন পর্যায়ের চাকুরিজীবী এলেও কোনো শিল্পপতি কিংবা ধনী ব্যবসায়ীশ্রেণী এখানে আসেননি। যে সকল মুসলমান রিফুজি ভারত থেকে মূলধন সঙ্গে এনেছিল তারা সকলেই পশ্চিম পাকিস্তানে আগমন করে। স্বভাবতই পাকিস্তানের জন্মলগ্নে পশ্চিম পাকিস্তান এক 'শক্তিশালী এলিটশ্রেণী সমৃদ্ধ মুহাজির, আমলাবর্গ এবং সেনাবাহিনী পায়'। এই সুবিধাবাদী শ্রেণীগোষ্ঠী স্বীয় স্বার্থে একটি শক্তিশালী কেন্দ্রীয় শাসনকাঠামো গড়ে তুলতে সচেষ্ট হয়। আর তাই কেন্দ্র ও প্রদেশের মধ্যে ক্ষমতাবন্টনে তাদের অনীহা শুরু থেকেই ছিল। বরং পূর্ববাংলাকে তাদের কাঁচামালের যোগানদার ও তৈরী পণ্য সামগ্রীর বাজার হিসেবে ব্যবহার করতে শুরু করে। ঐ উদ্দেশ্যে প্রণীত হয় দেশের অর্থনৈতিক নীতি। বাজেট প্রণয়নের লক্ষ্য হয় কর অব্যাহতি, লাইসেন্স-পারমিট বিতরণের ব্যবস্থা, পূর্ববাংলার সম্পদ পশ্চিম পাকিস্তানে পাচারের ব্যবস্থা করা। তাছাড়া 'বাজেট বরাদ্দের বাইরেও ঢালাওভাবে অর্থ ব্যয় করে পশ্চিম পাকিস্তানে বৃহদায়তন বাঁধ ও পানি প্রকল্প বাস্তবায়িত করা হতে থাকে'। তাছাড়া বৃহৎ সব শিল্প-কারখানা পশ্চিম পাকিস্তানে নির্মিত হওয়ায় উক্ত অঞ্চলের লোকেরাই সেখানে মজুর-শ্রমিক, কর্মচারী, কর্মকর্তা হিসেবে চাকুরি লাভ করে। পূর্ববাংলা থেকে হাজার মাইল দূরে যেয়ে সেখানে চাকুরি পাওয়া এবং পেলেও চাকুরি করা অসম্ভব ছিল। শুধু অর্থনৈতিক দিক দিয়েই নয়, উর্দুকে একমাত্র রাষ্ট্রভাষা করার প্রচেষ্টার মাধ্যমেও পূর্ববাংলার প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ করা হয়। উপরন্তু রাজনৈতিক নেতৃত্ব চলে যায় পশ্চিম পাকিস্তানীদের হাতে। ক্ষমতাসীন মুসলিম লীগের কেন্দ্রীয় নেতারা ছিলেন পশ্চিম পাকিস্তানী। ভারত থেকে আগত মুসলিম লীগ নেতৃবৃন্দ পশ্চিম পাকিস্তানে গমন করেন।

www.Educationblog24.com

এমন কি হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীও করাচীবাসী হন। ভারত থেকে আগত নেতৃবৃন্দকে পাকিস্তান গণপরিষদে আসন দেয়া হয় পূর্ববাংলার কোটা থেকে এবং এইভাবে গণপরিষদেও পূর্ববাংলাকে সংখ্যালঘুতে পরিণত করা হয়।

এইভাবে রাজনীতিতে, প্রশাসনে, সেনাবাহিনীতে, পুঁজিতে পশ্চিম পাকিস্তানীদের পূর্ণ কর্তৃত্ব থাকায় পাকিস্তানের যাত্রালগ্নে তার রাষ্ট্রীয় কাঠামোতে ভারসাম্যের অভাব দেখা যায়।

কেন্দ্রে অবাঙালিদের নিয়ন্ত্রণ

পাকিস্তানের প্রশাসনিক ব্যবস্থায়, সামরিক ক্ষেত্রে, উন্নয়ন প্রকল্পের ব্যয় বরাদ্দে, বৈদেশিক সাহায্য বণ্টনে ইত্যাদি সর্ববিষয়ে পূর্ব পাকিস্তানে ঔপনিবেশিক শাসন পুরোমাত্রায় চালু ছিল। তাছাড়া, বাঙালিদেরকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা থেকেও বঞ্চিত রাখা হয়। ১৯৪৭ থেকে ১৯৭০ পর্যন্ত তেইশ বছরে পূর্ব পাকিস্তান থেকে মাত্র একবার (১৯৪৭-৫১) পাকিস্তানের রাষ্ট্রপ্রধানের পদ লাভ করা সম্ভব হয়েছিল। পাকিস্তানের প্রথম গভর্নর জেনারেল মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ মৃত্যুবরণ করলে (১৯৪৮) পূর্ব পাকিস্তান থেকে খাজা নাজিমউদ্দীন পাকিস্তানের গভর্নর জেনারেল হন। মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ গভর্নর জেনারেল হিসেবে দেশের সর্বময় ক্ষমতা ভোগ করলেও খাজা নাজিমউদ্দীনের সময় দেশের প্রকৃত ক্ষমতা প্রয়োগ করতে থাকেন প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খান। আবার লিয়াকত আলী খান নিহত হওয়ার পর (১৯৫১) খাজা নাজিমউদ্দীন যখন পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হন তখন গভর্নর জেনারেল গোলাম মোহাম্মদ (পাঞ্জাবি) হন সকল ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দু। অতএব, দেখা যাচ্ছে যে, পূর্ব পাকিস্তানী খাজা নাজিমউদ্দীন গভর্নর জেনারেল হিসেবে যেমন প্রকৃত ক্ষমতা পাননি, আবার প্রধানমন্ত্রী হিসেবেও তার হাতে প্রকৃত সরকারপ্রধানের ক্ষমতা আসেনি। এটা ছিল পূর্ব পাকিস্তানী কারো হাতে (তা তিনি অবাঙালি পূর্ব পাকিস্তানী হন না কেন) ক্ষমতা না-দেওয়ার চক্রান্ত।

১৯৪৭ থেকে ১৯৫৮ পর্যন্ত সময়ে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন ৭ জন। তার মধ্যে ৪ জন ছিলেন পশ্চিম পাকিস্তানী। পূর্ব পাকিস্তান থেকে যে ৩ জন পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হয়েছিলেন, তাদের মধ্যে কেবল হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী বাঙালির স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয়ে সচেতন ছিলেন। বাকি দুজন (খাজা নাজিমউদ্দীন এবং বগুড়ার মোহাম্মদ আলী) পশ্চিম পাকিস্তানীদের স্বার্থরক্ষাকেই গুরুত্ব দিয়েছেন। ১৯৪৭ থেকে ১৯৭০ পর্যন্ত এই তেইশ বছরের মধ্যে মাত্র তেরো মাস (সেপ্টেম্বর ১৯৫৬-অক্টোবর ১৯৫৭) পাকিস্তানের রাষ্ট্রক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ছিল হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর নেতৃত্বে পূর্ব পাকিস্তানের রাজনৈতিক দল আওয়ামী লীগ, তাও আবার পশ্চিম পাকিস্তানী দল পিবলিকান পার্টির সঙ্গে কোয়ালিশন করে। এই স্বল্পতম সময়ে প্রধানমন্ত্রী হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী পাকিস্তানের রাষ্ট্রক্ষমতার নিয়ন্ত্রণ নিজ হাতে নেয়ার উদ্যোগ নিতে গিয়ে প্রেসিডেন্ট ইসকান্দার মীর্জা কর্তৃক বরখাস্ত হয়ে ক্ষমতা হারান। পূর্ব পাকিস্তানী

www.Educationblog24.Com

অপর দুই প্রধানমন্ত্রীও বরখাস্ত হওয়ার অভিজ্ঞতা পান। খাজা নাজিমউদ্দীনকে গভর্নর জেনারেল গোলাম মোহাম্মদ বরখাস্ত করে বগুড়ার মোহাম্মদ আলীকে প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত করেন। তাকেও তিনি একবার বরখাস্ত করে পুনরায় প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত করেন। এইভাবে দেখা যায় যে, পূর্ব পাকিস্তানীরা স্বল্প সময়ের জন্য রাষ্ট্র ক্ষমতা পেয়েও সে-ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারেননি।

আইয়ুবের সামরিক ও বেসামরিক শাসনামলে পূর্ব পাকিস্তানী যারা তার কেবিনেটে অন্তর্ভুক্ত হয়েছিলেন তারা সকলেই ছিলেন discredited and rejected Muslim Leagures of the eastern wing'। এইভাবে দেখা যায় যে, বাঙালিদেরকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রক্ষমতায় পৌঁছুতে দেয়া হয়নি, কিংবা রাষ্ট্র পরিচালনার নীতি নির্ধারণে বাঙালিদের মতামতের কোনো গুরুত্ব দেয়া হয়নি। প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত– তা রাজনৈতিক, প্রতিরক্ষা, অর্থনৈতিক বা কূটনৈতিক যে-কোনো বিষয়েই হোক না কেন সর্বশেষ বিচারে এলিটদের দ্বারাই হত এবং এরা ছিল পশ্চিম পাকিস্তানের সামরিক ও বেসামরিক অফিসারবৃন্দ।

এমনকি বাঙালিরা নিজ প্রদেশেও স্বশাসনের সুযোগ পায়নি। সেখানে গুরুত্বপূর্ণ প্রশাসনিক পদগুলো দখল করে রেখেছিল কেন্দ্রীয় শাসকচক্রের অনুগত পশ্চিম পাকিস্তানীরা। পূর্ব পাকিস্তানের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে নিযুক্ত এসব পশ্চিম পাকিস্তানী সামরিক বেসামরিক কর্মর্তারা বাঙালিদেরকে হেয় প্রতিপন্ন করত। তারা বাঙালি মুসলমানদেরকে নিম্নবর্ণের হিন্দু থেকে ধর্মান্তরিত মুসলমান গণ্য করে তাদের থেকে দূরত্ব বজায় রাখত এবং পারতপক্ষে সামাজিক মেলামেশা করতো না। যার ফলে পশ্চিম পাকিস্তানীদের সঙ্গে বাঙালিদের সৃষ্টি হয় পারস্পরিক তিক্ততা এবং বিভেদের সম্পর্ক। স্বভাবতই বাঙালিদের মনে হতাশা, ক্ষোভ, অসন্তুষ্টি বাড়তে বাড়তে এমন পর্যায়ে পৌঁছে যে, পাকিস্তান রাষ্ট্র কাঠামোর মধ্যে বাঙালি ও পশ্চিম পাকিস্তানীরা দুই ভিন্ন জাতিতে পরিণত হয়।

ব্রিটিশ আমলে মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ দ্বি-জাতিতত্ত্ব ঘোষণার মাধ্যমে ভারতের মুসলমানদেরকে আলাদা জাতি হিসেবে উপস্থাপন করে তাদের জন্য আলাদা আবাসভূমি পাকিস্তান প্রতিষ্ঠান করেছিলেন। কিন্তু সেই তিনিই পাকিস্তানের রাষ্ট্রক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়ে বাঙালিদের স্বার্থ উপেক্ষা করার মাধ্যমে (যেমন বাংলাভাষাকে রাষ্ট্র ভাষার স্বীকৃতি না দেয়া) বাঙালি ও পশ্চিম পাকিস্তানীরা যে আলাদা জাতি– এমন ধারণা সৃষ্টির সূচনা করে দেন। মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ পাকিস্তানে সংসদীয় সরকারব্যবস্থা প্রবর্তন না করে এক ব্যক্তির শাসন শুরু করেন। তিনি নিজ হাতে শাসন বিভাগ, আইন বিভাগ এবং রাজনৈতিক দলের সর্বময় ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত করে খারাপ দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন। তাঁর উত্তরসূরীরা পরবর্তীকালে তাঁকে অনুসরণ করে ক্ষমতা কুক্ষিগত করার চেষ্টা করে। ফলে পাকিস্তানে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রাতিষ্ঠানিক রূপ লাভ করতে ব্যর্থ হয়। মোহাম্মদ আলী

www.Educationblog24.com

www.Educationblog24.Com

জিন্নাহ, লিয়াকত আলী খান– তাঁদের জীবদ্দশায় পাকিস্তানের জন্য সংবিধান প্রণয়ন করে যেতে পারেননি। পাকিস্তানের সংবিধান প্রণয়ন করতে সময় লেগেছে নয় বছর। ১৯৪৭ থেকে ১৯৫৮ এই এগারো বছর পাকিস্তানে তথাকথিত সংসদীয় গণতন্ত্রে কোনো সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়নি। সর্বোপরি পূর্ব পাকিস্তানের ন্যায্য দাবি দাওয়া প্রদানের ব্যাপারে আইন পরিষদ, কিংবা কেন্দ্রীয় শাসকগোষ্ঠী কোনো কার্যকরী ভূমিকা পালন করেনি।

কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক কাঠামো এবং সামরিক আমলাতন্ত্রের প্রভাব

পাকিস্তানের মতো বহু ভাষাভাষী এবং ভিন্ন সংস্কৃতির অধিকারী ও ভৌগোলিকভাবে বিচ্ছিন্ন নাগরিকদের মধ্যে জাতীয় ঐক্য এবং সংহতি সুদৃঢ় করতে হলে তাদের মধ্যে 'একজাতি-একরাষ্ট্র'– এই চেতনাবোধ সৃষ্টি করার প্রয়োজনীয়তা ছিল। তা সম্ভব ছিল পাকিস্তানের দুই অংশের নাগরিকদের মধ্যে পারস্পরিক মমত্ববোধ ও সহানুভূতি সৃষ্টি করে একের সমস্যা অন্যের অনুধাবন করার মানসিকতা অর্জনের মাধ্যমে। কিন্তু পাকিস্তানের জন্মলাভের অব্যবহিত পরেই এর এক অংশ (অর্থাৎ পূর্ববাঙলা) থেকে অভিযোগ উত্থাপিত হল যে তার উপর অন্য অংশ (অর্থাৎ পশ্চিম পাকিস্তান) সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক বৈষম্যের সূত্রপাত করেছে। ফলে নতুন রাষ্ট্রের যাত্রালগ্নেই সূচনা ঘটে এক অংশের প্রতি অন্য অংশের অবিশ্বাস ও সন্দেহের। ফলে পাকিস্তানের পূর্বাংশের জনগণের মধ্যে পাকিস্তানী জাতীতাবোধের চেয়ে বাঙালি জাতীয়তাবোধ বেশি গুরুত্ব লাভ করে। তাদের কাছে পাকিস্তান রাষ্ট্রের বৃহত্তর সমস্যার চেয়ে পূর্ববাংলার সমস্যা প্রাধান্য লাভ করে।

বাঙালিদের মনে ক্ষোভের সঞ্চার হওয়ার সঙ্গত কারণও ছিল। স্বাধীনতার পরপরই রাষ্ট্রভাষার প্রশ্নে বাংলাভাষার প্রতি রাষ্ট্রীয়ভাবে যে অবজ্ঞা প্রদর্শন করা হয় তাতে পূর্ববাংলা প্রদেশের জনগোষ্ঠীর মধ্যে এমন ধারণার জন্মলাভ করে যে তাদেরকে কখনই রাষ্ট্রীয় সমানাধিকার দেয়া হবে না। প্রথমে ভাষার প্রশ্নে বাঙালিরা অধিকার সচেতন হয়। ক্রমান্বয়ে প্রশাসনিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ক্ষেত্রে ক্রমবর্ধমান বৈষম্যগুলি তাদেরকে ক্ষুব্ধ করে। একপর্যায়ে স্বাধিকার আন্দোলন শুরু হয়, যা ১৯৭১ সালে স্বাধীনতার আন্দোলনে পর্যবসিত হয়। পাকিস্তানের দুই অংশের মধ্যে সৃষ্টি বৈষম্যগুলো পর্যালোচনা করলেই দেখা যাবে পাকিস্তানের অখন্ডতা বজায় রাখা সম্ভব ছিল না।

পাকিস্তান ব্রিটিশদের কাছ থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে এক সুশৃঙ্খল আমলাগোষ্ঠী লাভ করে। ব্রিটিশ আমলে আমলা গোষ্ঠীই ছিল প্রশাসনের সকল ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দু। দেশে শান্তি-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা থেকে শুরু করে সকল উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের দায়িত্বপ্রাপ্ত ছিল আমলাগোষ্ঠী। পাকিস্তান সৃষ্টির পর এর আমলাশ্রেণী প্রকৃত

www.Educationblog24.com

ক্ষমতার অধিকারী হয়। কিন্তু এই আমলাগোষ্ঠীতে পূর্ববাংলার প্রতিনিধিত্ব ছিল নগন্য। "The Pakistan bureaucracy at the time of independence had been a West Pakistan show". সে সময় (১৯৪৭) মুসলমান ICS অফিসারদের এক-তৃতীয়াংশ ছিলেন পাঞ্জাবি, অবশিষ্টরা ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ (বিশেষ করে যুক্তপ্রদেশ ও মাদ্রাজ) থেকে আগত অবাঙালি রিফুজি মুসলমান। এদের নিয়ে গঠিত হয় পাকিস্তান সিভিল সার্ভিস। তারা পাকিস্তান প্রশাসনের উচ্চতম পদগুলো দখল করেন। স্বভাবতই স্বাধীনতার সূচনালগ্নেই পাকিস্তান প্রশাসনে অবাঙালি মুসলমানদের একচেটিয়া আধিপত্য কায়েম হয়। ১৯৪৭-এর পর ১৫ জন প্রাদেশিক সিভিল সার্ভিসের সদস্যকে পাকিস্তান সিভিল সার্ভিসে (পি.সি.সি) পদোন্নতি দেয়া হয়। উক্ত ১৫ জনের মধ্যে বাঙালি ছিলেন মাত্র ৪ জন। যে সময় সিভিল সার্ভিসে বাঙালিদের সংখ্যা বৃদ্ধি করে বৈষম্য কমানো উচিত ছিল, তখন তা না করে কমসংখ্যক বাঙালিকে নিয়োগ কিংবা পদোন্নতি দিয়ে উল্টো বৈষম্য বৃদ্ধি করা হয়। তাছাড়া করাচীতে রাজধানী প্রতিষ্ঠা করা হলে সেখানকার বিভিন্ন অফিস-আদালতে সৃষ্ট নতুন ছোট বড় পদে পশ্চিম পাকিস্তানীরাই একচেটিয়া চাকুরি লাভ করে। ভৌগোলিক দূরত্বের কারণে তখন বাঙালিদের পক্ষে সেখানে যেয়ে ইন্টারভিউ দিয়ে চাকুরি লাভ সম্ভব ছিল না। ১৯৫৬ পর্যন্ত বাংলাকে রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা না দেয়ায় বাংলাভাষী বাঙালি ছাত্রদের পক্ষে প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় টিকে থাকাও সম্ভব ছিল না। ফলে পূর্ব পাকিস্তানে শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা ক্রমান্বয়ে বাড়তে থাকে।

প্রশাসনে অবাঙালি মুসলমানদের একচেটিয়া আধিক্য রাষ্ট্রীয় নীতিমালা প্রণয়নে তাদেরকেই মুখ্য ভূমিকা পালনকারীতে পরিণত করে। পশ্চিম পাকিস্তানীদের জন্য তাদের স্বার্থ চিন্তা ছিল বিধায় পূর্ব পাকিস্তানীদের ন্যায্য অধিকার লাভ অধিকাংশ ক্ষেত্রে উপেক্ষিত হয়। ১৯৪৭ সালে যে ৯৪ জন অবাঙালি মুসলমান ICS অফিসার পাকিস্তানে এসেছিলেন ১৯৬৫ সালে তাদের মধ্যে ৪৭ জন কর্মরত ছিলেন। তাঁরা তখন ছিলেন বয়োজ্যেষ্ঠ অফিসার এবং দেশের সকল গুরুত্বপূর্ণ পদ তাঁদের দখলে ছিল।

রাষ্ট্রীয় প্রশাসনিক কাঠামোর বিভিন্ন শাখা-প্রশাখায় অবাঙালিদের কতখানি আধিপত্য ছিল তা সারণী-১ থেকে প্রতীয়মান হবে।

পাকিস্তান সরকার ১৯৫০ সালের ৬ অক্টোবর এক আদেশ জারির মাধ্যমে সুপিরিয়র সার্ভিসসমূহ সহ পাকিস্তান সিভিল সার্ভিসে কোটা পদ্ধতি প্রবর্তনের আদেশ জারি করেন। এই আদেশে নতুন চাকুরির ক্ষেত্রে মেধা যাচাইয়ের পাশাপাশি আঞ্চলিক কোটা সংরক্ষণকেও গুরুত্ব দেয়া হয়। কিন্তু এই আদেশ সত্ত্বেও প্রশাসনিক পদে বৈষম্য বাড়তেই থাকে। ১৯৫৬ সালে পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকারের ৪২,০০০ কর্মচারী-কর্মকর্তার মধ্যে পূর্ব পাকিস্তানীদের সংখ্যা ছিল মাত্র ২,৯০০ এবং তারা অধিকাংশই ছিলেন নিম্নপদস্থ।

www.Educationblog24.com

সারণী-১ : ১৯৬০ এর দশক পর্যন্ত বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের তুলনামূলক অবস্থান

	পদের নাম	পূর্ব পাকিস্তান	পশ্চিম পাকিস্তান
১.	সচিব (১৯৬৮ পর্যন্ত)	কেউ না	সকল পদ সবসময়
২.	অর্থ এবং সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের সকল সচিব (১৯৬৮ পর্যন্ত)	কেউ না	সকল পদ সবসময়
৩.	চেয়ারম্যান, ডেপুটি চেয়ারম্যানবৃন্দ পরিকল্পনা কর্মকমিশন	কেউ না	সকল পদ সবসময়
৪.	চেয়ারম্যানবৃন্দ : পাকিস্তান ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডেভেলপমেন্ট করপোরেশন ১৯৬২ পর্যন্ত	কেউ না	সকল পদ সবসময়
৫.	চেয়ারম্যান ও প্রশাসকবৃন্দ, পাকিস্তান ইন্টারন্যাশনাল এয়ারলাইন্স	কেউ না	সকল পদ সবসময়
৬.	১৯৬৭ পর্যন্ত পাকিস্তান স্টেট ব্যাংকের গভর্নরবৃন্দ	কেউ না	সকল পদ সবসময়
৭.	পাকিস্তানের অর্থমন্ত্রীবৃন্দ	কেউ না	সব সময়

উৎস : Safar A. Akanda, *East Pakistan and Politics of Regionslism*, unpublished Ph.D. Thesis. University of Denver. 1970 P.116. footnote-23.

১৯৫৫ এবং ১৯৬৮ সালে কেন্দ্রীয় সচিবালয়ে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের প্রতিনিধিত্ব পর্যালোচনা করলে (সারণী-২ দ্রষ্টব্য) প্রশাসনের গুরুত্বপূর্ণ উচ্চপদসমূহে পশ্চিম পাকিস্তানের একচেটিয়া আধিপত্য লক্ষ্য করা যায়।

পাকিস্তানে সামরিক শাসন জারির পর প্রশাসনিক ক্ষেত্রে বৈষম্য আরো বেড়ে যায়। সামরিক শাসনের ৪৪ মাসে ৭৯০ জন জুনিয়র গ্রেড কর্মচারী নিয়োগ করা হয়, যার মধ্যে পূর্ব পাকিস্তানের ছিল মাত্র ১২০ জন (১৫.২%)। ১৯৫৯ সালের সেপ্টেম্বর মাস থেকে ১৯৬০ সালের মে মাস পর্যন্ত ৯ মাসে ৭৩৪ জন সেকশন অফিসার নিয়োগ করা হয়, যার মাত্র ৭৪ জন (১০%) পূর্ব পাকিস্তানের। ১৯৫৯-১৯৬৩ সময়কালে রাওয়ালপিন্ডিস্থ কেন্দ্রীয় সচিবালয়ের ৩১৫ জন কেরানি নিয়োগ দেয়া হয়। এর মধ্যে পূর্ব পাকিস্তানী ছিল মাত্র ৩৬ জন (১১%)। ১৯৬০ থেকে ১৯৬৩ সালের মধ্যে ১৪ জন সামরিক কর্মকর্তাকে, বেসামরিক প্রশাসনে নিয়োগ দেয়া হয়। তারা সকলেই ছিলেন পশ্চিম পাকিস্তানী। আইয়ুবের ১৯৬২ সালের সংবিধানে যদিও বৈষম্য কমিয়ে এনে Parity সাম্য প্রতিষ্ঠার অঙ্গীকার করা হয়েছিল, কিন্তু বাস্তবে কিছুই হয়নি। যেমন ১৯৬৬ সালের কেন্দ্রীয় সরকারে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানী গেজেটেড কর্মকর্তার সংখ্যা ছিল যথাক্রমে ১,৩৩৮ এবং ৩,৭০৮ জন এবং একই বছরের নন-গেজেটেড কর্মচারীর সংখ্যা পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানে ছিল যথাক্রমে ২৬,৩১০ এবং ৮২,৯৪৪ জন।

www.Educationblog24.Com

সারণী-২ : ১৯৫৫ এবং ১৯৬৮ সালে পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সচিবালয়ে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের প্রতিনিধিত্ব

পদ	১৯৫৫ সালে			১৯৫৫ সালে পূর্ব পাকিস্তানীদের শতকরা হার	১৯৬৮ সালে পূর্ব পাকিস্তানীদের শতকরা হার
	মোট সংখ্যা	পশ্চিম পাকিস্তানী	পূর্ব পাকিস্তানী		
সেক্রেটারি	১৯	১৯	×	০.০	১৪.০
জয়েন্ট সেক্রেটারি	৪১	৩৮	৩	৭.৩	৬.০
ডেপুটি সেক্রেটরি	১৩৩	১২৩	১০	৭.৫	১৮.০
আন্ডার সেক্রেটারি	৫৪৮	৫১০	৩৮	৭.০	২০.০
অন্যান্য	-	-	-	-	-
মোট	৭৪১	৬৯০	৫১	৬.৯	?

উৎস : Safar A. Akanda *op.cit*, P. 121; Verninder Grover (ed.) *Encyclopaedia of SAARC Nations*, New Delhi. 1997

কেবল সিভিল সার্ভিসেই নয়, ফরেন সার্ভিস, বিভিন্ন স্বায়ত্তশাসিত ও আধা স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের চাকুরিতেও পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে বৈষম্য বিরাজমান ছিল। (সারণী-৩ দ্রষ্টব্য)।

পাকিস্তানের প্রতিরক্ষা সার্ভিসেও পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে ব্যাপক বৈষম্য বিরাজ করে। দেশভাগের সময় পাকিস্তান সেনাবাহিনীতে পূর্ব পাকিস্তানীদের সংখ্যা ছিল নগন্য। ব্রিটিশ আমলে ইংরেজ কর্তৃপক্ষ বাঙালিদেরকে অসামরিক জাতি বলে বিবেচনা করত, ফলে ব্রিটিশ সেনাবাহিনীতে বাঙালিদেরকে খুব কম সংখ্যক নিয়োগ দেয়া হত। স্বাধীনতার পর এ অবস্থার কোনো পরিবর্তন হয়নি। স্বাধীনতার পরবর্তী চার বছর পূর্ব পাকিস্তান থেকে মাত্র ৮১০ জনকে প্রতিরক্ষা বিভাগে নিয়োগ করা হয়। প্রতিরক্ষা সার্ভিসে আসার জন্য পূর্ব পাকিস্তানীদেরকে উৎসাহিত করা হয়নি। প্রতিরক্ষা বিভাগের সকল শাখার সদর দফতর ছিল পশ্চিম পাকিস্তানে। প্রতিরক্ষা ট্রেনিং ইনস্টিটিউটগুলিও ছিল সেখানে। প্রতিরক্ষা বিভাগে নাম লেখালেই চলে যেতে হত পশ্চিম পাকিস্তানে। ১৬ থেকে ২০ বা ২২ বছর বয়সে প্রতিরক্ষা বিভাগে চাকুরি নিয়ে নিজ মাতৃভূমি ছেড়ে হাজার মাইল দূরে যাওয়ার আগ্রহ খুব কম পূর্ব পাকিস্তানীর ছিল। অভিভাবকরাও তাদের সন্তানদের অতদূরে চাকুরি নিয়ে যেতে দিতে চাইতেন না। আবার ইচ্ছে থাকলেও প্রতিরক্ষা সার্ভিসে নিয়োগ লাভ বাঙালিদের জন্য ছিল বেশ কঠিন। রিক্রুটিং বোর্ডগুলি গঠিত ছিল পশ্চিম পাকিস্তানীদের নিয়ে। তারা সহসা বাঙালিদের অফিসার পদে নিয়োগ দিতো না। এমনকি জোয়ান পদে নিয়োগের জন্য যে দৈহিক মাপ ও গঠন নির্ধারণ করা হয়েছিল তা খুব কম বাঙালির ছিল। স্বভাবতই প্রতিরক্ষা সার্ভিসে পূর্ব ও পশ্চিমের বৈষম্য বাড়তে বাড়তে হয় আকাশছোঁয়া। (সারণী-৪ দ্রষ্টব্য)।

www.Educationblog24.com

www.Educationblog24.Com

সারণী-৩ : ফরেন সার্ভিস ও স্টেটব্যাংকের চাকুরিক্ষেত্রে বৈষম্য

চাকুরির ক্ষেত্র	সাল	মোট সংখ্যা	পূর্ব পাকিস্তান	পশ্চিম পাকিস্তান	পূর্ব পাকিস্তানের শককরা
ফরেন সার্ভিস ক্যাডার	১৯৫৩	১১৯	৩৬	৮৩	৩১%
	১৯৬২	২৪০	৫০	১৯০	২০.৮%
স্টেটব্যাংক অব পাকিস্তান	১৯৫০	২০৬	৪১	১৬৫	১৯.৯%
	১৯৬৩	৭৫১	২৩৬	৫১৫	৩১.৪%

উৎস : Safar A. Akanda. *op.cit* P.141, Table-XV. P. 142. Table-XVI

সারণী-৪ : ১৯৫৬ সালে প্রতিরক্ষা সার্ভিসের বিভিন্ন পদে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানী অফিসারের সংখ্যা ও হার

পদবি	পশ্চিম পাকিস্তানী অফিসারের সংখ্যা	পূর্ব পাকিস্তানী অফিসারের সংখ্যা	পূর্ব পাকিস্তানীদের শতকরা হার
লে. জেনারেল	৩	০	০.০০
মেজর জেনারেল	২০	০	০.০০
ব্রিগেডিয়ার	৩৪	১	২.৮৫
কর্নেল	৪৯	২	২.০০
লে. কর্নেল	১৯৮	২	১.৩৩
মেজর	৫৯০	১০	১.৬৬
সেনাবাহিনীতে মোট	৮৯৪	১৪	১.৫৬
নেভিতে মোট	৫৯৩	৭	১.১৬
বিমানবাহিনীতে মোট	৬৪০	৬০	৮.৫৭

উৎস : Verninder Grover, *op.cit* 20-21. Table-3. Table-4

পরবর্তী বছরগুলোতে এই বৈষম্য আরো বৃদ্ধি পায়। ১৯৬৮ সালে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানীদের মধ্যে অনুপাত ছিল জোয়ানদের ক্ষেত্রে ১ : ২৫ এবং অফিসারের ক্ষেত্রে ১:৯০।

অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বৈষম্য

সারণী-৫ এ পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানে শিক্ষাক্ষেত্রে অগ্রগতির একটা তুলনামূলক চিত্র পাওয়া যায়। সারণীতে লক্ষণীয় যে, ১৯৪৭ সালে প্রাইমারী থেকে কলেজ পর্যায় পর্যন্ত প্রতিষ্ঠান ও ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা পশ্চিম পাকিস্তানের তুলনায় পূর্ব পাকিস্তানে বেশি ছিল। কিন্তু পরবর্তী ২০ বছরে পূর্ব পাকিস্তান পশ্চিম পাকিস্তানের তুলনায় শিক্ষাক্ষেত্রে অনেক পিছিয়ে পড়ে। ১৯৪৭ থেকে ১৯৬৮ পর্যন্ত সময়ে পূর্ব পাকিস্তানে স্কুলগামী

www.Educationblog24.com

ছেলে-মেয়ের সংখ্যা বাড়লেও প্রাইমারী স্কুলের সংখ্যা কমেছে। অথচ একই সময়ে পশ্চিম পাকিস্তানে প্রাইমারি স্কুলের সংখ্যা প্রায় ৪ গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে।

সারণী-৫ : ১৯৪৭-৪৮ থেকে ১৯৬৮-৬৯ সময়কালে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানে শিক্ষার অগ্রগতি

প্রতিষ্ঠান	পশ্চিম পাকিস্তান			পূর্ব পাকিস্তান		
প্রাইমারী স্কুল	১৯৪৭-৪৮	১৯৬৮-৬৯	বৃদ্ধি	১৯৪৭-৪৮	১৯৬৮-৬৯	বৃদ্ধি
	৮,৪১৩	৩৯,৪১৮	+৩৬৯%	২৯৬৬৩	২৮,৩০৮	জনসংখ্যা বৃদ্ধি সত্ত্বেও ১৪৫৫টি কমেছে। (-৪.৬%)
সেকেন্ডারি স্কুল	২৫৯৮	৪৪৭২	+১৭৬%	৩৪৮১	৩৯৬৪	+১১.৪%
বিভিন্ন শ্রেণীর কলেজ	৪০	২৭১	+৬৭৫%	৫০	১৬২	+৩২%
মেডিকেল, ইঞ্জিনিয়ারিং ও কৃষি কলেজ	৪	১৭	+৪২৫%	৩	৯	+৩০০%
বিশ্ববিদ্যালয়	২ (৬৫৪ জন শিক্ষার্থী)	৬ (১৮২০ জন জন শিক্ষার্থী)		১ (১৬২০ জন শিক্ষার্থী)	৪ (৮,৮৩) জন শিক্ষার্থী)	

উৎস : *Bangladesh Documents*, P.19.

অতএব দেখা যায়, পশ্চিম পাকিস্তানী শিশুদের শিক্ষার সুযোগ বৃদ্ধি করার জন্য সেখানে বিদ্যায়তনের সংখ্যা বৃদ্ধি করা হলেও পূর্ব পাকিস্তানের শিশুদেরকে শিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে। এইভাবে শিক্ষার প্রতিটি পর্যায়ে পশ্চিম পাকিস্তানীদেরকে এগিয়ে যাবার ব্যবস্থা করা হয়। শিক্ষা বাবদ অর্থবরাদ্দের ক্ষেত্রেও বৈষম্য বাড়তে থাকে। ১৯৪৮-৫৫ সময়কালে শিক্ষাখাতে পশ্চিম পাকিস্তানকে যেখানে বরাদ্দ দেয়া হয় ১৫৩০ কোটি টাকা, সেখানে পূর্ব পাকিস্তানকে দেয়া হয় মাত্র ২৪০ কোটি টাকা। (১৩.৫% মাত্র)। অপর আরেক তথ্য অনুযায়ী ১৯৫১-১৯৬১ সময়ে শিক্ষাখাতে পূর্ব পাকিস্তানের জন্য মাথাপিছু বার্ষিক বরাদ্দ ছিল ৫.৬৩ টাকা। অথচ পশ্চিম পাকিস্তানীদের জন্য তা ৮.৬৩ টাকা (অর্থাৎ ব্যবধান ৫৩%-এরও বেশি ছিল)। তাছাড়া Colombo Plan, Ford Foundation, Commonwealth Aid- প্রভৃতি প্রোগ্রামের আওতায় যে সকল বৈদেশিক বৃত্তি দেয়া হয় তার সুযোগ-সুবিধা পশ্চিম পাকিস্তানীরা ভোগ করে, পূর্ব পাকিস্তানের যোগ্য প্রার্থীরা অনেক সময় এসব বৃত্তির সন্ধানই পেত না। এইভাবে শিক্ষাক্ষেত্রে পিছিয়ে পড়ে পূর্ব পাকিস্তানীরা পরোক্ষভাবে বিভিন্ন প্রশাসনিক পদে নিয়োগের সুযোগ থেকেও বঞ্চিত হতে থাকে।

পূর্ব পাকিস্তানীদের সবচেয়ে বড় অভিযোগ ছিল কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক পূর্ব পাকিস্তানকে অর্থনৈতিক শোষণ করা। পাকিস্তান আমলে ব্রিটেন, আমেরিকার অনেক নিরপেক্ষ অর্থনীতিবিদ বলেছেন যে, " The economic development of East Pakistan was sadly neglected and that something ought to be done about it."

www.Educationblog24.com

www.Educationblog24.Com

পূর্ব এবং পশ্চিম পাকিস্তানের জনগণের মাথাপিছু আয় এবং ব্যয়ের ক্ষেত্রে বৈষম্য ১৯৫১-৫২ সালেই স্পষ্ট হয় এবং তা পরবর্তী বছরগুলোতে ক্রমান্বয়ে বাড়তে থাকে। ১৯৪৭ সালে দেশভাগের সময় থেকেই পশ্চিম পাকিস্তান পূর্ব পাকিস্তানের চেয়ে অধিকমাত্রায় অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি লাভ করতে থাকে। ফলে দুই অংশের মধ্যে বৈষম্যও বাড়তে থাকে। ১৯৪৮-৪৯ আর্থিক বছরে পাকিস্তানের জাতীয় আয়ের মধ্যে বৈষম্যও বাড়তে থাকে। ১৯৪৮-৪৯ আর্থিক বছরে পাকিস্তানের জাতীয় আয়ের ৫৭.৫৯ ভাগ অর্জিত হয় পূর্ব পাকিস্তান থেকে। পূর্ব পাকিস্তানে উৎপাদিত চা, চামড়া, রেশম প্রভৃতি থেকে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা অর্জিত হয়। এই প্রদেশের বনজ সম্পদ– যেমন বাঁশ ও কাঠ– কাগজ ও নিউজপ্রিন্ট তৈরিতে অবদান রাখে। ১৯৪৭ সালে দেশ ভাগের সময় পাকিস্তানের উভয় অংশ শিল্প কারখানার দিকে প্রায় সমান অবস্থায় ছিল (সারণী-৬ দ্রষ্টব্য) পশ্চিম পাকিস্তান পশম, সিমেন্ট, চিনি শিল্প এবং যোগাযোগ অবকাঠামো ক্ষেত্রে অগ্রসর থাকলেও পূর্ব পাকিস্তান পাট, চা, চামড়া, সুতাকল, রেশম, তামাক প্রভৃতি

সারণী-৬ : ১৯৪৭ সালে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের শিল্প কারখানা

শিল্প	অবিভক্ত ভারতে সংখ্যা	পাকিস্তানের অংশে প্রাপ্ত	পূর্ব পাকিস্তানের অংশে প্রাপ্ত	পশ্চিম পাকিস্তানের অংশে প্রাপ্ত
পাটকল	১১৪	×	×	×
তুলা কল	৪০৫	১৬	১০	৪
চিনি কল	১৫১	৯	৫	৪
সিমেন্ট কারখানা	১৩	৫	১	৪
ম্যাচ ফ্যাক্টরি	?	৮	৪	৪
মোট		৩৮	২০	১৮

উৎস : Safar A. Akanda, *op.cit, p.* 171. Table XCCII.

ক্ষেত্রে সমৃদ্ধতর ছিল। পূর্ব পাকিস্তানের জমি ছিল তুলনামূলকভাবে অধিক উর্বর। ১৯৪৭-৪৮ সালে পাকিস্তানের দুই অংশের মধ্যে যে অর্থনৈতিক ভারসাম্য বজায় ছিল, পরবর্তী বছরগুলোতে তা অসমান হওয়ার কারণ হল শাসকগোষ্ঠীর স্বার্থান্বেষী অর্থনৈতিক নীতি গ্রহণ। এই বৈষম্য সৃষ্টির মূল কারণগুলো নিম্নরূপ :

১. পশ্চিম পাকিস্তানে সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে অধিক আর্থিক বিনিয়োগ;
২. পাকিস্তানের রাজধানী ও প্রতিরক্ষা সার্ভিসের সকল সদর দফতর পশ্চিম পাকিস্তানে প্রতিষ্ঠা করা
৩. পূর্ব পাকিস্তান থেকে অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রা পশ্চিম পাকিস্তানে স্থানান্তর;
৪. ব্যাংকিং এবং ঋণদান প্রতিষ্ঠানসমূহের সদর দফতর পশ্চিম পাকিস্তানে প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি।

১৯৪৭ সালে দেশভাগের পর বিত্তশালী রিফুজিরা পশ্চিম পাকিস্তানে গমন করেন। ভাষা ও সাংস্কৃতিক নৈকট্যের কারণে এবং ফেডারেল রাজধানী অবস্থিত হওয়ায় বোম্বে

www.Educationblog24.com

ও উত্তর প্রদেশের মুসলমান ব্যবসায়ী-শিল্পপতিবৃন্দ করাচী ও লাহোরে গমন করেন এবং সেখানে তাদের ব্যবসায়িক কর্মকাণ্ড শুরু করেন। অপরপক্ষে পূর্ব পাকিস্তানে ভিন্ন চিত্র লক্ষ্য করা যায়। সেখান থেকে হিন্দু মহাজন ব্যবসায়ী গোষ্ঠী তাদের পুঁজিপাট্টা নিয়ে ভারতে চলে যায়। পাকিস্তান কেন্দ্রীয় সরকার পূর্ব পাকিস্তানের পুঁজিপতি হিন্দুদের ভারতগমনে বাধা দেননি, আবার ভারত থেকে আগত মুসলমান পুঁজিপতিদেরকে পূর্ব পাকিস্তানে গমন করতেও উদ্বুদ্ধ করেননি। বরং পশ্চিম পাকিস্তানে আগত রিফুজি শিল্পপতি-ব্যবসায়ী শ্রেণীকে সহজ শর্তে ঋণ সুবিধা প্রদানসহ অবাধ আমদানি-রফতানি লাইসেন্স প্রদান করা হয়। ফলে বৈদেশিক বাণিজ্য তাদের দখলে চলে যায় এবং অল্পসময়ে তারা প্রচুর মুনাফা অর্জন করে। পাট এবং তুলা রফতানির একচেটিয়া অধিকারও পশ্চিম পাকিস্তানী ব্যবসায়ীদের হাতে চলে যায়। এইভাবে অর্জিত বিপুল মুনাফা তারা ১৯৫০ সাল নাগাদ টেক্সটাইল শিল্প প্রতিষ্ঠায় বিনিয়োগ করে। স্বাধীনতার পর পর ফেডারেল রাজধানী প্রতিষ্ঠা করতে এবং প্রতিরক্ষা বিভাগের সকল সদর দফতর নির্মাণে যে প্রচুর পরিমাণ অর্থব্যয় করা হয় তার সুফল একচেটিয়া পশ্চিম পাকিস্তানীরা ভোগ করে। পশ্চিম পাকিস্তানে শিল্পের প্রসার ঘটানোর জন্য রাস্তাঘাট নির্মাণ, বিদ্যুৎ এবং সেচ প্রকল্প হাতে নেয়া হয়। এইভাবে স্বাধীনতার ২/৩ বছরের মধ্যেই পশ্চিম পাকিস্তানের অর্থনৈতিক অবস্থার ব্যাপক উন্নতি ঘটে।

১৯৪৭-৫৫ সময়কালে পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকার যে অর্থব্যয় করেন তার প্রায় ৯০% ব্যয় করা হয় পশ্চিম পাকিস্তানে (সারণী-৭)। উক্ত সময় পূর্ব পাকিস্তান থেকে রাজস্ব আয় হয় ১৬৮১ মিলিয়ন টাকা। কিন্তু এই অর্থের মধ্যে মাত্র ৪২৭ মিলিয়ন টাকা সেখানে ব্যয় করা হয়।

সারণী- ৭ : ১৯৪৭-৫৫ সময়কালে পাকিস্তান কেন্দ্রীয় সরকারের প্রদেশভিত্তিক ব্যয়ের পরিমাণ

ব্যয়ের খাত	পশ্চিম পাকিস্তানে ব্যয় (মিলিয়ন) টাকা	পূর্ব পাকিস্তানে ব্যয় (মিলিয়ন) টাকা	পূর্ব পাকিস্তানে ব্যয়ের শতকরা হার
আর্থিক সাহায্য	১০,০০০	১,২৬০	১১.২
মূলধন ব্যয়	২,১০০	৬২০	২২.৮
অনুদান	৫৪০	১৮০	২৫.০
শিক্ষাখাত	১,৫৩০	২৪০	১৩.৩
বৈদেশিক সাহায্য বরাদ্দ	৭৩০	১৫০	১৭.০
প্রতিরক্ষা খাতে ব্যয়	৪,৬৫০	১০০	২.১
মোট	১৯,৫৫০	২,৫৫০	১০.২

উৎস : Safar A. Akanda, *op.cit*, p.176 Table XXIII.

১৯৪৭-৫৫ সময়কালে প্রদেশদ্বয়ের উন্নয়ন খরচ পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, উক্ত সময় পূর্ব পাকিস্তান সরকার যেখানে মাত্র ৫১৪.৭ মিলিয়ন টাকা উন্নয়ন খাতে খরচ করেছে, সেই একই সময়কালে পশ্চিম পাকিস্তান সরকার উন্নয়ন খাতে খরচ করেছে

www.Educationblog24.Com

১,৪৯৬.২ মিলিয়ন টাকা।

এইভাবে দেখা যায় যে, ১৯৪৭-৫৫ সময়কালে দুই প্রদেশের মধ্যে ব্যাপক অর্থনৈতিক বৈষম্য সৃষ্টি হয়। মাথাপিছু আয়ের ক্ষেত্রে এই বৈষম্য ১৯৫১-৫২ সালে যেখানে ছিল ১৮%, ১৯৫৪-৫৫ সালে তা বৃদ্ধি পেয়ে ২৪%।

প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় (১৯৫৫-৫৯) উন্নয়ন বৈষম্য

পাকিস্তানের প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা কার্যকরী হয় জুলাই ১৯৫৫ সালে। এতে দুই প্রদেশের মধ্যে বিরাজমান বৈষম্য কমিয়ে আনার প্রতিশ্রুতি থাকলেও বাস্তবে এই পরিকল্পনা বৈষম্য বৃদ্ধির সহায়ক হয়। পরিকল্পনা মেয়াদকালে পশ্চিম পাকিস্তানে পাবলিক সেক্টরে যেখানে ব্যয়র পরিমাণ ছিল ৪,৯৬৪ মিলিয়ন টাকা, সেখানে পূর্ব পাকিস্তানে ব্যয় করা হয় মাত্র ৯৮৩ মিলিয়ন টাকা (মোট ব্যয়ের মাত্র ১৬.৫%)।

প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার মূল্যায়ন বিশ্লেষণ করলে লক্ষ্য করা যায় যে, পশ্চিম পাকিস্তানের জন্য বরাদ্দকৃত অর্থ খরচ করেও সেখানে অতিরিক্ত অর্থ বরাদ্দ দেয়া হত, অথচ পূর্ব পাকিস্তানের জন্য বরাদ্দকৃত অর্থ সঠিক পরিকল্পনার অভাবে সম্পূর্ণ খরচ করা সম্ভব হত না। The Economic Survey of East Pakistan. 1964-65 থেকে জানা যায় যে, প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় পূর্ব পাকিস্তানে যে প্রকল্প পরিকল্পনা ছিল তার মাত্র ৩৭% অর্জিত হয়েছিল, অথচ পশ্চিম পাকিস্তানের অর্জন ছিল ১০০%। উক্ত সময়ে পশ্চিম পাকিস্তানে মাথাপিছু বিনিয়োগ যেখানে ছিল ২০৫ টাকা, সেখানে পূর্ব পাকিস্তানে এই পরিমাণ ছিল মাথাপিছু মাত্র ৮০ টাকা। প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় পশ্চিম পাকিস্তানীদের মাথাপিছু আয় ৫% বৃদ্ধি পেলেও পূর্ব পাকিস্তানীদের ক্ষেত্রে মাথাপিছু ১% কমে যায়। ফলে মাথাপিছু আয়ের ক্ষেত্রে দুই প্রদেশের মধ্যে বৈষম্য ১৯৫৪-৫৫ সালের ২৪% থেকে বেড়ে ১৯৫৯-৬০ সালে ২৯% হয়।

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় (১৯৬০-৬৫) বৈষম্য

এই পরিকল্পনাতেও দুই প্রদেশের অর্থনৈতিক বৈষম্য কমিয়ে আনার আশাবাদ ব্যক্ত করা হলেও কীভাবে তা অর্জন করা হবে সে বিষয়ে কোনো দিক নির্দেশনা দেয়া হয়নি। বরং বিনিয়োগের হার পশ্চিম পাকিস্তানের জন্য বেশি ধার্য করা হয় (পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের জন্য মাথাপিছু যথাক্রমে ১৯০ ও ২৯২ টাকা)। মাথাপিছু আয়ের ক্ষেত্রে দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার মেয়াদ শেষে দুই প্রদেশের মধ্যে বৈষম্য বেড়ে ৪৪% এ দাঁড়ায়।

তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার বৈষম্য

দুই প্রদেশের মধ্যে বিরাজমান বৈষম্য কমিয়ে আনার লক্ষ্যে এই পরিকল্পনায় কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়। পূর্ব পাকিস্তানের জন্য উন্নয়ন বরাদ্দ ধার্য করা হয় ২৭,০০০ মিলিয়ন টাকা এবং পশ্চিম পাকিস্তানের জন্য ২৫,০০০ মিলিয়ন টাকা। পাবলিক সেক্টরে বরাদ্দকৃত অর্থের পরিমাণ ছিল পূর্ব পাকিস্তানের ১৬,০০০ মিলিয়ন টাকা এবং পশ্চিম পাকিস্তানের জন্য ১৪,০০০ মিলিয়ন টাকা। কাগজে কলমে পূর্ব পাকিস্তানের জন্য বরাদ্দ বেশি দেখানো হলেও, কারচুপি করে পশ্চিম পাকিস্তানের জন্য বিশাল পরিমাণ অর্থ অতিরিক্ত বরাদ্দ রাখা হয়। যেমন Indus Basin Development Works-এর জন্য ২য়

www.Educationblog24.com

ও ৩য় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় প্রকৃত বরাদ্দের চেয়ে অতিরিক্ত ৯,০৪৩.৩২ মিলিয়ন টাকা খরচ করা হয়। তাছাড়া পশ্চিম পাকিস্তানের লবণাক্ততা ও জলাবদ্ধতা দূরীকরণে প্রকল্পের নামে ২য় ও ৩য় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার বরাদ্দের বাইরে ৫,৯০০ মিলিয়ন টাকা খরচ করা হয়। অপরপক্ষে পূর্ব পাকিস্তানের বন্যা নিয়ন্ত্রণ খাতে (যা এই প্রদেশের জন্য অতি জরুরি ছিল) কোনো অতিরিক্ত বরাদ্দ দেয়া হয়নি।

তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় পূর্ব পাকিস্তানের জন্য ২৭,০০০ মিলিয়ন টাকা বরাদ্দ দেয়া হলেও বাস্তবে খরচ করা হয় ১০,৯৭০ মিলিয়ন টাকা। অর্থাৎ মোট বরাদ্দের প্রকৃত খরচের পরিমাণ ছিল পাবলিক সেক্টরে ৪৩% এবং প্রাইভেট সেক্টরে ৩৫% মাত্র। ফলে কেবল তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার মেয়াদ শেষে ২৩% বৈষম্য বৃদ্ধি পায়।

পাকিস্তানের রাজধানী এবং সকল সামরিক ও বেসামরিক বিভাগসমূহের হেড অফিস পশ্চিম পাকিস্তানে অবস্থিত হওয়ায় সেগুলোর ভবন নির্মাণ, আসবাবপত্র ক্রয়, স্টাফদের বাসাবাড়ি নির্মাণ প্রভৃতিতে যে বিপুল অর্থ বিনিয়োগ করা হয় এবং বিভিন্ন নির্মাণ ও সরবরাহ কাজে যে কর্মক্ষেত্র সৃষ্টি হয় তার একচেটিয়া সুযোগ লাভ করে পশ্চিম পাকিস্তানীরা। কেবল করাচীকে রাজধানী শহর হিসেবে গড়ে তুলতেই ১৯৫৬ সাল পর্যন্ত ব্যয় হয় ৫,৭০০ মিলিয়ন টাকা। এই অর্থ ছিল উক্ত সময়ে পাকিস্তান সরকারের মোট ব্যয়ের ৫৬.৪% যে সময় পূর্ব পাকিস্তানে মোট সরকারি ব্যয়ের হার ছিল মাত্র ৫.১০%।

১৯৬১ সালে সামরিক সরকার প্রথমে রাওয়ালপিন্ডিতে এবং পরে ইসলামাবাদে রাজধানী স্থানান্তরের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। পূর্ব পাকিস্তানীদেরকে খুশি করার জন্য আইয়ুব খান ঢাকায় দ্বিতীয় রাজধানী প্রতিষ্ঠার ঘোষণা দেন। কিন্তু ১৯৬৭ সাল নাগাদ ইসলামাবাদের উন্নয়নে যেখানে ৩,০০০ মিলিয়ন টাকা ব্যয় করা হয়, সেখানে ঢাকার উন্নয়নে ব্যয় হয় মাত্র ২৫০ মিলিয়ন টাকা।

এইভাবে রাজধানী শহর নির্মাণের নামে পশ্চিম পাকিস্তানে বিপুল পরিমাণ অর্থ ব্যয় করা হয়।

সেনা, নৌ এবং বিমানবাহিনীর সদর দফতর পশ্চিম পাকিস্তানে অবস্থিত হওয়ায় প্রতিরক্ষাখাতে যে ব্যয় বরাদ্দ (রাজস্ব বাজেটের প্রায় ৬০%) তা প্রায় পুরোটাই ব্যয় হয় পশ্চিম পাকিস্তানে। ১৯৪৭-৫৬ সময়কালে প্রতিরক্ষা খাতে মোট ব্যয় ছিল ৪৫৬৫.৭ মিলিয়ন টাকা। এর মধ্যে মাত্র ১৬৭.২ মিলিয়ন টাকা ব্যয় করা হয় পূর্ব পাকিস্তানে। একই সময় পশ্চিম পাকিস্তানে অবস্থিত প্রতিরক্ষা সদর দফতরগুলি প্রশাসনিক খরচ ছিল ২,৫৬৩.৯ মিলিয়ন টাকা। পূর্ব পাকিস্তানে এই খাতে কোনো বরাদ্দ ছিল না।

পূর্ব পাকিস্তান থেকে পশ্চিম পাকিস্তানের সম্পদ পাচার

পাকিস্তানের দুই অংশের বৈদেশিক বাণিজ্যের পরিসংখ্যান বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে ১৯৪৭ থেকে ১৯৬৬ পর্যন্ত সময়কালে যেখানে পূর্ব পাকিস্তানের বাণিজ্য-উদ্বৃত্ত ছিল ৪৯২৪.১ মিলিয়ন টাকা, সেখানে পশ্চিম পাকিস্তানে ঘাটতি ছিল ১৬,৬৩৪.৬ মিলিয়ন টাকা। স্বভাবতই পূর্ব পাকিস্তানের উদ্বৃত্ত দিয়ে পশ্চিম পাকিস্তানের বাণিজ্য-ঘাটতি পূরণ করা হয়। ১৯৪৭-৬৬ সময়ে পাকিস্তানের মোট রফতানিতে পশ্চিম পাকিস্তানের অংশ ছিল ৪২%, অথচ মোট আমদানিতে তার অংশ ছিল ৬৯%।

www.Educationblog24.Com

অপরদিকে পূর্ব পাকিস্তান থেকে রফতানি খাতে অবদান ৫৮% হলেও সেখানে আমদানি হয় মাত্র ৩১%। পাকিস্তানের বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের গুরুত্বপূর্ণ উপাদান ছিল পাট রফতানি। কিন্তু পাট রফতানি করে যে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করা হয় তা ব্যয় হয় পশ্চিম পাকিস্তানের স্বার্থে। আবার দুই অঞ্চলের মধ্যে যে আন্তঃপ্রাদেশিক বাণিজ্য হয় তাতেও পূর্ব পাকিস্তান ক্ষতিগ্রস্ত হয়। বৈদেশিক বাণিজ্যে পূর্ব পাকিস্তান থেকে তুলনামূলকভাবে বেশি রফতানি হলেও, পূর্ব পাকিস্তান থেকে পশ্চিম পাকিস্তানে রফতানি হয় কম। পশ্চিম পাকিস্তান থেকে জাহাজভর্তি পণ্য এনে পূর্ব পাকিস্তানে চড়া দামে বিক্রি করা হলেও পূর্ব পাকিস্তান থেকে কোনো পণ্য না নিয়ে জাহাজগুলি খালি অবস্থায় পশ্চিম পাকিস্তানে ফিরিয়ে নেয়া হতো।

ব্যাংকিং সেক্টরেও পূর্ব পাকিস্তান অবহেলিত থাকে। ১৯৬৩ সালে তফসিলি ব্যাংকের সংখ্যা ছিল ৩৬, যার মোট ১১৩০টি শাখার মধ্যে পূর্ব পাকিস্তানে ছিল মাত্র মাত্র ৩৬২টি (৩২%)। স্বভাবত ব্যাংকিং খাতের সেবা পশ্চিম পাকিস্তানীরাই বেশি লাভ করে। ব্যাংকিং সেক্টরের মাধ্যমে যে বিনিয়োগ করা হয় তার ৯০ ভাগ পায় পশ্চিম পাকিস্তান।

অবশেষে তেইশ বছরের শোষণ, বঞ্চনা ও অত্যাচার সহ্য করার পর বাঙালিরা ১৯৭০-এর নির্বাচনে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন সত্ত্বেও ক্ষমতা লাভ করতে ব্যর্থ হলে তারা বাধ্য হয় স্বাধীনতার চিন্তা করতে। ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ রাতে নিরস্ত্র বাঙালির ওপর সামরিক বাহিনীকে লেলিয়ে দেয়ার মাধ্যমে পশ্চিম পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠীরাই বাঙালিদেরকে বাধ্য করে স্বাধীনতার যুদ্ধ শুরু করতে। যদিও পাকিস্তান সৃষ্টি হয়েছিল কংগ্রেস, মুসলিম লীগ ও ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের মধ্যে আলাপ-আলোচনা ও সমঝোতার ভিত্তিতে, কিন্তু বাংলাদেশকে স্বাধীনতা অর্জন করতে হয় সশস্ত্র যুদ্ধের মাধ্যমে।

সহায়ক গ্রন্থ

হাসান হাফিজুর রহমান (সম্পাদিত), *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ : দলিলপত্র, প্রথম খণ্ড, পটভূমি, ১৯০৫-১৯৫৮*, ঢাকা : তথ্য মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ১৯৮২।

মুনতাসীর মামুন ও জয়ন্ত কুমার রায়, *প্রশাসনের অন্দরমহল : বাংলাদেশ*, ঢাকা. ২০১২।

মুনতাসীর মামুন ও জয়ন্ত কুমার রায়, *বাংলাদেশ সিভিল সমাজ প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম* (নতুন পরিবর্ধিত সংস্করণ), ঢাকা. ২০১৩।

Khalid Bin Sayeed, *The Political system of Pakstan*, Karachi, 1967.

Rounaq Jahan, Pakistan : *Failure in National Integration*, London. 1972

www.Educationblog24.com

www.Educationblog24.Com

চতুর্থ অধ্যায়
ভাষা আন্দোলন ও বাঙালির আত্মপরিচয় প্রতিষ্ঠা

১৯৪৭ সালের বিভাগ পূর্ব অখণ্ড বাংলার ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ছিলেন পূর্ববাংলা মুসলিম লীগ নেতা হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী। তাঁর নেতৃত্বেই ১৯৪৬ সালের নির্বাচনে (ফেব্রুয়ারি মাসে অনুষ্ঠিত) বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগ পূর্ববাংলায় সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে এবং অবিভক্ত বাংলার ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়।

১৯৪৬ সালের ২৫ নভেম্বর অবিভক্ত বাংলার সর্বশেষ মন্ত্রিসভা গঠিত হয়। ১৯৪৭ সালের ২০ জুন বাংলার প্রাদেশিক পরিষদের সদস্যরা বাংলাকে দুটো অংশে বিভক্ত করার সিদ্ধান্ত নেন। বাংলা বিভক্তির সিদ্ধান্ত গৃহীত হলে মুসলিম লীগ কেন্দ্রীয় নেতৃত্বে পূর্ববাংলার আইনসভার জন্য নেতা নির্বাচনের নির্দেশ দেয়। ৫ আগস্ট (১৯৪৭) অনুষ্ঠিত এই নির্বাচনে খাজা নাজিমউদ্দিন ৭৫-৩৯ ভোটে সোহরাওয়ার্দীকে হারিয়ে সংসদীয় নেতা নির্বাচিত হন। সুতরাং খাজা নাজিমউদ্দিন ১৯৪৭ সালের ১৪ আগস্ট পূর্ববাংলার প্রথম মন্ত্রিসভা গঠন করেন। স্যার ফ্রেডারিক বোর্ন পূর্ববাংলার প্রথম গভর্নর নিযুক্ত হন।

এই মন্ত্রিসভা পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, ১৪ আগস্ট পূর্ববর্তী সোহরাওয়ার্দী মন্ত্রিসভার কোনো সদস্যকেই স্বাধীন পূর্ববাংলার প্রথম মন্ত্রিসভায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। স্বভাবতই নবীন রাষ্ট্রের জন্মলগ্নেই রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের মধ্যে সমঝোতার অভাব লক্ষ্য করা যায়।

১৯৪৮ সালের সেপ্টেম্বর মাসে পাকিস্তানের প্রথম গভর্নর জেনারেল মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ মৃত্যুবরণ করলে খাজা নাজিমউদ্দিন গভর্নর জেনারেল নিযুক্ত হন। তখন পূর্ববাংলায় প্রাদেশিক পরিষদের মুসলিম লীগ দলীয় সদস্যবৃন্দ সংসদীয় পদ্ধতিতে একজন মুখ্যমন্ত্রী নির্বাচিত করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু তাদের সে আশা পূরণ হয়নি। কারণ গভর্নর জেনারেল তাঁর মনোনীত নুরুল আমিনকে মুখ্যমন্ত্রী নিয়োগ করার জন্য পূর্ববাংলার গভর্নরকে নির্দেশ দেন। গভর্নর সে অনুসারে নূরুল আমিনকে মুখ্যমন্ত্রী নিয়োগ করেন। তিনি ১৯৫৪ সালের ২ এপ্রিল পর্যন্ত এই পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। এতে সংসদীয় রীতিনীতি চর্চার বিষয়টি বাধাপ্রাপ্ত হয়। অনেক মুসলিম লীগ সদস্য ক্ষুব্ধ হন। এমনি পরিস্থিতিতে পূর্ব বাংলায় পর পর কয়েকটি রাজনৈতিক দল গঠিত হয়।

পাঠক্রমের উপ অধ্যায়ে আছে–

ক. মুসলিম লীগের শাসন ও গণতান্ত্রিক রাজনীতির সংগ্রাম এবং খ. আওয়ামী লীগের প্রতিষ্ঠা, ১৯৪৯।

আমরা এখানে প্রথমে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের পরিচয় বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেছি যাতে এ বিষয়টি স্পষ্ট হয় যে, ১৯৪৭ সাল থেকে কী ধরনের রাজনৈতিক ও

www.Educationblog24.com

ছাত্র সংগঠনগুলো প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এ দল গঠনের প্রক্রিয়ায় জানা যাবে তাদের রাজনৈতিক চরিত্র।

আওয়ামী মুসলিম লীগের [পরবর্তী কালের আওয়ামী লীগ] প্রতিষ্ঠা ছিল এ পর্বে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। এখানে তা গুরুত্ব দিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

তারপর ভাষা আন্দোলন আলোচিত হয়েছে বিস্তারিতভাবে। 'ঘ' উপ অধ্যায়ে পাঠক্রমে আছে যুক্তফ্রন্ট ও ১৯৫৪ সালের নির্বাচন। এ বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ বিধায় বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে এবং বিবরণেই মুসলিম লীগের অপশাসনের বিরুদ্ধে যুক্তফ্রন্টের সংগ্রামের চিত্রটি পরিস্ফুটিত হয়েছে।

বিভিন্ন রাজনৈতিক দল : উৎপত্তি, বিকাশ, ভাঙন ও অবক্ষয়

পূর্ববাংলার জন্মলগ্নের দলসমূহ (১৯৪৭-৪৮)

১৯৪৭ সালের ১৪ আগস্ট স্বাধীনতা প্রাপ্তির সময় যে-সকল রাজনৈতিক দলের কার্যক্রম পূর্ববাংলায় চালু ছিল সেগুলো হচ্ছে মুসলিম লীগ, জাতীয় কংগ্রেস, কমিউনিস্ট পার্টি ইত্যাদি। এ.কে. ফজলুল হকের কৃষক-প্রজা পার্টির নামমাত্র অস্তিত্ব ছিল। স্বাধীনতা লাভের পূর্বে অখণ্ড বাংলায় ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ছিল বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগ। ১৯৪৬ সালের প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচনে এই দলটি ১১৯টি মুসলমান আসনের মধ্যে ১১৪টি আসনে জয়লাভ করে। বাকি ৫টি আসনে জয়লাভ করে ফজলুল হকের কৃষক-প্রজা পার্টি। ১৯৪৬ সালের নির্বাচনের পর অবিভক্ত বাংলার সরকার গঠন করেন হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী। সে সময় বঙ্গীয় মুসলিম লীগের মধ্যে অভ্যন্তরীণ কোন্দল ছিল। পার্টির সম্পাদক আবুল হাশিম এবং মুখ্যমন্ত্রী সোহরাওয়ার্দী ছিলেন একদিকে, আর পার্টির সভাপতি মওলানা আকরাম খাঁ এবং খাজা নাজিমউদ্দীন ছিলেন অন্যদিকে। সোহরাওয়ার্দী মন্ত্রিপরিষদ গঠন করলে খাজা নাজিমউদ্দীন রাজনীতি থেকে নিষ্ক্রিয় হন। কিন্তু ১৯৪৭ সালে অখণ্ড বাংলা গঠনের প্রশ্নে মুসলিম লীগের কেন্দ্রীয় হাই কমান্ড নাজিমউদ্দীন-আকরাম খাঁ গ্রুপকে সমর্থন দিলে তাদের গ্রুপটি শক্তিশালী হয়ে ওঠে। ফলশ্রুতিতে সোহরাওয়ার্দী-আবুল হাশিমের অখণ্ড বাংলা গঠনের স্বপ্ন ব্যর্থ হয়। বাংলা দ্বিখণ্ডিত হয় এবং পূর্ববাংলা পাকিস্তানে যোগদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। নবগঠিত পূর্ববাংলা প্রদেশে কে সরকার গঠন করবেন এই প্রশ্নে ৫ আগস্ট ১৯৪৭ বঙ্গীয় মুসলিম লীগ পার্লামেন্টারি পার্টিতে যে ভোটাভুটি হয় তাতে খাজা নাজিমউদ্দিন পূর্ববাংলা প্রদেশের প্রথম মুখ্যমন্ত্রী নিযুক্ত হন। তার নিযুক্তিতে দলের মধ্যেই একটি বিরোধী অংশের জন্ম হয়। দুই অংশের মধ্যে আদর্শগত মতভেদও ছিল। যেমন খাজা নাজিমউদ্দিন গ্রুপের উদ্দেশ্য ছিল শক্তিশালী কেন্দ্র গঠন করে মুসলিম জাতীয়তাবাদের নামে পাকিস্তানে সাম্প্রদায়িক রাজনীতি প্রতিষ্ঠা করা। এর বিপরীতে অন্য অংশের লক্ষ্য ছিল পূর্ববাংলার জন্য অধিক স্বায়ত্তশাসন লাভ ও পাকিস্তানকে অসাম্প্রদায়িক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র গড়ে তোলা। মুসলিম লীগের সরকারবিরোধী অংশের নেতা-কর্মীরা দেশভাগের পূর্বে এবং পরে কয়েকটি নতুন দল গঠন করে। নিম্নে তা আলোচনা করা হল :

www.Educationblog24.Com

(১) গণআজাদী লীগের জন্ম

নাজিমউদ্দীন বিরোধী অংশটি ছিল মূলত তরুণ কর্মীদল। বাম রাজনীতির দিকে তাদের কিছুটা ঝোঁকও ছিল। ১৯৪৭ সালের ১৪ আগস্টে দেশ স্বাধীন হবার পূর্বেই তারা একটি আলাদা সংগঠন প্রতিষ্ঠা করে। ১৯৪৭ সালের জুলাই মাসে প্রতিষ্ঠিত উক্ত সংগঠনটির নাম ছিল গণআজাদী লীগ (People's Feedom League)-এর আহ্বায়ক নিযুক্ত হয়েছিলেন কমরুদ্দিন আহমদ। কেন্দ্রীয় মুসলিম লীগ নেতৃত্বের বিরুদ্ধে আক্রোশ ও রাগের অভিব্যক্তি থেকেই এই সংগঠনের জন্ম। কিন্তু এই সংগঠন দীর্ঘস্থায়ী হতে পারেনি। এর কারণ : প্রথমত, আহ্বায়ক কমরুদ্দিন আহমেদের কর্মবিমুখ নিষ্ক্রিয় ভূমিকা, কারাগার-ভীতি ও ত্যাগী মনোভাবের অভাব; দ্বিতীয়ত, সমগ্র দেশে উৎকট সাম্প্রদায়িক বিষাক্ত আবহাওয়া, তৃতীয়ত, তদানীন্তন মুসলিম লীগ সরকারের কঠোর দমননীতি।

(২) পাকিস্তান গণতান্ত্রিক যুবলীগের জন্ম

স্বাধীনতা লাভের এক মাস পরেই ৬-৭ সেপ্টেম্বর (১৯৪৭) পূর্ববাংলার তরুণ-যুবক রাজনৈতিক কর্মীদল তাদের ভবিষ্যৎ রাজনৈতিক কর্মপন্থা নির্ধারণের উদ্দেশ্যে ঢাকা মিউনিসিপ্যালিটির ভাইস-চেয়ারম্যান খান সাহেব আবুল হাসনাতের বেচারাম দেউরিস্থ বাসভবনের হল কামরায় একটি যুব সম্মেলনে 'পাকিস্তান গণতান্ত্রিক যুবলীগ' গঠিত হয়। এর সভাপতি নির্বাচিত হন তসাদ্দুক আহমদ চৌধুরী।

পাকিস্তান যুবলীগ বারো দফা কর্মসূচী প্রণয়ন করে। উক্ত কর্মসূচীগুলো ছিল নিম্নরূপ :

১. অবিলম্বে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করিয়া পূর্ণ আজাদী ঘোষণা করিতে হইবে। আগামী অক্টোবরের ব্রিটিশ উপনিবেশ সম্মেলনে যোগদান করা চলিবে না। ব্রিটিশ আমলের কোনো ইংরেজ অফিসারের পেনশনের খরচ পাকিস্তান সরবার বহন করিতে পারিবে না। ১৯৪৮ সালের মধ্যেই পাকিস্তানের স্টার্লিং পাওনা কড়ায়-গণ্ডায় বুঝিয়া লইতে হইবে–কোনোরকম দীর্ঘমেয়াদী চুক্তি করা চলিবে না।

২. প্রাপ্তবয়স্কদের সার্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে অবিলম্বে নূতন গণপরিষদ মারফত গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা প্রণয়ন করিতে হইবে।

৩. ভাষার ভিত্তিতে স্বয়ং শাসন অধিকার সম্পন্ন প্রদেশ গড়িবার এবং আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার মানিলয়া লইতে হইবে।

৪. সংখ্যালঘুদের ন্যায্য অধিকার স্বীকার করিতে হইবে।

৫. জনগণের স্বার্থে পারস্পরিক অর্থনৈতিক সাহায্যের জন্য এবং সাম্রাজ্যবাদী হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে গণতান্ত্রিক দেশগুলির সহিত বন্ধুত্ব স্থাপন করিতে হইবে।

৬. বিনা ক্ষতিপূরণে জমিদারি প্রথার উচ্ছেদ করিয়া কৃষককে জমির মালিক করিতে হইবে। কৃষকের ঋণ মওকুফ করিতে হইবে। ক্ষেতমজুরদের ন্যায্য মজুরি দিতে হইবে।

৭. বড় বড় শিল্প, বড় ব্যাংক, ইনসিওরেন্স কোম্পানিগুলো জাতীয়করণ করিতে হইবে। শ্রমিকদের খাটুনির সময় আট ঘণ্টা বাঁধিয়া দিতে হইবে এবং বাঁচার মতো

www.Educationblog24.com

www.Educationblog24.Com

মজুরির ব্যবস্থা করিতে হইবে।

৮. ব্যাংক, চা-বাগান, খনি ইত্যাদি বড় বড় ব্যবসায় নিয়োজিত বিদেশী মূলধন বাজেয়াপ্ত করিতে হইবে। মার্শাল প্ল্যান অথবা অন্য কোনো বিদেশী মূলধন জাতীয় স্বার্থবিরোধী শর্তে গ্রহণ করা চলিবে না।

৯. বিনাব্যয়ে শিক্ষা বাধ্যতামূলক ও সার্বজনীন শিক্ষা চালু করিতে হইবে।

১০. রাষ্ট্রের খরচে স্বাস্থ্য এবং চিকিৎসার ব্যবস্থা করিতে হইবে।

১১. জনগণকে সামরিক শিক্ষা দিতে হইবে এবং জনগণের সামরিক বাহিনী গড়িয়া তুলিতে হইবে।

১২. নারীদের সমান গণতান্ত্রিক অধিকার স্বীকার করিতে হইবে।

পাকিস্তান গণতান্ত্রিক যুবলীগের রাজশাহী বিভাগীয় আঞ্চলিক কমিটির সেক্রেটারি মোহাম্মদ একরামুল হক কর্তৃক এই ইস্তাহার উত্থাপিত হয় এবং উপস্থিত প্রতিনিধিগণ কর্তৃক সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

(সূত্র : *স্বাধীনতার দলিলপত্র*, প্রথম খণ্ড, পৃ. ১০২-১০৩)।

'পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পরপরই ঢাকা, রাজশাহী ও ময়মনসিংহসহ বিভিন্ন জেলায় এর শাখা খোলা হয়, কিন্তু তীব্র পুলিশি নির্যাতন ও ক্ষমতাসীন মুসলিম লীগের গুণ্ডাদের অত্যাচারের ফলে ১৯৪৮ সালের শেষদিকে এই সংগঠনের বিলুপ্তি ঘটে।'

(দ্রষ্টব্য : ঐ, পৃ. ১০৮, পাদটীকা)।

(৩) তমদ্দুন মজলিশ

১৯৪৭ সালের ১ সেপ্টেম্বর ঢাকায় 'তমদ্দুন মজলিশ' নামে একটি সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠিত হয়। রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন সূচনায় এই সংগঠনের ভূমিকা ছিল উল্লেখযোগ্য।

(৪) অন্যান্য দল

ব্রিটিশ আমল থেকে পূর্ববাংলা কম্যুনিস্ট পার্টির সহযোগী সংগঠনরূপে 'রেল ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন', 'রেল কর্মচারী লীগ' প্রভৃতি কার্যকর ছিল। কম্যুনিস্ট পার্টির সহযোগী কৃষক সংগঠন হিসেবে 'কৃষক সভা' সিলেট, ময়মনসিংহ, রাজশাহী, যশোর, খুলনা প্রভৃতি এলাকায় কার্যকর ছিল।

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর পূর্ববাংলার মুখ্যমন্ত্রী খাজা নাজিমউদ্দীন-এর সরকার মুসলিম লীগ বিরোধী সকল দলকে দেশের সার্বভৌমত্বের প্রতি হুমকিস্বরূপ ষড়যন্ত্রকারীদের দলরূপে অভিহিত করে এবং সংগঠনসমূহের ওপর নানাভাবে হয়রানি করতে থাকেন। ফলে এসব দলের অগ্রযাত্রা ব্যাহত হয়।

(৫) মুসলিম লীগের অবক্ষয়

১৯৪৭ সালে দেশভাগের পর পাকিস্তান মুসলিম লীগের প্রথম কাউন্সিল অনুষ্ঠিত হয় ১৯৪৭- এর ডিসেম্বরে করাচীতে। উক্ত কাউন্সিল অধিবেশনে নিখিল ভারত মুসলিম লীগ বিভক্ত করে পাকিস্তান মুসলিম লীগ গঠনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। উক্ত কাউন্সিল

www.Educationblog24.Com

অধিবেশনে সোহরাওয়ার্দী মুসলিম লীগকে অসাম্প্রদায়িক দলে পরিণত করার প্রস্তাব দিলে তা নাকচ হয়ে যায়। পাকিস্তান মুসলিম লীগের গঠনতন্ত্র প্রণয়নের উদ্দেশ্যে প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খানকে আহ্বায়ক করে একটি কমিটি গঠন করা হয়। উক্ত কমিটি কর্তৃক প্রণীত গঠনতন্ত্র ১৯৪৮ সালের ফেব্রুয়ারিতে অনুষ্ঠিত কাউন্সিল অধিবেশনে অনুমোদিত হয়। নতুন গঠনতন্ত্র অনুযায়ী মন্ত্রীদের কোনো সাংগঠনিক কর্মকর্তার পদ গ্রহণ নিষিদ্ধ করা হয়। এই অধিবেশনে চৌধুরী খালিকুজ্জামানকে দলের আহ্বায়ক নিযুক্ত করা হয়। ১৯৪৯ সালের ২০ ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠিত ৩য় কাউন্সিল অধিবেশনে চৌধুরী খালিকুজ্জামান প্রথম সভাপতি নিযুক্ত হন। জিন্নাহর জীবদ্দশায় মুসলিম লীগ তার নিয়ন্ত্রণে ছিল। তার মৃত্যুর পর লিয়াকত আলী খান দলকে নিয়ন্ত্রণ করতে থাকেন।

এইভাবে পাকিস্তানের জন্মলগ্ন থেকে মুসলিম লীগ চলে যায় পশ্চিম পাকিস্তানী নেতাদের হাতে। তাদের কাউন্সিলের মোট ৪৬৫ জন সদস্যের মধ্যে পূর্ব পাকিস্তানের জন্য নির্ধারিত করা হয় মাত্র ১৮০ জন। উপরন্তু জিন্নাহর সময় মুসলিম লীগে নতুন সদস্য অন্তর্ভুক্ত করা স্থগিত রাখা হয়। এইভাবে দলীয় নেতৃবৃন্দ স্বেচ্ছাচারিতা দেখাতে থাকলে দলের প্রগতিশীল কর্মী-নেতাদের মধ্যে অসন্তুষ্টির সৃষ্টি হয়। দলের মধ্যে ক্ষোভের সঞ্চার হতে থাকে। এ সকল ক্ষোভ-অসন্তুষ্টি উপেক্ষা করে দলের নেতাদের স্বেচ্ছাচারিতা বেড়ে যায়। দলের গঠনতন্ত্র সংশোধন করে (১৯৫০ সালের ৮ অক্টোবর অনুষ্ঠিত কাউন্সিল অধিবেশনে) প্রধানমন্ত্রী পদাধিকার বলে দলের সভাপতি নিযুক্ত হবেন বলে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ফলে সভাপতির পদ প্রধানমন্ত্রীর হাতে চলে যায়। খাজা নাজিমউদ্দীন, বগুড়ার মোহাম্মদ আলী এরা সকলেই দলের সভাপতি ছিলেন। এতে দলে গণতন্ত্র চর্চা ব্যাহত হয়। দল সরকারকে নিয়ন্ত্রণ করবে– এর পরিবর্তে সরকারই দলকে নিয়ন্ত্রণ করতে থাকে। দল সরকারের অনুগ্রহের ওপর নির্ভরশীল হয়।

এমতাবস্থায় দলের ক্ষুব্ধ নেতা-কর্মীরা দল থেকে আলাদা হয়ে নতুন দল গঠন করে। পশ্চিম পাকিস্তানে মানকী শরিফের পীরের নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ (মে, ১৯৪৯) এবং পূর্ববাংলায় মওলানা ভাসানীর নেতৃত্বে আওয়ামী মুসলিম লীগ (২৩ জুন ১৯৪৯) গঠিত হয়। এইভাবে মুসলিম লীগের পতন সূচিত হয়। পূর্ববাংলায় মুসলিম লীগ দুর্বল হয়ে যায়। দলের এই দুর্বলতা স্পষ্ট হয় ১৯৪৯ সালের টাঙ্গাইলের উপনির্বাচনে। উক্ত উপনির্বাচনে মুসলিম লীগের প্রবীণ নেতা খুররম খান পন্নী বিপুল ভোটে পরাজিত হন আওয়ামী-মুসলিম লীগের তরুণ কর্মী সোহরাওয়ার্দী-হাশিম সমর্থিত শামসুল হকের নিকট। এই পরাজয়ে শাসকগোষ্ঠী এত বেশি আতঙ্কগ্রস্ত হন যে তারা পূর্ববাংলা প্রাদেশিক পরিষদের অন্য ৩৪টি আসনের উপনির্বাচন অনুষ্ঠিত করেননি এবং প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচন ১৯৫১ সালে অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা থাকলেও তারা তা ১৯৫৪ সাল পর্যন্ত ঠেকিয়ে রাখেন।

মুসলিম লীগের শাসকগোষ্ঠীর এই স্বৈরাচারী মনোভাব দলের মধ্যে এত বেশি ক্ষোভের সৃষ্টি করে যে, অনেক বিক্ষুব্ধ নেতা-কর্মী মুসলিম লীগ ত্যাগ করে আওয়ামী

www.Educationblog24.Com

মুসলিম লীগে যোগদান করেন। এইভাবে পুরাতন পরীক্ষিত কর্মীবৃন্দ দল ত্যাগ করায় দলের সাংগঠনিক কর্মকাণ্ড স্থবির হয়ে পড়ে। দলের মধ্যেও অন্তর্দ্বন্দ্ব শুরু হয়। নূরুল আমিন মুখ্যমন্ত্রী নিযুক্ত হওয়ার পর থেকে হামিদুল হক চৌধুরী একটি প্রতিদ্বন্দ্বী সমর্থক গোষ্ঠী তৈরি করেন। দলের অভ্যন্তরে কোন্দল এমন খারাপ পর্যায়ে পৌঁছে যে, পূর্ববঙ্গ মুসলিম লীগের সভাপতি মওলানা আকরাম খাঁ ১৯৫১ সালের জানুয়ারি মাসে পদত্যাগ করেন। ১৯৫১ সাল পর্যন্ত পূর্ববঙ্গ মুসলিম লীগের কোনো কাউন্সিল অনুষ্ঠিত হয়নি।

মওলানা আকরাম খাঁ পদত্যাগ করলে ১৯৫২ সালের ২৩ আগস্ট পূর্ববাংলা মুসলিম লীগের প্রথম কাউন্সিল অনুষ্ঠিত হয়। এই কাউন্সিল অধিবেশনে নূরুল আমিন পূর্ববাংলা মুসলিম লীগের সভাপতি নির্বাচিত হন। কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে তিনি পূর্ববাংলায় বিতর্কিত হওয়ায় তার পক্ষে মুসলিম লীগকে পূর্ববাংলায় শক্তিশালী করা সম্ভবপর হয়নি। ভাষা-আন্দোলনে মুসলিম লীগ জনপ্রিয়তা হারায়। এর প্রভাব পড়ে ১৯৫৪ সালের পূর্ববাংলা প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচনের সময়। ঐ নির্বাচনে মুসলিম লীগের ভরাডুবি ঘটে। নির্বাচনে শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয়ে মুসলিম লীগ পূর্ববাংলার রাজনীতি থেকে চিরবিদায় নেয়। নির্বাচনের পর নূরুল আমিন সভাপতির পদ থেকে পদত্যাগ করেন (৩-১-১৯৫৫)। তার দলীয় সহকর্মীরা তার বিরুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন করে যে তিনি প্রদেশে খাদ্য সরবরাহ ব্যবস্থা স্বাভাবিক রাখতে, বিহারি-মোহাজের পুনর্বাসন করতে এবং রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন নিয়ন্ত্রণ করতে ব্যর্থ হয়েছেন।

নূরুল আমিনের পদত্যাগের পরিপ্রেক্ষিতে পার্টির কাউন্সিল অধিবেশন বসে ১৩ ফেব্রুয়ারি ১৯৫৫। উক্ত অধিবেশনে পূর্ববাংলা প্রাদেশিক মুসলিম লীগে ধস নামে। নূরুল আমিনের সঙ্গে আরো পদত্যাগ করেন পার্টির সহ-সভাপতি খাজা হাবিবুল্লাহ, ট্রেজারার এম.এ. সলিম, যুগ্ম-সম্পাদক শাহ আজিজুর রহমান ও মঈনুদ্দীন চৌধুরী এবং প্রচার সম্পাদক সবুর খান। *দৈনিক সংবাদ*– যা এই দলের মুখপত্র হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছিল– তা এই দলের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে।

এদিকে কেন্দ্রেও মুসলিম লীগে কোন্দল দেখা দেয়। দ্বিতীয় গণপরিষদে সংখ্যাগরিষ্ঠতা হারিয়ে মুসলিম লীগ কৃষক-শ্রমিক পার্টির সঙ্গে কোয়ালিশন করতে বাধ্য হয়। এমনি পরিস্থিতিতে ১৯৫৬ সালের ২৮-২৯ জানুয়ারি পাকিস্তান মুসলিম লীগের কাউন্সিল অধিবেশনে আবদুর রব নিশতার সভাপতি নির্বাচিত হন। এ সময় পাঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রী ডা. খান সাহেবের সঙ্গে তার সংঘাত বাধে। এই সুযোগ গ্রহণ করেন প্রেসিডেন্ট ইসকান্দার মীর্জা। তিনি তার অনুগত একটি দল গঠনের অভিপ্রায়ে মুসলিম লীগ থেকে কিছু গণপরিষদ সদস্যদের নিয়ে গঠন করেন রিপাবলিকান পার্টি (মে, ১৯৫৬)। এইভাবে পশ্চিম পাকিস্তানে মুসলিম লীগ দ্বিধাবিভক্ত হয়। ২২ জন গণপরিষদ সদস্য মুসলিম লীগ থেকে রিপাবলিকাণ্ড পার্টিতে যোগ দেন। ফলে চৌধুরী মোহাম্মদ আলীর কোয়ালিশন মন্ত্রিসভাকে পদত্যাগ করতে হয় (১২ সেপ্টেম্বর, ১৯৫৬)। ১৯৪৭ সালের পর এই প্রথমবার মুসলিম লীগ কেন্দ্রীয় ক্ষমতা থেকে বিতাড়িত হয়। এরপর আই.আই. চুন্দ্রীগড়ের নেতৃত্বে মুসলিম লীগ আরেকবার মাত্র দুই মাসের জন্য

www.Educationblog24.com

পাকিস্তানে সরকার গঠন করতে সক্ষম হলেও ১৯৫৮ সাল পর্যন্ত এই দল আর ক্ষমতায় যেতে পারেনি।

সামরিক আইন চলাকালীন (১৯৫৮-৬২) সকল রাজনৈতিক দল নিষিদ্ধ ঘোষিত থাকে। ১৯৬২ সালে সামরিক আইন তুলে নেয়ার পর রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড শুরু হয়। আইয়ুব খান নিজেও একটা রাজনৈতিক দলের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন। তার অভিপ্রায় অনুযায়ী চৌধুরী খালিকুজ্জামান ১৯৬২ সালের ৪ সেপ্টেম্বর করাচীতে মুসলিম লীগের এক কনভেনশন আহ্বান করেন এবং কনভেনশন মুসলিম লীগ গঠন করেন। ১৯৬৩ সালে আইয়ুব খান কনভেনশন মুসলিম লীগের প্রেসিডেন্ট পদ গ্রহণ করেন। পূর্ব পাকিস্তানে ফজলুল কাদের চৌধুরী, সবুর খান, মোনেম খান কনভেনশন মুসলিম লীগে যোগদান করেন। কনভেনশন মুসলিম লীগে যোগদানের পুরস্কারস্বরূপ এরা প্রত্যেকে মন্ত্রিত্ব পেয়েছিলেন। মন্ত্রিত্ব ভোগ ছাড়াও ফজলুল কাদের চৌধুরী জাতীয় পরিষদের স্পিকার এবং মোনেম খান পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর হয়েছিলেন। কনভেনশন মুসলিম লীগে আইয়ুবের একান্ত আজ্ঞাবহ এবং অনুগতরাই সমবেত হয়েছিল। আইয়ুবকে খুশি রাখতেই এই দলের সদস্যরা সদা ব্যস্ত থাকতেন। ফলে সংগঠন হিসেবে কনভেনশন মুসলিম লীগ শক্তিশালী করার কোনো উদ্যোগ ছিল না। আইয়ুবও এই দলকে শক্তিশালী করতে চাননি। ১৯৬৫ সালের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের প্রাক্কালে ঘোষিত মেনিফেস্টোর শিরোনাম দিয়েছিলেন 'মাই মেনিফেস্টো' অর্থাৎ একটি দলের নয়, ব্যক্তি আইয়ুবের মেনিফেস্টো ছিল। কনভেনশন মুসলিম লীগ আইয়ুবের স্বেচ্ছাচারিতাকে সমর্থন দিয়েছে, প্রতিবাদ করেনি। আইয়ুব-বিরোধী আন্দোলনে এই দলের কোনো ভূমিকা ছিল না।

কনভেনশন মুসলিম লীগ গঠনের পর মুসলিম লীগের প্রাক্তন নেতারা গঠন করেছিলেন কাউন্সিল মুসলিম লীগ। ১৯৬২ সালের ২৭ নভেম্বর ঢাকায় আয়োজিত কাউন্সিলে এ দল গঠিত হয়। এর সভাপতি নিযুক্ত হন খাজা নাজিমউদ্দীন। তার মৃত্যুর পর (১৯৬৪) মিয়া মমতাজ দৌলতানা এর সভাপতি হন। এই দলটি মূলত পশ্চিম পাকিস্তানী নেতাদের নিয়ে গঠিত ছিল। পূর্ব পাকিস্তান এর নেতা ছিলেন খাজা খয়েরউদ্দিন। কাউন্সিল মুসলিম লীগ আইয়ুব বিরোধী আন্দোলনে অংশ নিয়েছিল। ১৯৬৫-এর প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে এই দল মিস. ফাতিমা জিন্নাহকে সমর্থন করেছিল। পিডিএম, 'ডাক' প্রভৃতি রাজনৈতিক জোট এই দলে যোগদান করেছিল। তবে ছয়দফাভিত্তিক স্বায়ত্তশাসনের প্রতি এই দলের সমর্থন ছিল না। পশ্চিম পাকিস্তানের স্বার্থ বিঘ্নিত হোক তা এই দল চায়নি। ১৯৭০-এর নির্বাচনে এই দল মাত্র একটি আসন লাভ করে। বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধে এই দল পাকিস্তানের সংহতি রক্ষার দোহাই দিয়ে মুক্তিযুদ্ধ-বিরোধী ভূমিকা পালন করে। এমনকি ১৯৭০ সালের ১০ এপ্রিল গঠিত 'শান্তি কমিটি'র আহ্বায়ক হয়েছিল কাউন্সিল মুসলিম লীগের পূর্ব পাকিস্তান প্রধান খাজা খয়েরউদ্দিন।

মুসলিম লীগ বিভক্তির সময় কাইয়ুমপন্থী নামক আরেকটি দলের সৃষ্টি হয়েছিল।

www.Educationblog24.Com

মুসলিম লীগের এই অংশ কাইয়ুমপন্থী মুসলিম লীগ নামে পরিচিত ছিল। এই দলটিও মুক্তিযুদ্ধ-বিরোধী ভূমিকা গ্রহণ করেছিল।

(৬) আওয়ামী মুসলিম লীগ (পরে আওয়ামী লীগ)-এর প্রতিষ্ঠা এবং বিকাশ

স্বাধীনতা প্রাপ্তির দুই বৎসরের মধ্যেই মুসলিম লীগের মধ্যে একটি সুবিধাভোগী শ্রেণী গড়ে উঠে। পূর্ব পাকিস্তানের প্রশাসনের গুরুত্বপূর্ণ পদসমূহে অবাঙালিরা নিয়োগপ্রাপ্ত হলে তারা নানান উপায়ে সুবিধা পেতে থাকে। মুসলিম লীগের মধ্যেও শাসকগোষ্ঠীর অনুগত একটি অংশ সকল সুযোগ সুবিধা ভোগ করতে থাকে। স্বভাবতই নাজিমউদ্দীন পন্থীদের বিরোধী একটা অংশের মধ্যে দারুণ ক্ষোভের সৃষ্টি হয়।

মুসলিম লীগের এই ক্ষুব্ধ অংশটুকু ১৯৪৮ সালের জানুয়ারি মাসে ঢাকার ১৫০নং মোগলটুলিতে এক সম্মেলনে মিলিত হয়ে 'ওয়ার্কার্স ক্যাম্প' নামে একটা গ্রুপ গঠন করে। ওয়ার্কার্স ক্যাম্প গ্রুপের সঙ্গে শীঘ্রই মুসলিম লীগ নেতাদের বিবাদ শুরু হয়। ওয়ার্কার্স ক্যাম্প গ্রুপ চেয়েছিল দলের সদস্য সংখ্যা বাড়াতে। দলের চাঁদা আদায়ের রসিদ বই ছিল তৎকালীন বঙ্গীয় মুসলিম লীগের সভাপতি মাওলানা আকরাম খাঁ-এর নিয়ন্ত্রণে। তিনি ওয়ার্কার্স ক্যাম্প গ্রুপকে রসিদ বই দিলেন না। তখন ক্যাম্প গ্রুপ কেন্দ্রীয় মুসলিম লীগ সভাপতি খালেকুজ্জামানের নিকট অভিযোগ উত্থাপন করেন। কিন্তু খালেকুজ্জামান আকরাম খাঁ-গংদের সিদ্ধান্তকেই সমর্থন জানালেন। এর প্রতিবাদে ওয়ার্কার্স ক্যাম্প গ্রুপ ১৯৪৯ সালের ২৩-২৪ জুন ঢাকাস্থ কে.এম. দাস লেনের বিখ্যাত রোজ গার্ডেনে সারা পূর্ববাংলা প্রাদেশিক মুসলিম লীগ কর্মী সদস্যদের এক সম্মেলন আহ্বান করে। এই সম্মেলনে পূর্ববাংলার প্রায় সব জেলা থেকে প্রতিনিধি উপস্থিত হয়। সম্মেলনের ঘটনা প্রসঙ্গে আবু আল সাঈদ লিখেছেন :

> বিভিন্ন সূত্র থেকে পাওয়া থেকে ধারণা করা যায়, তিনশ থেকে সাড়ে তিনশ প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন তাতে। এতে সভাপতিত্ব করে আতাউর রহমান খান। আবদুল হামিদ খান ভাসানী উদ্বোধনী ভাষণ পাঠ করেন। এ.কে. ফজলুল হক তখন পূর্ববাংলা সরকারের অধীনে এডভোকেট জেনারেল পদে অধিষ্ঠিত।
>
> এই সম্মেলন এমন এক সময় অনুষ্ঠিত হয় যখন পূর্ববাংলা মুসলিম লীগ সরকার প্রদেশের শাসন পরিচালনায় ব্যর্থতার নানা উদাহরণ সৃষ্টি করেছেন। আবু আল সাঈদ লিখেছেন :
>
> ১৯৪৯ সালের মে মাসের শুরু থেকেই পূর্ববঙ্গে খাদ্যাভাব চলছিল....ঢাকা শহরে পানির অভাব। ম্যালেরিয়ার প্রকোপ। নিত্যব্যবহার্য দ্রব্যমূল্যের আকাশচুম্বিতা, গ্রামে গ্রামে কৃষক বিদ্রোহ। কমিউনিস্টদের তৎপরতা...রাষ্ট্রভাষা নিয়ে বিতর্ক।...

এমন পরিস্থিতিতে সম্মেলনে 'আওয়ামী মুসলিম লীগ' নামক একটি রাজনৈতিক দল গঠনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী পার্টির প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি; আতাউর রহমান খান, আবদুস সালাম খান, সাখাওয়াত হোসেন, আলী আহম্মদ এবং আলী আমজাদ খান সহ-সভাপতি, শামসুল হক সাধারণ সম্পাদক এবং শেখ মুজিবুর রহমান, রফিকুল ইসলাম ও খন্দকার মুশতাক আহমেদ যুগ্ম-সম্পাদক

www.Educationblog24.com

www.Educationblog24.com

নির্বাচিত হন।২৫ নবগঠিত পার্টির উদ্দেশ্য ছিল পাকিস্তানকে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে পরিণত করা এবং দেশে সামাজিক ও অর্থনৈতিক সংস্কার সাধন করা। নবগঠিত পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগ ১২ দফা কর্মসূচী ঘোষণা করে। এর মধ্যে অন্যতম দাবি ছিল আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন, পূর্ববাংলা প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত করা, বাংলাভাষাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষারূপে স্বীকৃতি দেয়া, পাটশিল্পকে জাতীয়করণ করা এবং ক্ষতিপূরণ প্রদান না করে জমিদারি ব্যবস্থাকে বিলুপ্ত করা।২৬

প্রতিষ্ঠার সময় থেকে পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগ পূর্ব পাকিস্তানে বিরোধীদলের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়।

প্রতিষ্ঠার সময় আওয়ামী মুসলিম লীগের মধ্যেও রক্ষণশীল ও প্রগতিশীল-এই দুই ধারার রাজনীতিবিদ ছিলেন। প্রথম অংশ মুসলিম লীগের ন্যায় গতানুগতিক ধারার রাজনীতি করার পক্ষপাতী ছিলেন। প্রগতিশীল অংশ সামন্তবাদ-সাম্রাজ্যবাদ, পুঁজিবাদ বিরোধী গণতান্ত্রিক রাজনীতিতে দল গঠনের প্রয়াসী ছিলেন। এরা পার্টির নাম থেকে 'মুসলিম' শব্দটি বাদ দিয়ে পার্টিকে ধর্মনিরপেক্ষ করার পক্ষপাতী ছিল। কিন্তু রক্ষণশীল অংশের মনমানসিকতা থেকে সাম্প্রদায়িক চেতনার অবসান না-ঘটায় তারা 'মুসলিম' শব্দ বাদ দেয়ার বিরোধী ছিলেন। তাই পার্টির একতা বজায় রাখতে মওলানা ভাসানী 'মুসলিম' শব্দ রেখেই পার্টির নামকরণ করে। তাছাড়া মুসলিম লীগের বিরুদ্ধে জনগণকে উদ্বুদ্ধ করতে মুসলিম শব্দযুক্ত বিরোধীদলের প্রয়োজনীয়তা তখন ছিল। পার্টি গঠনের সময় সোহরাওয়ার্দী এর সঙ্গে যুক্ত ছিলেন না। তিনি পশ্চিম পাকিস্তানের করাচীতে বসতি করে আইন ব্যবসা ও জিন্নাহ আওয়ামী লীগ নামে একটি দল সংগঠিত করেছিলেন। পূর্ব পাকিস্তানে আওয়ামী-মুসলিম লীগ গঠিত হলে সোহরাওয়ার্দী জিন্নাহ-আওয়ামী লীগকে এর সঙ্গে সংযুক্ত করে পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগ গঠন করে দলটিকে জাতীয়রূপ দান করেন এবং তিনি কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব গ্রহণ করেন।

পাকিস্তান আওয়ামী লীগ গঠনের এক বছরের মধ্যেই পার্টি পাকিস্তান গণপরিষদে উত্থাপিত মূলনীতি কমিটির রিপোর্টের বিরোধিতা করে এক আন্দোলন গড়ে তোলে। এই আন্দোলনের ফলে মূলনীতি কমিটির রিপোর্ট গণপরিষদ থেকে প্রত্যাহৃত হয়। এইভাবে প্রতিষ্ঠার সূচনাতেই আওয়ামী মুসলিম লীগ একটি আন্দোলনমুখী দলে পরিণত হয়। ১৯৫২ সালের ৩০ জানুয়ারিতে যে সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ গঠিত হয়েছিল তার সভাপতি ছিলেন আওয়ামী মুসলিম লীগ এবং (মুসলিম) ছাত্রলীগ বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখে। ১৯৫৪ সালের প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচনে ক্ষমতাসীন মুসলিম লীগ উদ্যোগী ভূমিকা রাখে এবং নির্বাচনে মুসলিম লীগ সরকারকে পরাজিত করে ক্ষমতা থেকে এবং বাংলার রাজনীতি থেকে মুসলিম লীগকে নির্বাসিত করে।

১৯৫৫ সালের ২২ সেপ্টেম্বর অনুষ্ঠিত পার্টির কাউন্সিল মিটিংয়ে পার্টিকে একটি ধর্মনিরপেক্ষ দলে রূপান্তরিত করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। সে অনুসারে 'মুসলিম' শব্দটি বাদ দেয়া হয় এবং পার্টির নাম হয় আওয়ামী লীগ। তখন থেকে এই দলটি ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে আপামর জনসাধারণের একটি গণসংগঠনে পরিণত হয়।

www.Educationblog24.com

পূর্ব পাকিস্তানে ন্যাশনাল কংগ্রেস এবং হিন্দু তফশিলি সম্প্রদায়ের রাজনৈতিক দলগুলি বিকাশ লাভের সুযোগ না-পাওয়ায় তারা অনেকে আওয়ামী লীগে যোগদান করেন। ফলে এই দল পূর্ব পাকিস্তানের সর্বত্র বিস্তার লাভ করে। পূর্ব পাকিস্তানে মুসলিম লীগের পতন এবং আইয়ুবের আমলে এখানে তার দল– কনভেনশন মুসলিম লীগ শক্তিশালী হতে না-পারায় আওয়ামী লীগ একক বৃহত্তম এবং শক্তিশালী দল হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে।

বাঙালিরা জন্মগতভাবে অসাম্প্রদায়িক এবং উদার মতাবলম্বী হওয়ায় এখানে ইসলাম ধর্মাবলম্বী দলগুলো যেমন জনপ্রিয়তা অর্জন করতে পারেনি, তেমনি বামপন্থী দলগুলো বৃহত্তম জনগোষ্ঠীর গ্রহণযোগ্যতা অর্জন করতে পারেনি। ১৯৬০-এর দশকে মওলানা ভাসানী আইয়ুব-বিরোধী বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখতে ব্যর্থ হওয়ায় এবং বামপন্থী রাজনীতিকে প্রশ্রয় দেয়ায় তিনি ন্যাপকে শক্তিশালী করতে ব্যর্থ হন। উপরন্তু ন্যাপের ভাঙনের (মোজাফফর ন্যাপ অর্থাৎ মস্কোপন্থী ন্যাপ এবং ভাসানী ন্যাপ অর্থাৎ চীনাপন্থী ন্যাপ) ফলে লাভবান হয় আওয়ামী লীগ। এর প্রমাণ ১৯৭০-এর নির্বাচনে আওয়ামী লীগ জাতীয় পরিষদে ১৬২টি সাধারণ আসনের মধ্যে ১৬০টিই দখল করে। ঐতিহাসিক সত্য হচ্ছে যে, আইয়ুব-বিরোধী আন্দোলন, ছয়দফা আন্দোলন, উনসত্তরের গণআন্দোলন– ইত্যাদি সবক্ষেত্রেই আওয়ামী লীগই নেতৃত্ব দেয়। শেখ মুজিবুরের নেতৃত্বেই এই দল ১৯৭০-এর নির্বাচনে জয়লাভ করে এবং ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধে নেতৃত্ব দিয়ে স্বাধীনতা অর্জন করে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা করে।

সাংগঠনিকভাবে এই দলকে অনেক সংকট মোকাবিলা করতে হয়েছে। অনেক প্রবীণ নেতা এই দল ত্যাগ করে নতুন দল গঠন করেছেন। যেমন মওলানা ভাসানী আওয়ামী লীগ থেকে বের হয়ে ন্যাপ গঠন করেছেন। আতাউর রহমান খান গঠন করেছেন ন্যাশনাল লীগ। তারা অনেক নেতা-কর্মীকে আওয়ামী লীগ থেকে সঙ্গে নিয়ে গেছেন। কিন্তু আওয়ামী লীগ এতে বিন্দুমাত্র ক্ষতিগ্রস্ত হয়নি। বরং নানান আন্দোলনের পথ পাড়ি দিয়ে এই দল দিন দিন শক্তিশালী হয়েছে এবং পূর্ব পাকিস্তানে একক বৃহত্তম দলে পরিণত হয়েছে। মওলানা ভাসানী, আতাউর রহমান খান প্রমুখ প্রবীণ নেতারা দল থেকে বের হয়ে যাওয়ার কারণে শেখ মুজিবের উত্থান সহজ হয়েছে। তিনি সঠিক সময়ে সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে সক্ষম হয়েছেন। বাঙালি জাতির স্বাধিকার আন্দোলনে সঠিক নেতৃত্ব দান এবং সময়োপযোগী দিকনির্দেশনা দেওয়ার কারণে তিনি বাঙালি জাতির অবিসংবাদিত নেতায় পরিণত হয়েছেন। গণভিত্তি থাকায় এবং তৃণমূল পর্যায় পর্যন্ত জনসমর্থন অর্জন করতে সক্ষম হওয়ায় আওয়ামী লীগ তার জন্মের ষাট বৎসর পরেও আজ দেশের সর্ববৃহৎ দল হিসেবে টিকে আছে।

(৭) কমিউনিস্ট পার্টি, যুবলীগ, গণতন্ত্রী দল, ন্যাপ ইত্যাদি

ভারত বিভক্তির পর ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টিও বিভক্ত হয় এবং ১৯৪৮ সালের ৬ মার্চ পাকিস্তান কমিউনিস্ট পার্টির শাখা হিসেবে 'পূর্ববাংলা কমিউনিস্ট পার্টি' গঠিত হয়। পাকিস্তান কমিউনিস্ট পার্টির সদর দফতর পশ্চিম পাকিস্তানে অবস্থিত ছিল। কেন্দ্রীয়

www.Educationblog24.Com

কমিটির সাথে পূর্ব পাকিস্তান শাখার যোগাযোগ ছিল ক্ষীণ। স্বভাবতই পূর্ব পাকিস্তান কমিউনিস্ট পার্টি স্বাধীনভাবে সাংগঠনিক কাজ করতে থাকে। এ সময় কমিউনিস্ট পার্টি সশস্ত্র সংগ্রামের লাইন, যা 'বি.টি. রনদীভে' লাইন নামে খ্যাত, অনুসরণ করছিল। তখন এই পার্টির নেতৃত্বে চলছিল তেভাগা আন্দোলন নাচোল ও হাজং এর কৃষক আন্দোলন। পূর্ববাংলার সরকার এসব আন্দোলন দমন করতে ব্যাপক হিংসাত্মক কর্মপন্থা গ্রহণ করে। পূর্ববাংলার হাজার হাজার কম্যুনিস্ট নেতা-কর্মীকে কারারুদ্ধ করা হয়। কারাগারেও এসব বন্দির উপর চালানো হয় চরম নির্যাতন। এমনকি ১৯৫০ সালের ২৪ এপ্রিল রাজশাহী জেলার খাপড়া ওয়ার্ডে পুলিশের বেপরোয়া গুলিবর্ষণে সাতজন কমিউনিস্ট বন্দি নিহত হন। পূর্ববাংলার কমিউনিস্ট পার্টির নেতা-কর্মীদের উপর সরকারি নির্যাতনের মুখে পার্টির প্রকাশ্য তৎপরতা বন্ধ হয়। এ সব পার্টির অসংখ্য হিন্দুকর্মী দেশ ত্যাগ করে ভারতে চলে যান। এমতাবস্থায় পূর্ববাংলায় অবস্থানরত কমিউনিস্ট তথা বামপন্থীরা অন্য দলের মধ্যে ঢুকে পার্টির আদর্শ বাস্তবায়িত করার পরিকল্পনা গ্রহণ করে। কমিউনিস্ট মনোভাবাপন্ন অনেক মুসলমান নেতা-কর্মী পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগে যোগদান করেন। এমনকি তারা আওয়ামী মুসলিম লীগের কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটিতে জায়গা করে নিতে সমর্থ হন। তালুকদার মনিরুজ্জামানের মতে, পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগের কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটিতে ৩৭ জনের মধ্যে ৯ জন ছিলেন কমিউনিস্ট। কিন্তু ১৯৫৫ পর্যন্ত আওয়ামী মুসলিম লীগের নামে 'মুসলিম' শব্দ থাকায় সেখানে অমুসলমানদের অনুপ্রবেশ সম্ভব ছিল না। এমতাবস্থায় কমিউনিস্ট নেতাদের উদ্যোগে ১৯৫১ সালের মার্চ মাসে 'পূর্ব পাকিস্তান যুবলীগ' নামক একটি সংগঠন প্রতিষ্ঠা করা হয়। এই দলের সভাপতি ছিলেন মাহমুদ আলী ও সেক্রেটারি অলি আহমদ। ধর্মনিরপেক্ষতা, সাম্রাজ্যবাদ বিরোধিতা, সামন্তবাদ বিরোধিতা, বিশ্বশান্তি, গণতন্ত্র, সকলের জন্য চাকুরির সুযোগ প্রভৃতি ছিল এই দলের মূলমন্ত্র। যুবলীগ ১৪ দফা ঘোষণা ও দাবিনামা ঘোষণা করে। উক্ত ঘোষণা ও দাবিগুলো ছিল নিম্নরূপ :

১. আমরা যুদ্ধ চাই না। দুনিয়ার যুবসমাজ আজ যুদ্ধের বিরুদ্ধে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা ঘোষণা করিতেছে। তাহাদের সঙ্গে কণ্ঠ মিলাইয়া আমরাও ঘোষণা করিতেছি যে, আমরা সাম্রাজ্যবাদীদের যুদ্ধপ্রচেষ্টা ব্যর্থ করিব। সাম্রাজ্যবাদীদের যুদ্ধের কামানের খোরাক হইবো না। আমরা দাবি করিতেছি যে আমাদের সরকার যুদ্ধবাদীদের বিরুদ্ধে দাঁড়াক।

এ কথাও আমরা ঘোষণা করিতে চাই– এটম অস্ত্র হইতেছে আক্রমণের অস্ত্র, মানুষকে ব্যাপকভাবে নিশ্চিহ্ন করার অস্ত্র। তাই আমরা দাবি করিতেছি এটম অস্ত্রকে বিনাশর্তে অবৈধ ঘোষণা করা হউক এবং এই নিষেধাজ্ঞা কার্যকরী করার জন্য তারপর কঠোর আন্তর্জাতিক নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করা হোক।

যে সরকার প্রথম কোনো দেশের বিরুদ্ধে এটম অস্ত্র ব্যবহার করিবে, সেই সরকার মানবজাতির শত্রুতা করিবে। আমরা তাহাকে যুদ্ধ-অপরাধে অপরাধী মনে করিব।

www.Educationblog24.com

আজ আমরা ইহাও লক্ষ্য করিতেছি যে, দুনিয়ার কতিকয়েক রাষ্ট্র এশিয়া, আফ্রিকার বিভিন্ন দেশের কোটি কোটি মানুষকে দাসত্ব-শৃঙ্খলে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে এবং ঔপনিবেশিক দেশগুলির আজাদীর আন্দোলনে ভীত সাম্রাজ্যবাদী দস্যুরা মারমুখো হইয়া ঐসব দেশে রক্তের স্রোত বহাইয়া দিতেছে। আমরা এই সাম্রাজ্যবাদী আক্রমণ ও নৃশংসতার বিরুদ্ধে দৃঢ় আওয়াজ তুলিতে চাই এবং আজাদী সংগ্রামে নিযুক্ত আমাদের কোটি কোটি ভাই-বোনদের অভিনন্দন ও অকুণ্ঠ সমর্থন জানাই।

২. আমরা চাই পাকিস্তান ব্রিটিশ কমনওয়েলথ ত্যাগ করুক এবং পাকিস্তানে স্বাধীন গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র কায়েম হউক, যাহাতে প্রত্যেকটি ভাষাভাষী প্রদেশ পূর্ণ আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার ভোগ করিবে, প্রত্যেকটি উপজাতি পাইবে কৃষ্টির স্বাধীনতা ও স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন, জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে প্রত্যেকটি নাগরিক ভোগ করিবে সমান নাগরিক অধিকার এবং আরবি হরফহীন বাংলা হইবে রাষ্ট্রভাষা।

৩. আমরা চাই বেকারীর অবসান এবং জাতিধর্ম নির্বিশেষে প্রত্যেক যুবক-যুবতীর চাকুরি ও সৎভাবে জীবিকার্জনের নিশ্চয়তা, বেকারদের জন্য সরকারি ভাতা।

৪. আমরা চাই প্রাপ্তবয়স্কদের সার্বজনীন ভোটাধিকার ও যুক্ত নির্বাচন।

৫. আমরা চাই দেশের নিরক্ষরতা দূরীকরণ, শিক্ষার উন্নতি, যুদ্ধ খাতে ব্যয় কমাইয়া শিক্ষার জন্য বর্ধিত হারে ব্যয়বরাদ্দ, বাধ্যতামূলক অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষা, প্রয়োজন অনুসারে মেয়েদের জন্য শিক্ষার বিশেষ ব্যবস্থা ও প্রাপ্তবয়স্ক অশিক্ষিত যুব সমাজের জন্য শিক্ষার বিশেষ ব্যবস্থা, স্কুল-কলেজের উন্নতি, ছাত্রছাত্রীদের আবাসস্থল বৃদ্ধি ও ছাত্র-বেতন হ্রাস।

৬. আমরা চাই যুব সমাজের নৈতিক ও সাংস্কৃতিক উন্নতির জন্য শহরে ও গ্রামে সরকার কর্তৃক প্রচুর পরিমাণে পাঠাগার, ক্লাব ও খেলাধুলার ব্যবস্থা এবং বর্তমানে যে-সমস্ত পাঠাগার ও ক্লাব আছে সেগুলিতে সরকারি সাহায্য, মেয়েদের জন্য বিশেষ পাঠাগার ও ক্লাবের ব্যবস্থা।

৭. আমরা চাই জনসাধারণের স্বাস্থ্যের উন্নতির জন্য সরকার কর্তৃক প্রভূত পরিমাণে ব্যয়বরাদ্দ। শহরে ও গ্রামে প্রচুর চিকিৎসালয় ও ব্যায়ামাগার স্থাপন।

৮. আমরা চাই বিনা খেসারতে জমিদারি, জায়গিরদারি প্রথার উচ্ছেদ ও কৃষকের হাতে জমি।

৯. আমরা চাই শ্রমিকের জীবন ধারণের উপযোগী মজুরি, দৈনিক ৮ ঘণ্টা হিসেবে সপ্তাহে ৪৪ ঘণ্টা কাজের সময় নির্ধারণ। শ্রমিক-যুবকদের জন্য খেলাধুলা, পাঠাগার ও ক্লাবের ব্যবস্থা।

১০. আমরা চাই সমস্ত বিদেশী মূলধন বাজেয়াপ্তকরণ, বড় বড় শিল্পগুলির জাতীয়করণ।

১১. আমরা চাই যুবসমাজের জন্য সামরিক শিক্ষাব্যবস্থা ও অস্ত্র বহন করিবার অধিকার।

১২. আমরা চাই সমস্ত দাসত্বমূলক আইনের প্রত্যাহার, বিনাবিচারে আটক রাখার কানুন নাকচ, সমস্ত রাজনৈতিক বন্দিদের মুক্তি, সমাজের প্রত্যেকটি শ্রেণীর-শ্রমিকের, কৃষকের, মধ্যবিত্তের, ছাত্রদের, মেয়েদের, চাকুরেদের নিজ নিজ

www.Educationblog24.com

www.Educationblog24.com

সংগঠন গড়ার– সভাসমিতি করার ও মত প্রকাশের পূর্ণ ও অবাধ অধিকার। প্রত্যেকটি দলের নিজ মতানুযায়ী কাজ ও মত প্রকাশ করিবার বৈধ অধিকার।

১৩. আমরা চাই দেশের প্রত্যেকের নিজ নিজ ধর্ম পালন করার পূর্ণ অধিকার, সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ধর্ম ও অন্যান্য অধিকার রক্ষার পরিপূর্ণ ব্যবস্থা।

১৪. আমরা চাই সকল প্রকার প্রাদেশিকতা ও সাম্প্রদায়িকতার অবসান।'

সূত্র : *স্বাধীনতার দলিলপত্র*, প্রথম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১২-২১৩।

১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনে যুবলীগের বলিষ্ঠ ভূমিকা ছিল। বলা যায় যে, ভাষা আন্দোলন পরিচালনার নেতৃত্বও ছিল যুবলীগের নেতাদের হাতে। ফলে এই দলের অনেক নেতা-কর্মী জেল-জুলুমের মুখোমুখি হয়। অনেকে গ্রেফতার হন। আবার কেউ কেউ গোপনে চলে যান। ফলে যুবলীগে নামে কাজ করা অনেকের পক্ষে অসম্ভব হয়। এমতাবস্থায় কমিউনিস্ট পার্টির উদ্যোগে ১৯৫২ সালের এপ্রিলে 'পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন' নামের ছাত্রফ্রন্ট এবং ৩১ ডিসেম্বর 'গণতন্ত্রী দল' (Democratic Dal) নামের রাজনৈতিক দল গঠিত হয়। হাজী মোহাম্মদ দানেশ গণতন্ত্রী দলের সভাপতি ও মাহমুদ আলী এর সাধারণ সম্পাদক নিযুক্ত হন। গণতান্ত্রিক দল গঠনের উদ্দেশ্য ছিল যেসব কমিউনিস্ট পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের অন্তর্ভুক্ত হয়ে কাজ করতে অনাগ্রহী ছিলেন কিংবা হিন্দু হওয়ার কারণে যাদের পক্ষে আওয়ামী মুসলিম লীগের সদস্যপদ লাভ সম্ভব ছিল না তাদেরকে সম্পৃক্ত করা। এই দলের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ছিল:

The destruction of imperialism and feudalism and agent (the Muslim League). the confiscation of all foreign capital investments in Pakistan, the nationalization of foreign banks and insurance companies, the abolition of the Zamindary System without compensation. and the distribution of excess land to the landless peasants.

১৯৪৫ সালের জাতীয় পরিষদের নির্বাচনে কমিউনিস্টরা সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে। কমিউনিস্ট সদস্যগণ যুক্তফ্রন্ট (আওয়ামী মুসলিম লীগ নামে) এবং হিন্দু-সদস্যরা সংখ্যালঘু যুক্তফ্রন্ট, তপশিলি ফেডারেশন এবং গণতন্ত্রী দল থেকে নির্বাচনে অংশ নেন।

নির্বাচনে কমিউনিস্ট পার্টির চারজন সদস্য– পুর্ণেন্দু দস্তিদার, সুধাংশু বিমল দত্ত, বরুণ রায় ও অজয় বর্মণ সরাসরি প্রার্থী হিসেবে জয়লাভ করে। অন্যান্য দলের ছত্রচ্ছায়ায় যেসব কমিউনিস্ট পার্টি সদস্য নির্বাচিত হন তাদের মধ্যে ছিলেন মোঃ তোয়াহা, হাজী মোঃ দানেশ, সেলিনা বানু, মাহমুদ আলী, অধ্যাপক মোজাফফর আহমদ, মহিউদ্দিন আহমদ, আতাউর রহমান, সরদার ফজলুল করিম প্রমুখ।

নির্বাচনের পর আওয়ামী মুসলিম লীগ ১৯৫৫ সালে কাউন্সিল অধিবেশনে দলের নাম থেকে 'মুসলিম' শব্দটি বাদ দিয়ে দলের সদস্যপদ সকল সম্প্রদায়ের জন্য উন্মুক্ত করলে অনেক কমিউনিস্ট সদস্য আওয়ামী লীগে ঢুকে যান। কমিউনিস্ট পার্টি তার প্রকাশ্য দল পূর্ব পাকিস্তান গণতন্ত্রী দল ভেঙে দেয়। ফলে এই দলের অনেক নেতা-কর্মী আওয়ামী লীগে যোগ দেন। আওয়ামী লীগে কমিউনিস্টদের অনুপ্রবেশ বিষয়ে

www.Educationblog24.com

আওয়ামী লীগের আনুষ্ঠানিক সমর্থন ছিল না। এ বিষয়ে কোনো চুক্তি ও আনুষ্ঠানিক আলোচনা দুই দলের মধ্যে হয়নি। আওয়ামী লীগের কমিউনিস্টদের অনুপ্রবেশ ছিল 'একতরফা ও গোপনীয়'। আওয়ামী লীগে ঢুকে কমিউনিস্টরা মওলানা ভাসানীকে কেন্দ্র করে দলের মধ্যে একটি গ্রুপ সৃষ্টি করতে থাকে। এই গ্রুপ বিলুপ্ত-ঘোষিত গণতন্ত্রী দল এবং গণতান্ত্রিক যুবলীগের আদর্শ ও উদ্দেশ্য আওয়ামী লীগকে দিয়ে বাস্তবায়নের চেষ্টা করতে থাকে।

পাকিস্তান সরকার ১৯৫৫ সালের জুলাই মাসে কমিউনিস্ট পার্টিকে দ্বিতীয়বারের মতো নিষিদ্ধ ঘোষণা করে (প্রথমবার নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়েছিল ২৩ জুলাই ১৯৫৪)। তখন এই দল আন্ডারগ্রাউন্ডে চলে যায়। তাছাড়া পশ্চিম পাকিস্তানে অবস্থিত পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সঙ্গেও যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। ফলে পূর্ব পাকিস্তান কমিটি কেন্দ্রীয় কমিটির নিয়ন্ত্রণমুক্ত হয়ে স্বাধীনভাবে কাজ শুরু করে। ১৯৫৬ সালে কলিকাতায় গোপনভাবে অনুষ্ঠিত পাকিস্তান কমিউনিস্ট পার্টির তৃতীয়-কংগ্রেস পূর্ব পাকিস্তান কমিটি স্বাধীনভাবে কাজ করার অনুমতি পায়। এ সময় পূর্ব পাকিস্তান কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সম্পাদক নিযুক্ত হন মণি সিংহ। সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য হিসেবে ছিলেন মণি সিংহ, খোকা রায়ে নেপাল নাগ, বারীন দত্ত ও অনিল মুখার্জী। সদস্য হিসেবে নির্বাচিত হন শহীদুল্লাহ কায়সার, সুখেন্দু দস্তিদার, মোহাম্মদ তোয়াহা, আমজাদ হোসেন ও কুমার মৈত্র।

(৮) ন্যাপ গঠন

১৯৫৬ সালের ১২ সেপ্টেম্বর সোহরাওয়ার্দী কেন্দ্রে মন্ত্রিসভা গঠন করেন। তখন থেকেই আওয়ামী লীগের দুই নেতা সোহরাওয়ার্দী ও মওলানা ভাসানীর মধ্যে পাকিস্তানের পররাষ্ট্রনীতি বিষয়ে মতভেদ দেখা দেয়। ১৯৫৪ সালে পাকিস্তান সিয়াটো (সাউথ-ইস্ট-এশিয়া ট্রিটি অরগানাইজেশনস) এবং ১৯৫৫ সালে সেন্ট্রো (সেন্ট্রাল ট্রিটি অরগানাইজেশনস) নামক দুটি সামরিক চুক্তিতে স্বাক্ষর করে। প্রথম চুক্তিভুক্ত দেশগুলি ছিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন, অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড, থাইল্যান্ড, ফিলিপাইন এবং পাকিস্তান। দ্বিতীয় চুক্তিভুক্ত দেশগুলি পাকিস্তান, ইরান ও তুরস্ক। এই চুক্তি স্বাক্ষরের উদ্দেশ্য ছিল সোভিয়েত ও চীনের চারদিকে মার্কিন-পক্ষের শক্তিবলয় সৃষ্টি করা। কমিউনিস্টরা এইসব সামরিক চুক্তির সমালোচনা করতে থাকে। তারা মওলানা ভাসানীকে তাদের দলে টানতে সক্ষম হন। এই গ্রুপ এমন একসময় শক্তিশালী হয় যখন সোহরাওয়ার্দী কেন্দ্রে সরকার গঠন করেছেন। মার্কিনঘেঁষা সোহরাওয়ার্দী উপরিউক্ত চুক্তিদ্বয়ের সমর্থক ছিলেন। সোহরাওয়ার্দী পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্বভার গ্রহণ করলে ভাসানী তাকে পাকিস্তানকে সকল সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধজোটের বাইরে এনে আওয়ামী লীগের মেনিফেস্টো অনুযায়ী স্বাধীন ও নিরপেক্ষ বৈদেশিক নীতি অনুসরণ, পশ্চিম পাকিস্তানের এক ইউনিট ভেঙে দিয়ে স্বায়ত্তশাসনের ভিত্তিতে সাবেক প্রদেশসমূহ পুনর্গঠন এবং ঐতিহাসিক লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে দেশরক্ষা, পররাষ্ট্রনীতি ও মুদ্রাব্যবস্থা কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে রেখে পূর্ব পাকিস্তানকে পূর্ণ আঞ্চলিক

www.Educationblog24.com

স্বায়ত্তশাসন দেয়ার জন্য আহ্বান জানান। কিন্তু সোহরাওয়ার্দী মার্কিনঘেঁষা নীতিতে অবিচল থাকলে ভাসানী ক্ষুব্ধ হন। পার্টিতেও এর প্রভাব পড়ে। আওয়ামী লীগের মধ্যে গা ঢাকা দিয়ে থাকা কমিউনিস্টরা সক্রিয় হয়ে উঠে। তারা ১৯৫৭ সালের ৭ ও ৮ ফেব্রুয়ারি কাগমারীতে অনুষ্ঠিত পার্টির কাউন্সিল অধিবেশনে মার্কিনঘেঁষা পররাষ্ট্রনীতি বিরোধী প্রস্তাব পাস করাতে ব্যর্থ হলে আওয়ামী লীগে ভাঙন সৃষ্টি করে। পার্টি সভাপতি মওলানা ভাসানীসহ নির্বাহী কমিটির নয়জন সদস্য পার্টি থেকে পদত্যাগ করেন। পদত্যাগকারীগণ ১৯৫৭ সালের ২৫ জুলাই ঢাকায় এক মহাসম্মেলন আয়োজন করে। সেখানে আওয়ামী লীগভুক্ত বামপন্থী নেতৃবৃন্দ, লুপ্ত হয়ে যাওয়া গণতন্ত্রীদলের সদস্যরা এবং এমনকি পশ্চিম পাকিস্তানের অনেক কমিউনিস্ট নেতা যোগ দেন। এই সম্মেলনে ন্যাপ (ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি) নামক একটি নতুন পার্টির জন্ম হয়। মওলানা ভাসানী কেন্দ্রীয় ন্যাপ এবং পূর্ব পাকিস্তান শাখার সভাপতি নির্বাচিত হন। নবগঠিত ন্যাপের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ছিল:

১. পাকিস্তানকে সাম্প্রদায়িক, প্রাদেশিকতা, সাম্রাজ্যবাদ ও শোষণমুক্ত একটি শক্তিশালী জাতিতে সংগঠিত করণ;

২. জনসাধারণের অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতি সাধন;

৩. নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতিতে দেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা ও দেশের উভয় অংশের স্বায়ত্তশাসন কায়েম করার উদ্দেশ্যে দেশের সমস্ত গণতান্ত্রিক শক্তিকে ঐক্যবদ্ধ করা...

ন্যাপ গঠিত হলে বেআইনি ঘোষিত কমিউনিস্ট পার্টির অনেক নেতা-কর্মী এই দলে যোগদান করেন। ফলে এই দলের শক্তি অনেক বেড়ে যায়। পরবর্তী এক দশকের মধ্যে পূর্ব পাকিস্তান কমিউনিস্ট পার্টির অনেক নেতা ন্যাপের নেতৃত্ব পদে আসীন হন। ন্যাপ পূর্ব পাকিস্তানে জনসমর্থন অর্জন করতেও সক্ষম হয়। ন্যাপ তার অঙ্গ সংগঠনরূপে পূর্ব পাকিস্তান কৃষক সমিতি গঠন করে (ডিসেম্বর, ১৯৫৭)। আবদুল হক এর সভাপতি নির্বাচিত হন। এরপর কমিউনিস্ট ও ন্যাপ নেতাদের উদ্যোগে গঠিত হয় পূর্ব পাকিস্তান মজদুর ফেডারেশন (১৯৫৮, ফেব্রুয়ারি)। মোহাম্মদ তোয়াহা এর সভাপতি নির্বাচিত হন।

পূর্ব পাকিস্তান কমিউনিস্ট পার্টি ও পূর্ব পাকিস্তান ন্যাপের বিভক্তিকরণ

১৯৫৮ সালে সামরিক আইন জারি হলে সকল রাজনৈতিক দল ও রাজনৈতিক কর্মতৎপরতা নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়। রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দকে গ্রেফতার করা হয়। মওলানা ভাসানী গ্রেফতার হন। অনেকের নামে হুলিয়া জারি করা হয়। যে সকল কমিউনিস্ট নেতা-কর্মী ধরা পড়েননি তারা আন্ডারগ্রাউন্ডে চলে যান। ১৯৬২ সাল পর্যন্ত রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড নিষিদ্ধ থাকে। ১৯৬২ সালে সামরিক আইন তুলে নেয়া হলে দেশে পুনরায় রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড শুরু হয়। কিন্তু ইতোমধ্যে আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট শিবিরে বিভেদ ঘটে যায়, যার প্রভাব এদেশের কমিউনিস্ট পার্টিতেও পড়ে। সোভিয়েত ইউনিয়নের ২০তম কংগ্রেসে গৃহীত প্রস্তাবাবলি, ১৯৬২ সালের ভারত-চীন যুদ্ধে পাকিস্তানের চীনকে সমর্থন দেয়ার নীতি কমিউনিস্টদেরকে চীনাপন্থী ও সোভিয়েতপন্থী দুই ধারায় বিভক্ত করে। এর প্রভাব পড়ে ১৯৬৫ সালের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে। এই

www.Educationblog24.Com

নির্বাচনে বিরোধী দলগুলি মিস ফাতিমা জিন্নাহকে সমর্থন দিলে ভাসানী এবং তাঁর দল (আইয়ুব খানের সরকার চীনা সরকারের মিত্র হওয়ায়) নির্বাচনে ফাতিমা জিন্নাহকে সমর্থন দেয়নি। কমিউনিস্ট পার্টি ও ন্যাপের মধ্যে সৃষ্ট মতাদর্শ বিরোধ পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়নকে প্রভাবান্বিত করে। এসময় ছাত্র ইউনিয়ন নেতা কাজী জাফর আহমদ, হায়দার আকবর খান রানো প্রমুখ নেতৃবর্গ কমিউনিস্ট পার্টির চীনাপন্থী নেতা মোহাম্মদ তোয়াহা প্রমুখের লাইন অনুসরণ করেন। অবশেষে ১৯৬৫ সালের ১ থেকে ৩ এপ্রিল ঢাকায় ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউটে অনুষ্ঠিত পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়নের সম্মেলনে ছাত্র ইউনিয়ন দ্বিধাবিভক্ত হয়। সম্মেলন শেষে সোভিয়েতপন্থীদের গ্রুপ মতিয়া চৌধুরী ও সাইফুদ্দিন মানিক এবং চীনাপন্থীরা রাশেদ খান মেনন ও সফিকুর রহমানকে যথাক্রমে দুই গ্রুপের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত করেন। এইভাবে ছাত্র ইউনিয়ন (মতিয়া) এবং ছাত্র ইউনিয়ন (মেনন) নামে অভিহিত হয়। মতিয়া গ্রুপ সোভিয়েট ইউনিয়ন এবং মেনন গ্রুপ চীনের সমর্থকে পরিণত হয়। ১৯৬৫ সালে ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধে চীন পাকিস্তানকে সমর্থন দেয় এবং সোভিয়েত রাশিয়া ভারতকে সমর্থন দেয়। তখন থেকে এদেশে চীনাপন্থী ও সোভিয়েতপন্থীদের দূরত্ব আরো বেড়ে যায়।

ছাত্র ইউনিয়নের বিভক্তির পর কমিউনিস্ট পার্টিও চীনাপন্থী ও সোভিয়েটপন্থী এই দুই অংশ বিভক্ত হয়। চীনাপন্থীরা তোয়াহা ও সুখেন্দু দস্তিদারের নেতৃত্বে গঠন করে পূর্ব পাকিস্তান কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদ-লেলিনবাদ) এইভাবে চীনাপন্থীরা কমিউনিস্ট পার্টি থেকে আলাদা হয়ে গেলে মূল কমিউনিস্ট পার্টি দুর্বল হয়ে পড়ে। দীর্ঘদিন নিষিদ্ধ ঘোষিত থাকা সত্ত্বেও পূর্ব পাকিস্তান কমিউনিস্ট পার্টি তার অস্তিত্বই কেবল ধরে রাখতে সক্ষম হয়নি, বরং সারাদেশ জুড়ে শাখা বিস্তার করে পার্টিকে শক্তিশালী করতে পেরেছিল। চীনাপন্থীরা বেরিয়ে যাওয়ার পর ১৯৬৮ সালের অক্টোবরে পার্টি কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হয়; এবং উক্ত অধিবেশনে পূর্ব পাকিস্তান কমিউনিস্ট পার্টিকে একটি স্বতন্ত্র সত্ত্বাবিশিষ্ট স্বাধীন পার্টিতে পরিণত করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। বাস্তবে এই পার্টি মস্কোপন্থী কমিউনিস্ট পার্টি নামে পরিচিতি লাভ করে।

ছাত্র ইউনিয়ন ও কমিউনিস্ট পার্টির মতো ন্যাপেও ভাঙনের ধারা লাগে। সেখানেও নেতৃবর্গ সোভিয়েতপন্থী ও চীনাপন্থীতে বিভক্ত হয়। ১৯৬৭ সালে ন্যাপের রংপুর কাউন্সিল অধিবেশনে ভাসানীর নেতৃত্বে চীনাপন্থী ন্যাপ নেতা-কর্মীবৃন্দ উপস্থিত থাকলে মোজাফফর আহমেদের নেতৃত্বে সোভিয়েতপন্থীরা অনুপস্থিত থাকে এবং তারা ডিসেম্বর মাসে ঢাকায় পৃথক অধিবেশন আয়োজন করে। এইভাবে দুই পৃথক সম্মেলনে ন্যাপ দ্বিধাবিভক্ত হয়। এরপর থেকে চীনাপন্থী ন্যাপ পরিচিতি লাভ করে ভাসানী ন্যাপ নামে এবং সোভিয়েত পন্থীরা (মস্কোপন্থী) মোজাফফর ন্যাপ নামে। বিভক্তির মাধ্যমে ন্যাপ দুর্বল হয়ে পড়ে। ন্যাপ বিভক্তি হয়ে গেলে এর কিছু সদস্য কমিউনিস্ট পার্টিতে ফিরে যান এবং কিছু সদস্য আওয়ামী লীগে যোগদান করেন।

১৯৬৬ সালের পর থেকে কমিউনিস্টদের একটি অংশের মধ্যে অতিবিপ্লবী ঝোঁক প্রবল আকার ধারণ করে। বিপ্লবের রণকৌশল নির্ধারণের প্রশ্নে চীনাপন্থীরা ক্রমান্বয়ে

www.Educationblog24.com

বিভিন্ন উপদলে বিভক্ত হয়। ১৯৬৮ সালের এপ্রিল শামসুজ্জোহা-মানিক, আমজাদ হোসেন, নূরুল হাসান, মাহবুবউল্লাহ, আবুল কাশেম ফজলুল হক মিলে গঠন করেন পূর্ববাংলার বিপ্লবী কমিউনিস্ট আন্দোলন। দেবেন শিকদার ও আবুল বাশার এই সিদ্ধান্তে প্রতিবাদ করে ১৯৬৯ সালের জুলাই মাসে পাবনার জয়নগরে অনুষ্ঠিত এক সম্মেলনে 'পূর্ব বাংলার কমিউনিস্ট পার্টি' (মা.লে.) গঠন করেন। তবে অল্প কিছুদিন পর এই দুই সংগঠন একত্রীভূত হয়। ১৯৬৯ সালে কাজী জাফর আহমদ, হায়দার আকবর খান রনো, রাশেদ খান মেনন প্রমুখ ছাত্রনেতা ছাত্রজীবন শেষ করে 'কমিউনিস্ট বিপ্লবীদের পূর্ববাংলা সমন্বয় কমিটি' নামে পৃথক সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেন। এদের মধ্যে কাজী জাফর আহমদ শ্রমিক আন্দোলনে মনোনিবেশ করেন এবং টঙ্গী শ্রমিক এলাকায় শ্রমিক সংগঠন গড়ে তোলেন। সিরাজ শিকদার 'মাও গবেষণা কেন্দ্র' নামে একটি সংগঠনের ব্যানারে চীনাপন্থী কমিউনিস্টদের সংঘবদ্ধ করেন। কিন্তু অল্প কিছুদিন পরেই এই কেন্দ্র বিলুপ্ত করে ৮ জানুয়ারি (১৯৬৮) পূর্ববাংলা শ্রমিক আন্দোলন নামে সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেন। এই সংগঠন সর্বহারা শ্রেণীর নেতৃত্বে সশস্ত্র লড়াইয়ের মাধ্যমে জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লব পরিচালনার ডাক দেয়।

এইভাবে দেখা যায় যে, ১৯৬০-এর দশকে বামপন্থী দলগুলি নানান উপদলে বিভক্ত হয়ে যায়। বিভক্তি ঘটে চীনাপন্থী দলগুলোর মধ্যে বেশি।

(৯) কৃষক-শ্রমিক পার্টি (কে.এস.পি)

১৯৪৬ সালের নির্বাচনের ভরাডুবির পর এ.কে. ফজলুল হক রাজনীতি থেকে নিষ্ক্রিয় হন। কিন্তু ১৯৫৩ সালের ২৩ আগস্ট তিনি তার পার্টি কৃষক-প্রজা পার্টিকে পুনর্জন্ম দেন এবং পার্টির নামকরণ করেন কৃষক-শ্রমিক পার্টি। জমিদারি প্রথা বিলুপ্ত হয়ে যাওয়ায় পার্টির নামে 'প্রজা' শব্দটি পরিবর্তন করে 'শ্রমিক' শব্দ যুক্ত করা হয়। এ.কে. ফজলুল হক এর সভাপতি নিযুক্ত হন। মুসলিম লীগ থেকে অনেক হতাশাগ্রস্ত সুবিধাবঞ্চিত নেতা ও কর্মী কে.এস.পি.তে যোগদান করে। যোগদানকারী উল্লেখযোগ্য মুসলিম লীগার ছিলেন হামিদুল হক চৌধুরী, সৈয়দ আজিজুল হক, আবু হোসেন সরকার, আশরাফউদ্দিন চৌধুরী প্রমুখ। আওয়ামী মুসলিম লীগ গঠিত হলে তাতে যোগ দেন মুসলিম লীগের তরুণ কর্মীরা, যারা অধিকাংশ ছিলেন নিম্নবিত্ত ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর। কে.এস.পিতে মূলত যোগ দেন মুসলিম লীগের সিনিয়র সদস্যরা, যারা অধিকাংশই ছিলেন প্রবীণ এবং সমাজের উচ্চবিত্ত শ্রেণীর। ১৯৫৪ সালের পূর্ববাংলা প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচনকে সামনে রেখে দলটি গঠিত হয়। দল গঠনের পর পরই আওয়ামী মুসলিম লীগ এবং নেজামে এছলামীর সমন্বয়ে যুক্তফ্রন্ট গঠিত হয়। যুক্তফ্রন্ট নির্বাচনে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে। মওলানা ভাসানী কিংবা সোহরাওয়ার্দী পূর্ব বাংলা প্রাদেশিক পরিষদ নির্বাচনে প্রার্থী না-হওয়ায় এ.কে. ফজলুল হক যুক্তফ্রন্ট পার্লামেন্টারি পার্টি নেতা নির্বাচিত হন। এরপর তার মুখ্যমন্ত্রী হওয়া, তার দলের কেন্দ্রে কোয়ালিশন সরকার গঠন, যুক্তফ্রন্টের ভাঙন, পূর্ববাংলায় কে.এস.পি.র সরকার গঠন– ইত্যাদি বিষয়ে দ্বিতীয় অধ্যায়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। এখানে কেবল এইটুকু মন্তব্য

www.Educationblog24.Com

করা যায় যে, ১৯৫৮ সালের পর এই দলটি কেবল কাগজে-কলমে থেকে যায়, এর রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড স্থবির হয়ে পড়ে।

(১০) পাকিস্তান ন্যাশনাল কংগ্রেস

১৯৪৭ সালের দেশভাগের পর পূর্ববাংলা কংগ্রেস দলীয় সদস্যরা তাদের পার্টিকে 'পাকিস্তান ন্যাশনাল কংগ্রেস' নামে পুনর্গঠিত করেন। ইসলামী দেশ পাকিস্তানে সংখ্যালঘু হিন্দু সম্প্রদায়ের স্বার্থরক্ষাই ছিল এই দলের উদ্দেশ্য। সে-সময় তফশিলি সম্প্রদায়ের অনেক হিন্দু কংগ্রেসে যোগদান করে। ১৯৪৭-এর পর পাকিস্তানের মতো সাম্প্রদায়িক রাষ্ট্রে কংগ্রেসের রাজনীতি সহজ ছিল না। মুসলিম লীগের রাজনৈতিক নেতা-কর্মীদের সাম্প্রদায়িক আচরণ, প্রাদেশিক পরিষদ ও গণপরিষদে কংগ্রেস দলীয় সদস্যদেরকে পাকিস্তানের শত্রু এবং ভারতীয় অনুচর হিসেবে গালমন্দ করা, পত্র-পত্রিকাগুলিতে বিরূপ সমালোচনা ইত্যাদি কারণে পূর্ববাংলা তথা পাকিস্তানে কংগ্রেস পার্টির রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করা কঠিন হয়ে পড়ে। এমনি পরিস্থিতিতে পাকিস্তান কংগ্রেসের প্রথম সভাপতি কিরণ শঙ্কর রায় খুব শীঘ্র ধৈর্য হারিয়ে ফেলেন এবং দেশভাগের আট মাসের মাথায় তিনি পশ্চিমবঙ্গে চলে যান। তখন শ্রীশ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কংগ্রেসের হাল ধরেন।

১৯৪৬ সালের নির্বাচনে ধর্মভিত্তিক আসন নির্দিষ্ট আসন নির্দিষ্ট থাকায় আইন পরিষদে হিন্দু-মুসলমান-বৌদ্ধ-খ্রিস্টান প্রতিটি সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি ছিল। স্বভাবতই পাকিস্তান সৃষ্টির পর পূর্ববাংলা প্রাদেশিক আইন পরিষদে এবং প্রাদেশিক আইন পরিষদের সদস্যদের ভোটে গঠিত পাকিস্তান গণপরিষদে হিন্দু-প্রতিনিধিও ছিল। প্রকৃতপক্ষে এই হিন্দু-সদস্যরাই পূর্ববাংলা প্রাদেশিক আইন পরিষদ এবং পাকিস্তান গণপরিষদে বিরোধী দলের ভূমিকা পালন করে। তখন সকল মুসলমান-সদস্য ছিলেন মুসলিম লীগ দলের। বাংলাভাষাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষার স্বীকৃতি প্রদানের দাবি গণপরিষদে উত্থাপন করেছিলেন কংগ্রেস দলীয় সদস্য কুমিল্লার বাবু ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত। তিনি ১৯৪৮ সালের ২৩ ফেব্রুয়ারি বাংলাকে গণপরিষদের ভাষা হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করার দাবি তুলে এক সংশোধনী প্রস্তাব উত্থাপন করেন। কিন্তু যেহেতু একজন হিন্দু সদস্য বাংলাভাষার প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন অতএব এর পিছনে ভারতের চক্রান্ত আছে বলে তদানীন্তন প্রধানমন্ত্রী পর্যন্ত মন্তব্য করেছেন। স্বভাবতই কোনো হিন্দু সদস্যের পক্ষে এখানে স্বাধীনভাবে রাজনীতি করা অত্যন্ত কঠিন ছিল। তথাপি ১৯৫৪ সালের পূর্ববাংলার যুক্তফ্রন্ট নির্বাচনে পৃথক নির্বাচন পদ্ধতি অনুসরণ করায় ৭২ জন হিন্দু-প্রতিনিধি নির্বাচিত হন। পাকিস্তান দ্বিতীয় গণপরিষদেও এরা আসন পায়। ১৯৫৪-৫৮ সময়কালে পূর্ববাংলার 'সরকার ভাঙা-গড়া' খেলায় হিন্দু-প্রতিনিধিরা ভূমিকা রাখেন। ১৯৫৫ সালে আওয়ামী লীগকে অসাম্প্রদায়িকীকরণ করা হলে অনেক হিন্দু রাজনীতিবিদগণ এই দলে যোগদান করেন। ফলে কংগ্রেস দিনে দিনে দুর্বল হয়ে পড়ে। ১৯৫৮ সালে সামরিক আইন জারি করে সকল রাজনৈতিক দল নিষিদ্ধ ঘোষিত হলে কংগ্রেস দলের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয়ে যায়। সামরিক আইন প্রত্যাহৃত হলে অনেক দলের পুনরুজ্জীবন ঘটলেও পাকিস্তান কংগ্রেসের কার্যক্রম বিষয়ে কোনো তথ্য পাওয়া যায় না।

www.Educationblog24.com

www.Educationblog24.Com

(১১) খিলাফতে রব্বানী পার্টি

১৯৫২ সালের ২০ ফেব্রুয়ারি মতান্তরে ২০ এপ্রিল এই পার্টি প্রতিষ্ঠিত হয়। শোষণহীন ইসলামী সমাজ জীবন কায়েম করা এই পার্টির উদ্দেশ্য ছিল। যেহেতু তৎকালীন নেতৃবৃন্দ পাকিস্তানে ইসলামী সমাজব্যবস্থা প্রবর্তনে ব্যর্থ এবং যে-উদ্দেশ্য নিয়ে পাকিস্তান সৃষ্টি সেই দারুল ইসলাম প্রতিষ্ঠা যেহেতু মুসলিম লীগকে দিয়ে সম্ভব নয় তাই খিলাফতে রব্বানী পার্টির প্রতিষ্ঠা করা হয় বলে এই পার্টির আহ্বায়ক ও তমুদ্দন মজলিশের প্রাক্তন সাংগঠনিক সম্পাদক জনাব সোলায়মান খান বলেন।

(১২) নেজামে এছলামী

কুরআন ও সুন্নাহর শিক্ষাভিত্তিক শাসন ব্যবস্থা গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে ১৯৫৩ সালের ১ আগস্ট এই পার্টি গঠিত হয়। মওলানা হাফেজ আতাহার আলী এই দলের সভাপতি নিযুক্ত হন। যদিও মাদরাসা শিক্ষায় শিক্ষিত উলামাবৃন্দ এই দলের সদস্য হন, কিন্তু ফরিদ আহমদ এবং সৈয়দ কামরুল আহসানের মতো ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত কিছু ব্যক্তিত্ব এই দলে যোগ দেন। মূলত উচ্চবিত্ত মুসলমানেরা এই দলের নেতৃত্বে অধিষ্ঠিত থাকেন।

১৯৫৪ সালের পূর্ববাংলা প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচনে মুসলিম লীগ বিরোধী গঠিত জোট যুক্তফ্রন্টের শরিকদল ছিল নেজামে এছলামী। সামরিক আইন প্রত্যাহৃত হওয়ার পর এই দল পূর্ব পাকিস্তানে উল্লেখযোগ্য প্রসার লাভ করতে পারেনি।

(১৩) জামায়াতে ইসলাম

ব্রিটিশ আমলেই এই দলের জন্ম। যদিও জামায়াতে ইসলামী পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার বিরোধী ছিল, কিন্তু পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হলে এই দল পাকিস্তানকে দলীয় আদর্শ বাস্তবায়নের উত্তম ক্ষেত্র হিসেবে ব্যবহার করতে শুরু করে। দেশ ভাগের প্রথম দিকে জামায়াতে ইসলামী সামাজিক কর্মকান্ড এবং ইসলামী জ্ঞানচর্চার কর্মসূচি গ্রহণ করে। এইভাবে একটা সমর্থক গোষ্ঠী শুরু হলে জামায়াত রাজনৈতিক কর্মসূচি হাতে নেয়। পাকিস্তানের নির্বাচনী কর্মকাণ্ডে এই দল প্রথম সফলতা অর্জন করে ১৯৫৮ সালের করাচী মিউনিসিপ্যাল করপোরেশনের নির্বাচনের এক ডজনেরও বেশি আসন লাভের মাধ্যমে। এই দল একটি আদর্শভিত্তিক দল হওয়ায় এবং দলীয় নেতা-কর্মীদেরকে কঠোর নিয়ম শৃঙ্খলা অনুসরণ করতে হত বিধায় দলটি আপামর জনসাধারণের সমর্থন অর্জন করতে ব্যর্থ হয়। অন্য রাজনৈতিক দলগুলিতে যেমন যে-কেউ যখন খুশি তখন দলের সদস্যপদ লাভ করতে পারে, জামায়াতে ইসলামের সদস্যপদ লাভ তেমন সহজসাধ্য ছিল না। এই দলের সদস্যপদ লাভ করতে হলে দলের নির্দেশিত মত ও পথ অনুসরণ করতে হতো। ফলে দলের সদস্য সংখ্যা বাড়েনি। ১৯৫৭ সালে পাকিস্তানে এই দলের মোট সদস্য সংখ্যা ছিল ১২৭১ জন। দলের কার্যক্রম পরিচালনার জন্য জামায়াতে ইসলামী দলের সদস্যদেরকে নিয়মিত চাঁদা, জাকাত, কোরবানির পশুর চামড়া, অনুদান প্রভৃতি দিতে হত। স্বাধীনতার পর থেকে মওলানা মওদুদী এই দল পরিচালনা করতে থাকেন। তিনি প্রচুর ইসলামী সাহিত্য রচনা করেছেন যা প্রায় ক্ষেত্রে

www.Educationblog24.com

www.Educationblog24.Com

বিতর্কিত। জামায়াতের যে দর্শন তার দিক নির্দেশক মওলানা মওদুদী। তৎকালীন পূর্ববঙ্গ/ পূর্ব পাকিস্তানেও এর শাখা গঠিত হয়।

বিভিন্ন ছাত্র সংগঠনের জন্ম

যাহোক, ১৯৪৭ সালে ভারত বিভক্তির প্রাক্কালে বাংলায় তিনটি ছাত্র-সংগঠন ছিল : ১. কম্যুনিস্ট পন্থী All Bengal Student Federation. ২. কংগ্রেসপন্থী All Bengal Student Congress. ৩. মুসলিম লীগ পন্থী All Bengal Muslim Student League. বাংলা বিভক্তির পর পূর্ববাংলাতে উপরিউক্ত প্রতিটি সংগঠনের শাখা গঠিত হয়।

ABMSL-এ দুই গ্রুপ বিদ্যমান ছিল। তন্মধ্যে হাশিম-সোহরাওয়ার্দীর অনুসারীরা ছিল উদারনৈতিক, অন্যপক্ষে নাজিমউদ্দীন-আকরাম খা'র অনুসারীগণ ছিল রক্ষণশীল। বাংলা বিভক্তি প্রশ্নে বাংলা মুসলিম লীগে হাশিম-সোহরাওয়ার্দীরা বাংলা বিভক্তির বিরোধিতা করেন এবং ফলশ্রুতিতে তারা ১৯৪৭-এর ১৪ আগস্টের পরেও কলকাতায় থেকে যান। কিন্তু তাদের অনুসারী অনেক ছাত্রনেতা ও কর্মীবৃন্দ পূর্ববাংলায় চলে আসে। স্বাধীন পূর্ববাংলায় নাজিমউদ্দীনের মুখ্যমন্ত্রিত্বে মন্ত্রিসভা গঠিত হলে শাহ আজিজ-শামসুল হুদা চৌধুরী প্রমুখ রক্ষণশীল ছাত্রনেতৃবৃন্দ সরকারের পক্ষ অবলম্বন করে। অন্যপক্ষে হাশিম গংদের অনুসারী ছাত্রবৃন্দ সরকারের বিরোধীপক্ষ অবলম্বন করে। ফলে ১৯৪৮ সালের ৪ জানুয়ারি 'পূর্ববাংলা মুসলিম স্টুডেন্ট লীগ' দ্বিধাবিভক্ত হয় এবং নঈমুদ্দিন আহমদকে আহ্বায়ক করে East Pakistan Muslim Student League গঠিত হয়। সরকার সমর্থিত অংশের নামকরণ হয় All East Pakistan Muslim Student League.

১৯৪৮থেকে ১৯৫২ পর্যন্ত সংঘটিত ভাষা আন্দোলনে যেখানে EPMSL অগ্রণী ভূমিকা রাখে সেখানে AEPMSL সরকারের গুণ্ডাবাহিনীতে পরিণত হয়।

১৯৪৯ সালের জুন মাসে East Pakistan Awami Muslim League গঠিত হলে EPMSL আওয়ামী-মুসলিম লীগের অঙ্গসংগঠনে পরিণত হয় এবং AEPMSL মুসলিম লীগের এক কাগুজে ছাত্র-সংগঠনে পরিণত হয়। এই অংশের নেতা ছিলেন শাহ আজিজুর রহমান।

(১) পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগ (পরে ছাত্রলীগ)

৪ জানুয়ারি ১৯৪৮ প্রতিষ্ঠিত পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগের আহ্বায়ক নির্বাচিত হয়েছিলেন নঈমুদ্দিন আহমদ (রাজশাহী)। ছাত্রলীগের প্রথম সাংগঠনিক কমিটির অন্যান্য সদস্য ছিলেন :

১. আবদুর রহমান চৌধুরী (বরিশাল); ২. শেখ মুজিবুর রহমান (ফরিদপুর); ৩. অলি আহমদ (কুমিল্লা); ৪. আজিজ আহমদ (নোয়াখালী); ৫. আবদুল মতিন (পাবনা), ৬. দবিরুল ইসলাম (দিনাজপুর), ৭. মফিজুর রহমান (রংপুর); ৮. শেখ আবদুল আজিজ (খুলনা); ৯. নওয়াব আলী (ঢাকা); ১০. নূরুল কবির (ঢাকা সিটি); ১১. আবদুল আজিজ (কুষ্টিয়া); ১২. সৈয়দ নুরুল আলম (ময়মনসিংহ); ১৩. আবদুল কুদ্দুস

www.Educationblog24.Com

চৌধুরী (চট্টগ্রাম)।

প্রতিষ্ঠালগ্নে পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগ নিম্নলিখিত কর্মসূচী গ্রহণ করে :

ছাত্রলীগের আদর্শ ও উদ্দেশ্য

১. ক. পূর্ব পাকিস্তানে বিভিন্ন প্রতিভা সৃষ্টির উপযোগী পরিবেশ তৈরি করা;
খ. বিভিন্ন রকমের কারিগরি, ইঞ্জিনিয়ারিং, ডাক্তারি ও ধাত্রীবিদ্যা শিক্ষার জন্য ছাত্রছাত্রীদের উৎসাহিত করা।

২. পাকিস্তানকে আভ্যন্তরীণ ও বহিঃশত্রুদের কবলমুক্ত করা এবং সর্বশক্তি দিয়ে পাকিস্তানের সার্বভৌমত্ব রক্ষা করা।

৩. ক. স্বার্থান্বেষী নেতৃবৃন্দের বিরুদ্ধে তীব্র সংগ্রাম এবং ছাত্রসমাজকে তাহাদের স্বার্থসিদ্ধির যন্ত্ররূপে চালিত হইতে না দেওয়া;
খ. ছাত্রসমাজকে দলীয় রাজনীতি হইতে মুক্ত রাখা।

৪. ক. নিরক্ষরতার বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা;
খ. ছাত্রসমাজকে পরস্পর সহযোগিতার ভিত্তিতে অবিচ্ছেদ্যভাবে একত্রীভূত করা;
গ. ছাত্রসমাজের ন্যায্য দাবি-দাওয়াগুলোকে সুপ্রতিষ্ঠিত করা;
ঘ. ছাত্রসমাজকে কৃষ্টি ও আধুনিক রাজনৈতিক আন্দোলনের সংস্পর্শে আনিয়া নৈতিক ও চারিত্রিক বিপ্লবের সৃষ্টি করা;
ঙ. জাতি ও দেশের কল্যাণের জন্য ছাত্রসমাজের বিক্ষিপ্ত কর্মশক্তিকে সুসংবদ্ধ কেন্দ্রীভূত করা।

৫. ইসলামিক নীতির উপর ভিত্তি করতঃ জাতীয় দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিয়া অর্থনৈতিক স্বাধীনতা ও সমতা আনয়ন করা।

৬. পাকিস্তানের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে সমানাধিকারের ভিত্তিতে সৌহার্দ্য ও মিলনের পথ সুপ্রশস্ত করা।

৭. জনসংখ্যার অনুপাতে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানীদের ন্যায্য দাবি-দাওয়াগুলোর সুনিশ্চিত ব্যবস্থা করিয়া দিয়া পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মিলনকে সুদৃঢ় করা।

৮. সরকারের জনকল্যাণকর কর্মপদ্ধতিকে সমর্থন করা এবং গণস্বার্থবিরোধী কর্মপন্থার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করা।

৯. প্রাপ্তবয়স্কদের সার্বজনীন ভোটাধিকারের দাবি।

১০. দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতি, মুনাফাকারী ও চোরাকারবারীদের উচ্ছেদ সাধন এবং ব্যক্তিকে কেন্দ্র করিয়া ছাত্র-আন্দোলন পরিচালনার যে রেওয়াজ প্রচলিত আছে, তার ধ্বংস সাধন।

ছাত্রলীগের দাবি

১. আজাদী লাভের পরিপ্রেক্ষিতে সমগ্র শিক্ষা ব্যবস্থা এবং পাঠ্যপুস্তকের আমূল পরিবর্তন।

২. অবৈতনিক বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার প্রচলন ও বর্তমান শিক্ষা সংকোচ নীতির প্রতিরোধ।

৩. ক. বিনাব্যয়ে বাধ্যতামূলক সামরিক শিক্ষার প্রবর্তন;

www.Educationblog24.com

www.Educationblog24.com

খ. পূর্ব পাকিস্তানের যুবকদের বিমান, নৌ, স্থল প্রভৃতি সামরিক শিক্ষা প্রদানের জন্য অনতিবিলম্বে পূর্ব পাকিস্তানের সামরিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান স্থাপন;

গ. পাকিস্তান নৌবিভাগের সদর দফতর চট্টগ্রামে স্থানান্তরিতকরণ।

৪. কারিগরি, ইঞ্জিনিয়ারিং, ডাক্তারী, ধাত্রীবিদ্যা প্রভৃতি প্রসারের অধিকতর সুবন্দোবস্তকরণ।

৫. ক. স্বল্পব্যয়ে উচ্চশিক্ষার ব্যবস্থা;

খ. শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে অধিকতর সরকারি সাহায্য;

গ. শিক্ষায়তনগুলোতে উপযুক্ত বেতন দিয়া উপযুক্ত শিক্ষক নিয়োগ;

ঘ. পল্লী অঞ্চলকে শিক্ষাকেন্দ্ররূপে গড়িয়া তুলিবার উদ্দেশ্যে মফস্বল শিক্ষায়তনগুলোর জন্য অধিকতর ছাত্রাবাসের প্রতিষ্ঠা;

ঙ. গরিব ও মেধাবী ছাত্রদের জন্য শিক্ষায়তন ও ছাত্রাবাসগুলোতে অধিকতর ফ্রি স্টুডেন্টশিপ এবং বৃত্তির সংখ্যা বাড়াইয়া দেওয়ার ব্যবস্থা;

চ. শিক্ষায়তনসমূহের পাঠাগারগুলিতে ইসলামিক কৃষ্টি ও ঐতিহ্যমূলক গ্রন্থের সমাবেশ;

ছ. বিনাব্যয়ে ছাত্রদের চিকিৎসার উপযুক্ত ব্যবস্থা।

৬. নারীশিক্ষা প্রসারের উপযুক্ত ব্যবস্থা।

৭. পূর্ব পাকিস্তানের বিশ্ববিদ্যালয় ও স্কুল-কলেজসমূহে বাংলাভাষার মাধ্যমে শিক্ষা প্রদান ও পরীক্ষা গ্রহণের আশু ব্যবস্থা।

৮. শিক্ষায়তনগুলোকে স্বায়ত্তশাসনমূলক ক্ষমতা প্রদান।

৯. শিক্ষায়তন ও ছাত্রাবাসগুলোতে স্বায়ত্তশাসনমূলক ছাত্র ইউনিয়নের প্রতিষ্ঠা এবং স্বাধীন মতামত প্রকাশের অধিকার।

১০. শিক্ষায়তনসমূহে পুলিশের অন্যায় ও অযথা হস্তক্ষেপ বন্ধ করিয়া দিয়া শিক্ষায়তনগুলোর পবিত্রতা রক্ষা করা।"

সূত্র : *স্বাধীনতার দলিলপত্র*, প্রথম খণ্ড, পৃ.৪৭-৪৮।

পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগে 'মুসলিম' শব্দ থাকায় হিন্দু-সদস্যদের ঐ দলে যোগদান সম্ভব হয়নি। ১৯৪৯ সালে ছাত্রলীগকে অসাম্প্রদায়িকীকরণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। কিন্তু গঠনতন্ত্র অনুযায়ী তা কাউন্সিলারগণের অনুমোদনের প্রয়োজন ছিল। ১৯৫৩ সাল পর্যন্ত কোনো কাউন্সিল অধিবেশন না-হওয়ায় ছাত্রলীগের নাম থেকে 'মুসলিম' শব্দ বাদ দেয়া বিলম্বিত হয়। ১৯৫৩ সালে কাউন্সিল অধিবেশনের পর থেকে ছাত্রলীগ অসাম্প্রদায়িক ছাত্র-সংগঠনে পরিণত হয়। কালক্রমে পূর্ব পাকিস্তানে ছাত্রলীগ একক বৃহত্তম দলে পরিণত হয়। পাকিস্তান আমলে অন্যান্য ছাত্র-সংগঠনে ভাঙন ধরলেও ছাত্রলীগের ঐক্য অটুট থাকে। এই সংগঠনটি পাকিস্তান শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে সকল আন্দোলনে নেতৃত্ব দেয়। ১৯৪৮-৫২ সময়ের ভাষা আন্দোলনে, ১৯৫৪ সালের পূর্ববাংলা ব্যবস্থাপক পরিষদের নির্বাচনে: ১৯৬০, ৬২ ও ৬৪-এর আইয়ুব-বিরোধী ছাত্র আন্দোলনে, ১৯৬৬-এর ছয় দফা আন্দোলনে এবং ৬৯-এর গণআন্দোলনে বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখে। এর সংগ্রামী ঐতিহ্য গৌরবোজ্জ্বল। অলি আহমদ ছাত্রলীগের কৃতিত্বের মূল্যায়ন প্রসঙ্গে লিখেছেন।

www.Educationblog24.com

www.Educationblog24.com

ছাত্রমহলে পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগের অভূতপূর্ব জনপ্রিয়তাই পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগ গঠনে রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দকে উদ্বুদ্ধ করে। প্রকৃতপক্ষে প্রদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসের বিভিন্ন সন্ধিক্ষণে ছাত্রলীগ এক ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করিয়াছে। বিভিন্ন ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের একক দাবিদার এই ছাত্র-সংগঠন। ভাবীকালে এই সংগঠন পাকিস্তানের রাষ্ট্রীয় অবকাঠামোর রূপায়ণ ও পরিবর্তনে এবং বাংলাদেশের অভ্যুদয়ে এক উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে।

ছাত্র ফেডারেশন

দেশভাগের পর পূর্ববাংলা ছাত্র ফেডারেশনের যে শাখা গঠিত হয় তা গোড়াতেই বেশ দুর্বল ছিল। এই সংগঠনটি কম্যুনিস্ট পার্টির অঙ্গ সংগঠন ছিল। এর অধিকাংশ সদস্য ছিল হিন্দু। দেশভাগের পর হিন্দু রাজনৈতিক নেতা-কর্মীরা ব্যাপক হারে ভারতে গমন করায় কম্যুনিস্ট পার্টি ও ছাত্র ফেডারেশন উভয় সংগঠন এখানে দুর্বল এবং অকার্যকর হয়ে পড়ে। তাছাড়া সরকারের দমননীতির কারণেও ছাত্র ফেডারেশন এখানে স্থায়ী হতে পারেনি। পরবর্তীকালে ১৯৫২ সালে এই দলের অনেক নেতা-কর্মীর উদ্যোগে পূর্ব পাকিস্তানে ছাত্র ইউনিয়ন গঠিত হয়।

পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন

১৯৫২ সালের ২৬ এপ্রিল 'পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন' প্রতিষ্ঠিত হয়। মহান ভাষা আন্দোলনের পটভূমিকায় এই সংগঠনটির জন্ম। রাজনীতি সচেতন বামপন্থী ছাত্ররা যেহেতু ছাত্র ফেডারেশনের নামে রাজনীতি করতে সরকারি বাধা-বিপত্তি, জেল-জুলুম-হয়রানির সম্মুখীন হচ্ছিল এবং যেহেতু ধর্মীয় কারণে মুসলিম ছাত্রলীগেও (১৯৫৩ পর্যন্ত) যোগ দেয়া সম্ভব হচ্ছিল না; তাই একটি অসাম্প্রদায়িক প্রগতিবাদী ছাত্র-সংগঠনের প্রয়োজনীয়তা থেকেই ছাত্র ইউনিয়নের সৃষ্টি হয়। জাতীয়ভিত্তিক এই ছাত্র-সংগঠনটি প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পূর্বে ছাত্র-ইউনিয়ন নামে সংগঠন বিভিন্ন মফস্বল এলাকায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল বলে ড. আবুল কাশেম তাঁর গবেষণা প্রবন্ধে উল্লেখ করেছেন। ছাত্র ইউনিয়ন প্রতিষ্ঠার ইতিহাস প্রসঙ্গে ড. আবুল কাশেম ছাত্র ইউনিয়নের একজন প্রাক্তন সাধারণ সম্পাদকের নিম্নলিখিত বক্তব্য উদ্ধৃত করেছেন:

মহান ভাষা আন্দোলনের পটভূমিকায় ছাত্রআন্দোলন তথা গণতান্ত্রিক আন্দোলনের সম্মুখে যেসব নতুন সমস্যা ও প্রশ্ন দেখা দিয়েছিল তা আলোচনা করে একটা সিদ্ধান্তে উপনীত হবার জন্য ১৯৫২ সালে এপ্রিল মাসে ঢাকায় একটি প্রাদেশিক সম্মেলন বসেছিল। ঐ সম্মেলন সর্বসম্মতিক্রমে একটা নতুন ছাত্র প্রতিষ্ঠান গঠনের পক্ষে মত দেয়। এই ছিল '৫২-এর এপ্রিল সম্মেলনে ছাত্র-প্রতিনিধিদের বক্তব্য। ছাত্র প্রতিনিধিদের এই বক্তব্যের ভিত্তিতেই ঐ সম্মেলন ছাত্র প্রতিনিধিদের বক্তব্য। ছাত্র প্রতিনিধিদের এই বক্তব্যের ভিত্তিতেই ঐ সম্মেলনে যে নতুন ছাত্র প্রতিষ্ঠান গঠন করা হয় তার নাম দেয়া হয় পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন। একই সালের নভেম্বর মাসের সম্মেলনে যখন এর পূর্ণাঙ্গ কমিটি গঠিত হয় তখন ছাত্র-সংগঠনটিকে একটি প্রাদেশিক সংগঠনে পরিণত করা হয়, নাম হয় পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন।

www.Educationblog24.Com

১৯৫৪ সালের যুক্তফ্রন্ট গঠনে এবং পরবর্তীকালে সামরিক সরকার বিরোধী আন্দোলনে ছাত্র ইউনিয়ন বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখে। ১৯৫৭ সালে ন্যাপ গঠিত হলে ছাত্র ইউনিয়ন ন্যাপ-এর অঙ্গ সংগঠনে পরিণত হয়। ১৯৬৭ সালে ছাত্র ইউনিয়ন আদর্শিক সংঘাতের কারণে দুটি গ্রুপে বিভক্ত হয়। এক গ্রুপ ছাত্র ইউনিয়ন মতিয়া গ্রুপ এবং অন্যটি ছাত্র ইউনিয়ন মেনন গ্রুপে বিভক্ত হয়ে যায়।

(৪) ন্যাশনাল স্টুডেন্ট ফেডারেশন (এন.এস.এফ)

১৯৬২ সালে পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর মোনেম খান এন.এস.এফ গঠন করেন। দলটি শুরু থেকেই শাসকগোষ্ঠীর লাঠিয়াল বাহিনী হিসেবে কাজ করে এবং আইয়ুবের পতন পর্যন্ত তা সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সরকার অনুগত সংগঠন হিসেবে কাজ করে।

(৫) ছাত্র এসোসিয়েশন

দেশভাগের পর পাকিস্তান জাতীয় কংগ্রেসের অঙ্গ সংগঠন হিসেবে পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র এসোসিয়েশন নামে একটি ছাত্র-সংগঠন আত্মপ্রকাশ করে। ১৯৪৮ সালের ১৩ জানুয়ারি ময়মনসিংহে অনুষ্ঠিত সম্মেলনে দলের এই নামকরণ করা হয়েছিল। মুসলিম লীগ সরকারের শাসনামলে এই দলের বিকাশ সম্ভবপর হয়নি।

(৬) পাকিস্তান ছাত্র সংঘ (স্টুডেন্ট র‍্যালি)

অসাম্প্রদায়িক অথচ কমিউনিস্ট বিরোধী এমন ছাত্ররা এই দল গঠন করে। রাজনৈতিক দলের প্রভাবমুক্ত থেকে স্বাধীনভাবে ছাত্র-সংগঠন করাই এই দলের উদ্দেশ্য ছিল। কিন্তু এই দলটিও স্থায়ী হয়নি।

(৭) ছাত্রী সংঘ

মূলত কমিউনিস্ট পার্টির অনুপ্রেরণায় এই সংগঠন প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৪৮ সালে ইডেন ও কামরুন্নেছা বালিকা বিদ্যালয়ের একত্রীকরণের বিরুদ্ধে তীব্র ছাত্রীবিক্ষোভ ও আন্দোলন দানা বেঁধে উঠলে এই সংগঠন অত্যন্ত বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করে। তবে প্রকাশ্যে ইসলামী পাকিস্তানের রাজপথে ছাত্রীদের নিয়ে মিছিল করায় সেদিন এই সংগঠন তৎকালীন সরকার ও সমাজপতিদের তীব্র কটাক্ষের সম্মুখীন হয়। নেতৃত্বের ধারাবাহিকতা ও নানা প্রতিকূলতার জন্য শেষ পর্যন্ত এই সংগঠন তার স্থায়িত্ব সমুন্নত রাখতে পারেনি।

বিভিন্ন জোট গঠন

হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী জীবিত থাকাকালীন আওয়ামী লীগ পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়নি। ১৯৬২ সালের সংবিধান ঘোষণার আগেই তাকে জননিরাপত্তা আইনে আটক করা হয়েছিল। ১৯৬২ সালের সেপ্টেম্বরে তিনি মুক্তি পান। জেল থেকে ছাড়া পেয়েই তিনি ঢাকা আসেন এবং তাঁর মুক্তি উপলক্ষে ঢাকায় এক সংবর্ধনার আয়োজন করা হয়। সরকারপন্থী 'ডন' পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদ অনুসারে উক্ত জনসভায় প্রায় দুই লক্ষ লোকের সমাবেশ ঘটেছিল। উক্ত সমাবেশে সোহরাওয়ার্দী ঘোষণা করেন যে, বিরাজমান পরিস্থিতিতে তিনি আওয়ামী লীগের পুনঃপ্রতিষ্ঠার বিরোধী, তবে দেশে গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের উদ্দেশ্যে সকল দলের সমন্বয়ে তিনি একটি ফ্রন্ট গঠনের আহ্বান জানান।

www.Educationblog24.com

তার এই আহ্বানে ভালো সাড়া পাওয়া যায়। আওয়ামী লীগ, জামায়াতে ইসলামী, নেজামে ইসলামী, ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি, কৃষক-শ্রমিকপার্টি, কাউন্সিল মুসলিম লীগ ও নূরুল আমিনের নেতৃত্বাধীন মুসলিম লীগের অংশ মিলে সোহরাওয়ার্দীর নেতৃত্বে অক্টোবর (১৯৬২) 'ন্যাশনাল ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট' এনডিএফ নামে সুপরিচিত। নামে একটি ফ্রন্ট গঠিত হয়। গণতন্ত্র পুনরুদ্ধার এবং সংবিধানের গণতন্ত্রীকরণের আন্দোলন গড়ে তোলাই ছিল এনডিএফ গঠনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। এনডিএফ গঠনকারীরা ঘোষণা করেন যে, তারা কেউ আইয়ুব সরকারের অধীন কোনো পদ গ্রহণ করবেন না।

এনডিএফ-কে এর নেতৃবৃন্দ রাজনৈতিক দল না বলে একে গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের জন্য একটি আন্দোলন হিসেবে অভিহিত করে। খুব শীঘ্র এটি জনপ্রিয়তা অর্জন করে। 'রাজনৈতিক দল আইনের' আওতায় এবডোর আওতাভুক্ত ব্যক্তিগণের রাজনীতি করার অধিকার ছিল না। কিন্তু এনডিএফ-কে রাজনৈতিক দল হিসেবে অভিহিত না করা অনেক এবডোর রাজনীতিবিদ এনডিএফ-এর আন্দোলনে জড়িয়ে যান। বিষয়টি সরকারকে বিব্রত করে। ফলে আইয়ুব খান 'রাজনৈতিক দল আইন' সংশোধন করে ১৯৬৩ সালের ৭ জানুয়ারি ২টি অধ্যাদেশ জারি করেন। প্রথম অধ্যাদেশে 'রাজনৈতিক দল' কথাটির পুনঃব্যাখা করা হয় এবং বলা হয় যে একই রাজনৈতিক উদ্দেশ্য নিয়ে একটি গ্রুপ কিংবা কিছু ব্যক্তি কোনো রাজনৈতিক কার্যক্রমে লিপ্ত হলে এত রাজনৈতিক দলীয় কার্যক্রমের অনুরূপ বলে বিবেচিত হবে। এই অধ্যাদেশ বলে সরকার আরও একটি ক্ষমতা লাভ করে। তাহলো এবডোর অধীনে সাজাপ্রাপ্ত কোনো ব্যক্তিকে সরকার ছয় মাসের জন্য যে-কোনো ধরনের প্রেস কনফারেন্স করা ও বক্তৃতা-বিবৃতি প্রদান থেকে নিবৃত্ত রাখতে পারবেন। দ্বিতীয় অর্ডিন্যান্সের মাধ্যমে প্রেসিডেন্ট যে-কোনো এবডো-সাজাপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে তার আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে তার উপর থেকে অযোগ্যতার নিষেধাজ্ঞা তুলে নিতে পারতেন। উপরিউক্ত অধ্যাদেশদ্বয় একদিকে যেমন যে-কোনো রাজনৈতিক নেতাকে এনডিএফ-এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হলে তার উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করতে পারত, অন্যদিকে প্রেসিডেন্টের দলের সদস্য হতে ইচ্ছুক এমন এবডো-সাজাপ্রাপ্ত ব্যক্তির উপর থেকে নিষেধাজ্ঞা অপসারণ করা যেত।

১৯৬৩ সালের ডিসেম্বর মাসে সোহরাওয়ার্দী বৈরুতে ইন্তেকাল করেন। তাঁর মৃত্যুর পর ১৯৬৪ সালের ২৫ জানুয়ারি পাকিস্তান আওয়ামী লীগ আত্মপ্রকাশ করে। নবাবজাদা খাজা নসরুল্লাহ খান এর প্রেসিডেন্ট মনোনীত হন। শেখ মুজিবুর রহমান পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক মনোনীত হন। ইতিপূর্বে মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানীর সভাপতিত্বে ৩১ আগস্ট ১৯৬৩ সালে ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি আত্মপ্রকাশ করেছিল। আওয়ামী লীগ এবং ন্যাপ এনডিএফ-এর গণতন্ত্র পুনরুদ্ধার কর্মসূচীতে অব্যাহত সহযোগিতার প্রতিশ্রুতি ঘোষণা করে। ১৯৬৪ সালের মার্চ মাসে ঢাকায় এনডিএফ-এর এক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। পূর্ব পাকিস্তানের প্রায় সকল রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ এতে যোগ দেন। সম্মেলন শেষে নূরুল আমিনকে সভাপতি করে একটি কমিটি গঠিত হয়। সম্মেলনে গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের লক্ষ্যে সমস্ত মতাদর্শগত

www.Educationblog24.Com

বিভিন্নতার উর্ধ্বে উঠে এক মঞ্চে কাজ করার দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করা হয়। ১৯৬৪-৬৫ সালে অনুষ্ঠিত জাতীয় নির্বাচনসমূহ বিভিন্ন বিরোধীদলকে আইয়ুববিরোধী মঞ্চে সমবেত হওয়ার পূর্বে সুযোগ সৃষ্টি করে দেয়। ১৯৬৪ সালের জুলাই মাসে আওয়ামী লীগ, কাউন্সিল মুসলিম লীগ, জামায়াতে ইসলামী, নেজামে ইসলামী এবং ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি নির্বাচনে যুক্তফ্রন্ট গঠনের একটি প্রস্তাব সমর্থন করে এবং 'সম্মিলিত বিরোধীদল' (Combined Opposition Party বা COP) নামে একটি জোট গঠন করে। এই জোট প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে সকল বিরোধীদলের পক্ষে মিস ফাতিমা জিন্নাহকে প্রার্থী মনোনয়ন করে এবং নয় দফা নির্বাচনী ম্যানিফেস্টো ঘোষণা করে। দফাগুলি ছিল:

১. একটি গণতান্ত্রিক সংবিধান প্রণয়ন;
২. জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের প্রত্যক্ষ নির্বাচন ব্যবস্থা;
৩. জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের আইন ও বাজেট প্রণয়নের সর্বময় কর্তৃত্ব প্রদান;
৪. প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের বিধান;
৫. প্রেসিডেন্টের ক্ষমতা হ্রাসকরণ;
৬. শাসন বিভাগ থেকে বিচার বিভাগ পৃথকীকরণ;
৭. আইনের সাংবিধানিক বৈধতা যাচাইয়ের ক্ষমতা সুপ্রীমকোর্টকে প্রদান;
৮. সকল রাজনৈতিক বন্দিদের মুক্তি;
৯. নিবর্তনমূলক সকল আইনের বিলুপ্তি।

'কপ'-এর পক্ষ থেকে লে. জেনারেল মোহাম্মদ আজম খানকে প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থী করার ইচ্ছে থাকলেও ন্যাপের বিরোধিতায় তা সম্ভব হয়নি। ন্যাপ সভাপতি মওলানা ভাসানী ঘোষণা করেন যে, মার্শাল-ল' জারির সঙ্গে জড়িত ছিলেন এমন কোনো ব্যক্তিকে প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থী করার তিনি ও তার দল বিরোধী। আজম খান মার্শাল-ল' জারির সঙ্গে ও মার্শাল ল' প্রশাসনের সঙ্গে জড়িত থাকলেও তিনি পূর্ববঙ্গে ভীষণ জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিলেন। তাই আইয়ুবের বিরুদ্ধে তিনি একজন ভালো প্রার্থী হতে পারতেন। কিন্তু ন্যাপ-এর বিরোধিতায় তাঁকে প্রার্থী নির্বাচন করা সম্ভব হয়নি। ফলে মিস ফাতিমা জিন্নাহকে প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থী মনোনীত করা হয়। এমনকি একজন মহিলাকে রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ পদের জন্য প্রার্থী মনোয়ন করা শরিয়ত বিরোধী নয় এই মর্মে জামায়াতে ইসলামীর আমির মওলানা মওদুদী পার্টিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়ে নেন।

প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের পূর্বে পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন, পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগ এবং পাকিস্তান ছাত্রশক্তি নামক তিনটি ছাত্র সংগঠন মিলে 'পূর্ব পাকিস্তান সংগ্রামী ছাত্রসমাজ' নামক ছাত্র ঐক্যজোট গঠন করা হয়। এই জোটের পক্ষ থেকে ১৯৬৪ সালের ডিসেম্বর মাসে একটি প্রচারপত্র প্রকাশ করে। এতে প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের গুরুত্ব, মৌলিক গণতন্ত্রী এবং দেশবাসীর উদ্দেশে আবেদন, ছাত্রসমাজের দায়িত্ব ও কর্তব্য বিশদ ব্যাখা করা হয় এবং শেষে সাত দফা কর্মসূচী ঘোষণা করা হয়। সংগ্রামী ছাত্রসমাজের কর্মসূচীগুলো ছিল নিম্নরূপ:

১. সকল ইউনিয়ন এবং সম্ভব হইলে ইউনিটে 'ফাতেমা জিন্নাহ নির্বাচনী কমিটি'

www.Educationblog24.com

গঠন। রাজনৈতিক, অরাজনৈতিক, ছাত্র, যুবক ও স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিদের নিয়ে সম্মিলিতভাবে ইহা গঠন করা।

পাকিস্তান ডেমোক্রেটিক মুভমেন্ট (পি.ডি.এম) গঠন

আওয়ামী লীগের ছয়দফা আন্দোলনের ফলে সরকার ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে এবং এই আন্দোলনকে অঙ্কুরেই বিনাশ করার উদ্দেশ্যে আওয়ামী লীগের প্রথম সারির প্রায় সকল নেতাকে গ্রেফতার করা হয়। ফলে ছয়দফার আন্দোলন কিছুটা ভাটা পড়ে। এমনি অবস্থায় আইয়ুব-বিরোধী রাজনৈতিক দলসমূহের নেতৃবৃন্দ ১৯৬৭ সালের ২ মে ঢাকায় আতাউর রহমানের (যিনি একসময় আওয়ামী লীগে নেতা ছিলেন এবং পরে এনডিএফ-এর সঙ্গে যুক্ত হন) বাসায় মিলিত হন এবং পাকিস্তান ডেমোক্রেটিক মুভমেন্ট (পি.ডি.এম) নামক ঐক্যজোট গঠন করেন। এই জোটের অন্তর্ভুক্ত দলসমূহ ছিল কাউন্সিল মুসলিম লীগ, নেজামে এছলামী, কৃষক-শ্রমিক পার্টি, এন.ডি.এফ. এবং জামায়াতে ইসলামী। আওয়ামী লীগের অধিকাংশ নেতা বন্দি থাকায় এবং ছয়দফা আন্দোলন সাময়িকভাবে স্তিমিত হওয়ায় পূর্ব পাকিস্তানে যে রাজনৈতিক শূন্যতা সৃষ্টি হয় পি.ডি.এম. সেই শূন্যতা পূরণের চেষ্টা করে। পি.ডি.এম. এ যোগদানা করা হবে কি–না এই প্রশ্নে আওয়ামী লীগের মধ্যে ভাঙন ধরনোর চেষ্টা করা হয়। শেখ মুজিবুর রহমান, তাজউদ্দীন আহমদ প্রমুখ কারাগারে বন্দি থাকার সুযোগে আওয়ামী লীগের কিছু রক্ষণশীল নেতা– যেমন আবদুর রশীদ তর্কবাগীশ, আবুল মনসুর আহমদ প্রমুখ– পি.ডি.এম এ যোগদানের পক্ষপাতী ছিলেন। কিন্তু এই দলের ভাইস-প্রেসিডেন্ট ও ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক যথাক্রমে সৈয়দ নজরুল ইসলাম ও আমেনা বেগম পি.ডিএম. এ যোগদানে বিরোধিতা করেন। ফলে আওয়ামী লীগ দুই ভাগে বিভক্ত হয় এক অংশে থাকে ছয়দফা-পন্থীরা, অন্য অংশে পি.ডি.এম.–পন্থীরা। শেষ পর্যন্ত আওয়ামী লীগের সামান্য কয়েকজন রক্ষণশীল নেতা আবদুর রশীদ তর্কবাগীশের নেতৃত্বে পি.ডি.এম-এ যোগ দেন। পি.ডি.এম. আট দফা কর্মসূচী ঘোষণা করে। উক্ত দফাগুলি ছিল নিম্নরূপ–

পি.ডি.এম.এর আট দফা

এক. শাসনতন্ত্রে নিম্নবিধানসমূহের ব্যবস্থা থাকিবে :

(ক) পার্লামেন্টারি পদ্ধতির ফেডারেল সরকার;

(খ) ১৯৫৬ সালের শাসনতন্ত্র মোতাবেক প্রাপ্তবয়স্কদের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত আইন পরিষদের প্রাধান্য;

(গ) পূর্ণাঙ্গ মৌলিক অধিকার;

(ঘ) সংবাদপত্রের অবাধ আযাদী ও

(ঙ) বিচার বিভাগের নিশ্চিত স্বাধীনতা।

দুই. ফেডারেল সরকার নিম্ন বিষয়সমূহের উপর ক্ষমতা প্রয়োগ করিবেন:

(ক) প্রতিরক্ষা (ডিফেন্স);

(খ) বৈদেশিক বিষয়;

www.Educationblog24.Com

(গ) মুদ্রা ও কেন্দ্রীয় অর্থব্যবস্থা;

(ঘ) আন্তঃপ্রাদেশিক যোগাযোগ ও বাণিজ্য এবং ঐক্যমত নির্ধারিত অন্য যে-কোনো বিষয়।

তিন. পূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন কায়েম করা হইবে এবং কেন্দ্রীয় বিষয়গুলো সরকারের অবশিষ্ট যাবতীয় ক্ষমতা শাসনতন্ত্র মোতাবেক স্থাপিত উভয় আঞ্চলিক সরকারের নিকটই ন্যাস্ত থাকিবে।

চার. উভয় প্রদেশের মধ্যে বিরাজমান অর্থনৈতিক বৈষম্য বিষয়ে ব্যয় এবং বর্তমান ভবিষ্যৎ বৈদেশিক ঋণসহ কেন্দ্রীয় সরকারের দেনায় পূর্ব পাকিস্তানে ব্যয়িত অর্থের আনুপাতিক অংশ আদায়ের পর পূর্ব পাকিস্তানে অর্জিত সম্পূর্ণ বৈদেশিক মুদ্রা নিরঙ্কুশভাবে এই প্রদেশেই ব্যয় করা হইবে;

(খ) দুই অঞ্চলের অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রা প্রাদেশিক সরকারদ্বয়ের নিরঙ্কুশ কর্তৃত্বাধীনেই থাকিবে;

(গ) অর্থনৈতিক বৈষম্য দূর না-হওয়া পর্যন্ত পাকিস্তান সরকার বৈদেশিক সাহায্য ও ঋণের ক্ষেত্রে পূর্ব পাকিস্তানকে অগ্রাধিকার প্রদান করিবেন এবং এমন আর্থিক নীতি গ্রহণ করিবেন যাহাতে পূর্ব পাকিস্তান হইতে মূলধন পাচার সম্পূর্ণ বন্ধ হইয়া যায়। এই উদ্দেশ্যে ব্যাংকের মওজুদ অর্থ ও মুনাফা, বীমার প্রিমিয়াম এবং শিল্পের মুনাফা সম্পর্কে যথাসময়ে উপযুক্ত আইন প্রণয়ন করা হইবে।

পাঁচ. (ক) মুদ্রা, বৈদেশিক মুদ্রা ও কেন্দ্রীয় ব্যাংকিং;

(খ) আন্তঃ আঞ্চলিক বাণিজ্য;

(গ) আন্তঃ আঞ্চলিক যোগাযোগ;

(ঘ) বৈদেশিক বাণিজ্য।

উপরোক্ত বিষয়সমূহের প্রেক্ষাপটে প্রত্যেকটি পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের সমসংখ্যক সদস্য লইয়া গঠিত এক-একটি বোর্ড দ্বারা পরিচালিত হইবে। জাতীয় পরিষদের প্রত্যেক প্রদেশের সদস্যগণ নিজ প্রদেশের জন্য উক্ত বোর্ডসমূহের সদস্যগণকে নির্বাচন করিবেন।

ছয়. সুপ্রিমকোর্ট এবং কূটনৈতিক বিভাগসহ কেন্দ্রীয় সরকারের সকল বিভাগ ও স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের সমসংখ্যক ব্যক্তি দ্বারা গঠিত হইবে। এই সংখ্যাসাম্য অর্জনের জন্য ভবিষ্যতে এমনভাবে কর্মচারী নিয়োগ করিতে হইবে যাহাতে দশ বৎসরের মধ্যে তাহাদের সংখ্যা উভয় প্রদেশে সমান হইতে পারে।

সাত. প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে কার্যকরী সামরিক শক্তি ও সমরসজ্জার ব্যাপারে উভয় অঞ্চলের মধ্যে সমতা বিধান করা পাকিস্তান সরকারের শাসনতান্ত্রিক দায়িত্ব হইবে। এই উদ্দেশ্যে :

(ক) পূর্ব পাকিস্তানে সামরিক একাডেমী, অস্ত্র নির্মাণ কারখানা, ক্যাডেট কলেজ

www.Educationblog24.Com

ও স্কুল স্থাপন করিতে হইবে;

(খ) দেশরক্ষা বাহিনীর তিনটি বিভাগেই পূর্ব পাকিস্তান হইতে প্রয়োজনীয় সংখ্যক লোক নিয়োগ করিতে হইবে;

(গ) নৌবাহিনীর সদর দফতর পূর্ব পাকিস্তানে স্থানান্তরিত করিতে হইবে।

আট. এই ঘোষণায় 'শাসনতন্ত্র' শব্দ দ্বারা ১৯৫৬ সালের শাসনতন্ত্র বুঝায়–যাহা অবিলম্বে জারি করা হইবে। এই শাসনতন্ত্র চালু করিবার ছয় মাসের মধ্যে কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক আইন পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইবে। জাতীয় পরিষদের প্রথম অধিবেশনেই এই কর্মসূচীর দুই হইতে সাত নম্বর দফাসমূহকে শাসনতন্ত্রে সন্নিবেশিত করা হইবে।

আওয়ামী লীগের ছয় দফা দাবির সঙ্গে পি.ডি.এম.-এর আট দফা দাবির তুলনা :

পি.ডি.এম.-এর আট দফা দাবি আওয়ামী লীগের ছয়দফার বর্ধিত সংস্করণ। পাকিস্তানের দুই অংশের মধ্যে বিরাজমান বৈষম্য কত বছরে দূর করা হবে– ছয়দফায় এর কোনো উল্লেখ ছিল না। কিন্তু আট দফায় বলা হয়েছিল যে, দশ বছরের মধ্যে ঐ বৈষম্যসমূহ দূর করতে হবে। আট দফায় সামরিক বাহিনীর বৈষম্যও দূর করার দাবি উত্থাপন করা হয় বা ছয় দফায় করা হয়নি। পি.ডি.এম.-এর গঠন-কাঠামো ও এর গৃহীত কর্মসূচী ইতিপূর্বে গঠিত কপ কিংবা এন.ডি.এফ. থেকে ভিন্নতর ছিল। পি.ডি.এম. আইয়ুব বিরোধী আন্দোলন গড়ে তুলতে বদ্ধপরিকর ছিল। পি.ডি.এম.-এ অনেক পশ্চিম পাকিস্তানী নেতা ছিলেন, ফলে এই জোট একটি জাতীয় বিরোধীদলের জোট রূপ লাভ করে। আওয়ামী লীগের স্বায়ত্তশাসনের দাবি একটি আঞ্চলিক দলের জোট কিন্তু পি.ডি.এম-এর স্বায়ত্তশাসনের দাবি একটি জাতীয় দাবিতে পরিণত হয়। ফলে আওয়ামী লীগের ছয় দফায় বর্ণিত স্বায়ত্তশাসনের দাবি অধিকতর জনপ্রিয়তা লাভ করে। তবে ১৯৬৭ সালের ন্যাপ ও আওয়ামী লীগের ভাঙন এবং ভাসানী ন্যাপ কর্তৃক আইয়ুব সমর্থন দান ছয় দফা আন্দোলনকে কিছুটা বেকায়দায় ফেলে। এসময় পশ্চিম পাকিস্তানের জুলফিকার আলী ভুট্টো 'পাকিস্তান পিপলস পার্টি' গঠন করেন এবং ভাসানী ন্যাপের সাথে রাজনৈতিক ঐক্য স্থাপন করেন।

ডেমোক্রেটিক এ্যাকশন কমিটি (ডাক) গঠন

পাকিস্তান সরকার যখন আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা শুরু করেছিলেন ঠিক এসই সময়েই পি.ডি.এম.-ভুক্ত পাঁচটি দল ও অপর তিনটি দল মিলে 'ডেমোক্রেটিক এ্যাকশন কমিটি' সংক্ষেপে 'ডাক' (DAC) নামক একটি বিরোধী জোট গঠন করেন। এই জোট ছিল এন.ডি.এফ.,পি.ডি.এম. ছয় দফাপন্থী আওয়ামী লীগ, ন্যাপ (ওয়ালী), কাউন্সিল মুসলিম লীগ, জামায়াতে ইসলামী এবং নেজামে এছলামী দলসমূহ। ভাসানী ন্যাপ এবং জুলফিকার আলী ভুট্টোর পাকিস্তান পিপলস পার্টি এই জোটে যোগদান করেনি। 'ডাক' (DAC)-এর অন্যতম নেতৃবৃন্দ ছিলেন এন.ডি.এফ-এর হামিদুল হক চৌধুরী নূরুল আমিন, মাহমুদ আলী, নেজামে এছালামীর ফরিদ আহমেদ, পীর মোহসীনউদ্দিন (দুদু

www.Educationblog24.com

মিয়া), পি.ডি.এম.-পন্থী আওয়ামী লীগের আবদুস সালাম খান, ছয় দফা-পন্থী আওয়ামী লীগের সৈয়দ নজরুল ইসলাম, জামায়াতে ইসলামীর অধ্যাপক গোলাম আযম, ন্যাপ (ওয়ালী)-এর অধ্যাপক মোজাফফর আহমেদ এবং স্বতন্ত্র বিচারপতি এস.এম. রাশেদ। পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সভাপতি নসরুল্লাহ খান এর আহ্বায়ক মনোনীত হন। 'ডাক' জনসাধারণের রাজনৈতিক সার্বভৌমত্ব পুনরুদ্ধারের মহান দায়িত্ব পালনের জন্য বর্তমান আন্দোলনকে ব্যাপকতর ও সমন্বিত করে একটি অহিংস, সংঘবদ্ধ ও শৃঙ্খলাবদ্ধ গণআন্দোলন গড়ে তোলার সংকল্প ঘোষণা করে এবং সে লক্ষে ৮ দফা কর্মসূচি ঘোষণা করে। উক্ত ৮ দফা ছিল নিম্নরূপ :

১. ফেডারেল প্রকৃতির পার্লামেন্টারি শাসনব্যবস্থা কায়েম;
২. প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটে প্রত্যক্ষ নির্বাচন;
৩. অবিলম্বে জরুরি অবস্থা প্রত্যাহার;
৪. পূর্ণ নাগরিক অধিকার পুনঃপ্রতিষ্ঠা। সমস্ত কালাকানুন বিশেষকরে বিনা বিচারে আটক রাখার আইন ও বিশ্ববিদ্যালয় অর্ডিন্যান্স বাতিল;
৫. খান আবদুল ওয়ালী খান, শেখ মুজিবুর রহমান, জুলফিকার আলী ভুট্টোসহ সকল রাজনৈতিক বন্দি, রাজনৈতিক কারণে জারিকৃত সব গ্রেফতারি পরোয়ানা প্রত্যাহার;
৬. ফৌজদারি কার্যবিধির ১৪৪ ধারার আওতায় জারিকৃত সকল নির্দেশ প্রত্যাহার;
৭. শ্রমিকদের ধর্মঘটের অধিকার;
৮. নতুন ডিক্লারেশন দানের উপর আরোপিত বিধিনিষেধ সহ সংবাদপত্রের উপর জারিকৃত সকল নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার এবং ইত্তেফাক, চাতন, প্রগেসিভ পেপারস লিমিটেডসহ সকল বাজেয়াপ্তকৃত কিংবা ডিক্লারেশন বাতিলকৃত প্রেস পত্রিকা এবং সাময়িকী তাদের আদি মালিকের কাছে প্রত্যাবর্তন।'

'ডাক'-এর এই কর্মসূচির দলিলে স্বাক্ষরদাতাগণ তাদের নিজ নিজ দলের পক্ষ থেকে এই প্রতিজ্ঞা করেন যে তারা এবং তাদের পার্টি জনগণকে তাদের পূর্ণ সার্বভৌম ক্ষমতা ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য এবং ৮ দফা কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য নিরলসভাবে সুশৃঙ্খল, সুসংগঠিত, অহিংস আন্দোলন চালিয়ে যাবে।

'ডাক'-এর গৃহীত ৮ দফা কর্মসূচির প্রথম দুটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু বামপন্থী ও ডানপন্থীদের সমন্বয়ে গঠিত হওয়ায় এই জোটের পক্ষে আওয়ামী লীগের ছয় দফাকেও পুরোপুরি সমর্থন করা সম্ভব ছিল না। কিংবা আমেরিকার সঙ্গে সামরিক জোট গঠনেও অস্বীকার করতে পারছিল না। এমতাবস্থায় ডাকের পক্ষে আইয়ুব বিরোধী গণআন্দোলন গড়ে তোলা সম্ভব হয়নি।

এই অবস্থায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীবৃন্দ এক ব্যাপক ছাত্র-আন্দোলন গড়ে তোলেন যা পরে গণআন্দোলনের রূপ নেয়।

ছাত্রদের এগার দফা আন্দোলন

বিস্তারিত সপ্তম অধ্যায় দ্রষ্টব্য

www.Educationblog24.Com

মুসলিম লীগের অপশাসন ও গণতান্ত্রিক রাজনীতির সংগ্রাম ও ভাষা আন্দোলন : পটভূমি ও ঘটনা প্রবাহ

ভারতীয় উপমহাদেশে মুসলমানদের জন্য একটি আলাদা আবাসভূমি দরকার–এই স্লোগানের ভিত্তিতে পাকিস্তান রাষ্ট্রের জন্ম হয়। স্বভাবতই ধর্মই ছিল পাকিস্তান জাতীয়তার ভিত্তি। ১৯৫১ সালের আদমশুমারি রিপোর্ট অনুযায়ী পশ্চিম পাকিস্তানের প্রায় ৯৭% এবং পূর্ববাংলার ৮০% ছিল মুসলমান। কিন্তু অধিকাংশ অধিবাসীর ধর্ম এক হলেও তাদের ভাষা ছিল ভিন্ন। ১৯৫১ সালে ভাষার ভিত্তিতে পাকিস্তান জনগণের শতকরা হার ছিল নিম্নরূপ :

বাংলা	ভাষার	জনসংখ্যা	-	৫৬.৪০
পাঞ্জাবি	"	"	-	২৮.৫৫
পুশতো	"	"	-	৩.৪৮
সিন্ধি	"	"	-	৫.৪৭
উর্দু	"	"	-	৩.২৭
বেলুচি	"	"	-	১.২৯
ইংরেজি	"	"	-	০.০২
অন্যান্য	"	"	-	১.৫২
মোট			-	১০০.০০

বহু ভাষাভাষীর দেশ পাকিস্তানে রাষ্ট্রভাষার প্রশ্নটি স্বাধীনতার অব্যবহিত পর থেকে রাজনৈতিক সংকটের সৃষ্টি করে। এই সংকট সৃষ্টির জন্য দায়ী তৎকালীন শাসকগোষ্ঠী। তাদের একগুঁয়েমি ও অবিবেচক সিদ্ধান্তের ফলে পূর্ববাংলার জনগণের মনে ক্ষোভ সৃষ্টি করে, আর এই ক্ষোভ থেকে জন্ম নেয় বাঙালি জাতীয়তাবাদের চেতনা।

পূর্ব পাকিস্তানে ভাষা সচেতনতা

পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা কী হওয়া উচিত এ বিষয়ে প্রথম বিতর্ক শুরু করে বুদ্ধিজীবী মহল। ১৯৪৭ সালের জুলাই মাসে আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ড. জিয়াউদ্দিন আহমেদ উর্দুকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হিসাবে গ্রহণ করার প্রস্তাব করলে ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ জ্ঞানগর্ভ যুক্তি দিয়ে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার পাল্টা প্রস্তাব করেন। ড. শহীদুল্লাহ ছাড়াও ১৯৪৭ সালের মধ্যেই বাংলা রাষ্ট্রভাষার প্রতি বহু প্রখ্যাত ও স্বল্পখ্যাত এবং অখ্যাত লেখক তাদের দ্ব্যর্থহীন সমর্থন জানিয়েছিলেন। এর ফলে পূর্ববাংলার শিক্ষিত সমাজ এবং ছাত্রসমাজের মধ্যে বাংলা রাষ্ট্রভাষার সপক্ষে একটি প্রবল জনমত সৃষ্টি হয়। পত্র-পত্রিকায় লেখালেখির পাশাপাশি বিভিন্ন রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক সংগঠন প্রতিষ্ঠার মাধ্যমেও বাংলাভাষার দাবিকে জোরদার করা হয়। স্বাধীনতার অব্যবহিত পরে নবগঠিত ২/১টি রাজনৈতিক সংগঠনও বাংলা ভাষার প্রশ্নে বক্তব্য রাখে। ১৯৪৭ সালের ৬ ও ৭ সেপ্টেম্বর 'পূর্ব পাকিস্তানের গণতান্ত্রিক যুবলীগের' এক কর্মী সম্মেলনে ভাষা সম্পর্কে নিম্নলিখিত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় :

পূর্ব পাকিস্তান কর্মী সম্মেলনে প্রস্তাব করিতেছি যে, বাংলাভাষাকে পূর্ব পাকিস্তানের শিক্ষার

www.Educationblog24.Com

বাহন ও আইন-আদালতের ভাষা করা হউক। সমগ্র পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা কী হইবে তৎসম্পর্কে আলাপ-আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের ভার জনসাধারণের উপর ছাড়িয়া দেওয়া হউক এবং জনগণের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলিয়া গৃহীত হউক।

আর একটি সাংস্কৃতিক সংগঠন ভাষার প্রশ্নে সোচ্চার হয়। এই সংগঠনটির নাম 'তমুদ্দন মজলিশ'। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক আবুল কাশেমের উদ্যোগে ২ সেপ্টেম্বর ১৯৪৭ তারিখে উক্ত সংগঠনটি প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রতিষ্ঠার পর সংগঠনটি বিভিন্ন সাহিত্য-বৈঠক আয়োজন করে। এই সংগঠন ছাত্র-শিক্ষক মহলে বাংলাভাষা সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি করে। ১৫ সেপ্টেম্বর ১৯৪৭ সালে 'পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা–বাংলা না উর্দু' শীর্ষক একটি বই মজলিশ কর্তৃক প্রকাশিত হয়।

ভাষা বিতর্কের সূত্রপাত

যদিও পাকিস্তানের মাত্র ৩.২৭% ভাগ লোকের মাতৃভাষা ছিল উর্দু তথাপি উর্দুকেই স্বাধীনতার অব্যবহিত পর থেকেই পাকিস্তানের সরকারি ভাষা হিসেবে চাপিয়ে দেয়ার এক চেষ্টা চলছিল। পাকিস্তানের মুদ্রা, ডাকটিকেট, মানি অর্ডার ফরম, রেলের টিকেট প্রভৃতিতে কেবল ইংরেজি ও উর্দুভাষা ব্যবহার করা হয়। পাকিস্তান পাবলিক সার্ভিস কমিশনের বিষয় তালিকা থেকে এবং নৌ ও অন্যান্য বিভাগের নিয়োগ পরীক্ষায় বাংলাকে বাদ দেয়া হয়। এমনকি পাকিস্তান গণপরিষদের সরকারি ভাষা হিসেবে ইংরেজি ও উর্দুকে নির্বাচন করা হয়। গণপরিষদের অধিবেশন শুরু হলে ২৩ ফেব্রুয়ারি (১৯৪৮) কংগ্রেস দলীয় সদস্য ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত একটি সংশোধনী প্রস্তাব উত্থাপন করে ইংরেজি ও উর্দুর সঙ্গে বাংলাকেও গণপরিষদের সরকারি ভাষা করার প্রস্তাব দেন। ২৫ ফেব্রুয়ারি তাঁর এই প্রস্তাবের ওপর আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। তিনি যুক্তি দিয়ে বলেন যে, প্রাদেশিকতার মনোভাব নিয়ে তিনি এ প্রস্তাব করেননি। যেহেতু পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠ লোকের মাতৃভাষা বাংলা, সুতরাং সংখ্যাগরিষ্ঠের ভাষাই পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হওয়া উচিত।

কিন্তু যেহেতু এই প্রস্তাবটি আসে একজন হিন্দু সদস্যের কাছ থেকে তাই মুসলিম নেতৃবৃন্দ ধীরেন্দ্রনাথ দত্তের প্রস্তাবে ষড়যন্ত্রের গন্ধ খুঁজে পান। তাঁরা উক্ত প্রস্তাবকে দেশের সংহতি ও অখন্ডতা বিনষ্ট করার প্রয়াস বলে মন্তব্য করেন। গণপরিষদের অধিবেশনে প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খান মন্তব্য করেন যে, একটি সাধারণ ভাষার মাধ্যমে পাকিস্তানের মুসলমানদের মধ্যে ঐক্যবন্ধনের যে প্রয়াস চালানো হচ্ছে তা বানচাল করার জন্যই বাংলাভাষার প্রস্তাব করা হচ্ছে। তিনি বলেন যে, উপমহাদেশের কোটি কোটি মুসলমানের দাবির ভিত্তিতে পাকিস্তান রাষ্ট্র কায়েম করা হয়েছে। পাকিস্তান একটি মুসলিম রাষ্ট্র। তাই পাকিস্তানের ভাষা মুসলমানদের ভাষা হওয়া উচিত। যেহেতু পাকিস্তানের মুসলমানদের সাধারণ ভাষা উর্দু, অতএব উর্দুই হবে পাকিস্তানের একমাত্র সরকারি ভাষা, অন্য কোনো ভাষা নয়।

বিতর্কের পর ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত আনীত প্রস্তাব ভোটে দেয়া হলে অগ্রাহ্য হয়। পূর্ববাংলা মুসলিম লীগ দলীয় বাঙালি মুসলমান সদস্যগণ প্রস্তাবের বিরুদ্ধে ভোট দেন।

www.Educationblog24.com

www.Educationblog24.com

বাংলাকে গণপরিষদের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার দাবি অগ্রাহ্য হওয়ায় পূর্ববাংলায় গণ আন্দোলনের সূত্রপাত ঘটে। গণপরিষদে দেয়া লিয়াকত আলী খানের ঘোষণার প্রতিবাদে পূর্ববাংলায় ছাত্র-শিক্ষক-সাংবাদিক নির্বিশেষে সকল বুদ্ধিজীবী শ্রেণী এক নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলন গড়ে তোলেন।

উর্দুকে একমাত্র রাষ্ট্রভাষা ঘোষণার প্রতিবাদে ২৬ ফেব্রুয়ারি (১৯৪৮) ঢাকার ছাত্রবৃন্দ ধর্মঘট পালন করেন। ধর্মঘট চলাকালীন ঢাকার বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের ছাত্ররা বাংলাভাষার সমর্থনে স্লোগান দিতে দিতে রমনা এলাকায় মিছিল করে। মিছিল বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে এসে শেষ হলে সেখানে এক সভা হয়। সভায় সভাপতিত্ব করে তমুদ্দিন মজলিশের সম্পাদক আবুল কাশেম। সভায় বক্তারা বলেন– পাকিস্তান গণপরিষদের অধিবেশনে ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত যে প্রস্তাব করেছেন তা কোনো সাম্প্রদায়িক চিন্তা নয়, বরং সমস্ত বাংলা ভাষাভাষীদের দাবি এই যে উর্দুর পাশাপাশি বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা ঘোষণা করতে হবে। পাকিস্তানের মুদ্রায় টিকিটে, মানি অর্ডার ফরমে কেবল উর্দুভাষা উল্লেখ থাকার কড়া সমালোচনা করা হয় এবং উর্দুর পাশাপাশি বাংলাভাষা মুদ্রণ করারও জোর দাবি জানানো হয়।

বাংলাভাষার সংগ্রামকে সক্রিয় করার উদ্দেশ্যে একটি সংগঠনের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে ২ মার্চ (১৯৪৮) ঢাকার ফজলুল হক হলে 'রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ' গঠন করা হয়। এই পরিষদে নিম্নলিখিত সংগঠনের প্রত্যেকটি থেকে দুইজন করে প্রতিনিধি অন্তর্ভুক্ত করা হয়। যথা : তমুদ্দন মজলিশ, গণআজাদী লীগ, গণতান্ত্রিক যুবলীগ, সলিমুল্লাহ মুসলিম হল, ফজলুল হক, মুসলিম হলসহ অন্যান্য ছাত্রাবাস এবং পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগ। ছাত্র ফেডারেশন কমিউনিস্ট দলের ছাত্র সংগঠনকেও অন্তর্ভুক্ত করা হয়। পরিষদের আহ্বায়ক মনোনীত হন শামসুল আলম।

রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ ১১ মার্চ (১৯৪৮) পূর্ব পাকিস্তানের সর্বত্র সাধারণ ধর্মঘট আহ্বান করে। উক্ত দিন ছাত্ররা বাংলাভাষাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা ঘোষণার দাবিতে সেক্রেটারিয়েটের বাইরে সমবেত হলে পুলিশ ব্যাপক লাঠিচার্জ করে এবং ফলে কমপক্ষে ৫০ জন ছাত্র গুরুতর আহত হয়। উক্ত সমাবেশে ছাত্ররা প্রাদেশিক গভর্নর খাজা নাজিমউদ্দীনের ও তাঁর মন্ত্রিপরিষদের কড়া সমালোচনা করে এবং গণপরিষদ থেকে পূর্ববাংলার সদস্যদের পদত্যাগের আহ্বান জানায়।

এই প্রতিবাদসভাকে সরকার হিন্দু তথা পাকিস্তানের শত্রুদের দ্বারা আয়োজিত এক গভীর চক্রান্ত বলে প্রচার করে। সরকার ঘোষণা করে যে, বাংলাভাষার আন্দোলন প্রকৃতপক্ষে রাষ্ট্রবিরোধী ষড়যন্ত্র।

কিন্তু ছাত্রদের এই আন্দোলন ১১ মার্চ বন্ধ হয়ে যায়নি, বরং পরের দিনগুলিতে এই আন্দোলন আরো জোরদার হতে থাকে এবং সাধারণ জনসাধারণ আন্দোলনে অংশগ্রহণ করতে থাকে। পরিস্থিতি এমন পর্যায়ে পৌঁছে যে মুখ্যমন্ত্রী খাজা নাজিমউদ্দীন রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম কমিটির সঙ্গে ১৫ মার্চ আলোচনায় বসতে বাধ্য হন। উক্ত আলোচনা সভায় ৮ দফা চুক্তিনামা স্বাক্ষরিত হয়। চুক্তির শর্তসমূহ ছিল নিম্নরূপ :

www.Educationblog24.Com

১. ২৯ ফেব্রুয়ারি, ১৯৪৮ হইতে বাংলাভাষা প্রশ্নে যাহাদিগকে গ্রেফতার করা হইয়াছে তাহাদিগকে অবিলম্বে মুক্তি দান করা হইবে।

২. পুলিশ কর্তৃক অত্যাচারের অভিযোগ সম্পর্কে প্রধানমন্ত্রী স্বয়ং তদন্ত করিয়া এক মাসের মধ্যে এ বিষয়ে একটি বিবৃতি প্রদান করিবেন।

৩. ১৯৪৮-এর এপ্রিলের প্রথম সপ্তাহে পূর্ববাংলা সরকারের ব্যবস্থাপক সভায় বেসরকারি আলোচনার জন্য যে দিন নির্ধারিত হইয়াছে সেই দিন বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করিবার জন্য এবং তাহাকে পাকিস্তান গণপরিষদে এবং কেন্দ্রীয় সরকারের পরীক্ষা দিতে উর্দুর সমমর্যাদা দানের জন্য একটি বিশেষ প্রস্তাব উত্থাপন করা হইবে।

৪. এপ্রিল মাসে ব্যবস্থাপক সভায় এই মর্মে একটি প্রস্তাব উত্থাপন করা হইবে যে, প্রদেশের সরকারি ভাষা হিসেবে ইংরেজি উঠিয়া যাওয়ার পরই বাংলা তাহার স্থলে সরকারি ভাষারূপে স্বীকৃত হইবে। ইহা ছাড়া শিক্ষার মাধ্যমেও হইবে বাংলা। তবে সাধারণভাবে স্কুল-কলেজগুলিতে অধিকাংশ ছাত্রের মাতৃভাষার মাধ্যমেই শিক্ষাদান করা হইবে।

৫. আন্দোলনে যাঁহারা অংশগ্রহণ করিয়াছে তাঁহাদের কাহারো বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবে না।

৬. সংবাদপত্রের উপর হইতে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করা হইবে।

৭. ২৯ ফেব্রুয়ারি হইতে পূর্ববাংলার যে সকল স্থানে ভাষা আন্দোলনের জন্য ১৪৪ ধারা জারি করা হইয়াছে সেখান হইতে তাহা প্রত্যাহার করা হইবে।

৮. সংগ্রাম পরিষদের সাথে আলোচনার পর আমি এ ব্যাপারে নিঃসন্দেহ হইয়াছি যে এই আন্দোলন রাষ্ট্রের দুশমনদের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয় নাই।'

খাজা নাজিমউদ্দীন আলোচনা সভায় স্বীকার করেন যে, রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন কোনো স্বদেশবিরোধী চক্রান্ত নয়। আন্দোলনকারীদের দাবি যথার্থ। তিনি উক্ত চুক্তিনামায় নিজ হাতে লেখেন যে, 'he was satisfied that the movement was not inspired by enemies of the state.'

ইতোমধ্যে পূর্ববাংলা প্রাদেশিক পরিষদের অধিবেশন বসে। উক্ত অধিবেশনে ভাষার বিষয়টি উপেক্ষা করা হয়। ফলে ছাত্ররা নতুন করে আন্দোলন শুরু করে। চুক্তি বাস্তবায়নের জন্য নাজিমউদ্দীন কী ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন তা জানার জন্য ছাত্ররা ১৭ মার্চ (১৯৪৮) প্রাদেশিক পরিষদের সভাকক্ষের দিকে মিছিল সহকারে অগ্রসর হলে পুলিশ লাঠিচার্জ ও বন্দুকের ফাঁকা গুলি করে মিছিল ছত্রভঙ্গ করে দেয়।

ছাত্রদের এই আন্দোলনে নাজিমউদ্দীন ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে পড়েন। তিনি গভর্নর জেনারেল মোহাম্মদ আলী জিন্নাহকে যথাশীঘ্র সম্ভব পূর্ববাংলা সফরে আসার আহ্বান জানান। সে অনুসারে গভর্নর জেনারেল প্রথম এবং শেষবারের মতো ১৯ মার্চ পূর্ববাংলা সফরে আসেন। কিন্তু ভাষার প্রশ্নে তিনি স্বৈরাচারী মনোভাব দেখান। ২১ মার্চ (১৯৪৮) ঢাকা রেসকোর্স ময়দানে আয়োজিত এক বিশাল জনসভায় তিনি দৃঢ়স্বরে ঘোষণা করেন

www.Educationblog24.com

যে, তিনি কোনো শত্রুকে, এমনকি সে যদি মুসলমানও হয়, সহ্য করবেন না। তিনি অত্যন্ত স্পষ্ট করে ঘোষণা করেন যে, পাকিস্তানের সরকারি ভাষা হবে উর্দু–অন্য কোনো ভাষা নয়। জিন্নাহর এই ঘোষণায় সভার কোনো-কোনো অংশ থেকে মৃদু 'নো, নো' ধ্বনি উচ্চারিত হয়। উক্ত সভার তিন দিন পর (২৪ মার্চ, ১৯৪৮) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আয়োজিত সমাবর্তন অনুষ্ঠানে তিনি মন্তব্য করেন যে পূর্ববাংলার ভাষা আন্দোলন আসলে পাকিস্তানের শত্রুদের কারসাজি। তিনি আন্দোলনকারীদের 'পঞ্চমবাহিনী'রূপে অভিহিত করেন। তিনি মন্তব্য করেন যে, বাঙালিরা তাদের প্রদেশের সরকারি ভাষারূপে যে-কোনো ভাষা নির্বাচিত করতে পারে, কিন্তু পাকিস্তানের সরকারি ভাষা অবশ্যই হবে উর্দু। জিন্নাহর এ উক্তির তাৎক্ষণিক প্রতিবাদ করে উপস্থিত গ্রাজুয়েটবৃন্দ 'না না' ধ্বনি উচ্চারণ করে।

জিন্নাহর এই অবিবেচক, স্বৈরাচারী মনোভাব পূর্ববাংলায় বুদ্ধিজীবী মহলে দারুণ ক্ষোভের সৃষ্টি করে। কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতি পূর্ববাংলার মানুষের মনে সন্দেহ ও অবিশ্বাসের ভাব সৃষ্টি হয়। ভাষার আন্দোলন ক্রমান্বয়ে রাজনৈতিক আন্দোলনের রূপ পরিগ্রহ করে। ২৪ মার্চ রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের প্রতিনিধিদল মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে। সাক্ষাৎকারের সময় প্রতিনিধিদল জিন্নাহকে একটি স্মারকলিপি পেশ করে। স্মারকলিপি থেকে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার পক্ষে উপস্থাপিত যুক্তিগুলি জানা যায়।

উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা ঘোষণার স্বার্থ

ইতিহাসের বিচারে এ-কথা স্বীকার করতে হবে যে পাকিস্তানের মতো বহু ভাষাভাষী রাষ্ট্রের জনগণের মধ্যে ঐক্যের বন্ধন সৃষ্টি করতে হলে যে কোনো একটি ভাষাকে Common Language হিসেবে গ্রহণ করার প্রয়োজনীয়তা ছিল। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে যে, তৎকালীন পাক-শাসকগোষ্ঠী কেন উর্দুকে Common Language হিসেবে পাক-জনগণের উপর চাপিয়ে দেয় এবং এর পিছনে রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক কী কারণ নিহিত ছিল? ভারতবর্ষে উর্দুর জন্ম মুঘল শাসনামলে মূলত সেনাবাহিনীর সদস্যদের সাধারণ ভাষা হিসেবে হিন্দি, ফারসি ও আরবি ভাষার সংমিশ্রণে উর্দুর আবির্ভাব। উর্দু ভাষায় শব্দ বিন্যাসের ব্যাকরণগত পদ্ধতি নেয়া হয়েছে হিন্দি থেকে, আর শব্দ নেয়া হয়েছে আরবি ও ফারসি ভাষা থেকে। উর্দু লেখা হত ফারসি বর্ণমালায়। যেহেতু মুসলমান শাসকগোষ্ঠীর উদ্যোগে এই ভাষার জন্ম, তাই কালক্রমে উর্দু শাসকশ্রেণীর এবং মুসলমান অভিজাতশ্রেণীর ভাষায় পরিণত হয়।

ব্রিটিশ আমলে সরকারিভাষা হিসেবে ফারসি পরিত্যক্ত হলে উর্দুর প্রচলন বেড়ে যায়। উচ্চস্তরের মুসলমানগণ উর্দুকে ভাষা ও সংস্কৃতির ধারক, বাহক ও মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করেন। অর্থাৎ ভারতে কংগ্রেস ও হিন্দু মহাসভা হিন্দিকে ভবিষ্যতে রাষ্ট্রভাষা করার প্রস্তুতি নিলে মুসলিম লীগের মুসলমান নেতৃবৃন্দ উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে গ্রহণ করার জন্য বিভিন্ন পত্রিকায় আলোচনার অবতারণা করেছিলেন। এমনকি অনেক বাঙালি

www.Educationblog24.Com

মুসলিম লীগ রাজনীতিবিদ উর্দু পছন্দ করতেন। তাই দেখা যায় যে, পাকিস্তান সৃষ্টির পরও বাঙালি মুসলমান রাজনীতিবিদগণ উর্দুকে বয়কটের কথা কখনো বলেননি। তাঁরা বাংলাকে উর্দুর পাশাপাশি অন্যতম রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা দানের দাবি করেন। পাকিস্তানের মাত্র ৩.২৭% জনগণের মাতৃভাষা উর্দু হলেও পশ্চিম পাকিস্তানের অন্য ভাষাভাষীরা উর্দুকে দ্বিতীয় ভাষা হিসেবে গ্রহণ করে এবং সেখানে শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে উর্দুর প্রচলন করা হয়।

তাছাড়া পাকিস্তান সৃষ্টির পর পাকিস্তানের শাসনভার যে রাজনীতিবিদ ও আমলাদের হাতে যায় তারা অধিকাংশই ছিলেন উত্তর ভারত থেকে আগত উর্দু ভাষাভাষী লোক। নতুন রাষ্ট্রের ব্যবসা, ব্যাংকিং, কয়েকটি পরিবারের হাতে সীমাবদ্ধ হয়। তারাও ছিলেন উর্দু ভাষাভাষী। তাদের মাতৃভাষা ছিল উর্দু। স্বভাবতই তাদের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ক্ষমতার প্রাধান্য বজায় রাখার উদ্দেশ্যে ভাষার উপর প্রাধান্য বজায় রাখতে তাঁদের দৃঢ় সংকল্প ছিল। কারণ উর্দু প্রশাসনিক ও ব্যবসা-বাণিজ্যের ভাষা হলে উর্দু ভাষাভাষীদের জন্য তা যতটা সহজ হবে, অন্য ভাষাভাষীদের জন্য তত সহজ হবে না। প্রশাসনিক, ব্যবসা-বাণিজ্য, শিল্প-কারখানা, যোগাযোগ প্রভৃতি সকল বিভাগের সদর দফতর পশ্চিম পাকিস্তানে অবস্থিত হওয়ায় পশ্চিম পাকিস্তীরা এমনিতেই অনেক সুযোগসুবিধা ভোগ করছিল, তার উপর উর্দুকে দ্বিতীয় ভাষা হিসেবে গ্রহণ করায় সেখানকার অউর্দুভাষীদের জন্য উর্দু কোনো সমস্যা ছিল না। ফলে উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা ঘোষণা করা হলে পশ্চিম পাকিস্তানীরা এটা মেনে নেয়, সেখানকার অউর্দুভাষীরা এর কোনো প্রতিবাদই করেনি। প্রতিবাদ উচ্চারিত হল কেবল পূর্ববাংলায়।

অপরপক্ষে পাকিস্তান শাসকগোষ্ঠী তথা পূর্ববাংলার মুসলিম লীগ সদস্যগণ কর্তৃক বাংলার দাবি অগ্রাহ্য করার পিছনে আশঙ্কা ছিল যে বাংলা তাদের মতে হিন্দুদের ভাষা এবং বাংলাকে স্বীকৃতি দিলে পূর্ববাংলার বাঙালিগণ পশ্চিমবাংলার বাঙালিদের সঙ্গে যোগসাজশ করে ভবিষ্যতে বৃহৎ বাংলার দাবি করতে পারে। সেজন্য পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব বাংলাভাষা আন্দোলনকে রাষ্ট্রবিরোধী ও ইসলামবিরোধী চক্রান্ত বলে অভিহিত করে। বাংলাভাষাকে ইসলামীকরণ করার উদ্দেশ্যে তারা বাংলাকে আরবি কিংবা রোমান অক্ষরে পরিবর্তিত করার উদ্যোগ গ্রহণ করে। দুঃখজনক যে এই গর্হিত কাজের উদ্যোক্তা ছিলেন তৎকালীন (১৯৪৯) কেন্দ্রীয় সরকারের বাঙালি শিক্ষামন্ত্রী ফজলুর রহমান। তাঁর উদ্যোগে কেন্দ্রীয় সরকার ১৯৪৯ সালে পূর্ব পাকিস্তানে ভাষা পুনর্গঠন কমিটি গঠন করে। পূর্ব পাকিস্তানে এর কড়া প্রতিবাদ হয়। ফলে এই কমিটির রিপোর্ট ১৯৬০ সাল পর্যন্ত প্রকাশিত হয়নি।

বাংলাভাষাকে রাষ্ট্রভাষা করার প্রয়োজনীয়তা

পূর্ববাংলা বাংলাভাষা আন্দোলনকারীদের বাংলাভাষাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার দাবির পিছনে যুক্তি ছিল যথেষ্ট। বাংলা ছিল পাকিস্তানের ৫৬% লোকেরা মাতৃভাষা। মাতৃভাষা বাদ দিয়ে অন্য আরেকটি ভাষা শিক্ষা করা ও সেই ভাষায় চাকুরির প্রতিযোগিতায় ভালো করার সম্ভাবনা ছিল কম। পাকিস্তানের প্রশাসনে, সেনাবাহিনীতে ও অর্থনৈতিক সেক্টরে বাঙালিদের অংশগ্রহণ ছিল নগণ্য। তারপর যদি উর্দুকে সরকারি

www.Educationblog24.com

ভাষা করা হয় তাহলে ভাষা সমস্যার কারণে বাঙালিদের কেন্দ্রীয় প্রশাসনে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার সম্ভাবনা আরও ক্ষীণ হত। ফলে সকল ক্ষেত্রে উর্দুভাষীরা অগ্রাধিকার পেয়ে আস্তে আস্তে বাঙালিদের গ্রাস করে নিজেদের একাধিপত্য প্রতিষ্ঠিত করতো। যার অর্থ হচ্ছে বাঙালি সত্তার সমাধি। সুতরাং বাঙালি শিক্ষিত সম্প্রদায় উর্দুকে একমাত্র সরকারি ভাষা করার সিদ্ধান্তের তীব্র প্রতিবাদ করতে বাধ্য হন। তাদের এ প্রতিবাদ ক্রমান্বয়ে পশ্চিম পাকিস্তানী রাজনৈতিক আধিপত্যবাদের বিরুদ্ধে ও অর্থনৈতিক শোষণের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক আন্দোলনের স্বরূপ লাভ করে।

ভাষা-আন্দোলন : জিন্নাহর প্রত্যাবর্তনের পর

জিন্নাহর পূর্ববাংলা সফর ভাষা-আন্দোলনকে স্তিমিত করে দেয়। জিন্নাহ অনেককে বুঝাতে সক্ষম হন যে, ভাষা আন্দোলন ছিল কমিউনিস্টদের কারসাজি। দেশের সংহতি বিনষ্ট করাই উক্ত আন্দোলনকারীদের উদ্দেশ্য। তাঁর জনপ্রিয়তা এবং তাঁর প্রতি সাধারণ মানুষের অগাধ শ্রদ্ধাবোধ অনেক আন্দোলনকারীকে আন্দোলন থেকে সরিয়ে ফেলে। এমনকি তমুদ্দন মজলিশও আন্দোলনের কর্মসূচী প্রত্যাহার করে। তবে ভাষাকে ঘিরে ছাত্রদের মনে ক্ষোভ অব্যাহত থাকে। ছাত্ররা ১৯৪৮-এর পর থেকে ১৯৫১ পর্যন্ত প্রতি বছর ১১ মার্চ পালন করতেন। ১৯৪৯ সালে পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ফজলুর রহমান বাঙালি হয়েও বাংলা বর্ণমালাকে আরবিকরণের পরিকল্পনা করেন। এই উদ্দেশ্যে ৯ মার্চ (১৯৪৯) মাওলানা আকরাম খাঁ-এর নেতৃত্বে ১৬ সদস্য বিশিষ্ট পূর্ববাংলা ভাষা কমিটি গঠিত হয়। এর তাৎক্ষণিক প্রতিবাদ করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের শিক্ষক, ছাত্রছাত্রীবৃন্দ। তারা এর তীব্র নিন্দা করে যথাযথ কর্তৃপক্ষের নিকট প্রতিবাদলিপি পেশ করে। ৩১ ডিসেম্বর (১৯৪৮) ঢাকায় অনুষ্ঠিত পূর্ব পাকিস্তান সাহিত্য সম্মেলনে ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ উক্ত প্রয়াসের সমালোচনা করেন। পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক পরিষদের অধিবেশনে এবং পাকিস্তান গণপরিষদের অধিবেশনে বাংলা বর্ণমালার আরবিকরণ প্রয়াস নিয়ে বিতর্ক হয়। তবে পূর্ব পাকিস্তানের ভাষা কমিটি ৭ ডিসেম্বর (১৯৫০) পেশকৃত রিপোর্টে বাংলা বর্ণমালা আরবিতে লেখার বিরোধিতা করলে সরকারের উক্ত প্রয়াস বাধাগ্রস্ত হয়।

১৯৫০ সালের সেপ্টেম্বরে ভাষার প্রশ্নে নতুন বিতর্কের সূত্রপাত হয়। পাকিস্তান গণপরিষদের সাংবিধানিক মূলনীতি কমিটি ১৯৫০ সালের ২৮ সেপ্টেম্বরে একটি অন্তর্বর্তী রিপোর্ট গণপরিষদে পেশ করে। উক্ত রিপোর্টে উর্দুকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা করার প্রস্তাব হয়। মূলনীতি কমিটির রিপোর্টের প্রতিবাদ ঢাকায় একটি সংগ্রাম কমিটি গঠিত হয়। উক্ত সংগ্রাম কমিটি ৪ ও ৫ নভেম্বর (১৯৫০) ঢাকায় জাতীয় মহাসম্মেলন করেন এবং পাকিস্তানের সাংবিধানিক মূলনীতি সম্পর্কে যে সকল সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় তাতে রাষ্ট্রভাষা সংক্রান্ত প্রস্তাবে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা উর্দু ও বাংলা হবে বলে দাবি করা হয়। সংগ্রাম কমিটি ১২ নভেম্বর পূর্ববাংলায় বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। অবশেষে পাক প্রধানমন্ত্রী উক্ত রিপোর্ট প্রত্যাহার করে নেয়। ফলে ভাষার প্রশ্নটি আপাতত চাপা পড়ে। তবে রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন যেন একেবারে নিঃশেষ হয়ে না যায় সে উদ্দেশ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকজন 'উৎসাহী ও সংগ্রামী' ছাত্র ১৯৫১ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে

www.Educationblog24.Com

'রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ' গঠন করেন। আবদুল মতিন এর আহ্বায়ক নির্বাচিত হন।

১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন

এরপর ১৯৫২ সালের জানুয়ারির শেষের দিকে ভাষা আন্দোলন পুনরুজ্জীবিত হয় খাজা নাজিমউদ্দীনের এক উক্তিতে। প্রধানমন্ত্রী হিসেবে পূর্ববাংলা সফর করতে এসে (২৭-১-১৯৫২) এক জনসভায় তিনি মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর অনুরূপ ঘোষণা দেন যে, উর্দুই হবে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা। তাঁর এই ঘোষণায় ছাত্র-শিক্ষক-বুদ্ধিজীবী মহলে তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। খাজা নাজিমউদ্দীনের উক্তির প্রতিবাদে 'ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ' ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ৩০ জানুয়ারি (১৯৫২) ছাত্র ধর্মঘট ও সভা আহ্বান করে। ৩০ জানুয়ারির সভায় ৪ ফেব্রুয়ারি (১৯৫২) ঢাকা শহরে ছাত্রধর্মঘট, বিক্ষোভ মিছিল ও ছাত্রসভা অনুষ্ঠানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। ভাষা আন্দোলনকে ব্যাপক করার উদ্দেশ্যে '৩১ জানুয়ারি বিকেলে ঢাকার বার লাইব্রেরিতে পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগের সভাপতি মাওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানীর সভাপতিত্বে এক সর্বদলীয় সভা অনুষ্ঠিত হয়।' সভায় পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগ, তমুদ্দন মজলিশ, ইসলামী ভ্রাতৃসংঘ, যুব সংঘ, পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম আওয়ামী লীগ প্রভৃতি সংগঠনের প্রতিনিধি সমন্বয়ে ২৮ মতান্তরে ৪০ সদস্য বিশিষ্ট 'সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ' গঠিত হয়। উক্ত পরিষদ ৪ ফেব্রুয়ারির কর্মসূচী সমর্থন করে এবং ২১ ফেব্রুয়ারি সমগ্র পূর্ব পাকিস্তানে হরতাল, বিক্ষোভ মিছিল ও সভার কর্মসূচী ঘোষণা করে। ২১ ফেব্রুয়ারি পূর্ববাংলা প্রাদেশিক পরিষদের অধিবেশন আহ্বান করা হয়েছিল। '২১ ফেব্রুয়ারি কর্মসূচীর উদ্দেশ্য ছিল ঐ অধিবেশনে বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়ে পূর্ব পাকিস্তানের তরফ হতে এ ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সরকারের ওপর চাপ সৃষ্টি করা। সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের কর্মসূচীর প্রতি প্রাদেশিক সরকার কঠোর মনোভাব প্রদর্শন করে। ১২ ফেব্রুয়ারি ভাষা আন্দোলনের সমর্থক ইংরেজি পত্রিকা 'দৈনিক পাকিস্তান অবজারভার' নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয় এবং ২০ ফেব্রুয়ারি রাত থেকে এক মাসের জন্য সমস্ত ঢাকায় ১৪৪ ধারা জারি করা হয়। ১৪৪ ধারা জারি করার অর্থ একসঙ্গে ৪ জনের বেশি লোকের সমাগম, মিছিল, শোভাযাত্রা, সভা ও সমাবেশ করা আইনবিরোধী।

সরকারি ঘোষণায় বিভিন্ন ছাত্রাবাসে ছাত্ররা বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠে এবং তাঁরা ১৪৪ ধারা ভাঙার সিদ্ধান্ত করেন। কিন্তু সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের সভায় (২০ ফেব্রুয়ারিতে অনুষ্ঠিত) ভোটাভুটিতে ১১ জন ১৪৪ ধারা না-ভাঙার পক্ষে ও ৪ জন ভাঙার পক্ষে ভোট দেন। ফলে সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে ১৪৪ ধারা না-ভাঙার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। অবশ্য এই সিদ্ধান্তের সঙ্গে পূর্ব পাকিস্তান যুবলীগ নেতা অলি আহাদের আনীত একটি প্রস্তাব গৃহীত ও সংযোজিত হয়। ঐ প্রস্তাবটি ছিল : 'যদি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রসভা ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে পথে নেমে পড়ে, তাহলে উক্ত কমিটির সিদ্ধান্ত বাতিল বলে গণ্য হবে এবং এই কমিটিও বাতিল বলে ধরে নেয়া হবে। এই সিদ্ধান্তগুলো লেখা হয়েছিল ইংরেজিতে। যদিও পরিষদের সদস্য সংখ্যা ২৮ কিংবা ৪০ ছিল কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে, মাত্র ১৫ জন ভোটাভুটিতে অংশগ্রহণ করে। বাকিরা সভায় অনুপস্থিত

www.Educationblog24.Com

লেন, না উপস্থিত থেকেও ভোটে অংশ নেননি তা জানা যায় না। যাহোক, সর্বদলীয় ভাষা সংগ্রাম পরিষদের অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন দলের দলীয় সিদ্ধান্ত কী ছিল তা নিয়ে বর্তীতে অনেক বিতর্কের সূত্রপাত ঘটেছে।

যাহোক, ১৪৪ ধারা ভাঙার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন ছাত্ররা, যুবলীগের নেতা ও কর্মীগণ ং ছাত্রনেতাদের কয়েকজন পৃথকভাবে।

একুশে ফেব্রুয়ারি

১৪৪ ধারা ভাঙা, না-ভাঙার আলোচনা হয় ২০ ফেব্রুয়ারির মধ্যরাত পর্যন্ত, ফলে গর সিদ্ধান্ত প্রচারিত হওয়ার সময় ছিল না। ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি স্পতিবার, ৮ ফাল্গুন ১৩৫৮ বঙ্গাব্দ, ২৪ জমাদিয়ুল আউয়াল ১৩৭১ হিজরি। পূর্ব ষণানুযায়ী ২১ ফেব্রুয়ারি সকাল থেকেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্ররা জমায়েত হতে কে। রাস্তায় ১৪৪ ধারা জারি থাকায় বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান থেকে ছাত্ররা দুজন দুজন করে া বিশ্ববিদ্যালয় অভিমুখে আসে। বেলা ১১টায় ছাত্রসভা শুরু হয়। সভায় 'সর্বদলীয় র্ী পরিষদের সিদ্ধান্তের প্রতি নিন্দা জ্ঞাপন করে কর্মপরিষদকে পুনর্গঠন ঘোষণা করে ১৪৪ া ভাঙার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ১৪৪ ধারা ভাঙার পন্থা হিসেবে দশজন দশজন করে র রাস্তায় মিছিল বের করবে বলে সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগ রাত্রে ১৪৪ ধারা ভঙ্গের বিরুদ্ধে মত দিলেও ছাত্রসভার সিদ্ধান্তকে সম্মান দেখিয়ে মেনে নেয় এবং আন্দোলনে অংশগ্রহণ করে। এদের অনেকেই এদিন গ্রেফতার হন। নাব শামসুল হকও পরবর্তীকালে গ্রেফতার হয়ে দীর্ঘদিন জেলে ছিলেন'।

খণ্ড মিছিলগুলো যখন ১৪৪ ধারা ভাঙতে পথে নামছিল তখন রাস্তায় অপেক্ষমান শ তাদেরকে গ্রেফতার করে ট্রাকে তুলে নিয়ে যায়। কিন্তু কতজনকে পুলিশ আটক বে? অবশেষে পুলিশ মিছিলকারীদের উপর বেপরোয়া লাঠিচার্জ শুরু করে। এতেও ছিলকারীদের ঠেকাতে না পেরে নিক্ষেপ করে শত শত কাঁদুনে গ্যাস। পুলিশী হামলার ধ ছাত্ররা ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়। কিন্তু অল্প সময়ের মধ্যেই তারা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ও ডিকেল কলেজের মাঝখানের অনুচ্চ প্রাচীর টপকে মেডিকেল হোস্টেলের প্রধান কের কাছে আবার জমায়েত হন।' উদ্দেশ্য ছিল পূর্ববাংলা আইন পরিষদে গদানকারী সদস্যদের কাছে বাংলাভাষার দাবির কথা পৌঁছে দেয়া। তখন জগন্নাথ র অডিটোরিয়ামে পূর্ববাংলা আইন পরিষদের সভা বসত। আইন পরিষদের স্যবৃন্দ যেন অধিবেশনে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার বিষয়ে সুপারিশ গ্রহণ করেন সে ্য তাদেরকে অনুরোধ করাও ২১ ফেব্রুয়ারির কর্মসূচীর অংশ ছিল।

> প্রায় বেলা ২টা পর্যন্ত মিছিল নিয়ে ছাত্ররা বীরত্বের সঙ্গে গ্রেফতার বরণ করতে থাকে। তখন ধীরে ধীরে ছাত্ররা মেডিক্যাল কলেজ হোস্টেলে, মেডিক্যাল কলেজ ও ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ গেটে জমায়েত হতে থাকে। দলবদ্ধ হয়ে স্লোগান দিয়ে বের হতেই উদ্ধত পুলিশবাহিনী এসে তাড়া করে। বেলা প্রায় সোয়া তিনটার সময় এমএলএ ও মন্ত্রীরা মেডিকেল কলেজের সামনে দিয়ে পরিষদে আসতে থাকেন। ছাত্ররা যতই স্লোগান দেয় আর মিছিলে একত্রিত হয় ততই পুলিশ হানা দেয়। কয়েকবার ছাত্রদের উপর কাঁদুনে গ্যাস ছেড়ে তাড়া করতে মেডিকেল কলেজ হোস্টেলের ভিতর ঢুকে পড়ে। হোস্টেল প্রাঙ্গণে ঢুকে ছাত্রদের উপর আক্রমণ করায়

www.Educationblog24.Com

ছাত্ররা বাধ্য হয় ইট-পাটকেল ছুঁড়তে। একদিকে ইট-পাটকেল, আর অন্যদিকে থেকে তার পরিবর্তে কাঁদুনে গ্যাস আর লাঠিচার্জ। ঘটনাস্থলেই আবদুল জব্বার ও রফিকউদ্দিন আহমদ শহীদ হন। আর ১৭ জনের মতো গুরুতর আহত হন। তাদের হাসপাতালে সরানো হয়। তাদের মধ্যে রাত আটটার সময় আবুল বরকত শহীদ হন। গুলি চালানোর সাথে সাথেই পরিস্থিতির অচিন্তনীয় পরিবর্তন সাধিত হয়। তখন ছাত্রছাত্রীদের চোখেমুখে যেন ক্রোধ ও প্রতিহিংসার আগুন ঝরে। মেডিকেল হোস্টেলের মাইক দিয়ে তখন পুলিশি হত্যাকাণ্ডের তীব্র প্রতিবাদ করা হয়। আইন পরিষদের সদস্যদের প্রতি ছাত্রদের উপর গুলি চালাবার প্রতিবাদে অধিবেশন বর্জন করার দাবি জানানো হয়। ১৪৪ ধারার নাম-নিশানাও তখন আর পরিলক্ষিত হয় না। গুলি চালানোর সংবাদ দাবানলের মতো ছড়িয়ে পড়ে শহরের প্রান্তে প্রান্তে। তখনই অফিস-আদালত, সেক্রেটারিয়েট, বেতারকেন্দ্রের কর্মচারীরা অফিস বর্জন করে বেরিয়ে আসে।

একুশে ফেব্রুয়ারির শহীদ

২১ ফেব্রুয়ারির ঘটনায় শহীদদের সংখ্যা ও পরিচয় নিয়ে যথেস্ট মতভেদ লক্ষ্য করা যায়। ২১ ফেব্রুয়ারির ঘটনার পরপরই নেতৃবৃন্দের আত্মগোপন করার কারণে লাশের পরিচয় ও সংখ্যা সম্পর্কে তারা অনেকেই অজ্ঞাত থাকেন, উপরন্তু রাতে পুলিশ কর্তৃক হাসপাতাল থেকে অধিকাংশ লাশ সরিয়ে ফেলার ফলেও পরবর্তীতে নানান প্রশ্নের অবতারণা হয়। সকলেই যে ২১ ফেব্রুয়ারিতেই মৃত্যুবরণ করেছিলেন তা নয়, আহতদের কেউ কেউ ঘটনার বেশ কিছুদিন পর মৃত্যুবরণ করেন। যেমন সালাম মৃত্যুবরণ করেন ৭ এপ্রিল (১৯৫২)। আবার ২১ ফেব্রুয়ারির প্রতিবাদে ২২ ফেব্রুয়ারি যে প্রতিবাদ মিছিল অনুষ্ঠিত হয় সেই মিছিলে গুলিবিদ্ধ হয়েও কেউ কেউ শহীদ হন। যাহোক, ২১ ফেব্রুয়ারির ঘটনায় উক্ত দিন ও পরে কমপক্ষে ৬ জন যে শহীদ হয়েছিলেন সে বিষয়ে সরকারি বিবরণী অনুযায়ী নিশ্চিত হওয়া যায়। দুঃখজনক যে, আন্দোলনের সংগঠকরা সরকার প্রদত্ত নামের বাইরে শহীদদের আর কারো নাম উদ্ধার করতে পারেনি। ২১ ফেব্রুয়ারির প্রথম শহীদ হচ্ছেন রফিকউদ্দিন আহমদ। তখন তার বয়স ছিল উনিশ বা বিশ। তিনি মানিকগঞ্জের দেবেন্দ্র কলেজে আই.কম. দ্বিতীয় বর্ষে পড়তেন। তিনি কেন ঢাকায় এসেছিলেন তা জানা যায় না। 'শহীদ রফিককে দাফন করা হয়েছিল আজিমপুর গোরস্থানের অসংরক্ষিত এলাকায়। পরেও তার কবর সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়নি বলে সেখানে নতুন কবর পড়েছে।

শহীদ আবুল বরকতের জন্ম ১৬ জুন ১৯২৭ মুর্শিদাবাদ জেলার কান্দি মহকুমার ভরতপুর থানার বাবলাতলে। পিতার নাম শামসুজ্জোহা। 'স্থানীয় তালিবপুর হাইস্কুল থেকে তিনি ১৯৪৫ সালে ম্যাট্রিক এবং বহরমপুর কৃষ্ণনাথ কলেজ থেকে ১৯৪৭ সালে ইন্টারমিডিয়েট পাস করে। ১৯৪৮ সালে তিনি পূর্ববাংলায় চলে আসেন এবং ঢাকায় তার মামা (এসএনজি বিভাগের এ্যাসিস্টেন্ট একাউন্ট অফিসার) মালেক সাহেবের বাসায় পুরানা পল্টন লাইনের 'বিষ্ণুপ্রিয়া ভবনে' উঠে মৃত্যুর দিন পর্যন্ত থাকেন। ১৯৪৮ সালেই তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগে অনার্সে ভর্তি হন। তিনি অত্যন্ত মনোযোগী ছাত্র, ভদ্র, নম্র, বিনয়ী, চরিত্রবান ছিলেন। তিনি অতিরিক্ত লম্বা ছিলেন।

www.Educationblog24.com

১৯৫১ সালে তিনি অনার্স পরীক্ষায় ২য় শ্রেণীতে ৪র্থ স্থান পান। মালেক সাহেবের প্রচেষ্টায় 'রাত ১০টার দিকে বরকতের লাশ হাসপাতাল থেকে কড়া পাহারায় বের করে আজিমপুর গোরস্থানে নিয়ে যাওয়া হয়। বরকতের মামা মালেক সাহেব পরিবারের পক্ষ থেকে কবরের জায়গা কেনার টাকা এবং কাফনের খরচ দেন। পরে বরকতের পরিবার থেকেই তার কবর পাকা করে দেয়া হয়। তাঁর সমাধি এখনো আজিমপুর গোরস্থানে আছে।

শহীদ শফিউর হাইকোর্টের একজন কর্মচারী ছিলেন। পশ্চিমবঙ্গের হুগলি জেলার অন্তর্গত কোন্নগর গ্রামে ১৯১৮ খ্রিস্টাব্দের ২৪ জানুয়ারি তার জন্ম। কলকাতার গভর্নমেন্ট কমার্শিয়াল কলেজ থেকে আই.কম. পাস করার পর তিনি চাকুরি নেন। দেশ বিভাগের পর তিনি স্ত্রী আকিলা বেগম ও পরিবারের অন্যান্য সদস্যসহ ঢাকায় আসেন এবং হাইকোর্টে চাকুরি পান। তিনি ২২ ফেব্রুয়ারি অফিসে যাওয়ার পথে নবাবপুর রোডে গুলিবিদ্ধ হন। অনেক ধরাধরির পর শফিউরের পরিবার লাশের কাফন পরিয়ে দেয়ার অনুমতি পায়। রাত তিনটায় আজিমপুরে তাকে দাফন করা হয়। তার সমাধি আজিমপুর গোরস্থানে রক্ষিত আছে।

শহীদ আবদুল জব্বার ছিলেন একজন দর্জি। গফরগাঁওয়ের পাঁচাইয়া গ্রামের আবদুল কাদেরের পুত্র।

শহীদ অহিউল্লাহর বয়স ছিল মাত্র ৮/৯ বছর। 'রাজমিস্ত্রি হাবিবুর রহমানের ছেলে (অহিউল্লাহ) ২২ ফেব্রুয়ারি নবাবপুর রোডে খোশমহল রেস্টুরেন্টের সামনে হঠাৎ মাথায় রাইফেলের গুলি লেগে নিহত হয় এবং তার লাশ অপসারিত হয়।'

শহীদ আবদুস সালাম ২১ ফেব্রুয়ারি গুলিবিদ্ধ হন। তবে শাহাদত বরণ করে এপ্রিল, ১৯৫২। তিনি পূর্ব পাকিস্তান সরকারের ডাইরেক্টরেট অব ইন্ডাস্ট্রিজে (ইডন বিল্ডিংয়ে) পিয়নের কাজ করতেন। ঢাকায় ৩৬ বি, নীলক্ষেত ব্যারাকে বাস করতেন। তিনি নোয়াখালী জেলার ফেনী মহকুমার লক্ষণপুর গ্রামের মোহাম্মদ ফাজিল মিয়ার পুত্র। তার মৃতদেহের সন্ধান পাওয়া যায়নি।

২১ ফেব্রুয়ারি পরবর্তী ঘটনাবলী

২১ ফেব্রুয়ারি হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদস্বরূপ ২২ ফেব্রুয়ারি থেকে ২৪ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত হরতাল পালিত হয়। বিক্ষোভ মিছিল অনুষ্ঠিত হয়। ২২ ফেব্রুয়ারি পুলিশ মিছিলে গুলিবর্ষণ করে এবং কমপক্ষে ২ মৃত্যুবরণ করে। ২১ থেকে ২৪ ফেব্রুয়ারি চারদিন 'ঢাকা বেতার কেন্দ্রে' পূর্ণ হরতাল পালন করা হয়। ফলে কেবল সংবাদ বুলেটিন ছাড়া অন্য কোনো অনুষ্ঠান প্রচারিত হয়নি। একুশের ঘটনার প্রতিবাদে দৈনিক আজাদের সম্পাদক আবুল কালাম শামসুদ্দীন পূর্ববাংলা প্রাদেশিক পরিষদের সদস্যপদ থেকে পদত্যাগ করে। গভর্ণর ও স্পিকারের কাছে লেখা পদত্যাগপত্রে তিনি লেখেন:

'বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার দাবি করায় ছাত্রদের উপর পুলিশ যে বর্বরতার পরিচয় দিয়াছে তাহার প্রতিবাদে আমার সদস্যপদ হইতে পদত্যাগ করিতেছি। যে নুরুল আমিন সরকারের আমিও একজন সমর্থক– এ ব্যাপারে তাহাদের ভূমিকা এতদূর লজ্জাজনক যে, ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকিতে এবং পরিষদের সদস্য

www.Educationblog24.Com

হিসাবে বহাল থাকিতে লজ্জাবোধ করিতেছি।

মেডিকেল কলেজের ছাত্ররা স্বতঃস্ফূর্তভাবে শহীদদের স্মরণে একটি শহীদ মিনার নির্মাণের সিদ্ধান্ত নেয়। সে অনুসারে ড. সাঈদ হায়দার নকশার পরিকল্পনা করেন। মেডিকেল কলেজ সম্প্রসারণের জন্য প্রচুর ইট, বালি, রড, সিমেন্ট মজুদ ছিল। ২৩ ফেব্রুয়ারি রাতে মিনার নির্মাণে সেই রসদগুলি ব্যবহৃত হয়। অজ্ঞাতনামা দুই রাজমিস্ত্রি মিনার নির্মাণ করে। তাদেরকে সাহায্য করেন দলমত নির্বিশেষে সকল ছাত্র। শহীদ শফিউর রহমানের পিতা ২৪ তারিখে শহীদ মিনার উদ্বোধন করেন। কিন্তু ২৬ ফেব্রুয়ারি পুলিশ উক্ত মিনারটি ভেঙে ফেলে।

২৫ মার্চ (১৯৫২) শহীদ আবুল বরকতের ছোট ভাই আবুল হাসনাত ঢাকা জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, এসপি ও অন্যান্য পুলিশ অফিসারদের বিরুদ্ধে মহকুমা হাকিমের এজলাশে মামলা দায়ের করার চেষ্টা করেন। কিন্তু ফৌজদারি দণ্ডবিধি ১৩৭ ও ১৩২ ধারা অনুযায়ী কেন্দ্রীয় বা প্রাদেশিক সরকারের অনুমতি ছাড়া কোনো সরকারি উচ্চপদস্থ অফিসারের বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ গ্রহণ করা যায় না– এরই পরিপ্রেক্ষিতে যেহেতু আবেদনকারী অনুরূপ কোনো অনুমতিপত্র দাখিল করতে পারেনি তাই অভিযোগটি খারিজ করে দেয়া হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকবৃন্দ ২১ ও ২২ ফেব্রুয়ারির পুলিশী ও মিলিটারি কর্তৃক বিশ্ববিদ্যালয়ের মর্যাদা লঙ্ঘন করার তীব্র নিন্দা প্রকাশ করেন। শিক্ষার মাধ্যমরূপে বাংলা প্রবর্তনের জন্য তাঁরা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ করেন। যে সব রাজনীতিবিদ এতদিন ভাষা আন্দোলন থেকে দূরে ছিলেন তাঁরা (যেমন এ.কে. ফজলুল হক, মাওলানা ভাসানী, আতাউর রহমান খান প্রমুখ) ২৩ ফেব্রুয়ারি 'সিভিল লিবার্টি কমিটি' বা ব্যক্তিস্বাধীনতা কমিটি' নামে একটি সমিতি গঠন করে ভাষা আন্দোলনের সঙ্গে নিজেদের একাত্মতা ঘোষণা করেন। ইতোমধ্যে সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা কর্মপরিষদ ২৪ ফেব্রুয়ারি মেডিকেল কলেজ হোস্টেলে এক সভা অনুষ্ঠিত করে ২৬ ফেব্রুয়ারি থেকে ধর্মঘট প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে এবং সরকারকে বাংলাভাষার দাবি পূরণের জন্য ৫ মার্চ পর্যন্ত সময় দেয় এবং ঐ সময়ের মধ্যে দাবি পূরণ না হলে নতুন আন্দোলনের কর্মসূচী দেয়া হবে বলে হুমকি দেয়া হয়।

সরকারও জেল-জুলুমের নীতি অবলম্বন করে। পুলিশ এমনকি চারজন গণপরিষদ সদস্যকে (আবদুর রশীদ তর্কবাগীশ, খয়রাত হোসেন, মনোরঞ্জন ধর ও গোবিন্দলাল ব্যানার্জী) জননিরাপত্তা আইনে গ্রেফতার করে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কিছু শিক্ষককেও (প্রক্টর মোজাফফর আহমদ চৌধুরী, অধ্যাপক মুনীর চৌধুরী, ড. বি.সি চক্রবর্তী, অজিত কুমার গুহ প্রমুখ) গ্রেফতার করে। ভাষা আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত অনেক নেতা গ্রেফতার জেল-জুলুম এড়ানোর জন্য অনেক রাজনৈতিক নেতা আত্মগোপন করেন। সরকার দেশের জনগণকে বিভ্রান্ত করার জন্য সারাদেশ জুড়ে লক্ষ লক্ষ প্রচারপত্র বিলি করে। আন্দোলনকারীদের শান্ত করার উদ্দেশ্যে মুখ্যমন্ত্রী নূরুল আমিন ২২ ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠিত প্রাদেশিক পরিষদের অধিবেশনে বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার একটি সুপারিশ পাকিস্তান গণপরিষদের বিবেচনার জন্য প্রেরণের একটি প্রস্তাব পাস করিয়ে নেন।

তাছাড়া প্রদেশবাসীর কাছে তাকে এবং সরকারকে নির্দোষ প্রমাণের জন্য তিনি ১৯৫২ প্রদেশবাসীর উদ্দেশে রেডিওতে ভাষণ দেন। ভাষণে তিনি প্রমাণ করতে চান যে

www.Educationblog24.com

'রাষ্ট্রভাষার প্রশ্নটি আসল প্রশ্ন নয়, ইহার পশ্চাতে সরকারকে বানচাল করার জন্য বিদেশী দালাল ও অন্যান্যদের ঘৃণ্য ষড়যন্ত্র নিহিত আছে।'

পূর্ববাংলা প্রাদেশিক পরিষদ বাংলাভাষাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দেয়ার। জন্য কেন্দ্রীয় গণপরিষদের নিকট সুপারিশ প্রেরণ করলেও গণপরিষদের অধিবেশনে সে সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ বাধার সম্মুখীন হয়। পূর্ববাংলা থেকে নির্বাচিত মুসলিম লীগ --গণপরিষদ সদস্য নূর মোহাম্মদ বাংলাভাষা সংক্রান্ত পূর্ববাংলা প্রাদেশিক পরিষদের সুপারিশের বিষয়টি গণপরিষদের অধিবেশনে উথাপন করলেও পূর্ববাংলার জন্য কোন মুসলিম লীগ সদস্য তা সমর্থন করেননি। কেবল কংগ্রেস দলীয় সদস্য ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত ও প্রফেসর রাজকুমার চক্রবর্তী উক্ত প্রস্তাবের সমর্থনে বক্তব্য পেশ করেন। পশ্চিম পাকিস্তানের গণপরিষদের সদস্য সরদার শওকাত হায়াত খান (পাঞ্জাব), সরদার আসাদুল্লাহ জান খান (উ.প.সী.প্র) এবং শেঠ গুকদেব (সিন্ধু) বাংলাভাষাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার পক্ষে যুক্তি দেন। অবশেষে নূর মোহাম্মদ আনীত প্রস্তাব নাকচ হয়ে যায়। এরপর প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিমউদ্দীন পাকিস্তান সংবিধানের মূলনীতি কমিটির যে চূড়ান্ত রিপোর্ট গণপরিষদে উথাপন করেন তাতেও ভাষা প্রশ্নটি অনুল্লেখ থাকে। এরফলে পূর্ব বাংলার অধিবাসীদের অসন্তোষ ও ক্ষোভ আরো বেড়ে যায়।

পরবর্তী ২ বৎসর ভাষার প্রশ্নে আর কোনো অগ্রগতি হয়নি। ১৯৫৪ সালের পূর্ববাংলা প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচন উপলক্ষে পূর্ববাংলার জনগণ ভাষা, স্বায়ত্তশাসনসহ বিভিন্ন দাবির প্রশ্নে তাদের মতামত প্রকাশের সুযোগ লাভ করে। উক্ত নির্বাচনে মুসলিম লীগের বিরুদ্ধে বিভিন্ন দলের সমন্বয়ে 'যুক্তফ্রন্ট' নামক একটি নির্বাচনী জোট গঠিত হয়। উক্ত যুক্তফ্রন্ট নির্বাচনী মেনিফেস্টো হিসেবে যে ২১ দফা নির্বাচনী ওয়াদা ঘোষণা করে তার অন্যতম ছিল বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার অঙ্গীকার, ২১ ফেব্রুয়ারিকে শহীদ দিবস হিসেবে ঘোষণা, ২১ ফেব্রুয়ারির শহীদদের জন্য একটি শহীদ মিনার নির্মাণ ও শহীদদের পরিবারবর্গকে উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ প্রদান।

এই নির্বাচনে পূর্ববাংলার যুক্তফ্রন্ট সংখ্যাগরিষ্ঠ আসনে জয়লাভ করে। মুসলিম লীগের ভরাডুবি ঘটে। ফলে মুসলিম লীগের নেতৃবৃন্দ বাংলা ভাষার আন্দোলনের গুরুত্ব উপলব্ধি করে এবং সে অনুসারে মুসলিম লীগ পার্লামেন্টারি বোর্ডের মিটিংয়ে বাংলাকে উর্দুর পাশাপাশি অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার জন্য সুপারিশ করা হয়। এই সুপারিশের আলোকে ৯ মে ১৯৫৪ তারিখে পাকিস্তান গণপরিষদে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় যে পাকিস্তানের সরকারী ভাষা হবে উর্দু ও বাংলা এবং অন্য আর কোনো প্রাদেশিক পরিষদে সুপারিশ করা হবে। পার্লামেন্টের সদস্যগণ ইংরেজি ছাড়া উর্দু ও বাংলাতে বক্তব্য রাখতে পারবেন। গণপরিষদের এই সিদ্ধান্ত পাকিস্তানের ১৯৫৬ সালে সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত করা হয় এবং এইভাবে বাংলাভাষা অন্যতম রাষ্ট্রভাষার সাংবিধানিক স্বীকৃতি লাভ করে।

১৯৫৮ সালে দেশে সামরিক আইন জারি করা হলে কিছু পশ্চিম পাকিস্তানী আইয়ুব খানকে ভাষার প্রশ্নটি পুনর্বিবেচনা করে কেবল উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা করার জন্য পরামর্শ

www.Educationblog24.Com

দেন। কিন্তু আইয়ুব খান তাতে কর্ণপাত করেননি। বরং ১৯৬২ সালে ঘোষিত তার সংবিধানে তিনি বাংলা ও উর্দুকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হিসেবে বহাল রাখেন (আর্টিকেল-২১৫)।

১৯৭২ সালে প্রণীত স্বাধীন বাংলাদেশের সংবিধানের ৩নং অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রভাষা হবে বাঙলা।

ভাষা আন্দোলন পাকিস্তানের রাজনীতিতে এক সুদূরপ্রসারী প্রভাব ফেলে। ভাষা আন্দোলনের সঙ্গে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংবিধানিক প্রশ্নও জড়িয়ে পড়ে। যেমন কেন্দ্রীয় গণপরিষদে পূর্ববাংলার জনসংখ্যানুপাতিক আসন সংখ্যা দাবি করা হয়। প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন দাবি করা হয়, কেন্দ্রীয় সিভিল সার্ভিসে বাঙালিদেরকে অধিক সংখ্যক নিয়োগের দাবি করা হয় এবং পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে অর্থনৈতিক বৈষম্যের অবসান ঘটানোর দাবি করা হয়। বাংলা ভাষার প্রশ্নে মুসলিম লীগের বৈরী মনোভাবের কারণে এই দল থেকে গণতন্ত্রী দল, যুবলীগ, আওয়ামী লীগ প্রভৃতি নতুন নতুন দলের সৃষ্টি হওয়ায় পূর্ববাংলায় মুসলিম লীগের প্রাধান্য খর্ব হয়। ফলে ১৯৫৪ সালের পূর্ববাংলা প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচনে এই দলের চরম পরাজয় ঘটে।

ভাষা আন্দোলন প্রথম পর্যায়ে একটি সাংস্কৃতিক আন্দোলন ছিল। কিন্তু কালক্রমে এটি রাজনৈতিক রূপ পরিগ্রহ করে। অনেক রাজনৈতিক দল ও রাজনীতিবিদ এই আন্দোলনের সঙ্গে জড়িয়ে পড়েন। ফলে পূর্ববাংলায় স্বাধিকারের চিন্তাচেতনা শুরু হয়। পরবর্তী আন্দোলনসমূহে ভাষা আন্দোলন প্রেরণা হিসেবে কাজ করে। ভাষা আন্দোলন এক ধরনের প্রাদেশিকতাবাদের জন্ম দেয়। এরপর যখনই পূর্ববাংলার স্বার্থসংশ্লিষ্ট কোনো দাবি উচ্চারণ করা হয়েছে তখনই পূর্ববাংলাবাসীর সমর্থন অর্জন করেছে।

ভাষা আন্দোলন ছাত্রসমাজকে প্রচ্ছন্ন রাজনৈতিক শক্তিতে রূপান্তরিত করে। ছাত্ররা প্রত্যক্ষভাবে রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়ে। ভাষা আন্দোলনের মাত্র দুই মাসের মধ্যেই (এপ্রিলে) পূর্ববাংলায় ছাত্র ইউনিয়ন নামে ছাত্রসংগঠন জন্মলাভ করে। পরবর্তী আন্দোলনসমূহে তাই দেখা যায় ছাত্রসমাজই ছিল মূল শক্তি। যে কোনো সরকারের যে কোনো অন্যায় দুর্নীতির বিরুদ্ধে বলিষ্ঠ প্রতিবাদ উচ্চারণ করে ছাত্রসমাজ।

ভাষা আন্দোলন ছাত্র, শিক্ষক, বুদ্ধিজীবী, শ্রমিক, কর্মচারী প্রভৃতি সকল পেশার লোকদের মধ্যে ঐক্যের যে ঐতিহ্য সৃষ্টি করে, পরবর্তী আন্দোলনসমূহে আমরা তার পুনরাবৃত্তি দেখি।

ভাষা আন্দোলনের একটা বিশেষ বৈশিষ্ট্য ছিল এই যে, এর সঙ্গে জড়িত নেতৃবৃন্দ অসাম্প্রদায়িক রাজনীতির প্রবর্তন করেন। পার্লামেন্টের মধ্যে কংগ্রেসদলীয় হিন্দু নেতৃবৃন্দ ভাষার দাবিতে কথা বলেছেন, আর রাজপথে অকংগ্রেসীয়রা ধর্মীয় ভাঁওতাবাজির বিরুদ্ধে বক্তব্য রেখেছেন। ফলে পূর্ববাংলার হিন্দু-মুসলমান সম্প্রীতি বৃদ্ধি পেয়েছে। আওয়ামী-মুসলিম লীগ নামের বৃহৎ রাজনৈতিক দলটি ধর্মীয় ভাঁওতাবাজির রাজনীতি ত্যাগ করে ধর্মনিরপেক্ষতার আদর্শ গ্রহণ করে এবং ১৯৫৫ সালে পার্টির নাম থেকে 'মুসলিম' শব্দ বাদ দিয়ে পার্টিকে সকল ধর্মের লোকদের নিকট গ্রহণযোগ্য করে তোলে। ফলে পরবর্তী আন্দোলনসমূহে নেতৃত্ব আওয়ামী লীগের হাতেই চলে যায়।

www.Educationblog24.Com

১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনে স্কুল-কলেজের ছাত্রীরাও অংশগ্রহণ করে। এর ফলে ছাত্রীদের বোরখা পড়ার অভ্যেস কমে যায়। পরবর্তীতে সভা-সমিতিতে মেয়েদের অংশগ্রহণের ধারা সৃষ্টি হয়। রাজনীতিতেও মেয়েরা সক্রিয় অংশগ্রহণ করতে থাকে। ভাষা আন্দোলনের অনুপ্রেরণা আমাদের মুক্তিসংগ্রামের অন্যতম মূলমন্ত্র ছিল।

হক-ভাসানী-সোহরাওয়ার্দী যুক্তফ্রন্ট, ১৯৫৪সালের নির্বাচন ও পরিণতি

ক. ১৯৫৪ সালের পূর্ববাংলা ব্যবস্থাপক পরিষদের নির্বাচন

অবিভক্ত বাংলার আইন পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় ১৯৪৬ সালে। ১৪ আগস্ট ১৯৪৭-এ ঘোষিত Provincial Legislative Assembly Order. 1947 অনুসারে ১৯৪৬-এর নির্বাচনে নির্বাচিত সদস্যগণ ১৫ আগস্ট ১৯৪৭ থেকে পূর্ববাংলা প্রাদেশিক পরিষদের সদস্যে পরিণত হয়। সুতরাং পরবর্তী নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা ১৯৫২ সালে। কিন্তু উক্ত পরিষদের প্রথম অধিবেশন ১৯৪৮ সালের মার্চ মাসে অনুষ্ঠিত হয়েছে এই যুক্তিতে তৎকালীন কেন্দ্রীয় আইন পরিষদ ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনের ৬১(২) নং ধারা সংশোধন করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন যে, পূর্ববাংলা ব্যবস্থাপক পরিষদের নির্বাচন ১৯৫৩ সালে অনুষ্ঠিত হবে। কিন্তু ১৯৪৯ সালে পূর্ববাংলা ব্যবস্থাপক পরিষদের একটি গুরুত্বপূর্ণ আসনের উপনির্বাচনে মুসলিম লীগ প্রার্থী পরাজিত হওয়ায় প্রাদেশিক মুসলিম লীগ সরকার আর কোনো নির্বাচন মোকাবিলা করতে ভয় পান। ফলশ্রুতিতে নূরুল আমিন সরকারের অনুরোধক্রমে পাকিস্তান গণপরিষদ The East Bengal Legislative Assembly (Continuation) Act. 1953' পাস করার মাধ্যমে পূর্ববাংলা ব্যবস্থাপক পরিষদের মেয়াদ আরও এক বৎসর বৃদ্ধি করেন। অবশেষে ১৯৫৪ সালের ৮ থেকে ১২ মার্চ উক্ত নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়।

নির্বাচন পদ্ধতি

১৯৫২ সালের এপ্রিল মাসে পাকিস্তান গণপরিষদে ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনের নির্বাচন সংক্রান্ত বিধি সংশোধন করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় যে,

ক. নির্বাচন হবে ২১ বৎসর বয়স্ক সকল নাগরিকের প্রত্যক্ষ ভোটে।

খ. অমুসলমানদের জন্য আসন সংরক্ষণ করে পৃথক নির্বাচনী ব্যবস্থা অনুসরণ করা হবে।

গ. পূর্ববাংলা ব্যবস্থাপক পরিষদের আসন সংখ্যা হবে নিম্নরূপ :

১.	মুসলমান আসন	২৩৭টি	(৯টি মহিলা আসনসহ)
২.	সাধারণ (বর্ণ হিন্দুসহ)	৩টি	(১টি মহিলা আসনসহ)
৩.	তফশিলি জাতি হিন্দ	৩৮টি	(২টি মহিলা আসনসহ)
৪.	বৌদ্ধ	২টি	
৫.	খ্রিষ্টান	১টি	
	সর্বমোট	৩০৯টি	(১২টি মহিলা আসনসহ)

১৯৫১ সালের সেন্সাস রিপোর্টকে ভিত্তি করে আসন বণ্টন করা হয়। আনুমানিক ১

www.Educationblog24.Com

লক্ষ ৪০ হাজার অধিবাসীর জন্য একটি আসন নির্দিষ্ট করা হয়। সারণী ১-এর জনসংখ্যা, ভোটার সংখ্যা ও সম্প্রদায় ভিত্তিক আসন বন্টন দেখানো হল। সমস্ত পূর্ববাংলা যেখানে মুসলমানদের জন্য ২২৮টি নির্বাচনী এলাকায় বিভক্ত করা হয়, সেখানে বর্ণ-হিন্দুদের ক্ষেত্রে ৩০টি এলাকায় ও তফশিলি হিন্দুদের জন্য ৩৬টি এলাকায় বিভক্ত হয়। স্বভাবতই বর্ণ-হিন্দু বা তফশিলি হিন্দুদের নির্বাচনী এলাকা মুসলমানদের নির্বাচনী এলাকার চেয়ে অনেক বড় ছিল।

মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত আসন ব্যতিরেকে অন্য আসনেও মহিলাপ্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারতেন। মহিলাদের জন্য যে ১২টি আসন সংরক্ষিত ছিল সে আসনসমূহের নির্বাচনে কেবলমাত্র মিউনিসিপ্যাল এলাকায় মহিলাদেরই ভোটদানের অধিকার ছিল। সুতরাং মিউনিসিপ্যাল এলাকায় বসবাসরত মহিলা ভোটারদের প্রত্যেকের ভোট ছিল ২টি করে– ১টি নিজ সম্প্রদায়ের মহিলা (সংরক্ষিত) প্রার্থীর জন্য, অন্যটি নিজ সম্প্রদায়ের পুরুষ/মহিলা প্রার্থীর জন্য। মফস্বল এলাকায় (মিউনিসিপ্যালিটির বাইরে) বসবাসরত মহিলা ভোটারের ভোট ছিল একটি– নিজ সম্প্রদায়ের পুরুষ/মহিলা প্রার্থীর জন্য।

সারণী-১ : জনসংখ্যা, ভোটার সংখ্যা ও সম্প্রদায়ভিত্তিক আসন বন্টন

সম্প্রদায়	আসন সংখ্যা	মোট জনসংখ্যা	মোট ভোটার সংখ্যা	আসন প্রতি জনসংখ্যা	আসন প্রতি ভোটার সংখ্যা
ক) মুসলমান	২২৮ সং/ম৯	৩,২২,২৬,৬৩৯	১,৫১,৫৯,৮২৫ সং/ম ১,৬১,৯৬৬	১,৪১,৩৪৫	৬৬,৪৯০ সং/ম, ১৭,৯৯৬
খ) সাধারণ (বর্ণ হিন্দুসহ)	৩০ সং/ম ১	৪২,২৭,৯৮২	২০,৯৫,৩৫৫ সং/ম ২৫,৭২৬	১,৪০,৯৩৩	৬৯,৮৪৫ সং/ম ২৫,৭২৬
গ) তফশিলি হিন্দু	৩৬ সং/ম ২	৫০,৫২,২৫০	২৩,০৩,৫৭৮ সং/ম ১৪,৭৮৫	১,৪০,৩৪০	৬৩,৯৮৮ সং/ম ৭,৩৯৩
ঘ) বৌদ্ধ	২	৩,১৮,৯৫১	১,৩৬,৪১৭	১,৫৯,৪৭৫	৬৮,২০৯
ঙ) খ্রিস্টান	১	১,০৬,৫০৭	৪৩,৯১১	১,০৬,৫০৭	৪৩,৯১১
মোট	২৯৭+১২	৪,১৯,৩২,৩২৯			

সং/ম= সংরক্ষিত মহিলা আসনের জন্য মহিলা ভোটার সংখ্যা

১৯৫৩ সালের ১ জানুয়ারি যাদের বয়স ২১ বৎসর পূর্ণ হয়েছিল তারা ভোটার হওয়ার যোগ্য ছিলেন। ভোটার তালিকায় অসংখ্য ভুলভ্রান্তি ছিল। অনেকের নামই ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হয়নি। এমনকি ঢাকা সিটি মুসলিম লীগের প্রেসিডেন্ট জনাব সৈয়দ আহমদ রাজা-এর নাম ভোটার তালিকাভুক্ত হয়েছিল না বলে তিনি অভিযোগ করেছিলেন। ভোটার তালিকা সম্পর্কে আপত্তি পেশের শেষ তারিখ রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের দাবির মুখে ১০ দিন বাড়ানো হলেও আপত্তি পেশের মোট সংখ্যা শতকরা

www.Educationblog24.Com

এক ভাগেরও কম ছিল। চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশিত হয় ২৪ ডিসেম্বর ১৯৫৩। মোট ভোটার সংখ্যা ছিল ১,৯৭,৩৯,০৮৬ এর মধ্যে মহিলা ভোটার ১,০৫,৭১,৯৪৯ জন। ১৯৫৪ সালের ১ জানুয়ারি মনোনয়নপত্র গ্রহণ শুরু হয়। মনোনয়নপত্র দাখিলের শেষ তারিখ ছিল ১৪ জানুয়ারি ১৯৫৪। মনোনয়ন পত্র বাছাই ১৬,১৭ ও ১৮ জানুয়ারি (১৯৫৪) এবং মনোনয়নপত্র প্রত্যাহারের শেষ তারিখ ছিল ২১ জানুয়ারি (১৯৫৪)।

নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী দল ও জোট

১৯৫৪ সালের পূর্ববাংলা ব্যবস্থাপক পরিষদের নির্বাচনে মোট ১৬টি দল অংশগ্রহণ করে। মুসলমান আসনে যে-সকল দল প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে সেগুলো হচ্ছে–মুসলিম লীগ, পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগ, কৃষক-শ্রমিক পার্টি, নেজামে ইসলামী, যুব লীগ, গণতন্ত্রী দল, খেলাফতে রব্বানী পার্টি প্রভৃতি। অমুসলমান আসনে যে দলগুলো নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে সেগুলোর মধ্যে অন্যতম পাকিস্তান জাতীয় কংগ্রেস, তফশিলি ফেডারেশন, গণসমিতি, অভয় আশ্রম (কুমিল্লা), পূর্ব পাকিস্তান সমাজতন্ত্রী দল প্রভৃতি। কম্যুনিস্ট পার্টির মুসলমান সদস্যগণ মুসলমান আসনে এবং হিন্দু সদস্যগণ হিন্দু আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। মুসলমান আসনে আওয়ামী মুসলিম লীগ, কৃষক-শ্রমিক পার্টি এবং নেজামে ইসলামী 'যুক্তফ্রন্ট' গঠন করে সম্মিলিতভাবে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে। হিন্দু আসনের নির্বাচনে গণসমিতি, অভয় আশ্রম ও পূর্ব পাকিস্তান সমাজতান্ত্রিক দল 'সংখ্যালঘু যুক্তফ্রন্ট' গঠন করে।

যুক্তফ্রন্ট গঠন

১৯৫৪ সালের নির্বাচনে ক্ষমতাসীন মুসলিম লীগ সরকারের পতন ঘটানোর উদ্দেশে পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগ, কৃষক-শ্রমিক পার্টি ও নেজামে ইসলামী মিলে 'যুক্তফ্রন্ট' নামক একটি নির্বাচনী আঁতাত গড়ে তোলেন। ইতিপূর্বে ১৯৫২ সালের সেপ্টেম্বর মাসে 'মুসলিম লীগ সরকার' বিরোধী একটা রাজনৈতিক আন্দোলন গড়ে তোলার উদ্দেশে 'যুবলীগ' সকল বিরোধীদলের ঐক্য গড়ে তোলার উদ্যোগ গ্রহণ করে। শুরুতেই 'গণতান্ত্রিক দল' ও 'আওয়ামী লীগ' ঐ উদ্যোগকে স্বাগত জানায়। পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন ও পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগের নেতৃবৃন্দও মুসলিম লীগ বিরোধী জোট গঠন করতে প্রচারাভিযান চালায়। ফলশ্রুতিতে ১৯৫৩ সালের নভেম্বর মাসে ময়মনসিংহে অনুষ্ঠিত আওয়ামী মুসলিম লীগের কাউন্সিল অধিশেন মুসলিম লীগ বিরোধী জোট গঠনের উদ্দেশে সমমনা দলসমূহ নিয়ে যুক্তফ্রন্ট গঠনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

১৯৫৪ সালের নির্বাচন অনুষ্ঠানের ঘোষণা জারির সঙ্গে সঙ্গে শেরে বাংলা এ.কে. ফজলুল হক নির্বাচনী প্রস্তুতি শুরু করেন। ১৯৪৫-৪৬ সালের নির্বাচনে তাঁর দলের ভরাডুবি ঘটলে তিনি রাজনীতি থেকে নির্বাসন গ্রহণ করেন। নূরুল আমিন পূর্ববাংলার মুখ্যমন্ত্রী হয়ে ফজলুল হককে পূর্ববাংলার এ্যাডভোকেট জেনারেল পদে নিযুক্ত করেন। ১৯৫৩ সাল পর্যন্ত তিনি ঐ সরকারি পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ১৯৫৩ সালে তিনি পুনরায় রাজনীতি করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন এবং সরকারি চাকুরিতে ইস্তাফা দিয়ে তাঁর ১৯৩০-

www.Educationblog24.Com

এর দশকের নিজস্ব দল কৃষক-প্রজা পার্টিকে পুনরুজ্জীবিত করেন এবং এর নামকরণ করেন কৃষক-শ্রমিক পার্টি (KSP) আওয়ামী মুসলিম লীগ যুক্তফ্রন্ট গঠনের উদ্যোগ গ্রহণ করলে তিনি যুক্তফ্রন্টে যোগ দেয়ার অভিপ্রায় প্রকাশ করেন।

যুক্তফ্রন্টের আরেক শরিকদল– নিজামে এছলাম এর পূর্ব নাম 'জমিয়তে ওলামায়ে এছলাম'। ১৯৫৩ সালের ২৬ নভেম্বর পূর্বপাক জমিয়তে ওলামায়ে এছলামের দুদিন ব্যাপী অধিবেশন শেষে তাদের ধর্মীয় সংগঠনটিকে রাজনৈতিক সংগঠনে পরিণত করে এর নাম 'নিজামে এছলাম' রাখা হয় এবং আসন্ন নির্বাচনে অংশগ্রহণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। অধিবেশনে গৃহীত এক প্রস্তাবে বলা হয় যে,

> যে-সমস্ত প্রতিষ্ঠান নিজামে এছলাম ও উহার কার্যক্রম স্বীকার করিয়া নিজামে এছলাম দলের সহিত সহযোগিতা করিতে প্রস্তুত আছেন, তাহাদের সহিত 'নিজামে এছলাম দল' যুক্তফ্রন্ট গঠন করিতে রাজি আছেন।

এ ব্যাপারে আলাপ-আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের ভার দলের সভাপতি মওলানা আতাহার আলীর ওপর অর্পিত হয়। নির্বাচনে যুক্তফ্রন্টের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল বুঝতে পেরে নিজামে এছলাম যুক্তফ্রন্টে যোগদানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।

অবশেষে পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগ, কৃষক-শ্রমিক পার্টি এবং নিজামে এছলামীর সমন্বয়ে যুক্তফ্রন্ট গঠিত হয়।

যদিও যুক্তফ্রন্ট গঠনের মূল উদ্যোক্তা ছিল পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন, গণতন্ত্রী দল ও যুবলীগ, কিন্তু ফ্রন্টের কৃষক-শ্রমিক পার্টি ও নিজামে এছলামীর নেতৃবৃন্দের বিরোধিতায় এই দলগুলিকে ফ্রন্টভুক্ত করা হয়নি। তবে গণতন্ত্রী দল, যুবলীগ ও কম্যুনিস্ট পার্টির সদস্য আওয়ামী মুসলিম লীগের নামে নমিনেশন লাভ করেন। এ প্রসঙ্গে কিথ ক্যালার্ড উল্লেখ করেছেন যে,

> The Ganatantri Dal had aligned itself with the United front during the campaign and some of its members had secured United Front nominations for Muslim seats. It seems probable that a few members of the communist party also secured United front nominations although this was not publicy announced.

এ প্রসঙ্গে রঙ্গলাল সেন উল্লেখ করেছেন যে, ১৫ জন যুবলীগ সদস্য, ১০ জন গণতন্ত্রী দলের সদস্য এবং ১০ জন কম্যুনিস্ট পার্টির সদস্য আওয়ামী লীগের পরিচয়ে যুক্তফ্রন্টের নমিনেশন লাভে সমর্থ হয়। নাজমা চৌধুরী উল্লেখ করেছেন যে, অনেক বামপন্থী-নেতা স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেন।

নির্বাচনে খেলাফতে রব্বানী পার্টিরও ইচ্ছে ছিল 'যুক্তফ্রন্ট'-এর শরিক দল হওয়ার। এই উদ্দেশে ১৯৫৩ সালের ১৬ নভেম্বর ঢাকার গোপীবাগ থার্ড লেনে পার্টির সভাপতি জনাব আবুল হাশিমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত প্রেসিডিয়ামের এক সভায় লীগ-বিরোধী সম্মিলিত যুক্তফ্রন্ট গঠনের জন্য কৃষক-শ্রমিক পার্টি ও আওয়ামী লীগের নেতৃবৃন্দের প্রতি আহ্বান জানানো হয়। কিন্তু খেলাফতে রব্বানী পার্টিকে 'যুক্তফ্রন্ট'ভুক্ত করা হয়নি।

www.Educationblog24.com

অগত্যা এই পার্টি একতরফাভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে যে, তারা মাত্র ১০টি মুসলিম আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন, এবং বাকি ২২৬টি আসনের জন্য রব্বানী পার্টি যুক্তফ্রন্টের প্রার্থীদের সমর্থন করবেন।

নির্বাচনে ছাত্রসংগঠন সমূহের ভূমিকা

যুক্তফ্রন্ট গঠনে পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগ ও পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়নের বলিষ্ঠ ভূমিকা ছিল। নির্বাচনী কর্মকা শুরু হলে এই দুই সংগঠন 'যুক্তফ্রন্ট কর্মী শিবির' গঠন করে এবং গ্রামপর্যায় পর্যন্ত এর শাখা বিস্তৃত হয়। সংগঠকদ্বয়ের সমর্থক ছাত্রকর্মীরা সারাদেশে বিপুল উৎসাহ উদ্দীপনা নিয়ে নির্বাচনী প্রচারণা শুরু করে। নির্বাচনে যুক্তফ্রন্টকে সমর্থন করার পিছনে মূল কারণ ছিল এই যে, যুক্তফ্রন্টের ২১-দফার ৯, ১০ এবং ১১নং দফায় উল্লেখিত দাবিসমূহ ছিল ছাত্রদের স্বার্থ-সম্পর্কিত। তাছাড়া ১৯৫২ সালে বাংলাভাষার দাবিতে ছাত্রবৃন্দ যে আত্মত্যাগ করেছিল, ২১-দফার ১ম দফাটি ছিল সে-বিষয় সম্পর্কিত। সুতরাং ছাত্রদের দাবিদাওয়া বাস্তবায়নের স্বার্থেই তারা যুক্তফ্রন্টকে সমর্থন জ্ঞাপন করে।

অপরপক্ষে সরকারপন্থী ছাত্রসংগঠনটি (All East Pakistan Muslim Students League) মুসলিম লীগকে সমর্থন করে।

নির্বাচনে ইসলামী দলসমূহের ভূমিকা

কিছু ইসলামী দল বা সংগঠন এবং ইসলামী ব্যক্তিত্ব নিজেরা নির্বাচনে অংশগ্রহণ না করলেও মুসলিম লীগকে সমর্থন করার কথা ঘোষণা করেন। নিচে সে বিষয়ে আলোকপাত করা হল :

জমিয়তে হেজবুল্লাহ

এটি ছিল একটি ধর্মীয় সংগঠন। নির্বাচন সম্পর্কে এ দলের প্রাথমিক সিদ্ধান্ত ছিল নিম্নরূপ :

> জমিয়তে হেজবুল্লাহ আগামী নির্বাচনে স্বতন্ত্র পার্টি হিসেবে প্রার্থী খাড়া করাইবে না বলে দল বিশেষকে সমর্থন করিবে না। দ্বিজাতিতত্ত্ব ও নেজামে এছলাম সমর্থক কোনো নির্বাচন প্রার্থী জমিয়তে হেজবুল্লাহর 'একরার নামায়' দস্তখত করিলে সংশ্লিষ্ট এলাকায় উক্ত ব্যক্তির জনসমর্থন ও তাঁহার নিজস্ব যোগ্যতা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিচার করিয়া জমিয়ত তাহাকে সমর্থন করিবে।

কিন্তু নির্বাচন প্রক্রিয়া পুরোদমে শুরু হলে তারা প্রকাশ্যে মুসলিম লীগের প্রতি সমর্থন ঘোষণা করে। পূর্ব পাকিস্তান জমিয়তে হেজবুল্লাহর সম্পাদক মওলানা আজিজুর রহমান ঘোষণা করেন :

> পাকিস্তানে আদর্শ এছলামী শাসন কায়েম, জাতীয় সংহতি রক্ষা ও পাকিস্তানের হেফাজতের জন্য দীনদার মুসলমানদের পক্ষে মোছলেম লীগকে সমর্থন করা ছাড়া বর্তমানে শরীয়তসম্মত অন্য কোনো পথ নেই। সুতরাং আসন্ন নির্বাচনে

www.Educationblog24.com

www.Educationblog24.com

জমিয়তে হেজবুল্লাহ সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থভাবেই জাতীয় প্রতিষ্ঠান মোছলেম লীগকেই সমর্থন করিবে।

নির্বাচনের দুই সপ্তাহ পূর্বে এই দল ঘোষণা করে যে, 'লীগকে সমর্থন করা ওয়াজেব।

পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র-হেজবুল্লাহ

এটি জমিয়তে হেজবুল্লাহর ছাত্রফ্রন্ট। নির্বাচনে এই দলের ভূমিকা সম্পর্কে দলের প্রচার সম্পাদক মওলানা ছাহেব আলী ঘোষণা করেন :

> ...মুসলমানদের একমাত্র খালেছ প্রতিষ্ঠান হিসাবে মুসলিম লীগের স্থান বিরোধী খিচুড়ি দলের অনেক উর্ধ্বে। মরহুম ফুরাফুরা ও শর্ষীনার পীর ছাহেবদ্বয় ও হজরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী সাহেব প্রমুখ অলী আল্লাহগণ ও জাতীয় প্রতিষ্ঠানরূপে মুসলিম লীগকে সমর্থন করিয়া গিয়াছেন।... জাতীয় বর্তমান সংকট মুহূর্তে মাদরাসা ও স্কুল-কলেজের দীনদার ছাত্রদের নীরব থাকিলে বা কংগ্রেসী ওলামাদের এশারায় ভুলপথে চলিলে দেশ ও জাতির পক্ষে তাহা মারাত্মক হইবে, ইহাতে সন্দেহের অবকাশ নাই। তাই আজ আমি খোলাখুলিভাবে দীনদার ছাত্রদের প্রতি আবেদন করি যে, পাকিস্তানে নেজামে এছলাম কায়েম, জাতির সংহতি রক্ষা ও পাকিস্তানকে গুপ্ত-শত্রুদের হস্ত হইতে রক্ষা করার জন্য জাতীয় প্রতিষ্ঠান মুসলিম লীগকে সমর্থন করা ছাড়া গত্যন্তর নাই।

জমইয়াতে তোলাবায়ে আরাবিয়া

এটিও একটি ধর্মীয় সংগঠন। নির্বাচনে সরাসরি অংশগ্রহণ না করলেও পূর্ববাংলার ওলামায়ে কেরামের উদ্দেশে এক আবেদনে এই দলের সম্পাদক মাওলানা মোস্তাফিজুর রহমান বলেন, 'আসন্ন নির্বাচনে পাকিস্তানে নেজামে ইছলাম কায়েম করার উদ্দেশে নিজেদের মধ্যকার খুটিনাটি মতানৈক্য ভুলিয়া এক কর্মপন্থা অবলম্বন করুন।

জামায়াতে এছলামী

এই দলটি ইসলামী রাজনৈতিক দল হয়েও পাকিস্তানের নির্বাচন ব্যবস্থাকে 'অনৈছলামিক' বলে অভিহিত করে। তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান জামায়াতে এছলামীর আমীর চৌধুরী আলী আহমদ খান নির্বাচন পদ্ধতির সমালোচনা করে বলেন যে, 'ইহা দেশে অসাধুতার বিষ ছড়াইতে সাহায্য করিবে। ধর্মনিরপেক্ষতা বর্তমান বিশ্বের সকল অনর্থের মূল।'

বিভিন্ন ইসলামী ব্যক্তিত্বের মনোভাব

শর্ষীনার পীর সাহেব তাঁর অনুসারীদেরকে মুসলিম লীগকে সমর্থনের আহ্বান জানান।

মহামান্য আগা খান তাঁর পাকিস্তানস্থিত বিভিন্ন কাউন্সিলের প্রেসিডেন্ট ও সদস্যবর্গ এবং জামাতের সদস্যগণের নিকট প্রেরিত বাণীতে পূর্ববাংলার নির্বাচনে মুসলিম লীগকে সহায়তা করার জন্য অনুরোধ জানান। তিনি মন্তব্য করেন, 'লীগ জয়ী না হলে পাকিস্তানে ইসলাম দুর্বল হবে।

পূর্ব পাকিস্তান জমিয়তে আহলে হাদিসের সভাপতি মওলানা মোহাম্মদ আব্দুল্লাহেল

www.Educationblog24.com

কাফি তাঁর অনুসারীদেরকে আইনসভার নির্বাচনে মুসলিম লীগ মনোনীত প্রার্থীদেরকেই জয়যুক্ত করার প্রচেষ্টা গ্রহণের জন্য আবেদন জানান।

এইভাবে আমরা দেখি বিভিন্ন ইসলামী দল ও ব্যক্তিত্ব প্রকারান্তরে মুসলিম লীগকে সমর্থন জানান।

তবে এককালের অনেক বিখ্যাত মুসলিম লীগ নেতা যে এই নির্বাচনে নিশ্চুপ থাকেন তার প্রমাণ খাজা নাজিমউদ্দীন। নির্বাচনে কোনো দলকেই সমর্থন না জানিয়ে তিনি নিশ্চুপ থাকেন এবং একসময় সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে বলেন যে, 'আমি রাজনীতি হইতে বিদায় লইয়াছি।

নির্বাচনে হিন্দু দল ও জোট

তৎকালীন পূর্ববাংলা ব্যবস্থাপক পরিষদে অমুসলমান আসনের সংখ্যা ছিল ৭২। এর মধ্যে বৌদ্ধ এবং খ্রিস্টানদের জন্য নির্দিষ্ট আসন সংখ্যা যথাক্রমে ২ ও ১। নির্বাচনে মুসলমান আসনগুলো মুসলিম লীগ ও যুক্তফ্রন্টের মধ্যে সমানভাবে বিভক্ত হলে কোয়ালিশন সরকার গঠনের জন্য হিন্দু-আসনের নির্বাচিত সদস্যদের সমর্থন প্রয়োজন হবে– এই বিবেচনায় যুক্তফ্রন্টের ইঙ্গিতে 'সংখ্যালঘু যুক্তফ্রন্ট' গঠিত হয়। 'সংখ্যালঘু যুক্তফ্রন্টের' শরিক দলগুলো ছিল 'গণসমিতি', কুমিল্লার 'অভয় আশ্রম' এবং 'পূর্ব পাকিস্তান সমাজতন্ত্রী দল'। 'গণসমিতির নেতৃবৃন্দই এই ফ্রন্টকে নেতৃত্ব দেন। 'গণসমিতি' হচ্ছে 'পাকিস্তান জাতীয় কংগ্রেস' থেকে বেরিয়ে আসা নেতা-কর্মীদের সংগঠন। ১৯৪৭-এর পর 'পাকিস্তান জাতীয় কংগ্রেস' গঠনের সময় কিছু নেতা 'কংগ্রেস' বাদে অন্য নামে দলগঠনের প্রস্তাব দেন। কিন্তু তাদের প্রস্তাব অগ্রাহ্য করা হলে তারা ১৯৪৮-এর জুলাই মাসে 'গণসমিতি' গঠন করেন। এই দলে শুধু কংগ্রেস সদস্যরাই যোগ দেননি, 'সমাজতন্ত্রী দল', 'বিপ্লবী সমাজতন্ত্রী দল', 'ফরওয়ার্ড ব্লক' এবং অন্যান্য সংগঠনের কিছু হিন্দু নেতাকর্মীও যোগ দেন।

১৯৪৭-এর পর কংগ্রেস ও গণসমিতি প্রধানত বর্ণ-হিন্দুদের সংগঠন ছিল। সে-সময় তফশিলি হিন্দুদের সংগঠন ছিল 'তফশিলি জাতি ফেডারেশন'। ১৯৪৭-এর পূর্বে এবং পরে এই সংগঠনের নীতি ছিল মুসলিম লীগকে সহযোগিতা করা। ফলস্বরূপ ১৯৫০ সালে পূর্ববাংলা সরকারের কেবিনেটে এই দল থেকে দলের প্রেসিডেন্ট মি.ডি.এন. বারুই মন্ত্রী নিযুক্ত হন। পাকিস্তানে সংখ্যালঘুদের জন্য পৃথক নির্বাচনব্যবস্থা হবে, না যৌথ নির্বাচনব্যবস্থা হবে– এই ইস্যুতে ১৯৫৪-এর নির্বাচনের প্রাক্কালে দল বিভক্ত হয়। ডি.এন.বারুই পৃথক নির্বাচনব্যবস্থার সমর্থক ছিলেন। তাঁর বিরুদ্ধ অংশের নেতৃত্ব দেন মি. রসরাজ মণ্ডল। অবশেষে ১৯৫২ সালের মার্চ মাসে কুমিল্লায় বিরোধী অংশের সম্মেলন হয়। হক-ভাসানী-সোহরাওয়ার্দী উক্ত সম্মেলনে অতিথি হিসেবে যোগদান করেন। ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে রসরাজ মণ্ডলের অংশ এবং ডি.এন. বারুইয়ের অংশ পৃথক প্রার্থী মনোনয়ন দেন।

www.Educationblog24.com

www.Educationblog24.Com

নির্বাচনে ডি.এন. বারুইয়ের অংশের ভরাডুবি ঘটে।

নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী বিভিন্ন জোট ও দলের প্রার্থী সংখ্যা:

নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী বিভিন্ন জোট ও দলের প্রার্থী সংখ্যা ছিল নিম্নরূপ :

(ক) মুসলমান আসন (মোট আসন সংখ্যা ২৩৭)

মুসলিম লীগ	২৩৭ জন
যুক্তফ্রন্ট	২৩৪ জন
খেলাফতে রব্বানী পার্টি	৫ জন
স্বতন্ত্র	৫৪২ জন
মোট	১০১৮ জন (মহিলা প্রার্থীসহ)

(খ) অমুসলমান আসন (মোট আসন সংখ্যা ৭২)

পাকিস্তান জাতীয় কংগ্রেস	৩৯জন
তফশিলি জাতি ফেডারেশন	৩২ জন (ডি.এন.বারুই গ্রুপ)
তফশিলী জাতি ফেডারেশন	৩৬ জন (রসরাজ ম ল গ্রুপ)
সংখ্যালঘু যুক্তফ্রন্ট	১৯ জন
কম্যুনিস্ট পার্টি	১০ জন
বৌদ্ধ	১২ জন
খ্রিস্টান	১ জন
স্বতন্ত্র (গণতন্ত্রী দলসহ)	১২৩ জন
	মোট ২৭২ জন

সারণী-২ এ নির্বাচনে সম্প্রদায়ভুক্ত প্রার্থী সংখ্যা উল্লেখিত হল।

সারণী-২ নির্বাচনে সম্প্রদায়ভিত্তিক প্রার্থী সংখ্যা

সম্প্রদায়	আসন সংখ্যা		বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায়		অংশগ্রহণকারী প্রার্থী সংখ্যা		আসনপ্রতি গড় প্রার্থী সংখ্যা	
	পুরুষ	মহিলা	পুরুষ	মহিলা	পুরুষ	মহিলা	পুরুষ	মহিলা
মুসলমান	২২৮	৯	×	×	৯৮৬	৩২	৪.৩	৩.৬
অমুসলমান সাধারণ	৩০	১	২	১	১০১	×	৩.৬	×
তফশিলি	৩৬	২	×	১	১৫১	৩	৪.২	৩
বৌদ্ধ	২	×	×	×	১২	×	৬	×
খ্রিস্টান	১	×	১	×	×	×	×	×
মোট	২৯৭	১২	৩	২	১২৫০	৩৫		

পূর্ববাংলা প্রথম ব্যবস্থাপক পরিষদের (১৯৪৭-৫৪) ৯৮ জন মুসলিম লীগ দলীয়

www.Educationblog24.Com

সদস্যের মধ্যে ৪২ জন মুসলিম লীগের নমিনেশন পান। ৯ জন যুক্তফ্রন্টের প্রার্থী হন। এদের মধ্যে খয়রাত হোসেন (আওয়ামী লীগে যোগ দেন) এবং ইউসুফ আলী চৌধুরীর (কৃষক-শ্রমিক পার্টিতে যোগ দেন) নাম উল্লেখযোগ্য। ৮ জন স্বতন্ত্র সদস্য হিসেবে নির্বাচন করেন। এরা মুসলিম লীগ কিংবা যুক্তফ্রন্টের নমিনেশন লাভে ব্যর্থ হয়ে স্বতন্ত্র প্রার্থী হন। ৩৯ জন নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেননি।

বিভিন্ন দল ও জোটের নির্বাচনী ম্যানিফেস্টো ও প্রচারাভিযান

মুসলিম লীগ

মুসলিম লীগের অন্যতম বক্তব্য ছিল পাকিস্তানের অখ তা ও সংহতি বজায় রাখা, কেন্দ্রীয় সরকারকে অধিক শক্তিশালী করা, পাকিস্তানের জন্য ইসলামী শাসন প্রতিষ্ঠা করা প্রভৃতি।

পাকিস্তানের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী বগুড়ার মোহাম্মদ আলী ঢাকার এক নির্বাচনী সভায় বলেন যে, 'মুসলিম লীগই একমাত্র দল যা পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে ঐক্যের বন্ধন অটুট রাখতে সক্ষম। 'খোদা না করুন, সামনের নির্বাচন যদি অন্য কোনো দল নির্বাচিত হয় তাহলে পাকিস্তানের সংহতি বিপন্ন হবে'। পূর্ববাংলার মুখ্যমন্ত্রী নূরুল আমিন বলেন যে, 'যারা স্বাধীন পাকিস্তানে বিশ্বাস করে না, যারা অখ ভারতের স্বপ্ন দেখে তারা যদি নির্বাচিত হয় তাহলে পাকিস্তানের সার্বভৌমত্ব বিপন্ন হবে।' বাংলা ভাষার প্রশ্নে মুসলিম লীগ চতুরতার আশ্রয় গ্রহণ করে। প্রধানমন্ত্রী মোহাম্মদ আলী এক জনসভায় বলেন যে, 'যদি পূর্ববাংলা প্রদেশের জনগণের এই ইচ্ছে হয় যে, বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করতে হবে তাহলে তিনি গণপরিষদে তা সমর্থন করবেন। পূর্ববাংলার ধর্মপ্রাণ নিরীহ মুসলমানদেরকে ধোঁকা দেয়ার জন্য মুসলিম লীগ ধর্মীয় বন্ধনে পাকিস্তানের ঐক্য অটুট রাখার আহবান জানান। মোহাম্মদ আলী জিন্নাহের ভগ্নী মিস ফাতেমা জিন্নাহ নির্বাচনী প্রচারাভিযানে মুসলিম লীগের পক্ষ নেন। তিনি ভোটারদের উদ্দেশে ভিন্ন জনসভায় বলেন যে, 'মুসলমান ভোটারদের উচিত কম্যুনিস্ট ও হিন্দু ষড়যন্ত্রকারীদের প্রতিহত করার জন্য মুসলিম লীগের মনোনীত প্রার্থীদের ভোট দেয়া।' মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর জন্ম দিবস উপলক্ষে এক বেতার বক্তৃতায় পূর্ব বঙ্গবাসীর উদ্দেশ্যে মিস জিন্নাহ বলেন:

> আসন্ন নির্বাচনের মধ্য দিয়ে আপনাদিগকে এই কঠিন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে হইবে। নির্বাচনের ফলাফলের ওপরই পূর্ববঙ্গের ভবিষ্যৎ নির্ভর করিতেছে। ভবিষ্যৎ চিন্তা করুন এবং অনৈক্য ও বিভেদ দৃষ্টিকারী শক্তি সম্পর্কে সতর্ক থাকুন।

মুখ্যমন্ত্রী নূরুল আমিন বলেন যে, এই নির্বাচন অনেকটা গণভোটের মতো। নির্বাচনের ফলাফলে নির্ধারণ হবে যে, পূর্ববঙ্গ পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত থাকবে, না ভারতভুক্ত হবে।

নির্বাচন উপলক্ষে মুসলিম লীগের পক্ষ থেকে 'আজাদ' পত্রিকায় একটি দীর্ঘ নির্বাচনী ইশতেহার প্রচারিত হয়। উক্ত ইশতেহারের বক্তব্য বিষয় থেকে এই দলের মনোভাব অবলোকন করা সম্ভব।

www.Educationblog24.Com

যুক্তফ্রন্ট

১৯৫৪ সালের নির্বাচনে যুক্তফ্রন্ট ২১ দফা নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি ঘোষণা করে। নিম্নে ২১ দফার দাবিগুলো উল্লেখ করা হল :

যুক্তফ্রন্টের একুশ দফা

নীতি : কোরান ও সুন্নার মৌলিক নীতির খেলাফ কোনো আইন প্রণয়ন করা হইবে না এবং ইসলামর সাম্য ও ভ্রাতৃত্বের ভিত্তিতে নাগরিকগণের জীবন ধারণের ব্যবস্থা করা হইবে।

১. বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করা হইবে।

২. বিনা ক্ষতিপূরণে জমিদারি ও সমস্ত খাজনা আদায়কারী স্বত্ব উচ্ছেদ ও রহিত করিয়া ভূমিহীন কৃষকের মধ্যে উদ্বৃত্ত জমি বিতরণ করা হইবে এবং উচ্চহারের খাজনা ন্যায়সঙ্গতভাবে হ্রাস করা হইবে এবং সার্টিফিকেটযোগে খাজনা আদায়ের প্রথা রহিত করা হইবে।

৩. পাট ব্যবসায়কে জাতীয়করণ করার উদ্দেশে তাকে পূর্ববঙ্গ সরকারের প্রত্যক্ষ, পরিচালনাধীনে আনয়ন করিয়া পাটচাষীদের পাটের মূল্য দেওয়ার ব্যবস্থা করা হইবে এবং লীগ মন্ত্রিসভার আমলের পাট কেলেঙ্কারি তদন্ত করিয়া সংশ্লিষ্ট সকলের শাস্তির ব্যবস্থা ও তাহাদের অসদুপায়ে অর্জিত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হইবে।

৪. কৃষি উন্নতির জন্য সমবায় কৃষি ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হইবে ও সরকারি সাহায্যে সকল প্রকার কুটির ও হস্তশিল্প উন্নতি সাধন করা হইবে।

৫. পূর্ববঙ্গকে লবণশিল্পে স্বয়ংসম্পূর্ণ করিবার জন্য সমস্ত উপকূলে কুটিরশিল্প ও বৃহৎশিল্পে লবণ তৈয়ারির কারখানা স্থাপন করা হইবে এবং মুসলিমীগ মন্ত্রিসভার আমলের লবণের কেলেঙ্কারি সম্পর্কে তদন্ত করিয়া সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের শাস্তির ব্যবস্থা করা হইবে ও তাহাদের অসদুপায়ে অর্জিত যাবতীয় অর্থ বাজেয়াপ্ত করা হইবে।

৬. শিল্প ও কারিগরি শ্রেণীর গরিব মোহাজেরদের কাজে আশু ব্যবস্থা করিয়া তাহাদের পুনর্বসতির ব্যবস্থা করা হইবে।

৭. খাল খনন ও সেচের ব্যবস্থা করিয়া দেশকে বন্যা এবং দুর্ভিক্ষের কবল হইতে রক্ষা করিবার ব্যবস্থা করা হইবে।

৮. পূর্ববঙ্গকে বৈজ্ঞানিক উপায়ে শিল্পায়িত করিয়া ও কৃষিকে আধুনিক যুগোপযোগী করিয়া শিল্প ও খাদ্যে দেশকে স্বাবলম্বী করা হইবে এবং আন্তর্জাতিক শ্রমসংঘের মূলনীতি অনুসারে শ্রমিকদের অর্থনৈতিক ও সামাজিক এবং সকলপ্রকার অধিকার প্রতিষ্ঠিত করা হইবে।

৯. দেশের সর্বত্র একযোগে প্রাথমিক ও অবৈতনিক বাধ্যতামূলক শিক্ষা প্রবর্তন করা হইবে এবং শিক্ষকদের ন্যায়সঙ্গত বেতন ও ভাতার ব্যবস্থা করা হইবে।

www.Educationblog24.com

১০. শিক্ষাব্যবস্থার আমূল সংস্কার করিয়া শিক্ষাকে বৈজ্ঞানিক উপায়ে কার্যকরী করিয়া বেসরকারি বিদ্যালয়সমূহের বর্তমান ভেদাভেদ উঠাইয়া দিয়া একই পর্যায়ভুক্ত করিয়া সকল বিদ্যালয়সমূহকে সরকারি সাহায্যপুষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পরিণত করা হইবে এবং শিক্ষকদের উপযুক্ত বেতন ও ভাতার ব্যবস্থা করা হইবে।

১১. ঢাকা ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় আইন প্রভৃতি প্রতিক্রিয়াশীল কানুন বাতিল রহিত করিয়া বিশ্ববিদ্যালয়সমূহকে স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানে পরিণত করিয়া উচ্চশিক্ষাকে শস্তা ও সহজলভ্য করা হইবে এবং ছাত্রাবাসের অল্প ব্যয় সাধ্য ও সুবিধাজনক বন্দোবস্ত করা হইবে।

১২. শাসন ব্যয় সর্বাত্মকভাবে হ্রাস করা হইবে এবং তদুদ্দেশ্যে উচ্চ বেতনভোগীদের বেতন কমাইয়া নিম্ন বেতনভোগীদের বেতন বাড়াইয়া তাহাদের আয়ের একটি সুষ্ঠু সামঞ্জস্য বিধান করা হইবে। যুক্তফ্রন্টের কোনো মন্ত্রী এক হাজারের বেশি বেতন গ্রহণ করিবেন না।

১৩. দুর্নীতি ও স্বজনপ্রীতি, ঘুষ রিশওয়াত বন্ধ করার কার্যকরী ব্যবস্থা করা হইবে এবং এতদুদ্দেশে সমস্ত সরকারি ও বেসরকারি পদাধিকারী ব্যবসায়ীর ১৯৪০ সাল হইতে বর্তমান সময় পর্যন্ত আয়-ব্যয়ের হিসাবনিকাশ লওয়া হইবে এবং সন্তোষজনক কৈফিয়ৎ দিতে না পারিলে তাহাদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হইবে।

১৪. জননিরাপত্তা আইন ও অর্ডিন্যান্স প্রভৃতি কালাকানুন রদ ও রহিত করত বিনাবিচারে আটক বন্দিকে মুক্তি দেওয়া হইবে ও রাষ্ট্রদ্রোহিতার অপরাধে অভিযুক্ত ব্যক্তিদের প্রকাশ্য-আদালতে বিচার করা হইবে এবং সংবাদপত্র ও সভা-সমিতি করিবার অধিকার অবাধ ও নিরঙ্কুশ করা হইবে।

১৫. বিচার বিভাগকে শাসন-বিভাগ হইতে পৃথক করা হইবে।

১৬. যুক্তফ্রন্টের প্রধানমন্ত্রী বর্ধমান হাউসের পরিবর্তে অপেক্ষাকৃত কম বিলাসের বাড়িতে বাসস্থান নির্দিষ্ট করিবেন এবং বর্ধমান হাউসকে আপাতত ছাত্রাবাস ও পরে বাংলাভাষা গবেষণাগারে পরিণত করা হইবে।

১৭. বাংলা রাষ্ট্রভাষার দাবিতে যাহারা মুসলিম লীগ মন্ত্রিসভার গুলিতে শহীদ হইয়াছেন তাহাদের পবিত্র স্মৃতিচিহ্নস্বরূপ ঘটনাস্থলে একটি শহীদ মিনার নির্মাণ করা হইবে এবং তাহাদের পরিবারবর্গকে উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দেওয়া হইবে।

১৮. ২১ ফেব্রুয়ারিকে শহীদ দিবস ঘোষণা করিয়া উহাকে সরকারি ছুটির দিন ঘোষণা করা হইবে।

১৯. লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে পূর্ববঙ্গকে পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন ও সার্বভৌমিক করা হইবে এবং দেশরক্ষা, পররাষ্ট্র ও মুদ্রা ব্যতীত সমস্ত বিষয় (অবশিষ্ট ক্ষমতাসমূহ) পূর্ববঙ্গ সরকারের হাতে আনয়ন করা হইবে এবং দেশরক্ষা বিভাগের স্থলবাহিনীর হেডকোয়ার্টার পশ্চিম পাকিস্তান ও নৌবাহিনীর হেডকোয়ার্টার পূর্ব পাকিস্তানে স্থাপন করা হইবে এবং পূর্ব পাকিস্তান অস্ত্র নির্মাণের কারখানা নির্মাণ করত পূর্ব পাকিস্তানকে আত্মরক্ষায় স্বয়ংসম্পূর্ণ করা হইবে। আনসার বাহিনীকে সশস্ত্র বাহিনীতে পরিণত করা হইবে।

www.Educationblog24.com

www.Educationblog24.Com

২০. যুক্তফ্রন্টের মন্ত্রিসভা কোনো অজুহাতেই আইন পরিষদের আয়ু বাড়াইবে না। আইন পরিষদের আয়ু শেষ হওয়ার ছয় মাস পূর্বেই মন্ত্রিসসভা পদত্যাগ করিয়া নির্বাচন কমিশনের মারফত স্বাধীন ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের ব্যবস্থা করিবে।

২১. যুক্তফ্রন্টের মন্ত্রিসভার আমলে যখন যে আসন শূন্য হইবে, তিন মাসের মধ্যে তাহা পূরণের জন্য উপনির্বাচনের ব্যবস্থা করা হইবে এবং পর পর তিনটি উপনির্বাচনে যুক্তফ্রন্টের মনোনীত প্রার্থী পরাজিত হইলে মন্ত্রিসভা স্বেচ্ছায় পদত্যাগ করিবেন।

(সূত্রঃ *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধঃ দলিলপত্র*, প্রথম খণ্ড, পৃ. ২৭৩-৩৭৪)

১৯৫৪ সালের নির্বাচনে মুসলিমলীগ বিরোধী যুক্তফ্রন্টের প্রেরণাশক্তি ছিল ১৯৫২ সালে ভাষা আন্দোলন। তাই যুক্তফ্রন্টের নির্বাচনী মেনিফেস্টোতে ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারির ২১ ফিগারটিকে চিরস্মরণীয় করার অতিরিক্ত উপায় হিসেবে ২১ দফার কর্মসূচি প্রণয়ন করা হয়। আবুল মনসুর আহমেদ ২১-দফার খসড়া প্রণয়ন করেন।

২১-দফা বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, বাংলাভাষাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার দাবি, প্রদেশের জন্য অধিক স্বায়ত্তশাসন ও প্রশাসনে বাঙালির অধিকসংখ্যক নিয়োগ প্রভৃতি দিক অন্যতম।

তবে ২১-দফার বিশ্লেষণে কিছু বিষয়ের অস্পষ্টতা লক্ষ্য করা যায়। ১৯৫০ সালের পূর্ববাংলায় জমিদারি স্বত্ব বিলোপ করে ১০০ বিঘা পর্যন্ত জমি মালিকানার উচ্চতর সিলিং নির্ধারণ করলেও মুসলিম লীগ সরকার এই সিলিং বাস্তবায়িত করতে পারেননি। কারণ, মুসলিম লীগ জোতদার শ্রেণীর সংগঠন ছিল। যুক্তফ্রন্টের অনেক নেতা জোতদার শ্রেণীর ছিলেন। স্বভাবতই যুক্তফ্রন্টের ২১-দফায় সিলিং-এর কথা উল্লেখ করা হয়নি, তবে ভূমিহীন ভোটারদেরকে আকৃষ্ট কার জন্য বলা হয় যে, ভূমিহীন কৃষকদের মধ্যে 'উদ্বৃত্ত' জমি বিতরণ করা হবে। পররাষ্ট্রনীতির ব্যাপারে যুক্তফ্রন্ট শরিকদলের মতের ভিন্নতা ছিল। ডানপন্থীগণ পশ্চিমা শক্তির সঙ্গে সম্পর্ক ভালো করার নীতিতে বিশ্বাসী হলেও বামপন্থী নেতৃবৃন্দের দৃষ্টিভঙ্গি ছিল ভিন্ন। ফল পররাষ্ট্র ব্যাপারে ২১ দফা নিশ্চুপ থাকে। এতদসত্ত্বেও ২১-দফার দাবিগুলি ভোটারদের মন জয় করে।

খেলাফতে রব্বানী পার্টি

এই দলের নির্বাচনী-মান্যিফেস্টোর সারাংশ নিম্নরূপঃ

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার মূলভিত্তি ইসলামের সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও তামুদ্দনিক আদর্শের প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করা, ব্রিটিশ কমনওয়েলথ ত্যাগ, ইঙ্গ-মার্কিন ও রাশিয়া এই 'জড়বাদী' ব্লকের দম্ভে পাকিস্তানের নিরপেক্ষতা রক্ষা, আঞ্চলিক স্বায়ত্বশাসনাধিকার প্রতিষ্ঠা, বিনাবিচারে আটক রাখার নীতি বাতিল। শাসন বিভাগ হইতে বিচার বিভাগ পৃথকীকরণ, বিনাবিচারে আটক রাজবন্দিদের মুক্তি, পাট সহ কল একচেটিয়া ব্যবসা ও বৃহৎ শিল্প রাষ্ট্রায়াত্তকরণে, বিনা খেসারতে সমস্ত কর আদায় ভূমিস্বত্বের বিলোপ সাধন, ভূমিনির্ভর ভূস্বত্বচ্যুত নাগরিকদের জীবিকার ব্যবস্থা করা, সর্বোচ্চ উৎপাদন ও ন্যায়সঙ্গত বণ্টনের প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে প্রকৃত চাষীদের মধ্যে

www.Educationblog24.com

জমি বন্টন; লবণ, তামাক, সুপারিশ প্রভৃতি নিত্য ব্যবহার্য দ্রব্য ও খাদ্যশস্যের কর বাতিল, অবিলম্বে বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্র ভাষা হিসাবে গ্রহণ, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে স্বাধীনতা এবং শিক্ষা ও নাগরিক অধিকারের পরিপন্থী শাসনবিভাগীয় সমস্ত বাধানিষেধ প্রত্যাহার এবং ঘুষ-দুর্নীতি ও অন্যান্য সমাজবিরোধী কার্যকলাপের প্রতিকারের জন্য উপযুক্ত আইন প্রণয়ন ইত্যাদি।

গণতন্ত্রী দল

নির্বাচন উপলক্ষে গণতন্ত্রী দল 'দশ দফা' ম্যানিফেস্টো ঘোষণা করে।

১. ব্রিটিশ কমনওয়েলথ ত্যাগ ও পাকিস্তানকে সার্বভৌম গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র ঘোষণা।
২. পাকিস্তানে বাণিজ্য ও শিল্পে নিয়োজিত বিদেশী মূলধন ও সুদ বাজেয়াপ্ত করণ।
৩. বিনা খেসারতে জমিদারি প্রথার বিলোপ সাধন। জমিদারদের দখলি অতিরিক্ত জমি বাজেয়াপ্ত করে কৃষকদের মধ্যে উহার পুনর্বন্টন।
৪. পাটের রফতানি ব্যবসা জাতীয়করণ, উহার বাজার সম্প্রসারণ ও পাটের সর্বনিম্ন ন্যায্যমূল্যের নিশ্চয়তা দান।
৫. দেশের শিল্পায়নে বেসরকারি জাতীয় মূলধন নিয়োগে সক্রিয় উৎসাহ দান।
৬. দেশবাসীর ব্যক্তি স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠা, সকল রাজনৈতিক বন্দির মুক্তিদান, অন্তরীণাদেশ ও রাজনৈতিক কর্মীদের গ্রেফতারি পরোয়ানা প্রত্যাহার, সকল কালাকানুন ও অর্ডিন্যান্স রদকরণ এবং ধর্মচর্চা, সংবাদপত্র ও বাকস্বাধীনতার নিশ্চয়তা দান।
৭. বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসাবে স্বীকৃতি দান।
৮. বেকারত্ব ও ব্যয়বহুল জীবন যাত্রার বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করে দেশবাসীর বাঁচার অধিকার কায়েম করা।
৯. জনস্বাস্থ্য ও শিক্ষার উন্নয়ন, অবৈতনিক বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তন।
১০. পাকিস্তান-ভারত সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠা।

অন্যান্য

কংগ্রেস

নির্বাচন সম্পর্কে নির্বাচনী বোর্ডের সেক্রেটারি মি. মনোরঞ্জন ধর বলেন যে, সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের সম্মান রক্ষা ও অধিকার প্রতিষ্ঠা এবং ধর্ম, সংস্কৃতি ও সম্পত্তির নিরাপত্তা বিধান এবং সমান নাগরিক অধিকার প্রতিষ্ঠাই কংগ্রেসের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য।

পূর্ববঙ্গ তফশিলি জাতি ফেডারেশন (রসরাজ মণ্ডল গ্রুপ)

এই দলের লক্ষ্য ছিল জাতি ধর্ম নির্বিশেষে সকল নাগরিকের সমান অধিকারের ভিত্তিতে রাষ্ট্র গঠন এবং তফশিলিদের জন্য আসন সংরক্ষণসহ পৃথক নির্বাচনের দাবি বাস্তবায়ন প্রভৃতি।

www.Educationblog24.com

www.Educationblog24.Com

নির্বাচনের প্রস্তুতি

আগেই উল্লেখিত হয়েছে যে, ২৪ ডিসেম্বর (১৯৫৩) চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশিত হয় এবং জনগণের অবগতির জন্য তা রেজিস্ট্রি অফিসে, রিটার্নিং অফিসারদের অফিসে, পার্বত্য চট্টগ্রামে প্রত্যেক মৌজার সরদারের অফিসে, সিলেট জেলায় সার্কেল সাব-ডেপুটি কালেক্টরের অফিসে, ইউনিয়ন বোর্ড অফিসে, মহকুমা হাকিমের অফিসে, জেলা জজের, সাব জজের ও মুন্সেফের অফিসে, মিউনিসিপ্যাল এলাকায় মিউনিসিপ্যালিটির অফিসে এবং মিউনিসিপ্যাল ওয়ার্ডের সুবিধাজনক স্থানে ১৪ জানুয়ারি পর্যন্ত উন্মুক্ত রাখা হয়।

ছাপানো, কিংবা টাইপ-করা কিংবা হাতেলেখা ফরমে মনোনয়ন জমা দেওয়ার নিয়ম করা হয়। তফশিলি নির্বাচনী এলাকা ছাড়া প্রত্যেক নির্বাচনী এলাকার প্রার্থীগণকে ২৫০ টাকা জামানত দাখেল করতে হত। তফশিলি নির্বাচন এলাকার প্রার্থীগণকে ১০০ টাকা জামানত দাখেল করতে হত। 'রেভিনিউ ডিপোজিট' খাতে টাকা জমা দিতে হত।

১৯৫৪ সালের নির্বাচনে বিভিন্ন দলের প্রার্থীদের ব্যালটবাক্সে ব্যবহারের জন্য সরকার চূড়ান্তরূপে মোট ২৪টি প্রতীক নির্দিষ্ট করেন। নির্বাচনে মুসলিম লীগ 'হারিকেন' প্রতীক এবং যুক্তফ্রন্ট 'নৌকা' প্রতীক গ্রহণ করে।

পূর্ববাংলায় প্রায় ৫ হাজার ১০টি ভোটকেন্দ্র নির্ধারণ করা হয়। ভোটগ্রহণের জন্য রিজার্ভসহ ৭ হাজার ৪ শত ৮৩ জন প্রিসাইডিং অফিসার ও আনুমানিক ২৪ হাজার পোলিং অফিসার নিয়োগ করা হয়। গেজেটেড অফিসার, কলেজের প্রফেসর, হাইস্কুল ও হাই মাদরাসার প্রধান শিক্ষক ও সহকারী শিক্ষকদের প্রিজাইডিং অফিসার নিযুক্ত করা হয়। কোনো ভোটার যাতে একবারের বেশি ভোট দিতে না পারে সেজন্য ভোটদান কালে তার আঙুলে অমোচনীয় (যা সহজে ওঠে না) কালির ছাপ দেওয়ার বিধান করা হয় এবং ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে হিন্দু ও মুসলমান পুরুষ ও মহিলাদের আলাদা স্থান নির্দিষ্ট করা হয়। ভোট দেওয়ার জন্য ভোটারকে যাতে পাঁচ মাইলের বেশি হাঁটতে না হয় তৎপ্রতি লক্ষ্য রেখে বুথ প্রতিষ্ঠা করা হয়। ভোটগ্রহণের জন্য দেড় লক্ষাধিক ব্যালট বাক্স ব্যবহার করা হয় এবং প্রায় দুই কোটি ব্যালটপেপার ছাপানো হয়। নিয়ম করা হয় যে, ভোটগ্রহণ ৫ দিনে (৮ মার্চ থেকে ১২ মার্চ) সমাপ্ত হবে। ভোটগ্রহণ কার্য সকাল ৯.৩০ মিনিটে শুরু হয়ে বিকেল ৪.৩০ মিনিট পর্যন্ত চলবে; মাঝখানে ১২.৩০ মিনিট থেকে ১.৩০ মিনিট–এই এক ঘন্টাকাল ভোটগ্রহণ বন্ধ থাকবে। বিকেল ৫.৩০ মিনিটে ভোটগ্রহণ কেন্দ্রের আবেষ্টনী বন্ধ করা হবে। ঐ সময়ের পর আর কোনো নতুন লোকে আবেষ্টনীর মধ্যে প্রবেশ করতে দেওয়া হবে না। আবেষ্টনীর মধ্যে যারা থাকবেন ৪.৩০ মিনিটের পরও তাদের ভোট নেওয়া হবে।

এই নির্বাচনে অনুপস্থিত ভোটারদের জন্য ডাকযোগে ভোট দেয়ার সুবিধা দেয়া হয়। সরকারি প্রেসনোটে বলা হয়:

> যে-সকল ভোটার কেন্দ্রীয় অথবা প্রাদেশিক সরকারের কাজে নিজ এলাকা হইতে দূরে আছেন, অথবা যাহারা নিবর্তনমূলক আইনে আটক আছেন, তাহারা ডাকযোগে ভোট প্রদান করিতে পারিবেন।

www.Educationblog24.com

উল্লেখিত ব্যবস্থাসমূহ নির্বাচন সম্পন্ন করার সুষ্ঠু পদ্ধতি– এই বিষয়ে কোনো সন্দেহ নাই। কিন্তু নির্বাচন যাতে 'সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ' হয় সেজন্য বিরোধী দলসমূহের মনে যথেষ্ট আশঙ্কা ছিল। এই উদ্দেশ্যে বিভিন্ন বিরোধী দল বিভিন্ন রকমের দাবি উত্থাপন করে। জনাব ফজলুল হক প্রদেশে অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য নির্বাচনী কমিশনারের নিকট নিম্নলিখিত দাবিগুলো পেশ করেন।

১. মনোনয়ন পত্র বাছাইয়ের ব্যাপারে উদারনীতি গ্রহণ করিতে এবং নির্বাচনের পূর্বে মনোনয়ন পত্র বাছাইয়ের বিরুদ্ধে আপিলের ব্যবস্থা রাখিতে হইবে।

২. কোনো লোক যাহাতে দুইবার ভোটদান করিতে না পারে, তাহার জন্য ভোটারদের হাতের নখে যে কালির দাগ শীঘ্র মুছিয়া না যায় সেইরূপ কালির চিহ্ন দিতে হইবে।

৩. .... দলসমূহ যাহাতে গুন্ডামির আশ্রয় লইতে না পারে, তাহার জন্য ভোটগ্রহণ কেন্দ্রের সিকি মাইলের মধ্যে স্লোগান উচ্চারণ এবং অস্ত্রশস্ত্র ও লাঠিসোঁটা বহন নিষিদ্ধ করিতে হইবে।

৪. ইউনিয়নের কেন্দ্রস্থলে ভোটগ্রহণ কেন্দ্র স্থাপন করিতে এবং ভোটদাতাদের যাতায়াতের এবং স্থান সংকুলানের যাহাতে অসুবিধা না হয় তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে।

৫. পুলিশ কর্মচারীসহ সকল সরকারি অফিসার যাহাতে পক্ষপাতমূলক তৎপরতা শুরু না করেন, তজ্জন্য এখনই তাহাদিগকে সতর্ক করিয়া দিতে হইবে। নির্বাচন কমিশনার জনাব আজফার 'অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠানের প্রাণপণ প্রয়াস পাইবেন বলিয়া প্রতিশ্রুতি দেন।

মওলানা ভাসানী 'অবাধ ও নিরপেক্ষ' নির্বাচন অনুষ্ঠানের দাবি নিয়ে পূর্ববাংলার গভর্নর চৌধুরী খালিকুজ্জামানের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। গভর্নর মওলানা সাহেবকে প্রতিশ্রুতি দেন যে,

> নির্বাচনী প্রচারকার্য চালাইবার জন্য মোছলেম লীগ ও বিরোধী দলগুলোকে সমান সুযোগ দেওয়া হইবে এবং কোনো সরকারি কর্মচারী মোছলেম লীগের প্রচারকার্যে সহায়তা করিতেছে এরূপ সংবাদ পাইলে তাহার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইবে। গভর্নর আরও বলেন যে নির্বাচন যাহাতে শৃঙ্খলা ও সুষ্ঠুতার সহিত সম্পন্ন হয় সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখা হইবে।

সুষ্ঠু, অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের দাবিতে নিজামে এছলাম তার কাউন্সিল অধিবেশন শেষে নিম্নলিখিত প্রস্তাব পাস করে:

> সরকারি খরচে শাসন কর্তৃপক্ষের নির্বাচনী প্রচারণা চালানো সম্পর্কে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করা হয় এবং অবিলম্বে বর্তমান মন্ত্রিসভা ভাঙ্গিয়া দেওয়ার দাবি জানাইয়া দলমত নির্বিশেষে সকলকেই নির্বাচনী প্রচারণা চালাইবার জন্য গণতান্ত্রিক অধিকার হিসেবে মাইক ইত্যাদি ব্যবহারের অবাধ সুযোগ প্রদানের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার ও গভর্নরের নিকট দাবি জানানো হয়।

নির্বাচন শান্তিপূর্ণভাবে অনুষ্ঠিত হয়। আজাদ পত্রিকায় মন্তব্য করা হয় যে, 'নির্বাচনী দিবসের পূর্বে নানাজনে নানা প্রকার আশঙ্কা প্রকাশ করিয়াছিলেন। কিন্তু

www.Educationblog24.Com

গতকল্য ঢাকা শহরের ভোটারগণ এবং নির্বাচনের সহিত সংশ্লিষ্ট সকল দল ও ব্যক্তি বিস্ময়কর শৃঙ্খলাবোধের পরিচয় দিয়া সকলকেই স্তব্ধ করিয়া দিয়াছেন....পূর্ব পাকিস্তান গণতন্ত্রের প্রথম পরীক্ষায় সাফল্যজনকভাবে উত্তীর্ণ হইয়াছে।

আঙুলে অমোচনীয় কালি (indelible ink) লাগানোর বিধান করায় এবং East Bengal Electoral Offences Ordinance জারি করায় নির্বাচনে জাল ভোট দেয়ার চেষ্টা হয়নি, কিংবা জাল ভোট হয়নি।

নির্বাচনী ফলাফল

নির্বাচনে মুসলমান আসনে ৩৭.৬০% ভোট পড়ে। তখনকার যোগাযোগ ব্যবস্থার দুরবস্থা, মহিলাদের ভোটকেন্দ্রে আসতে অনীহা। প্রভৃতি কারণে ভোটদানের হার কম ছিল। নির্বাচনী ফলাফল ঘোষণা শুরু হয় ১৫ মার্চ (১৯৫৪) থেকে। সরকারি ফলাফল ঘোষিত হয় ২ এপ্রিল।

৭২টি অমুসলমান আসনের ফলাফল

পাকিস্তান জাতীয় কংগ্রেস	২৪টি আসন
তফশিলি ফেডারেশন	২৭টি আসন (রসরাজ মণ্ডল গ্রুপ)
সংখ্যালঘু যুক্তফ্রন্ট	১৩টি আসন (এর মধ্যে গণতন্ত্রী দল ৩টি)
কম্যুনিস্ট পার্টি	৪টি আসন
বৌদ্ধ	২টি আসন
খ্রিস্টান	১টি আসন
স্বতন্ত্র	১টি আসন
মোট	৭২টি আসন

২৩৭টি মুসলমান আসনের ফলাফল

যুক্তফ্রন্ট	২১৫টি আসন
মুসলিম লীগ	৯টি আসন
খেলাফতে রব্বানী পার্টি	১টি
স্বতন্ত্র	১২টি আসন
মোট	২৩৭টি আসন

মুসলমান আসনের স্বতন্ত্র সদস্যদের ৮ জন যুক্তফ্রন্টে যোগ দেন, ফলে যুক্তফ্রন্টের সদস্যাসংখ্যা ২২৩-এ উন্নীত হয়। চট্টগ্রাম থেকে নির্বাচিত একজন স্বতন্ত্র সদস্য মুসলিম লীগে যোগদান করলে ঐ দলের সদস্য সংখ্যা ১০ হয়।

সারণী-৩-এ মুসলমান আসনের জেলাভিত্তিক ফলাফল দেয়া হল। এতে দেখা যায় যে, ৮টি জেলায় যুক্তফ্রন্ট একচেটিয়াভাবে সবগুলি আসন লাভ করে। মুসলিম লীগ কেবলমাত্র রংপুর, যশোর, সিলেট ও ত্রিপুরা জেলায় আসন পায়। খেলাফতে রব্বানী

www.Educationblog24.com

www.Educationblog24.Com

পাটি সে আসনটি লাভ করে তা সিলেট জেলায়।

সারণী-৩ মুসলমান আসনের জেলাভিত্তিক ফলাফল

ক্রম নং	জেলা	মোট আসন	যুক্তফ্রন্ট	লীগ	রব্বানী পার্টি	স্বতন্ত্র
১	দিনাজপুর	৬	৬	-	-	-
২	রংপুর	১৬	১১	৪	-	১
৩	বগুড়া	৮	৮	-	-	-
৪	রাজশাহী	১৩	১২	-	-	১
৫	পাবনা	৯	৯	-	-	-
৬	কুষ্টিয়া	৬	৬	-	-	-
৭	যশোর	৮	৭	১	-	-
৮	খুলনা	৮	৮	-	-	-
৯	বাখরগঞ্জ	২০	১৯	-	-	১
১০	ফরিদপুর	১৪	১৪	-	-	-
১১	ঢাকা	২৩	২৩	-	-	-
১২	মোমেনশাহী	৩৪	৩৪	-	-	-
১৩	সিলেট	১৫	১১	২	১	১
১৪	ত্রিপুরা	২২	১৫	২	-	৫
১৫	নোয়াখালী	১৩	১২	-	-	১
১৬	চট্টগ্রাম	১৩	১১	-	-	২
	মহিলা	৯	৯	-	-	-
	মোট	২৩৭	২১৫	৯	১	১২

নির্বাচনে মুসলিম লীগের ভরাডুবি ঘটে। মুখ্যমন্ত্রী নূরুল আমিন এবং আরো চারজন ক্যাবিনেট মন্ত্রী এবং কমপক্ষে ৫০ জন মুসলিম লীগ দলীয় প্রার্থীর জামানত বাজেয়াপ্ত হয়। নূরুল আমিন নিজ আসনে খালেক নেওয়াজ খান নামক ২৫ বৎসর বয়সী এক আইনের ছাত্রের নিকট প্রায় ৭,০০০ ভোটের ব্যবধানে পরাজিত হন। তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম লীগের সাধারণ সম্পাদক ফকির আবদুল মান্নান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইনের ছাত্র জনাব তাজউদ্দীন আহমদের নিকট প্রায় ১৩ হাজার ভোটের ব্যবধানে পরাজিত হন। মুসলিম লীগ সমর্থিত তফশিলি জাতি ফেডারেশন (বারুরী গ্রুপ)-এর ভরাডুবি ঘটে।

নির্বাচনে মুসলিম লীগের পরাজয়ের কারণ

নির্বাচনে মুসলিম লীগের পরাজয়ের পিছনে অনেকগুলি কারণ ছিল। ১৯৪৭ সালের ১৪ আগস্টে শাসনক্ষমতা হাতে পেয়ে দলের নেতৃবর্গ নিজেদের ভাগ্য গড়ার কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়েন। তারা জনগণের সঙ্গে যোগাযোগ বজায় রাখতে অবহেলা দেখান। ফলে দলটি জনবিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। দলের অনেক পুরাতন এবং জনপ্রিয় নেতা ও সদস্য

www.Educationblog24.com

www.Educationblog24.Com

বিভিন্ন কারণে দলত্যাগ করেন এবং নতুন দল (যেমন আওয়ামী মুসলিম লীগ) গঠন করেন। ফলে দলের সাংগঠনিক শক্তি দুর্বল হয়ে পড়ে। তাছাড়া মুসলিম লীগ পরিচালিত কেন্দ্রীয় সরকারের নীতির ফলে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মাধ্যমে বহুমুখী বৈষম্যের সৃষ্টি হয়, সেজন্য পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ মুসলিম লীগকেই দায়ী করে এবং নির্বাচনে তার প্রভাব পড়ে। মুসলিম লীগের পূর্ব বাংলা শাখা এবং পূর্ব বাংলার মুসলিম লীগ সরকার এই প্রদেশের অর্থনৈতিক অবনতি রোধ করতে ব্যর্থ হয়। লবণ, কেরোসিন ও সরিষার তেল প্রভৃতি নিত্যব্যবহার্য দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধি পাওয়ায় গৃহবধূরাও মুসলিম লীগের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়ে এবং তারা মুসলিম লীগের বিরুদ্ধে ভোট দেয়। বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার দাবির প্রতি চরম বিরোধিতা করে ১৯৫২ সালের হত্যাকা ঘটিয়ে দলের বিরুদ্ধে বাংলার আপামর জনসাধারণকে বিক্ষুব্ধ করে তোলে। দীর্ঘ ৭ বৎসর সংবিধান প্রণয়ন করতে ব্যর্থ হওয়ায় প্রদেশবাসীর নিকট দলের গ্রহণযোগ্যতা কমে যায়। ফলে নির্বাচনের প্রাক্কালে মুসলিম লীগ নেতৃবৃন্দের কোনো বক্তব্যই জনগণকে খুশি করতে পারেনি। অপরপক্ষে, ফজলুল হক, ভাসানী ও সোহরাওয়ার্দী–এই তিনজনের নির্বাচনী প্রচারণার ফলে 'দেশময় যে প্রাণচাঞ্চল্যের বন্যা আসিল, তাতে মুসলিম লীগের মতো ক্ষমতাসীন দল ভাসিয়া গেল।'

মুসলিম লীগের মুখপত্র আজাদ পত্রিকা এই দলের পরাজয়ের জন্য নিম্নলিখিত কারণগুলো চিহ্নিত করে:

> সাধারণভাবে লীগের পরাজয়ের যেসব কারণ সর্বত্র আজকাল আলোচিত হইতেছে সেসবের ভিতর রহিয়াছে কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক কর্তৃপক্ষের এবং লীগের কতিপয় নীতি ও কার্যের প্রতিবাদ.... লীগের পরাজয়ের কারণগুলি হইতেছে: (১) বাংলাভাষার দাবির প্রতি অবিচার, ভাষা আন্দোলন সম্পর্কে নূরুল আমিন সরকারের দমন-নীতি; (২) পূর্ব পাকিস্তানের প্রতি কেন্দ্রের নীতি, সমদর্শিতার অভাব; অবিচার ও শোষণ নীতি; (৩) লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে পূর্ববাংলাকে স্বায়ত্তশাসন না- দেওয়ার প্রস্তাব ও মনোভাব; (৪) পূর্ববাংলার জনগণের আর্থিক দুর্দশা; (৫) শাসনতন্ত্র রচনার বিলম্ব; (৬) লীগের গণসংযোগের অভাব; (৭) লীগ ও মন্ত্রিত্বের একীকরণ; (৮) লীগের ভিতর বিপুল ব্যক্তিত্বশালী নেতৃত্বের অভাব; (১০) দুর্নীতি দমনে সরকারি ব্যর্থতা এবং এইভাবে তালিকায় আরো কারণ যোগ করা যাইতে পারে।

নির্বাচনে বিজয়ী পরিষদ সদস্যবৃন্দের সামাজিক পটভূমি

১৯৫৪ সালের পূর্ববাংলা ব্যবস্থাপক পরিষদের নির্বাচনে পরিষদ সদস্যদের সামাজিক পটভূমি নির্ণয় বর্তমানে দুঃসাধ্য। নির্বাচিত সদস্যদের অনেকেই এখন জীবিত নেই। তাদের অধিকাংশের কোনো জীবনীগ্রন্থ লিখিত হয় নাই। অধ্যাপক নাজমা চৌধুরীর গবেষণাগ্রন্থ থেকে আমরা কিছু তথ্য পাই। তিনি ১৯৬৭-৬৯ সময়ে তার পি.এইচ.ডি গবেষণাকর্মের অংশ হিসেবে ১৯৫৪-এর নির্বাচনে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের নিকট তাদের জীবনীর বিভিন্ন তথ্য জানতে চেয়ে একটি প্রশ্নমালা প্রেরণ করেন। ৩২২ জন নির্বাচিত প্রতিনিধির নিকট প্রশ্নমালা প্রেরিত হলেও মাত্র ১২৩ জন (৩৮.২%) প্রশ্নমালা পূরণ করে ফেরত পাঠান। উক্ত ১২৩ জনের দেয়া তথ্যের ভিত্তিতে অধ্যাপক

www.Educationblog24.Com

চৌধুরী তাদের যে সামাজিক পরিচয় লিপিবদ্ধ করেছেন তা সংক্ষেপে নিম্নরূপ:

নির্বাচিত প্রতিনিধিবৃন্দ অধিকাংশই ছিলেন বেশ বয়স্ক। ৬০-এর বেশি বয়স্ক সদস্যের সংখ্যা যেখানে ছিল ১৭%, ৩০-এর কম বয়স্ক সদস্য সংখ্যা সেখানে মাত্র ৭%। ৪৫-এর অধিক বয়স্ক সদস্য সংখ্যা ছিল ৫১%।

নির্বাচিত সদস্যবৃন্দ অধিকাংশই ছিলেন উচ্চ শিক্ষিত। আইন পাস সদস্য সংখ্যা ছিল লক্ষণীয় (৪৫%)। ডাক্তারি পাস ছিলেন ৫%। স্নাতকোত্তর ডিগ্রিধারী ১৫%। ম্যাট্রিক পাস করেননি এমন সদস্যসংখ্যা ৬%, ম্যাট্রিক পাস ৬% এবং ইন্টারমিডিয়েট পাস ৮%। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, নন-গ্রাজুয়েট সদস্য সংখ্যা ২০% (২৪ জন)। এদের মধ্যে ২ জন ধনী জমিদার পরিবারের সদস্য, ২ জন বড় জোতদার, ২ জন এমন পরিবারের সদস্য যে পরিবার থেকে ইতোপূর্বে পরিষদ সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলেন, ৫ জন মোক্তার, ৩ জন ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনে সম্পৃক্ত থাকায় পড়াশুনা করতে পারেননি, ১ জন বড় ব্যবসায়ী, ১ জন দীর্ঘদিন স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে জড়িত ছিলেন, ১ জন বিপ-বী কর্মী। এরা সকলেই নিজ নিজ এলাকায় সুপরিচিত হওয়ায় কম লেখাপড়া তাদের নির্বাচনে বিঘ্ন সৃষ্টি করেনি। নির্বাচিত সদস্যদের ৬% (৭ জন) ছিলেন ধর্মীয় শিক্ষায় শিক্ষিত। লক্ষণীয় যে, ধর্মীয় শিক্ষায় শিক্ষিতরা যে সকলেই কোনো ধর্মীয় সংগঠনের বা দলের সদস্য ছিলেন এমন নয়। উক্ত ৭ জনের ১ জন নিবাচিত হয়েছিলেন নিজামে এছলামী থেকে, ৩ জন মুসলিম লীগ থেকে এবং ২ জন আওয়ামী লীগ থেকে। ১ জনের দলীয় পরিচয় জানা যায়নি। আওয়ামী লীগের সদস্যদ্বয় ১৯৪৭-এর পূর্বে মুসলিম লীগ দলের সদস্য ছিলেন।

নির্বাচিত সদস্যদের পেশার ভিত্তিতে বিশ্লেষণ করে দেখানো হয়েছে যে, আইন পেশার সঙ্গে সংশ্লিষ্টদের সংখ্যা ছিল সর্বাধিক– ৫১%। জমিদার ভূস্বামী ১১%, শিক্ষাবিদ ৯%, সাংবাদিক ৩%, ডাক্তার ৬%, অন্যান্য ৯%। কেউই শিল্পপতি হিসেবে নিজেকে পরিচয় দেননি। অন্যান্য বলতে ধর্মপ্রচার করা, সার্বক্ষণিক রাজনীতি করা, সার্বক্ষণিক জনসেবা করা প্রভৃতি উল্লেখ করেছেন।

১৮৫৪ সালের নির্বাচনে নির্বাচিত সদস্যদের মাত্র ১৪%-এর ইতোপূর্বে কোনো না কোনো আইন পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হওয়ার অভিজ্ঞতা ছিল। এই তথ্য থেকে প্রতীয়মান হয় যে, ১৯৫৪ সালে গঠিত ব্যবস্থাপক পরিষদ পার্লামেন্টারি ব্যবস্থা অনভিজ্ঞদের দ্বারা পূর্ণ ছিল। তবে অন্তত ২৫% সদস্যের স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানে (ইউনিয়ন বোর্ড, লোকাল বোর্ড, ডিস্ট্রিক্ট বোর্ড) সংশ্লিষ্ট থাকার পূর্ব-অভিজ্ঞতা ছিল।

পর্যালোচনা

১৯৫৪ সালের পূর্ববাংলা ব্যবস্থাপক পরিষদের নির্বাচনের গুরুত্ব অত্যাধিক। পূর্ববাংলায় এটি ছিল প্রাপ্তবয়স্কদের প্রত্যক্ষভোটে অনুষ্ঠিত প্রথম সাধারণ নির্বাচন। নির্বাচন ছিল অবাধ, নিরপেক্ষ ও শান্তিপূর্ণ। নির্বাচনে সরকারি দলের এমন শোচনীয় পরাজয় ছিল বিরল ঘটনা। পূর্ববাংলার তৎকালীন সরকার নির্বাচনে পরাজয়ের সম্ভাবনা এড়ানোর জন্য নির্বাচন পিছিয়ে দেন, কিন্তু নির্বাচনে কারচুপির প্রচেষ্টা করেননি। এই নির্বাচনে জনগণ স্বতঃস্ফূর্তভাবে ব্যালটের মাধ্যমে তাদের মতামত প্রকাশের সুযোগ লাভ

www.Educationblog24.com

করেছিল এবং তারা উক্ত সুযোগের সদ্ব্যবহার করেছে। নির্বাচনে যুক্তফ্রন্টের ২১-দফার দাবির সপক্ষে ভোট দিয়ে জনগণ পূর্ববাংলার স্বায়ত্তশাসনের দাবিকে সমর্থন জানিয়েছিল। এই নির্বাচনে মুসলিম লীগের পরাজয়ের ফলে পাকিস্তান গণপরিষদে উক্ত দলের সদস্য সংখ্যা হ্রাস পায়, ফলে পাকিস্তানের কোয়ালিশন সরকার গঠন অপরিহার্য হয়ে পড়ে। পূর্ববাংলায় সেই-যে মুসলিম লীগের পতন ঘটল, এরপর আর কখনো এখানে মুসলিম লীগ শক্তিশালী হতে পারেনি।

খ. যুক্তফ্রন্ট সরকারের শাসনামল

যুক্তফ্রন্টের সরকার গঠন

নির্বাচনে মওলানা ভাসানী এবং সোহরাওয়ার্দী প্রার্থী হননি। ভাসানী পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগের সাংগঠনিক দায়িত্ব পালনকে অগ্রাধিকার দিতে চেয়েছেন। অপরদিকে সোহরাওয়ার্দী জাতীয় পর্যায়ে রাজনীতি করবেন বলে প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচনে অংশ নেননি। নির্বাচনে ভাসানী ও সোহরাওয়ার্দীর অংশ না-নেয়ায় সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছিল নির্বাচনে জয়লাভ করলে এ. কে. ফজলুল হক যুক্তফ্রন্ট পার্লামেন্টারি বোর্ডের নেতা নির্বাচিত হবেন। সেই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী তিনি পূর্ববাংলায় সরকার গঠনের আমন্ত্রণ পান এবং তার নেতৃত্ব ৩ এপ্রিল (১৯৫৪) চার সদস্য বিশিষ্ট মন্ত্রিপরিষদ গঠিত হয়। এই মন্ত্রিসভার অন্য সদস্যরা ছিলেন কৃষক-শ্রমিক পার্টির সৈয়দ আজিজুল হক ও আবু হোসেন সরকার এবং নেজামে এছলামীর মৌলভী আশরাফ উদ্দিন চৌধুরী। প্রাদেশিক আইন পরিষদের স্পিকার ও ডেপুটি স্পিকার নির্বাচিত হন যথাক্রমে কৃষক শ্রমিক-পার্টির আবদুল হাকিম এবং আওয়ামী লীগের শাহেদ আলী। নির্বাচনে মুসলিম লীগের শোচনীয় পরাজয় কেন্দ্রীয় সরকার সুনজরে দেখেনি। স্বভাবতই তারা যুক্তফ্রন্টের ভাঙন চেয়েছে। এমতাবস্থায় যুক্তফ্রন্টের শরিক দলগুলির সাবধান হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু তা না হয়ে শুরুতেই মন্ত্রিপরিষদ গঠন নিয়ে মনমালিন্য শুরু হয়। ৩ এপ্রিল ফজলুল হক যে ৩ জনকে মন্ত্রি পরিষদে অন্তর্ভুক্ত করেন তাদের ২ জন তার দলের এবং ১ জন নেজামে এছলামীর। এ সময় আওয়ামী লীগ বাদ পড়ে।

যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভায় আওয়ামী লীগ দলীয় সদস্য নির্বাচন নিয়ে ফজলুল হকের সঙ্গে আওয়ামী লীগের মতানৈক্য ঘটে। আওয়ামী লীগের মনোনীত সদস্যদের মধ্যে শেখ মুজিবুর রহমান ও আতাউর রহমানের নাম ছিল। ফজলুল হক এই দুজনকে মন্ত্রিসভায় অন্তর্ভুক্ত করতে রাজি ছিলেন না। ১৫ মে পর্যন্ত এ বিষয়ে আপোষ হয়নি। ইতোমধ্যে ফজলুল হকের কলিকাতা ভ্রমণকে কেন্দ্র করে তার বিরুদ্ধে কেন্দ্রীয় সরকার বিভিন্ন অভিযোগ উত্থাপন করেন। নির্বাচিত হওয়ার পর ফজলুল হক ৩০ এপ্রিল সরকারি সফরে কলিকাতা যান এবং সেখানে বিভিন্ন সংবর্ধনা সভায় যেসব ভাষণ দেন তার মূল কথা ছিল:

> রাজনৈতিক কারণে বাংলা দ্বিখণ্ডিত হয়ে থাকলেও বাঙালির শিক্ষা, সংস্কৃতি এবং বাঙালিত্বের যে একটা নিজস্ব বৈশিষ্ট্য আছে তা দুটি বাঙলায়ই বর্তমান এবং ভবিষ্যতেও বর্তমান থাকবে।

www.Educationblog24.com

ফজলুল হকের এসব মন্তব্যে মুসলিম লীগ নেতৃবৃন্দ তথা পাকিস্তান কেন্দ্রীয় সরকার তাকে অপসারণের উপায় খুঁজে পেলেন। তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপিত হলো যে তিনি ভারতের কাছে পূর্ববাংলাকে বিক্রি করে দিতে চান।

এমতাবস্থায় ফজলুল হক আওয়ামী লীগের সঙ্গে আপস করতে বাধ্য হন। ১৫ মে (১৯৫৪) আওয়ামী লীগ দলীয় কিছু সদস্যকে, এমনকি তার অপছন্দনীয় শেখ মুজিব ও আতাউর রহমান খানকে তিনি তার মন্ত্রিসভায় অন্তর্ভুক্ত করেন। কিন্তু চক্রান্তকারীর এই নতুন মন্ত্রিসভার পতন ঘটানোর জন্য নানান ষড়যন্ত্র শুরু করে। তারা অত্যন্ত সূচতুরভাবে পূর্ববাংলার শিল্প-এলাকাগুলোতে বাঙালি-অবাঙালি শ্রমিকদের মধ্যে দাঙ্গা বাঁধিয়ে দিয়ে অভিযোগ উত্থাপন করে যে, প্রদেশের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করতে যুক্তফ্রন্ট সরকার ব্যর্থ। এ সময় একজন সাংবাদিক পরিস্থিতি ঘোলাটে করতে সাহায্য করে। এ. কে. ফজলুল হক মুখ্যমন্ত্রীদের সম্মেলনে উপস্থিত হতে করাচি গেলে 'নিউইয়র্ক টাইমস'-এর সংবাদদাতা জন.পি কালাহান তার এক সাক্ষাৎকার গ্রহণ করে এবং ২৩ মে সাক্ষাৎকারটি বিকৃত করে প্রকাশ করেন। উক্ত সাক্ষাৎকারে ফজলুল হক পূর্ববাংলার অধিক স্বায়ত্তশাসন পাওয়া উচিত বলে অভিমত ব্যক্ত করেছিলেন। কিন্তু কালাহান লেখেন যে, ফজলুল হক পূর্ববাংলার স্বাধীনতা চান। রিপোর্টটি প্রকাশিত হলে হক সাহেব এর বিরোধিতা করেন। কিন্তু পাকিস্তান শাসকগোষ্ঠী মি. কালাহানের রিপোর্টটিই বিশ্বাস করে এবং ফজলুল হককে দেশদ্রোহী হিসেবে ঘোষণা করে।

আসলে যুক্তফ্রন্টের নির্বাচনী সাফল্য মুসলিম লীগ ও কেন্দ্রীয় শাসকগোষ্ঠী সুনজরে দেখেনি। তারা যুক্তফ্রন্ট সরকারকে বরখাস্ত করার নানান উপায় খুঁজতে থাকে এবং তারই প্রেক্ষিতে ফজলুল হকের বিরুদ্ধে একের পর এক অভিযোগ উত্থাপন করতে থাকে। অবশেষে কেন্দ্রীয় সরকার ২৯ মে (১৯৫৪) পূর্ব বাংলায় ফজলুল হক মন্ত্রিসভা বাতিল করে প্রদেশের ওপর গভর্নরের শাসন জারি করে। পূর্ববাংলায় গভর্নরের শাসন ১৯৫৫ সালেই জুন পর্যন্ত বহাল থাকে। ইতোমধ্যে ১৭ মে মেজর জেনারেল ইস্কান্দার মীর্জাকে পূর্ববাংলার গভর্নর নিয়োগ করা হয়েছিল। এক্ষণেই তিনিই গভর্নর হিসেবে সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী হয়। তিনি পূর্ব বাংলায় ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করেন। গভর্নরের শাসনের প্রথম সপ্তাহের মধ্যেই যুক্তফ্রন্টের ৬৫৯ জন সক্রিয় কর্মীকে গ্রেফতার করা হয়। সে সময় ১ জন যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রী (শেখ মুজিবুর রহমান) এবং ১৩ জন নির্বাচিত প্রাদেশিক পরিষদ সদস্যকেও গ্রেফতার করা হয়। জুনের মাঝামাঝি নাগাদ প্রায় এক হাজার বাঙালিকে বন্দি করা হয়। ফজলুল হককে গৃহবন্দি করে রাখা হয়। কম্যুনিস্ট পার্টিকে পাকিস্তানে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়। এই দলের অনেক নেতা ও কর্মীকে বন্দি করা হয়। গভর্নরের শাসন জারির সময় মওলানা ভাসানী ও সোহরাওয়ার্দী বিদেশে অবস্থান করছিলেন। ফলে নির্বাচিত সরকারকে বরখাস্ত করে গভর্নরের শাসন জারি করার প্রতিক্রিয়া হিসেবে পূর্ব বাংলায় কোনো প্রতিবাদ কিংবা মিছিল-মিটিং অনুষ্ঠিত হয়নি।

এইভাবে সন্দেহজনক সকল বামপন্থী নেতা ও কর্মীকে বন্দি করার পর কেন্দ্রীয়

www.Educationblog24.Com

সরকার পূর্ববাংলায় নির্বাচিত প্রতিনিধিদের দ্বারা সরকার গঠনের উদ্যোগ গ্রহণ করে। যে ফজলুল হককে দেশদ্রোহী আখ্যা দেয়া হয়েছিল তাকেই পদচ্যুত করার ২ মাসের মধ্যে কেন্দ্রীয় সরকারের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী করে পাকিস্তানের সংহতি রক্ষার দায়িত্ব দেয়া হয়। ফজলুল হক কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে আঁতাত করার সুযোগ পেয়ে পূর্ববাংলায় তার দলের (কৃষক-শ্রমিক পার্টি) সরকার পুনঃপ্রতিষ্ঠার তদবির করতে থাকেন। যদিও যুক্তফ্রন্টে আওয়ামী লীগের সংখ্যাগরিষ্ঠতা ছিল তথাপি আবু হোসেন সরকারকে পূর্ববাংলার মুখ্যমন্ত্রী করার চেষ্টা করতে থাকেন। এর ফলে যুক্তফ্রন্ট ভেঙে যায়। আওয়ামী লীগের আতাউর রহমান খান তৎকালীন পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী (বগুড়ার মোহাম্মদ আলী) সঙ্গে দেখা করে আওয়ামী লীগকে সরকার গঠনের সুযোগ দানের পক্ষে যুক্তি পেশ করেন। মোহাম্মদ আলী স্বীকার করেন যে, প্রাদেশিক পরিষদে বৃহত্তম দলের নেতা হিসেবে আতাউর রহমান খান মুখ্যমন্ত্রিত্ব দাবি করতে পারেন, কিন্তু পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে তিনি কীভাবে একজন কম্যুনিস্টকে পূর্ববাংলার মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে সুপারিশ করবেন? আতাউর রহমান খানকে কম্যুনিস্ট বলার কারণ এই যে, তিনি ১৯৫২ সালে পিকিঙে অনুষ্ঠিত শান্তি সম্মেলনে যোগদান করেছিলেন। উক্ত সম্মেলনে পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠীর গুরুত্বপূর্ণ অন্যান্য নেতা যোগদান করেও কম্যুনিস্ট আখ্যা পাননি, কিন্তু আতাউর রহমান খানকে কম্যুনিস্ট বলা হল। উদ্দেশ্য একটাই, পূর্ব বাংলায় আওয়ামী লীগকে ক্ষমতা না দিয়ে ফজলুর হকের দলকে ক্ষমতা দেয়া এবং এইভাবে যুক্তফ্রন্টকে খণ্ডিত করা। যুক্তফ্রন্টের মধ্যে ভাঙন ধরানোর কেন্দ্রীয় প্রচেষ্টা অচিরেই সফল হয়।

আমরা ইতোমধ্যে উল্লেখ করেছি যে, যুক্তফ্রন্ট গঠনের সময় এ. কে. ফজলুল হককে পার্লামেন্টারি দলের নেতা নির্বাচিত করা হয়েছিল, সেই সুবাদে তিনি যুক্তফ্রন্টে মুখ্যমন্ত্রী নির্বাচিত হয়েছিলেন। কিন্তু তিনিই যখন আওয়ামী লীগকে বাদ দিয়ে পূর্ববাংলা সরকার গঠনের জন্য চেষ্টা শুরু করেন তখন স্বভাবতই যুক্তফ্রন্টের আওয়ামী লীগ দলীয় প্রাদেশিক পরিষদ সদস্যবৃন্দ ১৯৫৫ সালের ১৭ ফেব্রুয়ারি পার্লামেন্টারি নেতা হিসেবে ফজলুল হকের প্রতি অনাস্থা প্রস্তাব উত্থাপন করে। কিন্তু এতে আওয়ামী লীগের জন্য হিতে বিপরীত হয়। ৩২ জন আওয়ামী লীগ দলীয় সদস্য পার্টি পরিবর্তন করে কৃষক শ্রমিক পার্টিতে যোগদান করে। এই ধারা অব্যাহত থাকে, ফলে ২ এপ্রিল (১৯৫৫)-এর মধ্যেই আওয়ামী লীগ দলীয় সদস্যসংখ্যা ১৪০ থেকে ৯৮-এ নেমে আসে। তখন কৃষক শ্রমিক পার্টির সদস্য সংখ্যা ৩৪ থেকে বেড়ে ৬৯ হয় এবং নেজামে এছলামী সদস্য সংখ্যাও বেড়ে ১২ থেকে ১৯ হয়। তাছাড়া আওয়ামী মুসলিম লীগ থেকে 'মুসলিম' শব্দ বাদ দেবার কারণে ২০ জন সদস্য আওয়ামী লীগ থেকে বের হয়ে আবদুস সালাম খানের নেতৃত্বে আওয়ামী মুসলিম লীগ নামে দলবদ্ধ হয় এবং তারা কৃষক-শ্রমিক পার্টি ও নেজামে এছলামীকে সরকার গঠনের ব্যাপারে সমর্থন হয়। এইভাবে যুক্তফ্রন্ট বিভক্ত হয়ে যায়। একদিকে আওয়ামী লীগ এবং অন্যদিকে কৃষক শ্রমিক পার্টি, নেজামে এছলামী এবং আওয়ামী মুসলিম লীগ। গণতন্ত্রী দল ও

www.Educationblog24.Com

কমিউনিস্ট দলের সদস্যবৃন্দ আওয়ামী লীগকে সমর্থন করে, অন্য দিকে খেলাফতে রব্বানী পার্টি ও কিছু হিন্দু-সদস্য ফজলুল হকের জোটকে সমর্থন দেন। এইভাবে পূর্ববাংলায় যুক্তফ্রন্টভুক্ত মুসলমান সদস্যবৃন্দ দুই ধারায় বিভক্ত হয়। আওয়ামী লীগের ধারাটি ধর্ম নিরপেক্ষ অসাম্প্রদায়িক রাজনীতিকে গ্রহণ করে, অপরপক্ষে ফজলুল হকের জোট রক্ষণশীল ধারার রাজনীতি গ্রহণ করে মুসলিম লীগের নিকট নিজেদেরকে গ্রহণযোগ্য করে তোলে।

কেন্দ্রীয় মুসলিম লীগ সরকার কেবল যুক্তফ্রন্ট ভেঙ্গেই ক্ষান্ত হয় না, তার সোহরাওয়ার্দীকে কেন্দ্রীয় সরকারের আইনমন্ত্রী হিসেবে নিয়োগ করে পূর্ববাংলায় আওয়ামী লীগকে বামপন্থীদের সমালোচনার সম্মুখীন করে। ফজলুল হক এবং সোহরাওয়ার্দী-উভয়েই কেন্দ্রীয় সরকারের মন্ত্রী ছিলেন, অথচ পূর্ববাংলায় মন্ত্রিসভা গঠনের অনুমোদন দেয়। আবু হোসেন সরকারের মন্ত্রি পরিষদের যোগদান করে কৃষক-শ্রমিক পার্টি, নেজামে এছলামী, আওয়ামী মুসলিম লীগ ও পাকিস্তান ন্যাশনাল কংগ্রেস নবনিযুক্ত কোয়ালিশন মন্ত্রিসভার প্রতি প্রাদেশিক আইনপরিষদের সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যের আস্থা ও সমর্থন আছে কিনা তা প্রমাণ করার জন্য আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে পরিষদের অধিবেশন আহবানের দাবি করা হলেও সরকার পরিষদের অধিবেশন আহবান করতে অস্বীকার করেন। এমনকি পরবর্তী আট মাসের আইনপরিষদের কোনো সভা আহ্বান করা হয়নি। উপরন্তু আবু হোসেন সরকারের মন্ত্রিসভার অস্তিত্ব রক্ষার্থে ১৯৫৬ সালে ৫ মার্চ ফজলুল হক পূর্ববাংলার গভর্নর পদ লাভে সক্ষম হন। গভর্নর পদে যোগদান করে ফজলুল হক ২২-৫-৫৬ তারিখে প্রাদেশিক পরিষদের বাজেট অধিবেশন আহবান করেন। কিন্তু বাজেট পাস করাতে ব্যর্থ হলে মন্ত্রিসভার পতন হবে–এই আশঙ্কায় গভর্নর ২৪ মে (১৯৫৬) আইনসভার অধিবেশন অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত রাখেন। পূর্ববাংলায় মন্ত্রিসভা সংবিধান অনুসারে চালানো যাচ্ছে না এই কারণ দেখিয়ে জরুরি ক্ষমতা বলে এখানে কেন্দ্রের শাসন জারি করা হয়। সাত দিন পর কেন্দ্রের শাসন প্রত্যাহার করে আবু হোসেন সরকারের পূর্ববর্তী মন্ত্রিসভা পুনর্বহাল করা হয়। যদিও তখন আওয়ামী লীগকে সরকার গঠনের আমন্ত্রণ জানানো এবং সংসদে তার সংখ্যাগরিষ্ঠতা প্রদানের সুযোগ দেয়াই সংসদীয় রীতি ছিল, কিন্তু তা উপেক্ষিত হয়।

ফজলুল হকের গভর্নর পদ লাভ ও তার দলের মন্ত্রিসভা গঠনের অনুমতি লাভের পিছনে মুসলিম লীগকে দেয়া তাদের ২টি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিশ্রুতি ছিল। প্রথমত পাকিস্তান মন্ত্রী পরিষদে পাস করার জন্য যে খসড়া সংবিধান পেশ করা হবে তা তার দল সমর্থন করবে। দ্বিতীয়ত আওয়ামী লীগের প্রস্তাবিত যৌথ নির্বাচনী ব্যবস্থা ও আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের দাবি সমর্থন করবে না।

পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর পদসহ মন্ত্রিপরিষদ গঠনের সুযোগ লাভের বিনিময়ে ফজলুল হক দল উপরিউক্ত প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেছিল। তারা পাকিস্তান গণপরিষদে উত্থাপিত খসড়া-সংবিধান সমর্থন করে। অপরদিকে গণপরিষদে খসড়া- সংবিধানে পাকিস্তানকে 'ইসলামী প্রজাতন্ত্র' রূপে ঘোষণা করাকে আওয়ামী লীগ দলীয়ভাবে

www.Educationblog24.Com

বিরোধিতা করে। আওয়ামী লীগ সংবিধানে যৌথ নির্বাচন ব্যবস্থা ও পূর্ববাংলার জন্য অধিক স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থা নিশ্চিত করার দাবি করে। কিন্তু গণপরিষদে কৃষক-শ্রমিক পার্টি মুসলিম লীগকে সমর্থন করায় কেন্দ্রীয় মুসলিম লীগ সরকার সংবিধান পাস করিয়ে নিতে সমর্থ হন। আওয়ামী লীগ গণপরিষদ থেকে ওয়াকআউট করে এবং সংবিধানে স্বাক্ষর করতে অস্বীকার করে। তবে সোহরাওয়ার্দী ব্যক্তিগতভাবে সংবিধানে স্বাক্ষর করেন।

কৃষক-শ্রমিক পার্টি যৌথ নির্বাচনী ব্যবস্থা বিরোধিতা করায় পূর্ববাংলায় প্রাদেশিক পরিষদের সংখ্যালঘু সদস্যবৃন্দ কৃষক-শ্রমিক পার্টির সরকার থেকে সমর্থন প্রত্যাহার করে নেয় এবং আওয়ামী লীগকে সমর্থন করে। এ সময় পূর্ববাংলায় আবু হোসেন সরকারের কৃষক-শ্রমিক পার্টির প্রতি কেবলমাত্র নেজামে এছলামী সমর্থন অব্যাহত রাখে। এমনি অবস্থায় ১৯৫৬ সালের আগস্ট মাসে প্রাদেশিক আইনপরিষদের অধিবেশন আহবান করা হয়। কিন্তু আইনপরিষদে আবু হোসেন সরকারের মন্ত্রিসভা আস্থা ভোটের সম্মুখীন হলে সুনিশ্চিত পরাজিত হবে বুঝতে পেরে মুখমন্ত্রীর পরামর্শক্রমে গভর্নর এ. কে. ফজলুল হক উক্ত পরিষদের অধিবেশন শুরু হওয়ার মাত্র কয়েক ঘন্টা পূর্বে অধিবেশন স্থগিত ঘোষণা করেন। এভাবে পুনরায় আবু হোসেন সরকার সংসদীয় গণতন্ত্রের প্রতি চরম অবজ্ঞা প্রদর্শন করে। কিন্তু তারা প্রাদেশিক সরকারের পতন ঠেকাতে পারেনি। ইতোমধ্যে কেন্দ্রে আওয়ামী লীগ সমর্থিত কোয়ালিশন সরকারের ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়। সেই প্রেক্ষিতে কেন্দ্রীয় সরকারের হস্তক্ষেপে শেষ পর্যন্ত ৩০ আগস্ট (১৯৫৬) আবু হোসেন মন্ত্রিসভার পতন ঘটে।

কৃষক-শ্রমিক পার্টির নেতৃত্বাধীন কোয়ালিশন সরকারের পতন ঘটার পর ৬ সেপ্টেম্বর (১৯৫৬) পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে কোয়ালিশন সরকার গঠিত হয়। এই কোয়ালিশন সরকার গণতন্ত্রী দল, রফিক হোসাইন-এর নেতৃত্বাধীন 'আওয়ামী মুসলিম লীগ' অংশ এবং অন্যান্য সংখ্যালঘু দল নিয়ে গঠিত হয়েছিল। কোয়িালিশন সরকারের মুখ্যমন্ত্রী হন আতাউর রহমান খান। প্রাদেশিক পরিষদের ৩০৯ জন সদস্যের মধ্যে আওয়ামী লীগ কোয়ালিশন সরকারের প্রতি ২০০ জন সদস্যের সমর্থন ছিল। এই ২০০ জনের মধ্যে আওয়ামী লীগের সদস্যসংখ্যা ছিল ৯৮ জন, গণতন্ত্রী দলের ১২ জন, সংখ্যালঘু ৭২ জন এবং ১৮ জন আওয়ামী মুসলিম লীগের।

পূর্ব পাকিস্তানে আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে কোয়ালিশন সরকার গঠনের ৫ দিন পর কেন্দ্রেও আওয়ামী লীগ ও রিপাবলিকান পার্টির কোয়ালিশন সরকার গঠিত হয়। এই নতুন সরকারের প্রধানমন্ত্রী হন আওয়ামী লীগ নেতা হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী উল্লেখ্য যে, ১৯৫৬ সালের জুলাই মাসে মুসলিম লীগ থেকে কিছু সদস্য বেরিয়ে যেয়ে রিপাবলিকান পার্টি গঠন করেছিলেন। তখন পাকিস্তান গণপরিষদের ৮০ জন সদস্যের মধ্যে আওয়ামী লীগ সমর্থিত সদস্য সংখ্যা ছিল ১৩ এবং রিপাবলিকান পার্টির সদস্য সংখ্যা ছিল ৩০ জন। তাছাড়া গণপরিষদের ১ জন গণতন্ত্রী দলীয় সদস্য ও ৭ জন সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের সদস্য আওয়ামী লগ রিপাবলিকান কোয়ালিশন সরকারের প্রতি

www.Educationblog24.com

www.Educationblog24.Com

সমর্থন জ্ঞান করেন। ফলে গণপরিষদে কোয়ালিশনের পক্ষে সদস্য সংখ্যা হয় ৫১ জন।

একই সঙ্গে কেন্দ্রে এবং প্রদেশে আওয়ামী লীগ ক্ষমতার অংশীদার হওয়ায় আওয়ামী লীগ সরকার স্বল্প সময়ের মধ্যে পূর্ববাংলায় অনেক উন্নয়নমূলক কর্মসূচি গ্রহণ করে এবং তা বাস্তবায়নে সক্ষম হয়। পূর্ববাংলায় আওয়ামী লীগ কোয়ালিশন সরকারের ক্ষমতার ভিত্তি ছিল জোতদারশ্রেণী এবং উঠতি বাঙালি বুর্জোয়াশ্রেণী। এই শ্রেণীর স্বার্থরক্ষার্থে ১৯৫৬ সালের শেষের দিকে জুট ট্রেডিং করপোরেশন প্রতিষ্ঠা করা হয়। পূর্ববাংলা প্রদেশ পাওয়ার-স্টেশন নির্মাণ, শিল্পের বিকাশ ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন সাধনের উদ্দেশে প্রচুর পরিমাণ অর্থ বরাদ্দ করা হয়। পূর্ববাংলার ব্যবসায়ীদের অনুকূলে আমদানি লাইসেন্স প্রদান করা হয়। এখানকার ধনী কৃষক ও জোতদারশ্রেণী এবং ব্যবসায়ী সম্প্রদায় তাদের পুঁজি যাতে শিল্প-কারখানা প্রতিষ্ঠায় নিয়োগ করতে পারে সে জন্য সরকার উদ্যোগ গ্রহণ করে। পূর্ব বাংলায় ২ বৎসরের শাসননামলে (মাঝে মধ্যে বিরতিসহ) আওয়ামী লীগ সরকার ফেঞ্চুগঞ্জে গ্যাস কারখানা স্থাপন করে; সাভারে ডেয়ারি ফার্ম প্রতিষ্ঠা করেন, ঢাকা-আরিচা, নগরবাড়ি-রাজশাহী এবং ঢাকা-চট্টগ্রাম যোগাযোগ সড়ক নির্মাণ করে; ঢাকা শহরে রমনা পার্ক গড়ে তোলে, বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও সেচ সুবিধার জন্য ওয়াটার এ্যান্ড পাওয়ার ডেভেলপমেন্ট বোর্ড (ওয়াপদা) প্রতিষ্ঠা করে, ঢাকায় প্রথম চলচ্চিত্র স্টুডিও এফ.ডি.সি (ফিল্ম ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন) প্রতিষ্ঠা করে। সরকার ভাষা শহীদদের স্মরণে ২১ ফেব্রুয়ারি সরকারি ছুটি ঘোষণা করে। বাংলা একাডেমী বাংলায় পুস্তক প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ করে। আওয়ামী লীগ সরকারের স্বল্পকালীন শাসনামলে আরো যে-সকল পদক্ষেপ গ্রহণ করে সেগুলোর মধ্যে অন্যতম হচ্ছে: প-্যানিং বোর্ড গঠন, তিন বছর উন্নয়ন পরিকল্পনা (১৯৫৭-৬০) প্রণয়ন, শিক্ষা সংস্কার কমিটি গঠন, আলিয়া মাদরাসার ভবন নির্মাণের জন্য প্রথমবারের মতো চল্লিশ হাজার টাকা অনুমোদন, ময়মনসিংহে পশু চিকিৎসা কলেজ স্থাপন, কৃষিঋণ সার্টিফিকেট ঋণ বাতিল, বন উন্নয়ন, স্থায়ী শিল্প ট্রাইবুনাল গঠন, ঢাকা শহরের উন্নয়নের জন্য ঢাকা ইমপ্রুভমেন্ট ট্রাস্ট প্রতিষ্ঠা এবং গ্রেটার ঢাকা সিটি মাস্টার প্ল্যান প্রণয়ন, শাসন বিভাগ থেকে বিচার বিভাগ পৃথকীকরণ ইত্যাদি।

অতএব বলা যায় যে, আওয়ামী লীগ সরকার তার স্বল্পকালীন শাসনামলে পূর্ববাংলার আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে।

কিন্তু আওয়ামী লীগের শাসনামল শান্তিপূর্ণ হতে পারেনি। কেন্দ্রে ও প্রদেশে আওয়ামী লীগ সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার এক সপ্তাহের মধ্যেই সরকার গৃহীত বিভিন্ন নীতির প্রশ্নে পার্টির অভ্যন্তরে কোন্দল দেখা দেয়। আওয়ামী লীগ গঠিত হওয়ার সময় থেকেই অনেক বামপন্থী নেতা-কর্মী এই পার্টিতে ঢুকে পড়ে। পার্টির এই অংশ ভাসানীর নেতৃত্বে সোহরাওয়ার্দীর পররাষ্ট্রনীতি এবং পূর্ববাংলার সরকারের লাইসেন্স পারমিট বিতরণ নীতির কঠোর সমালোচনা শুরু করেন। মাওলানা ভাসানী প্রকাশ্যে সমালোচনা করে বলেন যে, "আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়ে যে পররাষ্ট্রনীতি অবলম্বন করেছে তা পার্টির মেনিফেস্টো বিরোধী। এভাবে আওয়ামী লীগের অভ্যন্তরে দুটি

www.Educationblog24.Com

ভিন্নমতালম্বী গ্রুপের সৃষ্টি হয়।

বৈদেশিক নীতির প্রশ্নে সোহরাওয়ার্দীর সঙ্গে মনোমালিন্য এবং আওয়ামী লীগে অবস্থানরত বামশক্তির প্ররোচনায় শেষ পর্যন্ত মওলানা ভাসানী আওয়ামী লীগের সভাপতির পদে ইস্তাফা দেন (১৯৫৭ সালে ২৪ জুলাই) এবং ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি ন্যাপ) গঠন করেন। তিনি এর সভাপতি নির্বাচিত হন। ন্যাপ গঠনের ফলে প্রাদেশিক পরিষদের ২৮ জন সদস্য আওয়ামী লীগ ত্যাগ করে নবগঠিত ন্যাপ-এ যোগ দেন। এই সুযোগে কৃষক-শ্রমিক পার্টি ও মুসলিম লীগ–আওয়ামী লীগ সরকারের পতন ঘটানোর চক্রান্ত শুরু করে। এই চক্রান্ত ফলপ্রসূ হয়। ১৯৫৮ সালের মার্চ মাসের মধ্যে ১১ জন আওয়ামী লীগ দলীয় সদস্য এবং রসরাজ মণ্ডলের নেতৃত্বাধীন সংখ্যালঘু সদস্যবৃন্দ আওয়ামী লীগ সরকার থেকে সমর্থন প্রত্যাহার করে নেন। এমতাবস্থায় সরকার আসন্ন আইন পরিষদের বাজেট অধিবেশন কিছুদিন স্থগিত রাখার অনুরোধ করেন। কিন্তু গভর্নর পদে তখন ফজলুল হক অধিষ্ঠিত আছেন। তিনি উল্টো মন্ত্রিসভা ভেঙে দেন (৩১-৩-৫৮) ও কৃষক-শ্রমিক পার্টির আবু হোসেন সরকারকে সরকার গঠনের আমন্ত্রণ জানান (৩১-৩-৫৮)। এ সময় কেন্দ্রে ফিরোজ খান নূনের মন্ত্রিসভা আওয়ামী লীগের সমর্থন নিয়ে ক্ষমতায় টিকে ছিল। স্বভাবতই পূর্ববাংলায় আওয়ামী লীগ সরকারকে টিকিয়ে রাখার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার পূর্ববাংলার গভর্নরকে (এ. কে. ফজলুল হক) বরখাস্ত করেন (১-৪-৫৮)। পূর্ববাংলার চিফ সেক্রেটারিকে অস্থায়ী গভর্নরের দায়িত্ব দেয়া হয়। নতুন অস্থায়ী গভর্নর আতাউর রহমান খানের আওয়ামী লীগ সরকারকে পুনর্বহাল করেন (১-৪-৫৮)। সরকার আইনপরিষদে আস্থা ভোট দেন এবং ১৮-২-১১৭ ভোটে জয়লাভ করেন। কিন্তু এর দেড় মাস পরেই (১৮ জুন ১৯৫৮) পরিষদে খাদ্য পরিস্থিতির ওপর ভোটাভুটিতে আওয়ামী লীগ সরকার (১২৬-১৩৮) ভোটে হেরে যায়, তখন ন্যাপ ভোটদানে বিরত থাকে। ফলে ১৯ জুন (১৯৫৮) মন্ত্রিসভা পদত্যাগ করে এবং ২০ জুন তদস্থলে কৃষক-শ্রমিক পার্টির আবু হোসেন সরকার একটি কোয়ালিশন মন্ত্রিসভা গঠন করেন। কিন্তু ইতোমধ্যে আওয়ামী লীগ নিরপেক্ষ বৈদেশিক নীতি অনুসরণ ও পশ্চিম পাকিস্তানে এক ইউনিট সমর্থনের প্রতিশ্রুতি দিয়ে ন্যাপের সমর্থন আদায় করে। ন্যাপের সমর্থন নিয়ে আওয়ামী লীগে আইন পরিষদে (২৩-৬-৫৮ তারিখে) আবু হোসেন সরকারের মন্ত্রিসভাকে অনাস্থা ভোটে (১৫৮-১৪২) পরাজিত করে। কিন্তু তখন আওয়ামী লীগকে ক্ষমতা না দিয়ে পূর্ববাংলায় কেন্দ্রের শাসন জারি করা হয় (২৫-৬-৫৮)। দুইমাস পর কেন্দ্রের শাসন প্রত্যাহার করা হয় এবং আতাউর রহমান খানের নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ সরকার গঠিত হয় (২৫-৮-৫৮)।

এইভাবে ১৯৫৪ সালের মার্চ মাস থেকে ১৯৫৮ সালের আগস্ট মাস পর্যন্ত সময়ে প্রদেশে সাতটি মন্ত্রিসভা ও তিনবার গভর্নরের শাসন চালু হয়। ১৯৫৮ সালের বাজেটের ব্যাপারে চারটি মন্ত্রিসভার পতন ঘটে। কিন্তু আগস্ট পর্যন্ত বাজেট পাস সম্ভব হয় না। অবশেষে সেপ্টেম্বর মাসে আইনপরিষদে এক কলঙ্কজনক অধ্যায়ের সৃষ্টি হয় এবং অক্টোবরে সামরিক আইন জারির মাধ্যমে আইনপরিষদের অবসান ঘটে।

www.Educationblog24.com

পূর্বেই উল্লেখিত হয়েছে যে, আইন পরিষদের স্পিকার (জনাব আবদুল হাকিম) ছিলেন কৃষক-শ্রমিক পার্টির এবং ডেপুটি স্পিকার (জনাব শাহেদ আলী) ছিলেন আওয়ামী লীগ দলীয়। যুক্তফ্রন্ট ভেঙে যাওয়ার পর থেকে কখনো কৃষক–শ্রমিক পার্টির সরকার আবার কখনো আওয়ামী লীগের সরকার দেশ পরিচালনা করে। ১৯৫৮ সালের আওয়ামী লীগ স্পষ্টত অভিযোগ উত্থাপন করে যে, স্পিকার আবদুল হাকিম নিরপেক্ষ নন। এরই প্রেক্ষিতে ২০ সেপ্টেম্বর (১৯৫৮) আবদুল হাকিমের বিরুদ্ধে দেওয়ান মাহবুব আলী এম. পি. অনাস্থা প্রস্তাব উত্থাপন করেন। স্পিকার এক রুলিং দিয়ে তা বাতিল করেন। ফলে পরিষদ ভবনের মধ্যে গোলযোগ হয়। স্পিকার পরিষদ-কক্ষ ত্যাগ করেন। তখন ডেপুটি স্পিকার শাহেদ আলী স্পিকারের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। এ সময় দেওয়ান মাহবুব আলী স্পিকারের বিরুদ্ধে তার অনাস্থা প্রস্তাবের পুনরাবৃত্তি করলে ১৭০ জন সদস্য তা সমর্থন করেন। ডেপুটি স্পিকার প্রস্তাবটি ভোটে দিলে তা গৃহীত হয়। অত:পর পিটার পল গোমেজ নামক একজন এম.পি. স্পিকার আবদুল হাকিমের মানসিক অসুস্থতা সম্পর্কে প্রস্তাব উত্থাপন করেন এবং তাও গৃহীত হয়। এরপর স্বভাবতই স্পিকার আবদুল হাকিম আর স্পিকার পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন না। কিন্তু কৃষক-শ্রমিক পার্টির সদস্যবৃন্দ এই পরিবর্তন মানেনি। পরবর্তী ২ দিন চেয়ারম্যান প্যানেলের সদস্য সৈয়দ আজিজুল হকের সভাপতিত্বে স্বল্প সময়ের জন্য অধিবেশন চলে। কিন্তু তার পরদিন (২৩ সেপ্টেম্বর) ডেপুটি স্পিকার জনাব শাহেদ আলী স্পিকারের চেয়ারে বসামাত্র কৃষক-শ্রমিক পার্টি ও তার সমর্থক দলের সদস্যবৃন্দ জনাব শাহেদ আলীকে উক্ত চেয়ারে আসন গ্রহণ না করার দাবি করে। কিন্তু শাহেদ আলী আসন গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে তার দিকে বিভিন্ন বস্তু নিক্ষেপ হতে থাকে। এ বিষয়ে কৃষক-শ্রমিক পার্টির সমর্থক পত্রিকা 'আজাদ' রিপোর্ট করে:

> ঐ সময় একটি বস্তু ডেপুটি স্পিকারের উপর নিক্ষিপ্ত হওয়ায় তিনি মুখে আঘাত পান এবং আহত স্থান হইতে রক্তপাত হইতে থাকে। নিক্ষিপ্ত বস্তুটি সম্ভবত সদস্যদের ডেস্কের সহিত সংযুক্ত লেখার জন্য নির্দিষ্ট স্থানের ভগ্নাংশ।
>
> আহত অবস্থায় শাহেদ আলীকে হাসপাতালে নেয়া হয় সেখানে তিনি ২৫ সেপ্টেম্বর (১৯৫৮) বেলা ১:২০ মিনিটে ইন্তেকাল করেন। এই ঘটনা পূর্ববাংলা জাতীয় পরিষদের এক কলঙ্কজনক অধ্যায়। এরপর ৭ অক্টোবর (১৯৫৮) পাকিস্তানে সামরিক আইন জারি করা হলে পূর্ববাংলা তথা পাকিস্তানে সংসদীয় সরকার পদ্ধতির অবসান ঘটে।

যুক্তফ্রন্ট শাসনকাল পর্যালোচনা

১৯৫৪ সালের সুষ্ঠু নির্বাচনে ক্ষমতাসীন মুসলিম লীগ সরকারকে পরাজিত করে যুক্তফ্রন্ট জয়লাভ করলে এই প্রদেশে একটি সংসদীয় সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সুযোগ আসে। কিন্তু মুসলিম লীগ দল ও কেন্দ্রীয় সরকারের চক্রান্তে এবং সর্বোপরি যুক্তফ্রন্টের শরিক দলগুলোর অভ্যন্তরীণ কোন্দল ও সংখ্যালঘু সংসদ-সদস্যদের ঘন ঘন সমর্থন বদলের কারণে ঘন ঘন সরকার বদল হতে থাকে। মাত্র চার বৎসরে সাতটি মন্ত্রিসভার পতন ঘটে এবং তিনবার গভর্নরের শাসন জারি করা হয়। ফলে বহু প্রত্যাশিত ২১ দফার দাবিগুলো বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয়নি এবং দেশের উন্নয়ন সাধনের যে সুযোগ

www.Educationblog24.Com

নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিবৃন্দ পেয়েছিলেন তা তারা নিজেদের সংকীর্ণ দলীয় স্বার্থে কাজে লাগাতে পারেননি। উপরন্তু যুক্তফ্রন্ট ভুক্ত একটি দলের (কৃষক-শ্রমিক পার্টির) এম.পি-দের দ্বারা অন্য দলের (আওয়ামী লীগের) সমর্থিত স্পিকারকে পিটিয়ে হত্যা করা চুয়ান্নোর নির্বাচনে গঠিত আইন পরিষদের এক কলঙ্কজনক অধ্যায়।

সহায়ক গ্রন্থ

সিরাজুল ইসলাম (প্রধান সম্পাদক), *বাংলাদেশের ইতিহাস*, (১৭০৪-১৯৭১) প্রথম খণ্ড, ঢাকা, ১৯৯০

আবু আল সাঈদ, *আওয়ামী লীগের ইতিহাস*, ঢাকা, ১৯৯৬

হাসান হাফিজুর রহমান (সম্পাদিত), *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ : দলিরপত্র*, প্রথম খণ্ড, ঢাকা ১৯৮২

বদরুদ্দীন উমর, *পূর্ববাংলার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি*, তিন খণ্ড, ঢাকা, ২০১১

বশীর আল হেলাল, *ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস*, ঢাকা, ১৯৮৫।

জয়ন্ত কুমার রায়, *বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাস*, ঢাকা. ২০০৯

মুনতাসীর মামুন ও জয়ন্ত কুমার রায়, *বাংলাদেশে সিভিল সমাজ প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম*, ঢাকা. ২০১৩।

www.Educationblog24.com

www.Educationblog24.Com

পঞ্চম অধ্যায়

সামরিক শাসন : আইয়ুব খান ও ইয়াহিয়া খানের শাসনামল ১৯৫৮-১৯৭১

১৯৪৭ সালের পর উপমাহাদেশে সামরিক শাসন জারি হবে তা কেউ কখনও ভাবেন নি। সামরিক শাসনের অর্থ হলো, বেসামরিক কর্তৃত্ব বিলোপ। সভ্যদেশসমূহকে বেসামরিক কর্তৃত্বের অধীনে সবাইকে কাজ করতে হয়। এমনিক সামরিক বাহিনীকেও।

সামরিক শাসন জারি হলে তা থাকে না। তারা সংবিধান বিলোপ করে, বেসামরিক কর্তৃত্বকে অধীনস্থ করে, রাজনীতিবিদদের ওপর কলঙ্ক আরোপ করে। সামরিক শাসনামলে সামরিক বাহিনীর সঙ্গে যারা যুক্ত তাদেরই সমস্ত জাগতিক সুযোগ সুবিধা দেয়া হয়। পাকিস্তানে প্রথম সামরিক শাসন জারি করেন আইয়ুব খান। তার পতন হলে নতুন সামরিক শাসক হন ইয়াহিয়া খান।

আইয়ুব খান ক্ষমতায় এসেই ঘোষণা করেন, 'রাজনীতিকদের ব্যর্থতার গ্লানি মুছে দেবার দায়িত্বটা সামরিক বাহিনীরই।' যে ইস্কান্দার মির্জা আইয়ুব খানকে ক্ষমতায় এনেছিলেন, সেই আইয়ুবই ক্ষমতা দখল করে ঘোষণা করেছিলেন, 'মির্জা নির্বোধের মতো আচরণ করলে, যথোচিত ব্যবস্থা গ্রহণ করে' তিনি তার গুরুদায়িত্ব পালন করবেন। আইয়ুব নিজের ক্ষমতা পাকাপোক্ত করার জন্য ১৩ জন জেনারেলকে বরখাস্ত করেছিলেন, রাজধানী করাচী থেকে প্রথমে রাওয়ালপিন্ডি পরে ইসলামাবাদে স্থানান্তর করেছিলেন, নিজেকে ফিল্ড মার্শাল উপাধিতে ভূষিত করেছিলেন। সামরিক শাসনের প্রকৃতির জন্য একে সাধারতঃ জংলি আইন বলে উল্লেখ করা হয়। এক কথায় সামরিক শাসন হলো প্রচলিত আইন বিরোধী, দায়-দায়িত্বহীন, উৎপীড়নমূলক শাসন যেখানে অস্ত্রের মুখে সবাইকে জিম্মি রাখা হয়। আগে সাম্রাজ্যবাদী দেশসমূহ নিজ স্বার্থে সামরিক শাসকদের সমর্থন করতো। আজকের পরিবর্তিত পৃথিবীতে সামরিক শাসকরা আর সে রকম পৃষ্ঠপোষকতা পান না।

খ. আইয়ুব খানের ক্ষমতা দখল ও শাসনের বৈশিষ্ট্য

১৯৫৮ সালের ৭ অক্টোবর রাত ১০:৩০ মিনিটে পাকিস্তানের তৎকালীন প্রেসিডেন্ট মেজর জেনারেল ইসকান্দার মীর্জা সামরিক বাহিনীর সহায়তায় মালিক ফিরোজ খান নূন সংসদীয় সরকারকে উৎখাত করে পাকিস্তানে সামরিক আইন জারি করেন। তিনি উক্ত ৭ অক্টোবরের ফরমান বলে পাকিস্তান সশস্ত্রবাহিনীর সর্বাধিনায়ক জেনারেল মুহম্মদ আইয়ুবখানকে প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক নিয়োগ করেন। একই ফরমান বলে ১৯৫৬ সালের সংবিধান বাতিল ঘোষণা করা হয়, কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকারসমূহকে বরখাস্ত করা হয়, জাতীয় প্রাদেশিক পরিষদসমূহ ভেঙে দেওয়া হয়, রাজনৈতিক

www.Educationblog24.Com

দলসমূহ বিলুপ্ত করা হয়, মৌলিক অধিকারসমূহ কেড়ে নেয়া হয়। ২৭ অক্টোবর জেনারেল আইয়ুব খান প্রেসিডেন্ট মীর্জাকে উৎখাত করে তাকে দেশত্যাগে বাধ্য করেন। ২৮ অক্টোবর আইয়ুব খান এক সরকারি আদেশ জারির মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রী পদ বিলুপ্ত ঘোষণা করেন এবং নিজে পাকিস্তানের প্রেসিডেন্টের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। ১৯৫৯ সালের ফেব্রুয়ারিতে অনুষ্ঠিতব্য নির্বাচন বাতিল ঘোষণা করা হয়। এইভাবে দেশে সংসদীয় গণতন্ত্রের অপমৃত্যু ঘটে।

অসাংবিধানিক পন্থায় ক্ষমতা গ্রহণের পর আইয়ুব খানের জন্য ২টি কাজ জরুরি হয়ে পড়ে। প্রথমত তাকে এটা প্রমাণ করা যে, পূর্ববর্তী শাসনাকালে দেশ ধ্বংসের পর্যায়ে উপনীত হয়েছিল। দ্বিতীয়ত বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করে এটা প্রমাণ করা যে, তিনি ক্ষমতা গ্রহণ করে দেশকে কেবল ধ্বংসের হাত থেকেই রক্ষা করেননি, বরং দেশে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা আনয়ন করেছেন এবং বিভিন্ন সামাজিক ও অর্থনৈতিক সংস্কার সাধনের মাধ্যমে দেশকে উন্নত ও শক্তিশালী করেছেন।

আইয়ুব খান তার ক্ষমতা গ্রহণের আবশ্যকতা প্রমাণ করার জন্য বলেন যে, দেশের রাজনীতিবিদগণের ক্ষমতার লড়াই, স্বার্থান্ধতা দুর্নীতি, দলীয় পৃষ্ঠপোষকতা, দেশপ্রেমের প্রভাব প্রভৃতি কারণে তারা দেশের জন্য গঠনমূলক কিছু করতে পারেননি। তাছাড়া গুপ্তচালান, মজুদদারি, মুনাফাখোরি ইত্যাদির ফলে দেশের অর্থনীতি ধ্বংসের সম্মুখীন হয়েছিল। ক্ষমতা গ্রহণের পরপরই সামরিক সরকার যেভাবে বিভিন্ন রাজনীতিবিদ, উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা, ধনী ব্যবসায়ী প্রমুখের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ শুরু করে তাতে তাদের দুর্নীতির বিষয়টি জনগণের মনে বদ্ধমূল হয়ে যায়। প্রথম যাদের বিরুদ্ধে দুর্নীতি ও স্বজনপ্রীতির অভিযোগ আনা হয় তাদের মধ্যে ছিলেন পাকিস্তানের দুই সাবেক প্রধানমন্ত্রী সোহরাওয়ার্দী এবং ফিরোজ খান নূন। অনেক সাবেক কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ও প্রাদেশিক মুখ্যমন্ত্রীদের বিরুদ্ধেও দুর্নীতির অভিযোগ আনা হয়। এমনকি এম. এ. খুহরো নামক একজন সাবেক প্রতিরক্ষামন্ত্রীকে কালোবাজারে গাড়ি বিক্রির দায়ে আটক করা হয়। এভাবে জনমনে একটা ধারণার সৃষ্টি হয় যে সামরিক সরকার দেশ থেকে দুর্নীতির জঞ্জাল দূর করতে বদ্ধপরিকর।

সামরিক আইন জারি কয়েক মাসের মধ্যেই প্রায় ১৫০ জন সাবেক মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী, পার্লামেন্টারি সেক্রেটারি এবং প্রায় ৬০০ জন সাবেক জাতীয় প্রাদেশিক আইন পরিষদের সদস্যের বিরুদ্ধে বিভিন্ন দুর্নীতি ও স্বজনপ্রীতির অভিযোগ তদন্ত করে দেকা যায় (দুর্নীতিপরায়ণ) রাজনীতিকগণের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের উদ্দেশ্যে আইয়ুব খান ১৯৫৯ সালের ৭ অক্টোবর নির্বাচিত সংস্থাসমূহ (অযোগ্যতা) আদেশ ১৯৫৯ (Elective Bodies Disqualification Order 1959) সংক্ষেপে (BDO এবং PODO (Public Office Disqualification Order)-(সরকারি পদ লাভে অযোগ্যতা সংক্রান্ত আদেশ) নামে দুটি আদেশ জারি করেন। এই আদেশ বলে সামরিক সরকার দেশের যে কোনো সরকারি পদে আসীন ছিলেন এবং যে-কোনো নির্বাচিত সংস্থার সদস্য ছিলেন এমন ব্যক্তিগণকে 'অসদাচরণের' দায়ে অভিযুক্ত করতে পারতেন। উক্ত

www.Educationblog24.Com

আদেশে 'অসদাচরণ' বলতে রাষ্ট্রদ্রোহমূলক কার্যকলাপ, ব্যক্তিগত স্বার্থোদ্ধারের জন্য অসৎ উপায় অবলম্বন ও দুর্নীতি করাকে বুঝানো হয়। কারো বিরুদ্ধে অসদাচরণের অভিযোগ উত্থাপন করা হলে সে সম্পর্কে অনুসন্ধান ও শুনানি গ্রহণের জন্য দুই প্রদেশে দুইটি ও কেন্দ্রে একটি ট্রাইবুনাল গঠন করা হয়। এইরূপে ট্রাইবুনালে কেউ অভিযুক্ত প্রমাণিত হলে তিনি ১৯৬৬ সালের ৩১ ডিসেম্বরের পূর্বে দেশের যে-কোনো নির্বাচিত সংস্থার সদস্য হওয়ার অযোগ্য বলে গণ্য হবেন। অভিযুক্তরা অর্থদণ্ডে ও দণ্ডিত হতেন। এবডো-র আওতায় সামরিক সরকার ৮৭ জন বিশিষ্ট রাজনীতিবিদকে অভিযুক্ত করেন। তাদের মধ্যে হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী, খান আবদুল গাফফার খান, মিয়া মমতাজ দৌলতানা প্রমুখ অন্যতম।

কেবল রাজনীতিবিদদেরকেই আইয়ুব খান হেয় প্রতিপন্ন করেননি, কেন্দ্রীয় সিভিল সার্ভিসের অনেক সদস্যকেও তিনি চাকুরি থেকে বরখাস্ত করেছেন। উচ্চপদস্থ সামরিক কর্মকর্তাদের যোগ্যতা ও দক্ষতা নির্ণয় করার জন্য সামরিক সরকার চারটি ট্রেনিং কমিটি গঠন করেন। এই কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে পাকিস্তান সিভিল সার্ভিসের ১৩ জন, ফরেন সার্ভিসের ৩ জন, পুলিশ সার্ভিসের ১৫ জন ও প্রাদেশিক সার্ভিসের মোট ১৬৬২ জন কর্মকর্তাকে বরখাস্ত কিংবা বাধ্যতামূলক অবসর প্রদান কাণ্ড হয়। সংবাদপত্রের বিরুদ্ধে এবং এর সঙ্গে জড়িত সাংবাদিকদের বিরুদ্ধে জেল-জুলুম নির্যাতন নেমে আসে। সে সময় পূর্ব পাকিস্তানে স্বাধিকারের কথা, পূর্ব পাকিস্তানের বিরুদ্ধে পশ্চিম পাকিস্তানের শোষণের কথা যে-সকল পত্রিকায় প্রকাশ পেত-যেমন ইত্তেফাক, সংবাদ ও পাকিস্তান অবজার্ভার–সেগুলোকে কালো তালিকাভুক্ত করে সরকারি ও আধা-সরকারি বিজ্ঞাপন থেকে বঞ্চিত করা হয়। সামরিক শাসন বিরোধী সাংবাদিকদের বিদেশ গমনে বাধা দেয়া হয়। এ প্রসঙ্গে মুনতাসীর মামুন ও জয়ন্ত কুমার রায় লিখেছেন:

> সামরিক শাসন প্রথমেই আঘাত হেনেছে সংবাদপত্রের উপর। বাঙালিরা দেখলো, দেখে মর্মাহত হলো যে, সাংবাদিকরা সামরিক শাসন বিরোধী উচ্চারণ বা গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের কথা বলতে গিয়ে কিভাবে বন্দী হচ্ছেন, দমিত হচ্ছেন। প্রয়োজনীয় রীট জারি করে সাংবাদিকদের রক্ষার জন্য বিচার বিভাগও এগিয়ে আসেনি।

আইয়ুব খান, মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ-র মতো বাংলা ভাষার প্রতি বিরূপ মনোভাব পোষণ করতেন। তিনি যুক্তি দেন যে, দুই অঞ্চলের সংহতি বিধানের জন্য এক ভাষা দরকার। সেজন্য তিনি ভাষার সমন্বয় সাধন করার উদ্দেশ্যে রোমান হরফে বাংলা লেখার উদ্যোগ নেন। ১৯৫৯ বাংলা একাডেমীকে এই সস্কার কাজের দায়িত্ব দেয়া হয়। বাংলা একাডেমীর তৎকালীন পরিচালক সৈয়দ আলী আহসান-এর সভাপতিত্বে বাংলা ভাষা সংস্কারের জন্য একটি কমিটি গঠিত হয়। এই অপচেষ্টার বিরুদ্ধে সংবাদপত্রে প্রতিবাদলিপি ছাপা হয়। *দৈনিক ইত্তেফাকে* ফেব্রুয়ারি ১৯ ও ২০ (১৯৫৯) তারিখ 'হরফ পরিবর্তন প্রসঙ্গে' শিরোনামে দুটো সম্পাদকীয় প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। মাসিক মোহাম্মদী পত্রিকাতেও প্রতিবাদ ছাপা হয় (চৈত্র ১৩৬৫, পৃ-৫০১)। ১৯৫৯ সালের একুশে ফেব্রুয়ারির অনুষ্ঠানে ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ ভাষা সংস্কারের প্রতিবাদ করেন।

www.Educationblog24.Com

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগও রোমান হরফের বিরুদ্ধে প্রস্তাব গ্রহণ করে। এইসব প্রতিবাদের মুখে আইয়ুব খানের বাংলা হরফ পরিবর্তনের প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়। কিন্তু বাঙালির সংস্কৃতির উপর আঘাত হানার চেষ্টা অব্যাহত থাকে। আইয়ুব খানের পূর্ব পাকিস্তানী দালাল-রা বাঙালি হয়েও বাংলার স্বার্থবিরোধী কাজে লিপ্ত থাকেন। তারা বাংলা ভাষাকে পরিবর্তন করে 'মুসলমানিত্ব প্রদানের' উদ্যোগ নেন। তাদের চেষ্টায় নজরুলের কবিতার শব্দ পরিবর্তন করা হয়। এ প্রসঙ্গে মুনতাসীর মামুন এবং জয়ন্ত কুমার রায় লিখেছেন।

> কবি নজরুলের বিখ্যাত কবিতা 'চল চল চল'-এর একটি লাইনে ছিল
> 'নব নবীনের গাহিয়া গান, সজীব করিব মহাশ্মশান, পাঠ্য বইয়ের তা সংশোধন করে লেখা হল সজীব করিব গোরস্থান। প্রচলিত কবিতা-সকালে উঠিয়া আমি মনে মনে বলি/সারাদিন আমি যেন ভালো হয়ে চলি' এর সংশোধন করা হলো এভাবে 'ফজরে উঠিয়া আমি দিলে দিলে বলি/সারাদিন আমি যেন ভালো হয়ে চলি।'

আইয়ুব খান এবং তার অনুসারীরা রবীন্দ্র বিদ্বেষী ছিলেন। তারা রবীন্দ্রনাথকে হিন্দু সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি হিসেবে গণ্য করতেন। ১৯৬১ সাল ছিল বিশ্ব কবির জন্মশত বার্ষিকী। এ উপলক্ষে যেন কোনো অনুষ্ঠান না হয় সরকার সেই চেষ্টা চালায়। বাংলা একাডেমী যেন রবীন্দ্রজন্ম শতবার্ষিকী উপলক্ষে কোন অনুষ্ঠানের আয়োজন না করে। সরকার সে ব্যবস্থা করে এবং সফল হয়। সাংস্কৃতিকর্মীদের মধ্যে আতঙ্ক সৃষ্টির উদ্দেশ্যে সামরিক সরকার কে. জি মোস্তফা, আলাউদ্দিন আল আজাদ প্রমুখকে গ্রেফতার করে। তবে সরকার ও তার অনুচরবৃন্দের শতচেষ্টা সত্ত্বেও সকল সাংস্কৃতিকর্মীকে আটকিয়ে রাখা যায়নি। বিচারপতি মাহবুব মোরশিদের এবং অধ্যাপক খান সরওয়ার মোর্শেদের নেতৃত্বে গঠিত হয় 'রবীন্দ্র জন্মশতবার্ষিকী কমিটি'। এই কমিটি ছয়দিন ব্যাপী অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। ডাকসু কার্জন হলে দুই দিনব্যাপী অনুষ্ঠান করে। রবীন্দ্রসঙ্গীত শিল্পী ওয়াহিদুল হক ও সনজীদা খাতুন এবং আরো অনেকে মিলে গঠন করেন 'ছায়ানট'। মফস্বল শহরেও রবীন্দ্র জন্মশতবার্ষিকী অত্যন্ত জাকজমকের সঙ্গে উদযাপিত হয়।

মৌলিক গণতন্ত্র

আইয়ুব খান ১৯৫৯ সালে মৌলিক গণতন্ত্র ব্যবস্থা নামে দেশে এক নতুন ধরনের স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন প্রবর্তন করে। 'মৌলিক গণতন্ত্র' বলতে ১৯৫৯ সালের মৌলিক গণতন্ত্র আদেশ বলে সৃষ্ট চারস্তর বিশিষ্ট স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থাকে বুঝায়। মৌলিক গণতন্ত্র ব্যবস্থার উদ্দেশ্য ছিল 'জনগণের ইচ্ছাকে সরকারের কাছাকাছি এবং সরকারি কর্মকর্তাদেরকে জনগণের কাছাকাছি এনে গণতান্ত্রিক বিকেন্দ্রীকরণ'-এর ব্যবস্থা করা। নিচের দিক থেকে এই স্তরগুলি ছিল : (১) ইউনিয়ন কাউন্সিল (গ্রাম এলাকায়) এবং টাউন ও ইউনিয়ন কমিটি (শহর এলাকায়), (২) থানা কাউন্সিল (পূর্ব পাকিস্তানে) বা তহশিল কাউন্সিল (পশ্চিম পাকিস্তানে), (৩) জেলা কাউন্সিল এবং (৪) বিভাগীয় কাউন্সিল।

১. ইউনিয়ন কাউন্সিল: কয়েকটি গ্রাম নিয়ে একটি ইউনিয়ন গঠিত। ১০,০০০

www.Educationblog24.Com

থেকে ১৫,০০০ সংখ্যক জনগোষ্ঠী অধ্যুষিত এলাকা নিয়ে ইউনিয়ন কাউন্সিলের সীমানা নির্ধারিত হয়। ইউনিয়ন কাউন্সিল হচ্ছে মৌলিক গণতন্ত্র ব্যবস্থার সর্বনিম্ন, কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ ধাপ। ১৫ জন সদস্য নিয়ে ইউনিয়ন কাউন্সিল গঠিত। তার মধ্যে ৩ ভাগের ২ ভাগ সদস্য সার্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে প্রাপ্তবয়স্কদের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত। ১২০০ থেকে ১৫০০ জন ভোটদাতার প্রতিনিধি হিসেবে একজন সদস্য নির্বাচিত হতেন। এই নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিবৃন্দই মৌলিক গণতন্ত্রী (Basic Democracy Member) বা সংক্ষেপে B.D. Member নামে পরিচিত হন। উভয় দেশ থেকে ৪০,০০০ করে পাকিস্তানে মোট ৮০,০০০ মৌলিক গণতন্ত্রীর সংখ্যা নির্বাচিত হয়। নির্বাচিত মৌলিক গণতন্ত্রী Electoral College হিসেবে প্রাদেশিক ও জাতীয় পরিষদের সদস্য নির্বাচনের এবং প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের ভোটারে পরিণত হন। ইউনিয়ন কাউন্সিলের ৩ ভাগের ১ ভাগ সদস্য ছিলেন সরকার মনোনীত। তবে এই মনোনয়নের বিধান ১৯৬২ সালের সংবিধান কার্যকরী হওয়ার সময় বিলুপ্ত হয়। নির্বাচিত অধিক গণতন্ত্রীগণ নিজেদের মধ্য থেকে একজনকে ইউনিয়ন কাউন্সিলের চেয়ারম্যান নিযুক্ত করতেন।

ইউনিয়ন কাউন্সিল ইউনিয়নের জনসাধারণের সার্বিক উন্নয়নের দায়িত্বপ্রাপ্ত হয়। ছাত্র-পুলিশের সহায়তায় তা ইউনিয়নে শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখে। ইউনিয়ন কাউন্সিলসমূহ Conciliation Court- এর মাধ্যমে ছোটখাটো ফৌজদারি ও দেওয়ানি মামলার নিষ্পত্তির অধিকারী হয়। নিজস্ব কর্মকাণ্ডের ব্যয় নির্বাহের জন্য এটা জনসাধারণের ওপর বিভিন্ন ট্যাক্স আরোপেরও তা আদায়ের ক্ষমতা লাভ করে।

২. থানা কাউন্সিল : ইউনিয়ন কাউন্সিলের পরবর্তী ধাপ ছিল থানা কাউন্সিল। থানার অন্তর্গত সকল ইউনিয়ন কাউন্সিলের (পশ্চিম পাকিস্তানে তহশিল কাউন্সিল) চেয়ারম্যানবৃন্দ ও সমসংখ্যক থানা/তহশিল পর্যায়ের বিভিন্ন সরকারি কর্মকর্তা সমন্বয়ে থানা/তহশিল কাউন্সিল গঠিত হয়। মহকুমা প্রশাসক থানা কাউন্সিলের সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। থানার সার্কেল অফিসার পদাধিকার বলে থানা কাউন্সিলের সভাপতি হন। তিনি মহকুমার প্রশাসকের অনুপস্থিতিতে থানা কাউন্সিলের সভায় সভাপতিত্ব করেন। থানার অন্তর্গত বিভিন্ন ইউনিয়ন কাউন্সিলগুলোর কাজের সমন্বয় সাধন করাই ছিল থানা কাউন্সিলের অন্যতম কাজ।

৩. জেলা কাউন্সিল : থানা কাউন্সিলের উপরে ছিল জেলা কাউন্সিল। এর জনসংখ্যা ছিল সর্বাধিক ৪০। তার অর্ধেক সদস্য ছিল জেলা পর্যায়ের বিভিন্ন সরকারি কর্মকর্তা, বাকি অর্ধেক ছিলেন বেসরকারি সদস্য। বেসরকারি সদস্যদের অন্তত অর্ধেক জেলার অন্তর্গত বিভিন্ন ইউনিয়ন কাউন্সিলের চেয়ারম্যানদের মধ্যে থেকে মনোনীত করতেন। ডেপুটি কমিশনার জেলার কাউন্সিলের চেয়ারম্যানের দায়িত্ব পালন করতেন। জেলা কাউন্সিলের বাধ্যতামূলক ও ঐচ্ছিক– এই দুই ধরনের দায়িত্ব ছিল। মৌলিক গণতন্ত্র অর্ডার-এর চতুর্থ তফশিলের প্রথম অংশে বাধ্যতামূলক কার্য এবং ২য় অংশে

www.Educationblog24.Com

ঐচ্ছিক কার্যাবলির বিবরণ উল্লেখিত হয়েছে। বাধ্যতামূলক দায়িত্বসমূহের মধ্যে আছে প্রাথমিক শিক্ষার বিস্তার, জনস্বাস্থ্য রক্ষা, রাস্তাঘাট, কালভার্ট ও ব্রিজ নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণ করা।

৪. **বিভাগীয় কাউন্সিল :** বিভাগীয় কাউন্সিল মৌলিক গণতন্ত্র কাঠামোর সর্বোচ্চ ধাপ। এর মোট সদস্যসংখ্যা ৪৫ জন। মোট সদস্যের অর্ধেক ছিলেন সরকারি সদস্য। বিভাগের অন্তর্গত জেলা কাউন্সিলের চেয়ারম্যান এবং বিভিন্ন উন্নয়ন দপ্তরের প্রতিনিধিবর্গ ছিলেন সরকারি সদস্য। বেসরকারি সদস্যের অন্তত অর্ধেক বিভিন্ন ইউনিয়ন কাউন্সিলের চেয়ারম্যানদের মধ্যে থেকে মনোনীত। বিভাগীয় কমিশনার পদাধিকার বলে বিভাগীয় কাউন্সিলের চেয়ারম্যান হন। বিভাগের অন্তর্গত বিভিন্ন জেলা কাউন্সিলগুলোর মধ্যে সমন্বয় সাধনই ছিল বিভাগীয় কাউন্সিলের অন্যতম কাজ।

পর্যালোচনা

মৌলিক গণতন্ত্র ব্যবস্থা আইয়ুব খানের অভিনব সৃষ্টি। এই ব্যবস্থা প্রবর্তনের মাধ্যমে এমন এক গণতন্ত্র প্রবর্তনের কথা বলা হয় যা জনগণ বুঝতে পারবে: কিন্তু বাস্তবে আইয়ুবের উদ্দেশ্য ছিল ক্ষমতাকে সুদৃঢ় করার উদ্দেশ্যে তৃণমূল পর্যায়ে তাঁর সমর্থক-গোষ্ঠী সৃষ্টি করা। আইয়ুব সম্পূর্ণ রাজনৈতিক উদ্দেশ্যেই মৌলিক গণতন্ত্র ব্যবস্থা প্রবর্তন করেন। মৌলিক গণতন্ত্রীরা গ্রাম এলাকায় নতুন রাজনীতিক হিসেব গড়ে উঠে আইয়ুবের স্বার্থরক্ষা করবেন। তারা সরকারের আনুকূল্য ও পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করার বিনিময়ে সরকারের নিয়ন্ত্রণে থেকে সরকারের ক্যাডারে পরিণত হবেন। এই ব্যবস্থার মাধ্যমে জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের সদস্য নির্বাচনের ভোটাধিকার মৌলিক গণতন্ত্রীদের দেওয়া হয়। ফলে জনগণ সেই ভোটাধিকার থেকে বঞ্চিত হয়। এইভাবে জাতীয় রাজনীতিতে দেশের জনগণের ভূমিকা গৌণ হয়ে যায়। সীমিত সংখ্যক মৌলিক গণতন্ত্রীদের ওপর সরকারের নিয়ন্ত্রণ ও প্রভাব সহজেই প্রতিষ্ঠিত হয়। ফলে নির্বাচনে সরকারি প্রার্থীর জয়লাভ সহজ হয়। আইয়ুব খান নিজেও ১৯৬৫ সালে প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে কেবল মৌলিক গণতন্ত্রীদেরকে বশীভূত করে ভোট আদায় করে জয়লাভ করেন–যদিও উক্ত নির্বাচনে সাধারণ জনগণের উৎসাহ-উদ্দীপনা এবং সমর্থন ছিল সম্মিলিত বিরোধী দলীয় প্রার্থী মিস ফাতিমা জিন্নাহর পক্ষে।

বিভিন্ন নির্বাচন

১৯৬০ সালের ১১ জানুয়ারি সারাদেশে 'মৌলিক গণতন্ত্রী' নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত নির্বাচনে জনসাধারণ সার্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে ইউনিয়ন কাউন্সিল সদস্যগণকে অর্থাৎ তথাকথিত মৌলিক গণতন্ত্রীগণকে (Basic Democrats বা B.D Member) নির্বাচিত করেন। উক্ত নির্বাচনে পূর্ব পাকিস্তানের ৪০,০০০ এবং পশ্চিম পাকিস্তানের ৪০,০০০ মোট ৮০,০০০ মৌলিক গণতন্ত্রী নির্বাচিত হন। মৌলিক গণতন্ত্রীদের নির্বাচনের পর আইয়ুব খান ১৩ জানুয়ারি (১৯৬০) The Presidential (Election and Constitutional) Order, 1960 গঠন করেন। এই অর্ডিন্যান্সের উদ্দেশ্য ছিল মৌলিক গণতন্ত্রীগণ একটি রেফারেন্সের মাধ্যমে আইয়ুব খানকে প্রেসিডেন্ট পদে

www.Educationblog24.com

নির্বাচিত করে তাকে একটি সংবিধান প্রণয়ন অধিকার প্রদান করবেন। প্রেসিডেন্ট পদে তার মেয়াদকাল শুধুমাত্র অন্তর্বর্তীকালীন সময়ের জন্য হবে না, বরং ভবিষ্যতে প্রণীত সংবিধানে যে মেয়াদকাল নির্ধারণ করা হবে– সেই প্রথম মেয়াদকালের জন্য। এইভাবে আইয়ুব খান সামরিক শাসনকে আইনসিদ্ধ করার প্রথম পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। নির্বাচিত মৌলিক গণতন্ত্রীরা ১৪ ফেব্রুয়ারি (১৯৬০) গোপন ব্যালটে হ্যাঁ-না ভোট দিয়ে আইয়ুবকে পাঁচ বছরের জন্য প্রেসিডেন্ট হিসেবে নির্বাচিত করেন। ৭৮,৭২০টি ভোট পড়ে, তন্মধ্যে হ্যাঁ-ভোট ২৫,২৮২টি ছিল। ১৯৬০ সালে নির্বাচিত মৌলিক গণতন্ত্রীগণ ১৯৬২ সালের এপ্রিল মাসে পাকিস্তানের জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের সদস্য নির্বাচিত করেন।

গ. আইয়ুব খানের পতনও ইয়াহিয়া খানের শাসন, এক ইউনিট বিলুপ্তিকরণ, সার্বজনীন ভোটাদিকার, এলএফও

সামরিক শাসনামল

আইয়ুব খান ১৯৫৮ সালের সামরিক আইন জারি করার মাধ্যমে কেন্দ্রে প্রদেশগুলিতে গণতান্ত্রিক ও সংসদীয় শাসন ব্যবস্থার বিলোপ সাধন করেন। তার সামরিক শাসনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল কেন্দ্রীকরণ। তিনি নিজের হাতে সকল নির্বাহী ও আইন প্রণয়নের ক্ষমতা গ্রহণ করেন। এমনকি প্রাদেশিক সরকারের উপরও তার নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করা হয়। সামরিক শাসনামলে রাজনৈতিক দল নিষিদ্ধ থাকে। দেশে সকল রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড নিষিদ্ধ করা হয়। দুর্নীতি দমনের নামে দেশের অনেক জনপ্রিয় ও প্রগতিশীল রাজনৈতিক নেতার উপর উৎপীড়নমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। মৌলিক গণতন্ত্র ব্যবস্থা প্রবর্তনের মাধ্যমে আইয়ুব খান নিজস্ব অনুগত বাহিনী গঠন করেন– যা দেশের কোনো কল্যাণ সাধন করতে পারেনি। তার ভূমি-সংস্কার কাগজে-কলমেই থেকে যায়–তা বাস্তবায়ন সম্ভব হয়নি। কেবলমাত্র মুসলিম পারিবারিক আইন ছিল একটা ইতিবাচক দিক।

আইয়ুব খানের সামরিক শাসনামলের ৪৪ মাসে তার বিরুদ্ধে প্রকাশ্য কোনো আন্দোলন সংঘটিত হয়নি, কিংবা কোনো বক্তব্য-বিবৃতি উচ্চারিত হয়নি। কিন্তু পরোক্ষভাবে ছাত্র, সাংবাদিক, সাংস্কৃতিক কর্মী এবং কিছু রাজনীতিবিদ নানান কৌশলে সামরিক জান্তার বিরুদ্ধে বক্তব্য উপস্থাপন করেছেন। সামরিক শাসনের সময়ে আইয়ুব বিরোধী নীরব আন্দোলনের ইস্যু ও আন্দোলনের বিবরণ নিম্নে পেশ করা হল :

১৯৬২-র ছাত্র-আন্দোলন

১৯৬১ সালের শেষের দিকে মুজিব ও মানিক মিয়া এবং মণি সিংহ ও খোকা রায়ের মধ্যে এক গোপন বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। ঐ বৈঠকে আইয়ুব-বিরোধী আন্দোলনের বিষয়ে ঐকমত্য হয় এবং সিদ্ধান্ত হয় যে, আইয়ুব খান কর্তৃক শাসনতন্ত্র ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা আন্দোলন শুরু করবে এবং তারপর ক্রমে ক্রমে তা সারাদেশে ছড়িয়ে দেয়া হবে। ঐ বৈঠকে আরও সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, 'ছাত্রলীগ ও ছাত্র ইউনিয়ন

www.Educationblog24.Com

যৌথভাবে কাজ করবে।'

সোহরাওয়ার্দী গ্রেফতারের প্রতিবাদ

এই বৈঠকের পরপরই ১৯৬২ সালের ৩০ জানুয়ারি সোহরাওয়ার্দীকে গ্রেফতার করা হয়। এর প্রতিবাদে ছাত্ররা ১ ফেব্রুয়ারি (১৯৬২) ছাত্রধর্মঘট আহবান করে। রাস্তায় বিক্ষোভ মিছিল বের হয়। ধর্মঘট ১ ফেব্রুয়ারি থেকে ৫ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত চলে। ৫ ফেব্রুয়ারি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ করে দেয়া হয়। শেখ মুজিবুর রহমান, তোফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া প্রমুখ রাজনীতিবিদগণ এবং অনেক ছাত্রনেতাকে সরকার গ্রেফতার করে। এইভাবে ১৯৬২ সালের জানুয়ারিতে সামরিক শাসন বিরোধী প্রকাশ্য আন্দোলনের সূত্রপাত ঘটে।

সংবিধান বিরোধী আন্দোলন

সামরিক আইন চলাকালীন সময়েই ছাত্ররা আইয়ুব খান প্রণীত সংবিধান বিরোধী আন্দোলন শুরু করে। ইতোপূর্বে উল্লেখিত হয়েছে যে, ১ মার্চ (১৯৬২) পাকিস্তানের দ্বিতীয় সংবিধান ঘোষণা করা হয় (এবং তা কার্যকরী করা হয় ৮ জুন থেকে)। উক্ত সংবিধানে পূর্ব পাকিস্তানীদের 'দাবি-দাওয়া' চরমভাবে উপেক্ষা করা হয়। নাগরিকের মৌলিক অধিকার খর্ব করা হয়, ভোটাধিকার সংরক্ষিত করে মৌলিক গণতন্ত্রী নামে একটি শ্রেণী সৃষ্টি করা হয়–যারা শাসকগোষ্ঠীর তল্পিবাহকহিসেবে কাজ করবে। উক্ত সংবিধান (যা ব্যক্তি আইয়ুব খান দ্বারা নিজের স্বার্থে প্রণীত) ঘোষিত হওয়ামাত্র পূর্ব পাকিস্তানের ছাত্রসমাজ বিক্ষোভ, সমাবেশ এবং ক্লাস বর্জন শুরু করে। সরকারও প্রচণ্ড ছাত্র-দলন শুরু করেন। বহু সংখ্যক ছাত্রনেতাকে গ্রেফতার করা হয়। ছাত্রদের ব্যাপক হারে গ্রেফতারের আরেকটি কারণ ছিল। ইতোমধ্যে নতুন সংবিধানের আওতায় সারাদেশে ২৮ এপ্রিল জাতীয় পরিষদের এবং ৬ মে প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচন ঘোষিত হয়েছিল। ছাত্ররা উক্ত নির্বাচন বয়কটের জন্য রাজনীতিবিদদের প্রতি আহবান জানায়। রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ ছাত্রদের নির্বাচন বয়কটের আহবানে সাড়া না দিলেও কয়েকজন রাজনৈতিক নেতা (হামিদুল হক চৌধুরী, নূরুল আমিন, আতাউর রহমান খান, সৈয়দ আজিজুল হক, মোহসেন উদ্দিন আহমেদ) গ্রেফতারকৃত ছাত্রদের মুক্তি দাবি করেন। সে দাবিতেও সামরিক কর্তৃপক্ষ কর্ণপাত করেনি। অবশেষে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়ে গেলে এবং ৮ জুন (১৯৬২) সামরিক আইন প্রত্যাহার করা হলে গ্রেফতারকৃত ছাত্রদেরকে মুক্তি দেয়া হয়।

শিক্ষা কমিশনের রিপোর্ট বিরোধী আন্দোলন

১৯৬২ সালের সেপ্টেম্বরে ছাত্ররা আরেকটি আন্দোলন সংগঠিত করেছিল। তা ইতিহাসে 'বাষট্টির শিক্ষা আন্দোলন' নামে অভিহিত হয়ে আছে। আইয়ুব খান সামরিক আইন জারি করে বিভিন্ন ক্ষেত্রে সংস্কারের নামে যে চমক দেখান, শিক্ষা সংস্কারের চেষ্টা তার একটি। তিনি ১৯৫৯ সালের ১২ ডিসেম্বর শিক্ষা কমিশন গঠনের ঘোষণা দেন। সরকারিভাবে উক্ত কমিশন আনুষ্ঠানিকভাবে গঠিত হয় ৩০ ডিসেম্বর ১৯৫৮)। তদানীন্তন শিক্ষা সচিব এস. এম. শরীফকে সভাপতি করে এগারো সদস্য বিশিষ্ট জাতীয় শিক্ষা

www.Educationblog24.Com

কমিশন গঠিত হয়। এই কমিশনের নাম শরীফ কমিশন। ১৯৫৯ সালের ২৬ আগস্ট কমিশন তার সুপারিশ পেশ করে। রিপোর্টটি মুদ্রিত হয়ে প্রকাশিত হয় ১৯৬২ সালে। এই কমিশন যে সকল সুপারিশ পেশ করে তার মধ্যে অন্যতম ছিল:

তিন বছরের বি.এ. পাস কোর্স পদ্ধতি চালু করা। (এর আগে দুই বছরের বি. এ পাস কোর্স চালু ছিল)।

স্কুল-কলেজের সংখ্যা সীমিত রাখা, শিক্ষা ব্যয়ের শতকরা ৮০ ভাগ অভিভাবক এবং বাকি ২০ ভাগ সরকার কর্তৃক বহন করা।

৬ষ্ঠ শ্রেণী হতে ডিগ্রি স্তর পর্যন্ত ইংরেজিকে বাধ্যতামূলক করা।

এই কমিশনের রিপোর্টের বিরুদ্ধে সর্বপ্রথম ঢাকা কলেজের ছাত্ররা বিক্ষোভ করে। তারা 'ডিগ্রি স্টুডেন্টস ফোরাম' নামে একটি সংগঠন প্রতিষ্ঠা করে। এই ফোরামের ব্যানারে ছাত্র নেতৃবৃন্দ ঢাকা শহরের অন্যান্য কলেজেও (জগন্নাথ কলেজ, কায়েদে আযম কলেজ, ইডেন কলেজ) প্রতিবাদ সভা করে। শীঘ্রই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রনেতৃবৃন্দ এই আন্দোলনে জড়িয়ে পড়েন এবং 'ডিগ্রি স্টুডেন্ট ফোরাম' ইস্ট পাকিস্তান স্টুডেন্ট ফোরামে' রূপান্তরিত হয়। পরবর্তীকালে নেতৃত্ব চলে যায় ছাত্রলীগ ও ছাত্র ইউনিয়নের যৌথ নেতৃত্বের হাতে।

মুনতাসীর মামুন এবং জয়ন্ত কুমার রায় আন্দোলনের নিম্নরূপ বিবরণ দিয়েছেন:

১৫ ই আগস্ট থেকে ১০ই সেপ্টেম্বর প্রতিদিন মিছিল-বিক্ষোভ অনুষ্ঠিত হয়। ১৫ই আগস্ট পালিত হয় সাধারণ ধর্মঘট। ১৭ই সেপ্টেম্বর ছাত্ররা আহবান করে হরতাল..... ১৭ই সেপ্টেম্বর ঢাকায় ছাত্র-জনতা মিলিতভাবে রাস্তায় নেমে পড়ে। পুলিশের গুলিতে নিহত হয় বাবুল, বাসকন্ডাক্টর গোলাম মোস্তফা এবং গৃহভৃত্য ওয়াজিউল্লাহ.... আহত হয় প্রায় আড়াইশো জন। যশোর, চট্টগ্রাম প্রভৃতি জেলা শহরেও ব্যাপক প্রতিরোধ হয়। ২৩ সেপ্টেম্বর নিহত হয় একজন ছাত্র।

ছাত্রদের এই আন্দোলনে রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ সারা দেননি। তখনো প্রকাশ্য রাজনীতি নিষিদ্ধ ছিল–এটাও সমর্থন না-দেয়ার একটা কারণ হতে পারে। বাষট্টির সেপ্টেম্বরে এই আন্দোলনের সাফল্য এই যে, সরকার শরীফ কমিশনের সুপারিশ স্থগিত রাখেন। এই আন্দোলনের বড় সাফল্য এই যে, ছাত্ররাই পরবর্তীকালে স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলনে প্রধান শক্তিতে পরিণত হয়। পরবর্তীকালে প্রতি বছর ১৭ সেপ্টেম্বর 'শিক্ষা দিবস'রূপে পালিত হত এবং আজো ছাত্রসমাজ এ দিবসটি গুরুত্ব সহকারে পালন করে।

৬৪-র ছাত্র আন্দোলন

ঘ. ১. সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা প্রতিরোধ : ছাত্রদের আইয়ুব বিরোধী আন্দোলন অব্যাহত থাকে। আমরা উপরের আলোচনায় দেখেছি যে, ১৯৬২ সালে ছাত্ররা তিনটি ইস্যুতে তিনবার আন্দোলনে নামে: প্রথমত, সোহরাওয়ার্দীর গ্রেফতারের প্রতিবাদে ফেব্রুয়ারির প্রথম সপ্তাহে, দ্বিতীয়বার সংবিধান বিরোধী আন্দোলনে মার্চ মাসে এবং তৃতীয়বার শিক্ষা কমিশনের রিপোর্টের বিরুদ্ধে আগস্ট-সেপ্টেম্বর। এরপর ১৯৬৪ সালে একের পর এক অনেকগুলো আন্দোলন হয়। চৌষট্টির প্রথম আন্দোলন ছিল অবাঙালি সাম্প্রদায়িক

www.Educationblog24.com

দাঙ্গার বিরুদ্ধে। ১৯৬৪ সালের ৭ জানুয়ারি সরকারের ইঙ্গিতে অবাঙালি মুসলমানেরা ঢাকা শহরে এবং তারপর আশেপাশে ভয়াবহ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা শুরু করে। ফেব্রুয়ারির এই দাঙ্গা ভয়াবহ আকার ধারণ করে এবং তা বাঙালি-অবাঙালির দাঙ্গায় মিলিত হয়। এই দাঙ্গায় হিন্দুদের রক্ষা করতে যেয়ে আন্তর্জাতিক নজরুল ফোরামের চেয়ারম্যান কবি আমির হোসেন চৌধুরী এবং ১৬ জানুয়ারি ঢাকায় নটরডেম কলেজের ক্যাথলিক ফাদার নোভাক নিহত হন। মোহাম্মদপুরের বিহারিরা ফিজিক্যাল ট্রেনিং কলেজের মেয়েদের হোস্টেলে আক্রমণ চালায়। ইত্তেফাক-সম্পাদক তোফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়ার নেতৃত্বে 'দাঙ্গা প্রতিরোধ কমিটি' গঠিত হয় এবং কমিটির উদ্যোগে ১৭ জানুয়ারি তারিখে ইত্তেফাক, আজাদ ও সংবাদ পত্রিকায় 'পূর্ব পাকিস্তান রুখিয়া দাঁড়াও' শিরোনামে একটি আবেদনপত্র প্রকাশ করা হয়।

ঢাকার সচেতন ছাত্রসমাজ এই দাঙ্গার বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়। বিশেষ করে ছাত্র ইউনিয়নের ছেলেরা দাঙ্গা প্রতিরোধ এবং দাঙ্গায় আহত ও ক্ষতিগ্রস্তদের সাহায্যের কাজে আত্মনিয়োগ করে।

২. সমাবর্তন বিরোধী আন্দোলন : চৌষট্টিতে ছাত্রদের আরেকটি আন্দোলন গড়ে ওঠে রাজশাহী ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সমাবর্তন উৎসবকে কেন্দ্র করে। পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর মোনেম খান এই দুই বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্য ছিলেন। বাষট্টি সালেই মোনেম খান ছাত্রসমাজের বিরূপতা অর্জন করেন। ঐ বছর তিনি জাতীয় পরিষদের নির্বাচনে ময়মনসিংহ থেকে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হয়ে সংবাদপত্রে এক বিবৃতি প্রদান করেন। উক্ত বিবৃতিতে তিনি দেশের রাজবন্দিদের দেশদ্রোহী হিসেবে আখ্যায়িত করেন এবং তাদেরকে যেন মুক্তি দেয়া না হয় তার জন্য সরকারের কাছে অনুরোধ জানান। এতে ছাত্ররা ক্ষুব্ধ হয়। জাতীয় পরিষদের বৈঠকে যোগদানের উদ্দেশ্যে-- পাকিস্তানে যাওয়ার পথে তেজগাঁও বন্দরে ছাত্ররা তাকে লাঞ্ছিত করে। এতে তিনি আইয়ুব খান কর্তৃক পুরস্কৃত হন। তিনি আইয়ুব মন্ত্রিসভায় স্বাস্থ্যমন্ত্রীরূপে নিযুক্ত হয়। এর অল্প দিন পরেই আইয়ুব খান তাকে পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর নিযুক্ত করেন। গভর্নর হিসেবে মোনেম খান পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের উপর শোষণ, বঞ্চনা ও নির্যাতন স্টিমরোলার চালানোর জন্য আইয়ুবের একজন বিশ্বস্ত, অনুগত ও প্রভুভক্ত চাকরের দায়িত্ব পালন করেন। গভর্নর হয়েই তিনি ছাত্রদের দমনের কাজ শুরু করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে নিয়ন্ত্রণের জন্য ড. এম.ও. গণিকে উপাচার্য নিয়োগ করেন। ছাত্রদেরকে দমনের জন্য এন.এস.এফ (ন্যাশনাল স্টুডেন্টস ফেডারেশন) নামে একটি ছাত্র সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেন। প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই এন এসএফ এদেশের গণতান্ত্রিক আন্দোলনের ওপর মোনেম খানের লাঠিয়াল বাহিনী হিসেবে কাজ করছিল। স্বভাবতই তিনি ছাত্র সমাজের আস্থা অর্জন করতে পারেননি। এই মোনেম খান যখন সমাবর্তন উৎসবের আয়োজন করে ছাত্রদেরকে ডিগ্রি প্রদান করতে যান তখন ছাত্ররা তা গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানায়। সমাবর্তন উৎসব প্রথম ছিল রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৬ মার্চ ১৯৬৫ তারিখে। এরপর ২২ মার্চ ছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সমাবর্তনের তারিখ। রাজশাহী

www.Educationblog24.com

উৎসব প্যান্ডেলে ছাত্ররা কালো পতাকা টাঙিয়ে দেয় এবং ডিগ্রি হাতে মোনেম খানের বিরুদ্ধে স্লোগান দিতে থাকে। ঢাকার সমাবর্তনের দিন মোনেমে খান সমাবর্তন প্যান্ডেলে প্রবেশ করা মাত্র ছাত্ররা আইয়ুব মোনেমে বিরোধী স্লোগান দিতে থাকে। ছাত্র-পুলিশ খণ্ড যুদ্ধ শুরু হয়। সমাবর্তন উৎসব হল লণ্ড ভণ্ড। এর পরিণতিতে এল পুলিশ ও এনএসএফের সম্মিলিত ছাত্র নির্যাতন। 'ডিগ্রি প্রত্যাহার, বহিষ্কার, গ্রেফতার, হুলিয়াজারি এসব মিলিয়ে এক তাণ্ডব নৃত্য চলে সারা বিশ্ববিদ্যালয় জুড়ে। এই আন্দোলনের ফলশ্রুতিতে পূর্ব পাকিস্তানে ১৪শত স্কুল ও ৭৪টি কলেজ বন্ধ করে দেয়া হয় এর ১২শত ছাত্রকে গ্রেফতার করা হয়।

রাশেদ খান মেনন এই আন্দোলনের ফলাফল সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন :

> এই আন্দোলনে আশু কোনো ফল লাভ না হলেও এই প্রক্রিয়া ছাত্র-আন্দোলনকে অনেকখানি বহির্মুখী করে। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ঐক্য ও আন্দোলন গড়ে তোলার জন্য ছাত্র-আন্দোলনের চাপ আরও তীব্র হয়। অন্যদিকে বিশ্ববিদ্যালয়কে কেন্দ্র করে আইয়ুব-মোনেমী এই তাণ্ডব নৃত্য সামাজিক অন্যান্য শক্তিকেও দ্রুত ঐ একনায়কতন্ত্রমূলক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে পোলারাইজড হতে সাহায্য করে। এই সম্মিলিত প্রয়াসের ফলেই চৌষট্টির শেষের দিকে জন্ম নেয় সম্মিলিত বিরোধী দল ও তার নেতৃত্বে আন্দোলন।

পরবর্তী অধ্যায়ে আমরা আইয়ুব-বিরোধী রাজনৈতিক আন্দোলন আরো বিশদ আলোচনা করব।

নিম্নে আইয়ুবের পতনের পর্বটি আলোচনা করা হল।

আইয়ুববিরোধী ছাত্র-আন্দোলন ১৯৬৮ সালের অক্টোবর মাসে শুরু হলেও তা ১৯৬৯-এর জানুয়ারিতে তুঙ্গে ওঠে এবং মধ্য জানুয়ারিতে গণআন্দোলনের রূপ নেয়। আইয়ুববিরোধী মিছিল মিটিং সভা সমাবেশ নিত্যদিনকার ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। আইয়ুব পুলিশ, ইপিআর ও সেনাবাহিনী দিয়ে ঐ আন্দোলন স্তব্ধ করার চেষ্টা করেন। কিন্তু আন্দোলন তো স্তব্ধ হয়ইনি, বরং শ্রমিক শ্রেণীর অংশগ্রহণে তা দিন দিন আরও শক্তিশালী হতে থাকে। ১৯৬৯ সালের ২০ জানুয়ারি ছাত্র ইউনিয়ন মেনন গ্রুপের নেতা আসাদুজ্জামান পুলিশের গুলিতে শহীদ হলে আন্দোলন সরকারের নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়। ১৪৪ ধারা জারি করে কিংবা সান্ধ্য আইন জারি করে, কিংবা শত শত নেতা-কর্মীকে ধর-পাকড় করেও আন্দোলনকে থামানো সম্ভব হয়নি। এক হিসেবে দেখা যায় যে, ১৯৬৯-এর গণআন্দোলনে প্রায় ১০০ জন পূর্ব পাকিস্তানী নিহত হয়েছিলেন, তার মধ্যে ৩৪ জন শিল্প-কারখানার শ্রমিক, ২০ জন ছাত্র, ৭ জন সরকারি কর্মচারী, ৫ জন ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী, ১ জন স্কুল-শিক্ষক অন্যতম।

আন্দোলন কেবলমাত্র ঢাকা শহরেই সীমাবদ্ধ ছিল না। তা পল্লীগ্রামসহ সকল মফস্বল শহরেও বিস্তৃত হয়েছিল। ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ দেশের সকল মৌলিক গণতন্ত্রীকে পদত্যাগের আহ্বান জানালে প্রায় ৭৫% সে আহ্বানে সাড়া দেন। পল্লী এলাকার অনেক মৌলিক গণতন্ত্রীকে বিদ্রোহী জনতা হত্যা করে। কয়েকজন বিরোধী দলীয় জাতীয় পরিষদ সদস্য পদত্যাগ করেন। স্কুল-কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের

www.Educationblog24.Com

অধিকাংশ ছাত্র শিক্ষকবৃন্দ ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের আন্দোলনের সঙ্গে একাত্মতা ঘোষণা করেন। আন্দোলন চরম আকার ধারণ করে যখন প্রক্টরের দায়িত্ব পালন করার সময় রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ড. শামসুজ্জোহা পুলিশের বেয়নেট চার্জের ফলে মৃত্যুবরণ করেন (১৮-২-৬৯)। ড. জোহার মৃত্যুসংবাদে সারাদেশে এমন ব্যাপক গণবিক্ষোভ সৃষ্টি হয় যে, সরকার ১৯৬৯ সালের ২২ ফেব্রুয়ারি আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা প্রত্যাহার করে এবং শেখ মুজিবুর রহমানকে মুক্তি দেয়। অনেক কম্যুনিষ্ট বন্দিকে– যারা দীর্ঘদিন থেকে আটক ছিলেন– তাদেরকেও মুক্তি দেয়। শেখ মুজিবুর রহমানের মুক্তিলাভে ঢাকায় আনন্দের জোয়ার বয়ে যায়। ২৩ ফেব্রুয়ারি (১৯৬৯) ঢাকার তৎকালীন রেসকোর্স ময়দানে (বর্তমানে সোহরাওয়ার্দী উদ্যান) শেখ মুজিবকে সংবর্ধনা দেয়া হয়। উক্ত সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে প্রায় পাঁচ লক্ষ লোকের সমাবেশ ঘটেছিল। উক্ত সময় ছাত্রনেতা তোফায়েল আহমেদের প্রস্তাবনায় শেখ সাহেবকে 'বঙ্গবন্ধু' উপাধিতে ভূষিত করা হয়। উক্ত সভাতেই 'জয় বাংলা' স্লোগানের উদ্ভব ঘটে। সভায় 'বঙ্গবন্ধু' ছয় দফা ও এগারো দফা দাবি অর্জিত না-হওয়া পর্যন্ত আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন।

শেখ মুজিবকে মুক্তি দেয়ার পর আন্দোলনের ব্যাপকতা আরো বেড়ে যায়। এ অবস্থায় আপস-মীমাংসার জন্য আইয়ুব খান বিরোধী ডাক (DAC) নেতৃবৃন্দের সঙ্গে এক গোলটেবিল বৈঠক আহ্বান করেন। ১৯৬৯ সালের ১০ মার্চ রাওয়ালপিন্ডিতে উক্ত বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। ভাসানী ন্যাপ ও পাকিস্তান পিপলস পার্টি উক্ত বৈঠক বয়কট করে। এমনকি শেখ মুজিবকে উক্ত বৈঠকে যোগদান না করার জন্য মওলানা ভাসানী তাঁকে অনুরোধ করেন। কিন্তু শেখ মুজিব গোলটেবিল বৈঠকে যোগদান করেন এবং আওয়ামী লীগের ৬ দফা দাবি ও ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের ১১ দফা দাবি আলোচনার জন্য বৈঠকে উপস্থাপন করেন। জামাতে ইসলামীর মওলানা মওদুদী এবং এবং নেজামে এছলামীর চৌধুরী মোহাম্মদ আলী বঙ্গবন্ধুকে উক্ত দাবিসমূহ উপস্থাপনে বিরোধিতা করেন। উক্ত গোলটেবিল বৈঠকে উপস্থিত পূর্ব পাকিস্তানী নেতৃবৃন্দের মধ্যে কেবলমাত্র মোজাফফর ন্যাপের অধ্যাপক মোজাফফর আহমেদ এবং স্বতন্ত্র সদস্য বিচারপতি এস এম মুরশেদ বঙ্গবন্ধুকে সমর্থন করেন। পশ্চিম পাকিস্তানী নেতা খান আবদুল ওয়ালী খান (পাকিস্তান ন্যাপের সভাপতি)-ও পূর্ব পাকিস্তান স্বায়ত্তশাসনের বিষয়টি সমর্থন করেন। অনেক আলাপ-আলোচনার পর কেবলমাত্র ২টি বিষয়ে সম্মতি প্রকাশের মাধ্যমে ১৩ মার্চ গোলটেবিল বৈঠক সমাপ্ত হয়। আইয়ুব খান যে দুটি বিষয় মেনে নেন তা হল (১) ফেডারেল সংসদীয় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা এবং (২) প্রাপ্তবয়স্কদের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচন অনুষ্ঠান। আওয়ামী লীগ ও মোজাফফর ন্যাপ ছাড়া অন্যান্য বিরোধী দল এই সিদ্ধান্ত মেনে নেন। শেখ মুজিবুর রহমান এই সিদ্ধান্ত প্রত্যাখ্যান করে ঘোষণা করেন যে, পূর্ব পাকিস্তানবাসী এতে খুশি হতে পারে না। আইয়ুব খান গোলটেবিল বৈঠকের সিদ্ধান্তকে 'ঐতিহাসিক' বলে মন্তব্য করেন। জামাতে ইসলামী গোলটেবিল বৈঠককে 'সফল' বলে অভিহিত করে। হামিদুল হক চৌধুরী একে 'জনমতের বিজয়' বলে মন্তব্য করেন।

www.Educationblog24.com

www.Educationblog24.com

মওলানা ভাসানী বৈঠকে যোগদান না করলেও বৈঠকে গৃহীত সিদ্ধান্তে সন্তোষ প্রকাশ করেন। শেখ মুজিবুর রহমান 'ডাক' থেকে আওয়ামী লীগকে প্রত্যাহার করে নেন। মোজাফফর ন্যাপও তাঁকে অনুসরণ করে। ফলে ১৪ মার্চ DAC ভেঙে যায়। ছাত্র নেতৃবৃন্দ আওয়ামী লীগ ও মোজাফফর ন্যাপকে অভিনন্দিত করে এবং পূর্ব পাকিস্তানের যে-সকল দল ছয় দফা ও এগারো দফার বিরোধিতা করেছে তাদেরকে নিন্দা করে।

ঢাকায় আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে স্বায়ত্তশাসনের সমর্থকদের এক প্রতিবাদ মিছিল অনুষ্ঠিত হয় পক্ষান্তরে জামাতের নেতৃত্বে 'ইসলামী সংগ্রাম পরিষদ' গঠিত হয় এবং তারা ৬ দফা ও ১১ দফা বিরোধী প্রচারাভিযান শুরু করে। এইভাবে বিরোধী জোটের মধ্যে দুটি ধারার সৃষ্টি হয়। একটি ধারা ছয়দফা ও এগারো দফার পূর্ণ বাস্তবায়নে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিল, অপর ধারা গোলটেবিল বৈঠকে অর্জিত ফসল নিয়েই সন্তুষ্ট ছিল। তারা বড়জোর ১৯৫৬ সালের সংবিধান পুনঃপ্রবর্তনের পক্ষপাতী ছিল।

ইতোমধ্যে ২১ মার্চ (১৯৬৯) শেখ মুজিবুর রহমান ৬ দফা ও ১১ দফার আলোকে পাকিস্তান সংবিধানের প্রয়োজনীয় সংশোধনীর খসড়া প্রেসিডেন্ট আইয়ুব সমীপে পেশ করেন। সংবিধানে সংশোধনীর এই খসড়া পেয়ে আইয়ুব ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে পড়েন। কারণ উক্ত খসড়া নীতি পশ্চিম পাকিস্তানের অনগ্রসর অঞ্চলগুলির ব্যাপক সমর্থনের ফলে পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকার ও সেনাবাহিনীর ক্ষমতা সংকুচিত হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দেয়। পশ্চিম পাকিস্তানে এক ইউনিট ভেঙে ৪টি স্বতন্ত্র প্রদেশ গঠনের দাবি জনপ্রিয়তা লাভ করে এবং উক্ত দাবির সমর্থনে ব্যাপক ছাত্র-শ্রমিক গণআন্দোলন শুরু করে। আইয়ুব-বিরোধী আন্দোলন আর কেবল পূর্ব পাকিস্তানেই সীমাবদ্ধ থাকে না, তা পশ্চিম পাকিস্তানেও ব্যাপকতা লাভ করে। এমতাবস্থায় আইয়ুবের পক্ষে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকা অসম্ভব হয়ে পড়ে। কিন্তু স্বৈরাচারী আইয়ুব তার ক্ষমতা জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের হাতে দেয়ার চেয়ে সেনাবাহিনীর হাতে অর্পণ করাকে শ্রেয় মনে করলেন এবং সে অনুসারে তিনি ২৪ মার্চ ১৯৬৯ তৎকালীন পাকসেনা প্রধান জেনারেল মোহাম্মদ ইয়াহিয়া খানকে এক চিঠি লিখে ক্ষমতা গ্রহণের আহ্বান জানান। ফলে ইয়াহিয়া খান ২৫ মার্চ দেশে সামরিক আইন জারি করেন। এইভাবে পাকিস্তানে দ্বিতীয়বারের মতো সামরিক শাসন জারি হয়।

পূর্ব পাকিস্তানের ৬ দফা ও ১১ দফার আন্দোলনের সঙ্গে পশ্চিম পাকিস্তানী ছাত্র জনতার আন্দোলন এক হয়ে আইয়ুব খানের শাসনামলের পতন ঘটালেও শাসনক্ষমতা জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধির হাতে অর্পণের, কিংবা দেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে ব্যর্থ হয়। পাকিস্তানের শাসনক্ষমতায় অধিষ্ঠিত গ্রুপ কিছুতেই ছয় দফার বাস্তবায়ন চাননি। ফলে আইয়ুবের পতন ঘটলেও তাদের স্বার্থরক্ষার্থেই দেশে সামরিক শাসনের পুনঃপ্রবর্তন করা হয়।

১৯৬৯ সালের ২৫ মার্চ আইয়ুব খানের নিকট থেকে ক্ষমতা গ্রহণের পর ২৮ নভেম্বর ১৯৬৯ জেনারেল ইয়াহিয়া ঘোষণা করেন যে যত শীঘ্র সম্ভব তিনি প্রাপ্তবয়স্কদের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করবেন। এই নির্বাচিত

www.Educationblog24.Com

প্রতিনিধিদের কাজ হবে দেশকে একটি ব্যবহারযোগ্য শাসনতন্ত্র দেয়া এবং যেসব রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক সমস্যা গণমনকে আলোড়িত করেছে তার একটা সমাধান বের করা। ক্ষমতা হস্তান্তরের প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে ইয়াহিয়া খান দুটি গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। প্রথমত তিনি পশ্চিম পাকিস্তানের এক ইউনিট ব্যবস্থা বাতিল করে সেখানে চারটি নতুন প্রদেশ সৃষ্টি করেন। দ্বিতীয়ত 'এক ব্যক্তি এক ভোট'– এই নীতিতে ভোট হবে বলে ঘোষণা করেন। প্রথম সিদ্ধান্তটি পাকিস্তানের আঞ্চলিকতাবাদে বিশ্বাসী জনগণকে সন্তুষ্ট করে। দ্বিতীয় সিদ্ধান্তের মাধ্যমে পূর্ব পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠতার দাবি মেনে নেয়া হয়।

সহায়ক গ্রন্থ

হাসান হাফিজুর রহমান, *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ : দলিলপত্র*, দ্বিতীয় খণ্ড, ঢাকা, ১৯৮২
মুনতাসীর মামুন ও জয়ন্তকুমার রায়, *বাংলাদেশে সিভিল সমাজ প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম*, ঢাকা, ২০১৩।

www.Educationblog24.com

www.Educationblog24.Com

ষষ্ঠ অধ্যায়
জাতীয়তাবাদের বিকাশ ও স্বাধিকার আন্দোলন

জাতীয়তাবাদ বা ন্যাশনালিজম নিয়ে শুধু প্রবন্ধ নয়, অনেক বইও লেখা হয়েছে। এর সংজ্ঞা, স্বরূপ নিয়েও বিতর্কের শেষ নেই। আমরা এখানে বিতর্ক নয়, সাধারণ একটি আলোচনা করব।

প্রতিটি দেশের মানুষেরই নিজ জাতির ইতিহাস, সংস্কৃতি, ভৌগোলিক অবস্থান ইত্যাদি নিয়ে একটি আবেগ আছে। একটি জাতির অন্তর্ভুক্ত হয়েও সে আবেগ থাকতে পারে। জাতীয়তাবাদ সে আবেগেরই বহিঃপ্রকাশ মাত্র।

মার্কসবাদীরা মনে করেন, 'প্রধানতঃ পুঁজিবাদী বিশ্বের বিভিন্ন রাষ্ট্রের স্বাতন্ত্র প্রকাশক আদর্শ হচ্ছে জাতীয়তাবাদ। এর দুটি দিক আছে, আগ্রাসী জাতীয়তাবাদ যা প্রকাশ পায় অপর জাতি/রাষ্ট্রকে আক্রমণ দখল বা জাতিগত নিপীড়নের মাধ্যমে। যেমন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে নাজি জার্মানীর জাতীয়তাবাদ। অন্যটি হচ্ছে সাম্রাজ্যবাদী/শোষক শাসক/রাষ্ট্রের থেকে মুক্তি যেমন ১৯৭১ সালে বাঙালি জাতীয়তাবাদে বলীয়ান হয়ে আমরা পাকিস্তানের বিরুদ্ধে লড়াই করে স্বাধীনতা অর্জন করেছি।

বাংলার জাতীয়তাবাদের ধারা খুঁজতে গেলে আঞ্চলিকতার বিষয়টিও আলোচনায় আনতে হবে। আগে উল্লেখ করেছি বাংলার বিভিন্ন নরগোষ্ঠী বসবাস করতো যাদের পরস্পরের সঙ্গে যোগাযোগ ছিল ক্ষীণ। সভ্যতার বিস্তৃতির ফলে, বিভিন্ন কৌমের পরস্পরের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপিত হয়েছিল। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কৌমের সমন্বয়ে গঠিত হয়েছিল বৃহত্তর কৌম, যেমন–বঙ্গ, রাঢ়, পুণ্ড্র প্রভৃতি। এই কৌমচেতনা প্রাচীন যুগে তো বটেই, মধ্যযুগেও ছিল এবং এখনও বহমান।

কৌমচেতনার সঙ্গে ক্রমে যুক্ত হয়েছিল আঞ্চলিক স্মৃতি এবং চেতনার। বঙ্গ, রাঢ়, পুণ্ড্র প্রভৃতি জনপদগুলি পাল (আনুমানিক ৭৫০ থেকে ১১৭৪ খ্রিষ্টাব্দ) ও সেন রাজারা (আনুমানিক ১০৯৫-১২৪৫ খ্রিষ্টাব্দ) ঐক্যবদ্ধ করার চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু আঞ্চলিক চেতনা তবু লুপ্ত করা সম্ভব হয়নি।

এ পরিপ্রেক্ষিতে, সর্বভারতের পটভূমিকায় জাতীয়, আঞ্চলিক, উপ-আঞ্চলিক চেতনার কথা আলোচনা করা দরকার। জাতীয় চেতনার ক্রমবিকাশ হয়েছিল পশ্চিম ইউরোপে এবং এর পেছনে কাজ করেছিল পুঁজিবাদী শক্তি। এর কারণ, বিকাশমান বুর্জোয়া শ্রেণী চেয়েছিল সামন্ততান্ত্রিক রাষ্ট্রের বেড়াজাল ভেঙ্গে নতুন বাজারের সৃষ্টি করতে যা co-extensive with a definite culturally-politically unified or unifitable territory, could be brought into existence with popular support. ভাষা ছিল এ চেতনার একটি প্রধান মাধ্যম। বুর্জোয়ারা, নিজ রাজনৈতিক

www.Educationblog24.Com

স্বার্থে তখন সচেতন করে তুলেছিল জনগণকে তাদের স্বতন্ত্র রাজনৈতিক সাংস্কৃতিক সত্তা সম্পর্কে এবং এ জন্যে প্রয়োজনবোধে সৃষ্টি করা হয়েছিল বিভিন্ন 'মিথ'। এটিই হল জাতীয়তাবাদ এবং তা সাহায্য করেছিল বুর্জোয়াদের জনগণকে সংগঠিত করে রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করতে। পরবর্তীকালে ঔপনিবেশিক শাসনাধীন রাষ্ট্রগুলিতে জাতীয় আন্দোলন ছিল প্রাথমিকভাবে উপনিবেশের বিরুদ্ধে, যাতে বুর্জোয়ারা রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করতে পারে এবং নিরবচ্ছিন্ন গতিতে সমাজকে পুঁজিবাদী সমাজে রূপান্তরিত করতে পারে। সুতরাং জাতীয়তাবাদের উৎস শুধু হৃদয়াবেগ বা দেশের প্রতি ভালবাসাই নয়, অন্য কিছুও।

ঔপনিবেশিক শাসনামলে দেখা গেছে, নিজেদের স্বার্থেই ব্রিটিশরা যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি করে কেন্দ্রীয় প্রশাসনিক ব্যবস্থা গড়ে তুলেছিল যার সঙ্গে যোগ ছিল মেট্রোপলিটনের। ঐ সময় বিভিন্ন অঞ্চলের অসংহত বুর্জোয়াদের উৎসাহিত করা হয়েছিল বিদেশী পুঁজি ও ব্যবসার সঙ্গে সহযোগিতা করার জন্যে। উপ-আঞ্চলিক, আঞ্চলিক বা সর্বভারতীয় পর্যায়ে উঠতি ভারতীয় বাঙালি বুর্জোয়াদের স্থান ছিল অধস্তন। কিন্তু তারা চায়নি নিজেদের বাজারের ওপর বিদেশীদের আধিপত্য। নিজেদের বিকাশের জন্যে তাদের প্রয়োজন ছিল ঐ বাজারের। কিন্তু এ বিরোধী ভূমিকা কখনও ছিল না বিপ্লবাত্মক বরং তা ছিল সমঝোতাপূর্ণ। সামগ্রিকভাবে বলা যেতে পারে, ঐ সময়ে বুর্জোয়ারা ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে অসন্তোষ প্রকাশ করে চলেছিল এবং গুরুত্ব আরোপ করেছিল এর বিরুদ্ধে ভারতীয় জনগণের ঐক্যের।

প্রাক ঔপনিবেশিক যুগে ভারতে জাতীয় চেতনা বলে কিছু গড়ে ওঠেনি। ঔপনিবেশিক আমলে, আরো নির্দিষ্ট করে বলতে গেলে উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময় থেকে জাতীয় চেতনার বিকাশ ঘটেছিল এবং এর দু'টি ধারা ছিল বহমান– একটি সর্বভারতীয়, অপরটি আঞ্চলিক। প্রথমটির ভিত্তি ছিল– সর্বভারতীয় ইতিহাস ও ঐতিহ্য। দ্বিতীয়টির ভিত্তি ছিল স্ব স্ব অঞ্চলের বৈশিষ্ট্য এবং নিজ অঞ্চলের লোক সমষ্টির ঐ অঞ্চলের বাজার ও সম্পদ ব্যবহারের সুযোগ। জাতীয় চেতনার মধ্যে আঞ্চলিক চেতনার এই অবস্থানের ভিত্তিতে আবার অনুপ্রবেশ করেছে প্রাচীন বাংলার অতীত এবং ঐতিহ্য।

প্রাচীন বাংলা সম্পর্কে নীহাররঞ্জন রায় লিখেছিলেন, "ভূমি নির্ভর কৃষি জীবনের কারণে" কৌম ও আঞ্চলিক চেতনা কাজ করেছিল। আঞ্চলিক চেতনার মধ্যে ভূমি নির্ভরতার এই অনুপ্রবেশ ক্রিয়াশীল দেখতে পাই বিকাশমান মধ্য বা বুর্জোয়া শ্রেণীর মধ্যে। ঐ সময় একই সঙ্গে সর্বভারতীয়, আঞ্চলিক (বাংলা) ও উপ-আঞ্চলিক (পূর্ববঙ্গ)- এই চেতনাত্রয় কাজ করেছিল। বুর্জোয়া শ্রেণীর জন্য সর্বভারতীয় পরিসরে সুবিধা ছিল বেশি। সে জন্যে সে চেয়েছিল সর্বভারতীয় চেতনার বিকাশ। কোনো কোনো ক্ষেত্রে আবার আঞ্চলিক চেতনা বৃদ্ধিতে সহায়তা করেছিল সে, যেমন বঙ্গভঙ্গের সময়। কলকাতার বিরুদ্ধে আবার পূর্ববঙ্গের কাঠামোগত দুর্বল মধ্যশ্রেণীর উপ-আঞ্চলিক চেতনা কাজ করেছিল। ঐ মধ্যশ্রেণীর মতে, তাদের অঞ্চলের উৎপাদিত কাঁচামাল চলে যাচ্ছিল কলকাতায়, কিন্তু পাচ্ছিল না ন্যায্যমূল্য। পূর্ববঙ্গের যোগাযোগ ব্যবস্থাও ছিল অবহেলিত। এ সব কিছুর পরিচয় পাব আমরা তৎকালীন পূর্ববঙ্গের মধ্যশ্রেণীর বাহন সংবাদ/সাময়িক

www.Educationblog24.Com

পত্রগুলিতে। এই চেতনায় সহায়তা করেছিল আবার ভূমিনির্ভর জীবন, শিল্পের অভাব। এই উপ-আঞ্চলিক চেতনা পূর্ববঙ্গবাসীর মন থেকে একেবারে লুপ্ত হয়ে যায়নি কখনও। সে চেতনা আবার বাঙালি জাতীয়তাবাদে রূপান্তরিত হয়ে স্বাধীন বাংলাদেশ গঠনে (১৯৭১) সহায়তা করেছিল। ভাষা এবং জাতি হিসেবে বাঙালির 'একত্বতা' গড়ে উঠলেও পূর্ব ও পশ্চিমবঙ্গের এমন কিছু আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য আছে যা দুটি অঞ্চলকে স্বতন্ত্র করে রেখেছে। প্রকৃতিগত দিক থেকেও পূর্ব ও পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে পার্থক্য আছে। কারণ, পূর্ববঙ্গ নদীমাতৃক অঞ্চল। এছাড়া সংস্কৃতিগতভাবেও যে প্রাচীনকালে দুটি অঞ্চলের খুব মিল ছিল এমন কথা বলা যায় না। যেমন রাঢ় (বা পশ্চিমবঙ্গ)-এর ওপর প্রভাব পড়েছিল বেশি উত্তর ভারতীয় 'কালচারাল ইডিওমস'-এর যার উদাহরণ ঐ অঞ্চলের স্থাপত্য ও ভাস্কর্য।

এ পরিপ্রেক্ষিতে, অনেকে প্রশ্ন তুলতে পারেন এই বলে যে, বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলে উত্তর ভারতীয় সংস্কৃতির প্রভাব রাঢ় অঞ্চল থেকে কিছুটা কম ছিল না। কিন্তু পরবর্তীকালে দেখা গেল, বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চল ও পূর্বাঞ্চল সাংস্কৃতিক প্রশ্নে প্রায় এক এবং রাঢ় ও সংলগ্ন অঞ্চল ঐ প্রশ্নে স্বতন্ত্র। এর একটি কারণ বোধ হয় এই যে, পূর্বাঞ্চলে মুসলমানদের আগমন এবং তারপর তাদের সংগঠিত ধর্মজীবন ও কৃষি বাণিজ্যের প্রভাব ব্যাপ্ত হয়ে পড়েছিল উত্তরাঞ্চলে। এক কথায় মুসলমানদের আগমন, মসজিদ নির্মাণ ও তাকে ঘিরে পতিত জমি উদ্ধার ও সংগঠন, বিশেষ করে সুফীদের প্রভাব গ্রাস করেছিল বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলকে। এখনও ঐসব অঞ্চলে সুফীদের সম্পর্কে বিভিন্ন কিংবদন্তী সেই স্মৃতিই বহন করে। এভাবে, একসময়, উত্তরাঞ্চল রাঢ়ের সংলগ্ন ও সাংস্কৃতিক প্রভাবে থাকা সত্ত্বেও কালক্রমে ঐ প্রশ্নে তা পূর্ববঙ্গের আঞ্চলিকতার বলয়ে লীন হয়ে গিয়েছিল।

এ পরিপ্রেক্ষিতে বলা যেতে পারে, ঐ ভূখণ্ডের মানুষের মধ্যে এই একক বা ভৌগোলিক সীমানা স্থান করে নিয়েছিল যা জেনারেশনের পর জেনারেশনের ভালোবাসায় সিক্ত হয়েছে। এই বোধ ক্রমান্বয়ে এগিয়ে নিয়ে গেছে ১৯৭১ সালে যখন ঘোষণা করা হয়েছে এই একক নিয়েই গঠিত হবে বাংলাদেশ।

ক. সাংস্কৃতিক আগ্রাসনের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ ও বাঙালি সংস্কৃতির উজ্জীবন

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব ১৯৬৬ সালে ছয় দফা ঘোষণা করেছিলেন। এই একই সময় বাঙালির বিরুদ্ধে সাংস্কৃতিক আগ্রাসনও পরিচালিত হয়।

ছয়দফা আন্দোলন দমনের জন্য কেবল রাজনৈতিক নেতা কর্মীদেরকে গ্রেফতার কিংবা গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করেই সরকার ক্ষান্ত হয়নি। তারা পূর্ব পাকিস্তানীদের ভাষা ও সাংস্কৃতির ওপর নগ্ন হামলা চালায়। নিম্নে এ বিষয়ে সংক্ষিপ্ত আলোকপাত করা হলো :

রবীন্দ্রসঙ্গীতের নিষিদ্ধ করার অপচেষ্টা

১৯৬৭ সালের জুন মাসে পাকিস্তান জাতীয় পরিষদের অধিবেশনে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গীত নিয়ে বিতর্ক শুরু হয়। ইতিপূর্বে ১৯৬৫ সালের পাক-ভারত যুদ্ধের

www.Educationblog24.Com

সময় পাকিস্তান রেডিও টেলিভিশনে রবীন্দ্রসংগীত প্রচার বন্ধ থাকে। বাজেট অধিবেশনে রাজশাহী থেকে নির্বাচিত বিরোধীদলীয় সদস্য মজিবর রহমান চৌধুরীর এক প্রশ্নের উত্তরে তথ্যমন্ত্রী খাজা শাহাবুদ্দিন মন্তব্য করেন যে, পাকিস্তানী আদর্শের সঙ্গে না মিললে রেডিও-টেলিভিশনে রবীন্দ্রসংগীত প্রচার বন্ধ করে দেয়া হবে। খান এ.সবুর পহেলা বৈশাখ উদযাপন এবং রবীন্দ্র-সংগীতকে হিন্দু-সংস্কৃতির অংশ বলে মন্তব্য করেন। জাতীয় পরিষদের এই বিতর্কের সংবাদ ঢাকার সংবাদপত্রে (দৈনিক পাকিস্তান ও অবজারভার, ২৩-২৮ জুন ১৯৬৭ দ্রষ্টব্য) প্রকাশিত হলে বাঙালি বুদ্ধিজীবীরাও বিতর্কে জড়িয়ে পড়েন। ২৫ জুন ১৯৬৭ আঠারো জন বুদ্ধিজীবী সরকারি বক্তব্যের সমালোচনা করে এক বিবৃতি দেন :

...সরকারি মাধ্যম হতে রবীন্দ্রসংগীতের প্রচার হ্রাস ও বর্জনের সিদ্ধান্ত প্রকাশ করা হইয়াছে। এই সিদ্ধান্ত আমরা অত্যন্ত দুঃখজনক বলে মনে করি। রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য বাংলাভাষাকে যে ঐশ্বর্য দান করেছে, তার সংগীত আমাদের অনুভূতিকে যে গভীরতা ও ভিন্নতা দান করেছে তা রবীন্দ্রনাথকে বাংলাভাষী পাকিস্তানীদের সাংস্কৃতিক সত্তার অবিচ্ছেদ্য অংশে পরিণত করেছে। সরকারি নীতি নির্ধারণের সময় এই সত্যের গুরুত্বকে মর্যাদা দান করা অপরিহার্য।

এই বিবৃতির পাল্টা আরেকটি বিবৃতি দৈনিক পাকিস্তানে ২৯ জুন ছাপা হয়। এতে স্বাক্ষর করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঁচ জন শিক্ষক। তারা বলেন :

....(১৮ জন বুদ্ধিজীবীর) বিবৃতির ভাষায় এই ধারণা জন্মে যে স্বাক্ষরকারীরা বাংলাভাষী পাকিস্তানী ও বাংলাভাষী সংস্কৃতির মধ্যে সত্যিকারের কোনো পার্থক্য রয়েছে বলে স্বীকার করেন না। বাংলাভাষী পাকিস্তানীদের সংস্কৃতির সম্পর্কে এই ধারণার সঙ্গে আমরা একমত নই বলে এই বিবৃতি দিচ্ছি।

একই দিন (২৯-৬-৬৭) দ্বিতীয় আরেকটি বিবৃতি দৈনিক পাকিস্তানে ছাপা হয়। এতে স্বাক্ষরদাতা ছিলেন ৪০ জন। বিবৃতিতে তারা মন্তব্য করেন :

রবীন্দ্রসংগীত সম্পর্কে ১৮ জন বুদ্ধিজীবীর বিবৃতি মারাত্মক। ...যে তমুদ্দনিক স্বাতন্ত্র্যের ভিত্তিতে পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠা, উপরোক্ত বিবৃতি মেনে নিলে সে ভিত্তিই অস্বীকৃত হয়। এই কারণে উপরোক্ত বিবৃতিকে আমরা শুধু বিভ্রান্তিকর নয়, অত্যন্ত মারাত্মক এবং পাকিস্তানের মূলনীতি বিরোধী বলেও মনে করি।

শেষোক্ত বিবৃতিদাতারা ইনস্টিটিউট অব ইঞ্জিনিয়ার্সে এক সভা করে 'নজরুল একাডেমী' প্রতিষ্ঠা করেন। তারা একটা বিবৃতিও প্রচার করেন। বিবৃতিতে তারা বলেন।

...রবীন্দ্র সংগীতের ভাব, ভাষা ও সুরের কোনোটার সঙ্গে পূর্ব পাকিস্তানের তৌহিদবাদী জনসাধারণের তিলমাত্র যোগ নাই। রবীন্দ্রনাথের ঐশ্বর্য ও কৃষ্টি পূর্ব পাকিস্তানী, তমদ্দুনের সম্পূর্ণ বিপরীত...।

এইভাবে কিছু বুদ্ধিজীবীর সমর্থন পেয়ে সরকার ১৩৭৪ সালের ২২ শ্রাবণের পূর্ব মুহূর্তে (আগস্ট ১৯৬৭) বেতার ও টেলিভিশনে রবীন্দ্রসংগীত প্রচার বন্ধ করে দেয়। এর দুবছর পর উনসত্তরের গণআন্দোলনের জোয়ারে উক্ত নিষেধাজ্ঞা ভেসে যায়। রেডিও-

www.Educationblog24.Com

টিভিতে রবীন্দ্রসংগীত প্রচার বন্ধ হয়ে গেলে ঢাকার বিভিন্ন প্রগতিশীল সাংস্কৃতিক সংস্থা বিশেষত 'ছায়ানট', 'বুলবুল ললিতকলা একাডেমী' ও 'ঐক্যতান' রবীন্দ্রসংগীতের বিভিন্ন অনুষ্ঠান আয়োজন করে সাহসিকতার পরিচয় দেয়। এ সময় বদরুদ্দীন উমর লিখিত সংস্কৃতি ও সাম্প্রদায়িকতা সম্পর্কিত দুটো বই 'সংস্কৃতির সংকট' ও 'সাংস্কৃতিক সাম্প্রদায়িকতা' সাংস্কৃতিক প্রতিরোধ আন্দোলনকে খুবই অনুপ্রাণিত ও প্রভাবিত করেছিল।

বাংলা ভাষা সংস্কারের প্রয়াস

আইয়ুব-মোনেম চক্র কেবল রবীন্দ্রসংগীত নিষিদ্ধ করেই ক্ষান্ত হয়নি, তারা বাংলাভাষা সংস্কার করে একটি 'জাতীয় ভাষা' প্রচারের চেষ্টা শুরু করে। ১৯৬৭ সালের মার্চ মাসে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলর ড. ওসমান গণি বাংলা বিভাগের ড. কাজী দীন মুহাম্মদের নেতৃত্বে ভাষা ও বানান সংস্কারের জন্য একটি কমিটি নিয়োগ করেন। ঐ কমিটির সুপারিশ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক কাউন্সিলে গৃহীত হয়। ড. মুহম্মদ এনামুল হক, অধ্যাপক মুহম্মদ আবদুল হাই এবং অধ্যাপক মুনীর চৌধুরী উক্ত সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ করেন। বিভিন্ন সাংস্কৃতিক গোষ্ঠীও এর বিরোধিতা করে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ঐ সিদ্ধান্ত বাস্তবায়িত হয়নি। উনসত্তরের গণআন্দোলনে তা চাপা পড়ে যায়।

খ. শেখ মুজিবুর রহমানের ৬-দফা আন্দোলন

ছয় দফা আন্দোলনের পটভূমি

স্বাধীন পাকিস্তানের শুরু থেকেই কেন্দ্রকে শক্তিশালী করা হয় এবং প্রদেশের ওপর কেন্দ্রের নিয়ন্ত্রণ জোরদার করা হয়। প্রদেশের গভর্নরের নিয়োগদান করতেন গভর্নর জেনরেল। স্বভাবতই প্রাদেশিক গভর্নর সবসময় গভর্নর জেনরেলের প্রতিনিধি হিসেবে কাজ করতেন। এমনকি প্রাদেশিক মন্ত্রিপরিষদের গঠন, দায়িত্ব বণ্টন ও কার্যকাল বিষয়েও গভর্নরের ওপর গভর্নর জেনরেলের নিয়ন্ত্রণ ছিল। The Pakistan Provincial Constitution (Third Amendment) Order, 1948. এর মাধ্যমে প্রদেশের ওপর কেন্দ্রের নিয়ন্ত্রণ আরো বৃদ্ধি করা হয়। এতে বলা হয় গভর্নর জেনরেল যদি মনে করেন যে, পাকিস্তান কিংবা এর কোনো অংশের শান্তি ও নিরাপত্তা হুমকির সম্মুখীন হয়েছে, কিংবা এমন পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে যাতে প্রাদেশিক সরকার দায়িত্ব পালনে অপারগ, সেক্ষেত্রে গভর্নর জেনারেল উক্ত প্রদেশের সকল ক্ষমতা নিজ হাতে গ্রহণ করতে পারবেন (তবে প্রদেশের হাইকোর্ট এই নিয়ন্ত্রণের বাইরে থাকবে)। ১৯৪৯ সালে PRODA (Public and Representative Offices [Disqualification Act] জারির মাধ্যমে প্রাদেশিক মন্ত্রীদেরকে পরোক্ষভাবে পরাধীন করা হয়। এই আইনে হাইকোর্টের বিচারককে দিয়ে যে কোনো সময় যে কোনো মন্ত্রীর কাজের তদন্ত করা যেত এবং উক্ত তদন্তে কোনো অনিয়ম কিংবা দুর্নীতি চিহ্নিত হলে উক্ত মন্ত্রীকে নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য সকল রকম সরকারি গুরুত্বপূর্ণ পদের জন্য অযোগ্য ঘোষণা করা যেত। এর ফলে

www.Educationblog24.Com

প্রাদেশিক মন্ত্রীগণ সব সময় কেন্দ্রের অনুগত থাকতেন।

প্রদেশের ওপর কেন্দ্রের নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখার আরেকটি মাধ্যম ছিল কেন্দ্রীয় সিভিল সার্ভিসের সদস্যবর্গ। প্রদেশের গুরুত্বপূর্ণ পদে তারা অধিষ্ঠিত ছিলেন। কিন্তু তাদের চাকরি ছিল কেন্দ্রীয় সরকারের নিয়ন্ত্রণে। ফলে তারা প্রাদেশিক সরকারের আদেশ-নিষেধ মানতেন না। ফলে প্রদেশে আমলাতন্ত্র খুব শক্তিশালী হয়ে ওঠে। এই আমলাগোষ্ঠীতে বাংলাদেশের কোনো প্রতিনিধিত্ব ছিল না। এমনকি ১৯৫৪ সালে পূর্ব বাংলা সচিবালয়ে একজন বাঙালি সচিবও ছিলেন না। অবাঙালি সচিবগণ পূর্ববাংলার স্বার্থকে কখনই বিবেচনায় আনতেন না, বাঙালি অফিসারদের সঙ্গেও তারা ভালো ব্যবহার করতেন না, তারা ছিলেন জনবিচ্ছিন্ন।

কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকারের অফিসগুলিতে পূর্ববঙ্গের প্রতিনিধিত্ব ছিল নামমাত্র। পররাষ্ট্র দপ্তর ও কূটনৈতিক অফিসগুলিতে সাতজন সহকারী সেক্রেটারির মধ্যে একজনও পূর্ববঙ্গের লোক নেই। বায়ান্নজন সুপারিনটেনডেন্টের মধ্যে মাত্র তিনজন এবং দুশো ষোলজন সহকারীর মধ্যে মাত্র পঁচিশজন পূর্ববঙ্গের অধিবাসী।

দেশের সামরিক বাহিনীতেও বাঙালিদের প্রতিনিধিত্ব ছিল না বললেই চলে। ১৯৫৬ সালের এক হিসেবে সেনাবাহিনীর বিভিন্ন পদে পূর্ববাংলার প্রতিনিধিত্ব ছিল নিম্নরূপ :

পদ	পশ্চিম পাকিস্তান	পূর্ব পাকিস্তান
জেনারেল	১	০
লে. জেনারেল	৩	০
মেজর জেনারেল	২০	১
ব্রিগেডিয়ার	৩৫	০
কর্নেল	৫০	০
লে. কর্নেল	১৯৮	২
মেজর	৫৯০	১০

সকল বাহিনীর সদর দফতর ছিল পাকিস্তানে।

অর্থনৈতিক দিকেও প্রদেশের ওপর কেন্দ্রের নিয়ন্ত্রণ বৃদ্ধি পায়। যদিও ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনে আয়ের মূল উৎসসমূহ কেন্দ্রের হাতে দেয়া হয়েছিল, তথাপি উক্ত আয় কেন্দ্র ও প্রদেশের মধ্যে বন্টনের একটা বিধি ছিল। স্বাধীনতার পর আয়কর পুরোপুরি কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে যায়। বিক্রয়-কর, যা ইতিপূর্বে প্রদেশের হাতে ছিল তা ১৯৪৮ সালে কেন্দ্রীয় সরকার গ্রহণ করে। ইতিপূর্বে Jute export duty এর কমপক্ষে ৫০% পাট-রফতানিকারী প্রদেশ লাভ করত। কিন্তু স্বাধীনতার অব্যবহিত পরেই ঐ নিয়ম বদলানো হয় এবং প্রদেশ কতভাগ পাবে তা গভর্নর জেনারেলের ইচ্ছের ওপর ছেড়ে দেয়া হয়। এ প্রসঙ্গে পূর্ববাংলার মুখ্যমন্ত্রী নুরুল আমিনও গণপরিষদের

www.Educationblog24.Com

১৯৫১-৫২ সালে বাজেট অধিবেশনে পূর্ববাংলার অর্থনৈতিক করুণ দশার কথা উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, পূর্ববাংলার বাজেট ঘাটতি বছর প্রতি ৪/৫ কোটি টাকার, কিন্তু এই ঘাটতি প্রশাসনিক ব্যর্থতার জন্য ছিল না, এটা ছিল প্রদেশের আয়ের উৎসসমূহ কেন্দ্রের হাতে নিয়ে নেয়ার কারণে।

১৯৪৭-৪৮ থেকে ১৯৫৪-৫৫ সময়ে কেন্দ্রীয় সরকার যেখানে পূর্ব পাকিস্তানে ব্যয় করেছে ৪২ কোটি ৬৬ লক্ষ টাকা, পশ্চিম পাকিস্তানে ব্যয়ের পরিমাণ ৭৯০ কোটি ৪৭ লক্ষ টাকা। এই সময়ে বিদেশ থেকে প্রাপ্ত সাহায্যের পরিমাণ ছিল ৩৯ কোটি ১২ লক্ষ টাকা– এর মধ্যে পূর্ব পাকিস্তানের অংশ ছিল মাত্র ৩ কোটি ৩৭ লক্ষ টাকা। যার ফলে পশ্চিম ও পূর্বের মধ্যে অর্থনৈতিক উন্নয়নে বিশাল বৈষম্যের সৃষ্টি হয়।

পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে বাজেট বরাদ্দের বৈষম্যের আরেকটি নমুনা নিম্নরূপ :

> এবারের (১৯৫১) উদ্ধৃত্ত পাক বাজেটে শিক্ষাখাতে কোনো প্রদেশের জন্য কত ব্যয় বরাদ্দ করা হইয়াছে, তাই দেখা যাক : করাচি ৪০ লক্ষ ১৪ হাজার, মাথাপিছু ৪ টাকা ৩ আনা ৩ পাই; সিন্ধু ১০ লক্ষ, মাথাপিছু ৩ আনা ৬ পাই; সীমান্ত প্রদেশ ১১ লক্ষ, মাথাপিছু ৩ আনা ৩ পাই; সীমান্তপ্রদেশ ১১ লক্ষ, মাথাপিছু ৩ আনা ৩ পাই; পূর্ববঙ্গ ৭১ হাজার, মাথাপিছু ১ পাইয়ের ৩ ভাগের ১ ভাগ।

উপরে উল্লেখিত বিষয়সমূহের সঙ্গে বাংলাভাষার আন্দোলন পূর্ববাংলার মানুষের মনে মুসলিম লীগ ও সরকারের প্রতি ক্ষোভ ও অসন্তুষ্টির সৃষ্টি করে। পূর্ববাংলায় অধিক স্বায়ত্তশাসনের দাবি জোরদার হয়।

১৯৬৫ সালের পাক-ভারত যুদ্ধের সময় পূর্ব পাকিস্তান ছিল সম্পূর্ণ অরক্ষিত। পূর্ব পাকিস্তানের সামরিক ব্যবস্থা যে কতটা দুর্বল ছিল তা এই যুদ্ধের সময় স্পষ্ট হয়ে যায়। যুদ্ধের সতেরো দিন প্রশাসনিক দিক দিয়েও এই প্রদেশ কেন্দ্র থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিল। ফলে পূর্ব পাকিস্তানের স্বায়ত্তশাসনের দাবি, যা দেশভাগের সময় থেকেই উচ্চারিত হচ্ছিল, তা পাক-ভারত যুদ্ধের পর আরো জোরদার হয়। স্বায়ত্তশাসনের দাবি নিয়ে এগিয়ে আসে আওয়ামী লীগ। প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের পর 'কপ' (Combined opposition party,) নিষ্ক্রিয় হয়ে যায়। 'কপ' এর পক্ষ থেকে কিছু বক্তব্য বিবৃতি দেওয়া হয় জাতীয় পরিষদের সভায়। বেশিরভাগ রাজনৈতিক দলগুলোর, যেমন–ন্যাপ, নেজাম ইসলামী, মুসলিম লীগ, জামায়েত ইসলামী প্রভৃতির নেতৃত্বে ছিলেন তখন পশ্চিম পাকিস্তানীরা। এন.ডি.এফ-এর নূরুল আমিন, হামিদুল হক চৌধুরী, আতাউর রহমান খান প্রমুখ নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনে বিশ্বাসী। এমতাবস্থায় আওয়ামী লীগ প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের বিষয়টি রাজনৈতিক ইস্যুতে পরিণত করে।

১৯৬৫ সালের যুদ্ধের পরপরই স্বায়ত্তশাসনের প্রবক্তাদের অন্যতম শেখ মুজিবুর রহমান ঘোষণা করেন যে, পূর্ব পাকিস্তানের জন্য স্বায়ত্তশাসন আদায় অতি আবশ্যক হয়ে পড়েছে। পূর্ব পাকিস্তানকে সর্ববিষয়ে স্বয়ংসম্পূর্ণ করতে হবে। শুধু ঘোষণা দিয়েই শেখ মুজিব ক্ষান্ত হননি, তিনি স্বায়ত্তশাসনের দাবি আদায়ের লক্ষ্যে ছয় দফা কর্মসূচি প্রণয়ন করেন। ১৯৬৬ সালের ৫ ও ৬ ফেব্রুয়ারি লাহোরে অনুষ্ঠিত বিরোধীদলসমূহের

www.Educationblog24.Com

নেতৃবৃন্দের এক কনভেনশনে, যা আইয়ুব খান কর্তৃক তাসখন্দ চুক্তি স্বাক্ষরের বিরোধিতা করার জন্য আয়োজন করা হয়েছিল, সেখানে (৬-৬-১৯৬৬ তারিখে) শেখ মুজিবুর রহমান ঐতিহাসিক ছয় দফা কর্মসূচি উপস্থাপন করেন। উক্ত কনভেনশন মূলত পাকিস্তানের ডানপন্থী দলসমূহ নিয়ে গঠিত ছিল। কনভেনশনে উপস্থিত ৭৪০ জন প্রতিনিধির মধ্যে পূর্ব পাকিস্তান থেকে আগত ছিলেন মাত্র ২১ জন। উক্ত ২১ জনের মধ্যে ছিলেন শেখ মুজিবুর রহমান ও তার দলের অপর ৪ জন নেতা। ন্যাপ এবং এন.ডি.এফ উক্ত কনভেনশনে যোগদান করেনি। এই কনভেনশনে শেখ মুজিবুর রহমান ছয় দফা কর্মসূচি উপস্থাপন করলে উপস্থিত ৭৩৫ জন প্রতিনিধি তা তাৎক্ষণিকভাবে নাকচ করে দেন। এর প্রতিবাদে শেখ মুজিব তার ছোট প্রতিনিধিদল নিয়ে সম্মেলনস্থান ত্যাগ করেন এবং পূর্ব পাকিস্তানে ফিরে আসেন।

শেখ মুজিব ৬ দফা দাবি উপস্থাপন করেন ৬ ফেব্রুয়ারি, ১৯৬৬। ৭ ফেব্রুয়ারি ঢাকার সংবাদপত্রে এ বিষয়ে সংক্ষিপ্ত বিবরণ ছাপা হয়। এই দাবিগুলি সম্পর্কে আওয়ামী লীগের অনেক নেতা অবগত ছিলেন না। বিষয়টি উপস্থাপনের পূর্বে আওয়ামী লীগ ওয়ার্কিং কমিটিতে অনুমোদন নেয়া তো দূরের কথা– কমিটির সামনে তা পেশই করা হয়নি। ফলে অনেক নেতা-কর্মী ক্ষুব্ধ হন, এবং অনেকে হন বিভ্রান্ত। তবে "৬ দফার প্রতি আওয়ামী লীগের তরুণ-নেতৃবৃন্দের পূর্ণ সমর্থন পাওয়া গেলো।" প্রবীণ নেতাদের আপত্তি বা গড়িমসি সত্ত্বেও তরুণ কর্মীরা 'বাঙালির দাবি ৬ দফা', 'বাঁচার দাবি ৬ দফা', '৬ দফার ভিতরেই পূর্ব পাকিস্তানের স্বায়ত্তশাসন নিহিত' ইত্যাদি স্লোগান সংবলিত পোস্টারে পোস্টারে দেয়াল ছেয়ে ফেলেন। কেবল তাই নয়, ওয়ার্কিং কমিটির কোনো সভা অনুষ্ঠানের পূর্বেই ২১ ফেব্রুয়ারি (১৯৬৬) পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের ব্যানারে এবং শেখ মুজিবুর রহমানের নামে "আমাদের বাঁচার দাবি ৬ দফা-কর্মসূচি" শীর্ষক এক পুস্তিকা বিলি করা হয়। উক্ত পুস্তিকায় ৬ দফার দাবিগুলো বিস্তারিত ব্যাখা দেয়া হয়।

ছয় দফার বিবরণ

এক. ঐতিহাসিক লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে শাসনতন্ত্র রচনা করত পাকিস্তানকে একটি সত্যিকার ফেডারেশনরূপে গড়িতে হইবে। তাতে পার্লামেন্টারি পদ্ধতির সরকার থাকিবে। সকল নির্বাচন সার্বজনীন প্রাপ্তবয়স্কের সরাসরি ভোটে অনুষ্ঠিত হইবে। আইনসভাসমূহের সার্বভৌমত্ব থাকিবে।

দুই. ফেডারেশন সরকারের এখতিয়ারে কেবলমাত্র দেশরক্ষা ও পররাষ্ট্রীয় ব্যাপার এই দুটি বিষয় থাকিবে। অবশিষ্ট সমস্ত বিষয় স্টেটসমূহের (বর্তমান ব্যবস্থায় যাকে প্রদেশ বলা হয়) হাতে থাকিবে।

তিন. এই দফায় মুদ্রা সম্পর্কে দুটি বিকল্প প্রস্তাব দেয়া হয়। এর যে কোনো একটি গ্রহণের প্রস্তাব রাখা হয় :

'(ক) পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের জন্য দুইটি সম্পূর্ণ পৃথক অথচ সহজে বিনিয়োগযোগ্য মুদ্রার প্রচলন করিতে হইবে। এই ব্যবস্থা অনুসারে কারেন্সি

www.Educationblog24.Com

কেন্দ্রের হাতে থাকিবে না, আঞ্চলিক সরকারের হাতে থাকিবে। দুই অঞ্চলের জন্য দুইটি স্বতন্ত্র 'স্টেট' ব্যাংক থাকিবে।

(খ) দুই অঞ্চলের জন্য একই কারেন্সি থাকিবে। এ ব্যবস্থায় মুদ্রা কেন্দ্রের হাতে থাকিবে। কিন্তু এ অবস্থায় শাসনতন্ত্রে এমন সুনির্দিষ্ট বিধান থাকিতে হইবে যাতে পূর্ব পাকিস্তানের মুদ্রা পশ্চিম পাকিস্তানে পাচার হইতে না পারে। এই বিধানে পাকিস্তানের একটি ফেডারেল রিজার্ভ ব্যাংক থাকিবে। দুই অঞ্চলে দুইটি পৃথক রিজার্ভ ব্যাংক থাকিবে।

চার. সকল প্রকার ট্যাক্স-খাজনা-কর ধার্য ও আদায়ের ক্ষমতা থাকিবে আঞ্চলিক সরকারের হাতে। ফেডারেল সরকারের সে ক্ষমতা থাকিবে না। আঞ্চলিক সরকারের আদায়ী রেভিনিউ-এর নির্ধারিত অংশ আদায়ের সঙ্গে সঙ্গে ফেডারেল তহবিলে অটোমেটিক্যালি জমা হইয়া যাইবে। এই মর্মে রিজার্ভ ব্যাংকসমূহের উপর বাধ্যতামূলক বিধান শাসনতন্ত্রেই থাকিবে। এইভাবে জমাকৃত টাকাই ফেডারেল সরকারের তহবিল হইবে।

পাঁচ. এই দফায় বৈদেশিক বাণিজ্য ব্যাপারে শাসনতান্ত্রিক বিধানের সুপারিশ করা হয় :

১. দুই অঞ্চলের বৈদেশিক মুদ্রা আয়ের পৃথক পৃথক হিসাব রাখিতে হইবে।

২. পূর্ব পাকিস্তানের অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রা পূর্ব পাকিস্তানের এখতিয়ারে এবং পশ্চিম পাকিস্তানের অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রা পশ্চিম পাকিস্তানের এখতিয়ারে থাকিবে।

৩. ফেডারেশনের প্রয়োজনীয় বিদেশী মুদ্রা দুই অঞ্চল হইতে সমানভাবে অথবা শাসনতন্ত্রে নির্ধারিত হারাহারি মতে আদায় হইবে।

৪. দেশজাত দ্রব্যাদি বিনাশুল্কে উভয় অঞ্চলের মধ্যে আমদানি-রফতানি চলিবে।

৫. ব্যবসা-বাণিজ্য সম্বন্ধে বিদেশের সঙ্গে চুক্তি সম্পাদনের, বিদেশে ট্রেড মিশন স্থাপনের এবং আমদানী-রফতানী করিবার অধিকার আঞ্চলিক সরকারের হাতে ন্যস্ত করিয়া শাসনতান্ত্রিক বিধান করিতে হইবে।'

ছয়. এই দফায় পূর্ব পাকিস্তানে মিলিশিয়া বা প্যারা মিলিটারি রক্ষীবাহিনী গঠনের সুপারিশ করা হয়।

আওয়ামী লীগের সভায় ছয় দফার অনুমোদন

১৩ মার্চ ১৯৬৬ আওয়ামী লীগ ওয়ার্কিং কমিটির সভায় ছয় দফা কর্মসূচি অনুমোদন করা হয়। মওলানা তর্কবাগীশ এবং আরো কিছু প্রবীণ নেতা ছয় দফার বিরোধিতা করেন। ওয়ার্কিং কমিটিতে অনুমোদিত হলেও তা পার্টির কাউন্সিল অধিবেশনে অনুমোদনের জন্য সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। কাউন্সিল অধিবেশন বসে ১৮ ও ১৯ মার্চ ১৯৬৬। পার্টির সভাপতি মওলানা আবদুর রশীদ তর্কবাগীশ ৬ দফার বিরোধিতা করে সভাস্থল ত্যাগ করলে সৈয়দ নজরুল ইসলাম সভার কাজ চালিয়ে যান। এই সভায় ছয় দফা কর্মসূচি অনুমোদিত হয়। তাছাড়া নতুন ওয়ার্কিং কমিটিও গঠিত হয়।

www.Educationblog24.Com

ছয়দফা সম্পর্কে মুজিবের ব্যাখা

লাহোর থেকে ঢাকায় ফিরে ১১-২-৬৬ তারিখে আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে শেখ মুজিব তাঁর দলের ছয় দফা কর্মসূচি ব্যাখা করেন। তিনি বলেন যে, পাক ভারত যুদ্ধের পর এটা পরিষ্কার হয়েছে পাকিস্তানের সংহতি ও অখন্ডতা রক্ষা করতে হলে লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে এর উভয় অংশকে পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন দিতে হবে এবং পূর্ব পাকিস্তানকে সকল বিষয়ে স্বয়ংসম্পূর্ণ করতে হবে। একটি রাষ্ট্রের কেন্দ্রকে শক্তিশালী করলেই যে রাষ্ট্রটি শক্তিশালী হবে– এমনটি ঠিক নয়। বরং একটি যুক্তরাষ্ট্রের সকল ফেডারেটিং ইউনিটগুলোকে শক্তিশালী করতে পারলেই উক্ত রাষ্ট্রটি শক্তিশালী হবে। সুতরাং পাকিস্তানকে শক্তিশালী রাষ্ট্রে পরিণত করতে হলে এবং এর উভয় অংশের মধ্যে সংহতি বৃদ্ধি করতে হলে ছয় দফা কর্মসূচি বাস্তবায়িত করতে হবে।

স্বায়ত্তশাসন সম্পর্কে অন্য দলের নেতাদের মনোভাব

আওয়ামী লীগ যে সময় ছয় দফা কর্মসূচি ঘোষণা করে সে সময় পূর্ব পাকিস্তানের কিছু দল ও নেতাও সংসদীয় গণতন্ত্র কিংবা প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের দাবি করছিলেন। যদিও এসব দল কিংবা নেতা শেখ মুজিব-বিরোধী ছিলেন কিন্তু শেখ মুজিবের স্বায়ত্তশাসনের দাবিকে তারা উপেক্ষা করতে পারেননি।

জাতীয় পরিষদের বিরোধীদলীয় নেতা নূরুল আমিন, যিনি এক সময় পূর্ব পাকিস্তানের মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন এবং যার মুখ্যমন্ত্রিত্বের আমলে পূর্ব পাকিস্তানে ভাষা আন্দোলন সংঘটিত হয় সেই নূরুল আমিনও বলতে শুরু করেন যে, দেশের অখন্ডতা ও সংহতি নির্ভর করে ১৯৫৬ সালের সংবিধানের আলোকে সংসদীয় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা ও আঞ্চলিক বৈষম্য দূর করার মাধ্যমে। তিনি মন্তব্য করেন যে আইয়ুব খানের প্রেসিডেন্ট-শাসিত সরকার দিয়ে দেশের ঐক্য বজায় রাখা সম্ভব নয়।

পূর্ব পাকিস্তানের আরেক প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী আতাউর রহমান খান বলেন যে, ভৌগোলিক অবস্থানের কারণে পাকিস্তানের ঐক্য ও সংহতি বজায় রাখার একমাত্র উপায় হল দেশে সংসদীয় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা, প্রাপ্তবয়স্কদের প্রত্যক্ষ ভোটে জনপ্রতিনিধি নির্বাচনের ব্যবস্থা করা এবং প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন প্রদান করা। তার মতে প্রতিরক্ষা, বৈদেশিক বিষয় ও মুদ্রা কেন্দ্রের হাতে রেখে বাকি ক্ষমতা প্রদেশসমূহকে প্রদান করতে হবে।

তৎকালীন পাকিস্তান জাতীয় পরিষদের ডেপুটি নেতা (১৯৬৫-৬৯) শাহ আজিজুর রহমান ১৯৬৫-৬৬ সালের জাতীয় বাজেট বক্তৃতায় বলেন যে, আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন প্রদান ও দুই প্রদেশের মধ্যে অর্থনৈতিক বৈষম্য দূর করার মাধ্যমেই পাকিস্তানকে শক্তিশালী করা সম্ভব।

উপরের আলোচনা থেকে লক্ষ্য করা যায় যে, পূর্ব পাকিস্তানে স্বায়ত্তশাসনের দাবিটি একটি সার্বজনীন দাবিতে পরিণত হয়। কিন্তু এই দাবিকে সাংগঠনিকস্বরূপ দেয়া ও দাবি বাস্তবায়নের জন্য একটি গণআন্দোলনের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন শেখ মুজিবুর রহমান ও তাঁর দল আওয়ামী লীগ।

www.Educationblog24.Com

ছয়দফার প্রচারণা

শেখ মুজিবুর রহমান ও আওয়ামী লীগের অন্যান্য নেতৃবৃন্দ সারাদেশ জুড়ে ছয়দফার প্রচার শুরু করেন। ছয়দফা অচিরেই জনপ্রিয় হয়ে উঠল। এতে করে আইয়ুব-মোনেম চক্র আতঙ্কিত হয়ে পড়ে। শুরু হয় জেল-জুলুম। শেখ মুজিব যেখানেই জনসভা করতে যান সেখানেই তাকে গ্রেফতার করা হয়। একটা মামলা দায়ের করা হয়, আবার জামিনও দেয়া হয়। ৬ দফার প্রচারণার এক পর্যায়ে ৮ মে ১৯৬৬ শেখ মুজিব দেশরক্ষা আইনে গ্রেফতার হন। এই গ্রেফতারের পূর্বে ২০ মার্চ থেকে ৮ মে পর্যন্ত ৫০ দিনে তিনি ৩২টি জনসভায় ভাষণ দেন। এই সময়সীমার মধ্যে সমগ্র পূর্ব পাকিস্তানে তিনি ৬ দফার পক্ষে যে অভাবনীয় জনমত সৃষ্টি করেন, তা সত্যিই এক অকল্পনীয় ব্যাপার।

শেখ মুজিবই নন, ১০ মে ১৯৬৬ সালের মধ্যে দলের প্রায় ৩৫০০ নেতা-কর্মী গ্রেফতার হন। কিন্তু শেখ মুজিব তার আগেই সব কিছু গুছিয়ে এনেছিলেন। তাঁর অনুপস্থিতিতে কর্মী বাহিনী যাতে কাজ চালিয়ে যেতে পারে সেভাবেই গড়ে তুলেছিলেন তাঁর সংগঠনকে। ইতোমধ্যে ছাত্রলীগও ছয়দফার প্রচারণায় জড়িয়ে পড়ে। সে-সময় আবদুর রাজ্জাক ছিলেন ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক। ছাত্র ইউনিয়নের সহায়তায় আবদুর রাজ্জাকাক ৬ দফার ৫০,০০০ হাজার লিফলেট ছাপিয়ে জনগণের মধ্যে বিলি করেছিলেন। ন্যাপের যে-অংশ ৬ দফার সমর্থক ছিলেন তারা সংবাদ থেকে ৬ দফার লিফলেট ছাপিয়ে দিতেন।

শেখ মুজিবের গ্রেফতারের প্রতিবাদে আওয়ামী লীগ ও ছাত্রলীগ ৭ জুন ১৯৬৬ গোটা প্রদেশ জুড়ে সাধারণ ধর্মঘটের ডাক দেয়। দেশের শ্রমিকশ্রেণী প্রথমবারের মতো একটি রাজনৈতিক আন্দোলনে অংশগ্রহণ করে। এতদিন শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে আওয়ামী লীগের তেমন জনপ্রিয়তা ছিল না। কিন্তু ৭ জুনের হরতালে ঢাকা ও নারায়ণগঞ্জের শ্রমিকরা জড়িয়ে পড়ে।

হরতালের খবর সংবাদপত্রে ছাপানো নিষিদ্ধ ছিল, তাই ৭ জুনের হরতালের বিবরণ কোনো সংবাদপত্রে পাওয়া যায় না। আবু আল সাঈদ তাঁর গ্রন্থে কোনো রেফারেন্স ছাড়াই ৭ জুনের নিম্নলিখিত বিবরণ দিয়েছেন :

১৯৬৬ সালের ৭ জুন সকাল থেকেই হরতাল শুরু হল ঢাকা ও নারায়ণগঞ্জ শহরে। সকাল নয়টার দিকে তেজগাঁও শ্রমিক এলাকায় প্রচ বিক্ষোভ মিছিল শুরু হয়। পুলিশ শ্রমিকদের উপর গুলি চালালে বেঙ্গল বেভারেজে চাকরিরত সিলেটের অধিবাসী মনু মিয়া ঘটনাস্থলেই মারা যায়। মনু মিয়ার মৃত্যুর খবর ছড়িয়ে পড়ার সাথে সাথে প্রচণ্ড বিক্ষোভে ফেটে পড়ে শ্রমিক সমাজ। তাদের সাথে যোগ দেয় ছাত্র জনতা। তারা তেজগাঁয় সকল ট্রেন থামিয়ে দেয়। তেজগাঁ স্টেশনের কাছে নোয়াখালীর শ্রমিক আবুল হোসেন (আজাদ এনামেল এ্যান্ড এ্যালুমিনিয়াম কারখানা) ই.পি.আর.-এর রাইফেলের সামনে বুক পেতে দেন। ইপিআর বাহিনী তাঁর বুকেও গুলি চালায়। অল্প সময়ের মধ্যে সমস্ত এলাকায় শ্রমিক এবং আওয়ামী লীগ-ছাত্রলীগের কর্মীরা ঢাকা শহর উত্তাল করে তোলে। নারায়ণগঞ্জ রেলওয়ে স্টেশনের কাছে পুলিশের গুলিতে ৬ জন শ্রমিক মৃত্যুবরণ করেন ঘটনাস্থলেই। ফলে বিক্ষোভ-প্রতিবাদে সর্বস্তরের শত শত মানুষ রাজপথে নেমে আসে। পুলিশের উস্কানির মুখে জনগণ থানার মধ্যে ঢুকে যায় এবং যাদের

www.Educationblog24.com

www.Educationblog24.Com

গ্রেফতার করা হয়েছিল তাদের ছিনিয়ে নিয়ে আসে। সন্ধ্যার পরপরই ঢাকার শ্রমিক এলাকাগুলোতে কারফিউ জারি করা হয়। গ্রেফতারের সংখ্যাও সন্ধ্যার মধ্যে দেড় হাজার ছাড়িয়ে যায়।

৮ জুনের সংবাদপত্রে কেবল সরকারি প্রেসনোট ছাপা হয়। পাকিস্তান অবজারভার চতুরতার সঙ্গে উক্ত প্রেসনোট ছাপে। অবজারভার নিম্নলিখিত মন্তব্যসহ প্রেসনোটটি পত্রিকায় ছাপে :

"We are not publishing our staff. correspondents' reports on the incidents owing to some unavoidable circumstances-'Editor'

উক্ত প্রেসনোটে ৭ জুনের হরতালের দিন পুলিশের গুলিতে ১০ জন নিহত হয়েছে বলে উল্লেখ করা হয়। প্রেসনোটে যদিও ঘটনার সত্য বিবরণ কম থাকে, তথাপি ৭ জুনের হরতাল বিষয়ে দেয়া সরকারি প্রেসনোটটি থেকে হরতালে জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত সমর্থনের চিত্র পাওয়া যায়। প্রেসনোটটি নিম্নরূপ :

ঢাকা ও নারায়ণগঞ্জে পুলিশের গুলিতে ১০ জন নিহত

(সরকারি প্রেসনোট)

ঢাকা ৭ই জুন, আওয়ামী লীগ কর্তৃক আহূত হরতাল ৭-৬-১৯৬৬ তারিখে অতি প্রত্যুষ হইতে পথচারী ও যানবাহনের ব্যাপক বাধা সৃষ্টির মাধ্যমে সংগঠিত করা হয়। ঢাকা ও নারায়ণগঞ্জে বিভিন্ন এলাকায় ছোকরা ও গুণ্ডাদের লেলিয়ে দেয়া হয়। ইপিআরটিসি বাসগুলিতে ইট-পাটকেল ছোঁড়া হয় এবং টায়ারের পাম্প ছেড়ে দিয়ে সর্বপ্রকার যানবাহনের অচলাবস্থা সৃষ্টি করা হয়। নিরীহ জনসাধারণ ও অফিস যাত্রীদের অপমান ও হয়রানি করা হয়। হাইকোর্টের সম্মুখে তিনটি গাড়ি পোড়াইয়া দেওয়া হয়। পুলিশ কার্জন হল, বাহাদুর শাহ পার্ক ও কাওরান বাজারের নিকট গুণ্ডাদের বাধা দান করে এবং টিয়ার গ্যাস ব্যবহার করিয়া তাহাদেরকে ছত্রভঙ্গ করিয়া দেয়।

তেজগাঁও দুই-ডাউন চট্টগ্রাম মেইল তেজগাঁও রেলস্টেশনের আউটার সিগন্যালে আটক করিয়া লাইনচ্যুত করা হয়। ট্রেনখানা প্রহরা দানের জন্য একদল পুলিশ দ্রুত তথায় গমন করে। জনতা তাদের ঘিরিয়া ফেলে এবং তুমুলভাবে ইট-পাটকেল নিক্ষেপ করে, ফলে বহু পুলিশ কর্মচারী আহত হয়। যখন পুলিশ জনতার কবলে পড়িয়া যাবার উপক্রম হয় তখন আত্মরক্ষার জন্য তাহারা গুলিবর্ষণ করে। ফলে ৪ ব্যক্তির মৃত্যু হয়।

নারায়ণগঞ্জের এক উচ্ছৃঙ্খল জনতা সকাল ৬-৩০ মিনিটের সময় গলাচিপা রেলওয়ে ক্রসিং-এর নিকট ঢাকাগামী ট্রেন আটক করে। পরে জনতা নারায়ণগঞ্জগামী ৩৪নং ডাউন ট্রেন আটকাইয়া উহার বিপুল ক্ষতিসাধন ও ড্রাইভারকে প্রহার করে। জনতা জোর করিয়া যাত্রীদের নামাইয়া দেয়। যাত্রীদের উদ্ধারের জন্য আগত একটি পুলিশ দল আক্রান্ত এবং বহুসংখ্যক পুলিশ-কর্মচারী আহত হয়। পুলিশ দল লাঠিচার্জের সাহায্যে জনতা ছত্রভঙ্গ করিয়া দেয়। অতঃপর বন্দুকসহ মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত জনতা নারায়ণগঞ্জ থানা আক্রমণ করিয়া দারুণ ক্ষতিসাধন এবং বন্দুকের গুলিতে পুলিশ অফিসারদের জখম করে। উচ্ছৃঙ্খল জনতা থানা ভবনে প্রবেশ করার পর পুলিশ আত্মরক্ষার্থে গুলিবর্ষণ করার ফলে ৬ ব্যক্তি নিহত হয় ও আরও ১৩ ব্যক্তি আহত হয়

www.Educationblog24.com

www.Educationblog24.Com

৪৫ জন পুলিশ আহত হন এবং তাহাদের মধ্যে কয়েকজনের আঘাত গুরুতর। ...টঙ্গীতে বিভিন্ন মিলের শ্রমিকরা ধর্মঘট পালন করে এবং একটি মিছিল বের করে।...ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একশ্রেণীর ছাত্র পিকেটিং করে এবং সেখানে আংশিক ধর্মঘট পালিত হয়।

দুপুরে আদমজী, সিদ্ধিরগঞ্জ ও ডেমরা এলাকার শ্রমিকগণ ১৪৪ ধারা লঙ্ঘন করিয়া শোভাযাত্রা সহকারে ঢাকা অভিমুখে অগ্রসর হইতে থাকে। ঢাকা নগরীর দুই মাইল দূরে ই.পি.আর বাহিনীর একটি দল শোভাযাত্রার গতিরোধ করে। অপরাহ্নে এক জনতা গেণ্ডারিয়ার নিকট একখানি ট্রেন আটক করে। চট্টগ্রামগামী গ্রীন-এ্যারো ও ঢাকা অভিমুখী ৩৩-আপ ট্রেনখানিকে অপরাহ্নের দিকে তেজগাঁও স্টেশনে আটক করা হয়। ....সন্ধ্যার পর একটি উচ্ছৃঙ্খল জনতা কালেক্টরেট ও পরে স্টেট ব্যাংক আক্রমণ করে। রক্ষীগণ জনতাকে ছত্রভঙ্গ করার জন্য গুলিবর্ষণ করে।

বেলা ১১টায় ৫ বা ততোধিক ব্যক্তির একত্র সমাবেশ ও শোভাযাত্রা নিষিদ্ধ করিয়া ১৪৪ ধারা জারি করা হয়। শহরের অন্যান্য স্থানে পরিস্থিতি শান্ত ও স্বাভাবিক ছিল।

সূত্র : *স্বাধীনতার দলিলপত্র*, ২য় খন্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭০।

৭ জুনের পরবর্তী ঘটনাবলি

৭ জুনের হরতালের সময় পুলিশের গুলিবর্ষণের প্রতিবাদে ৮ জুন ন্যাপ-দলীয় নেতৃবৃন্দ যৌথভাবে এক প্রচারপত্র প্রচার করেন (ইস্ট পাকিস্তান প্রেস, ২৬৩ বংশাল রোড, ঢাকা থেকে)। দীর্ঘ এই প্রচারপত্রে নেতৃবৃন্দের ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ ঘটে। এখানে অংশবিশেষ উল্লেখিত হল।

জালিমশাহীর গুলিতে আবার জনতার রক্ত ঝরিয়াছে। গত ৭ জুন ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ তেজগাঁয় পুলিশের গুলিতে এদেশের শান্তিকামী মানুষকে আবার জীবন বিসর্জন দিতে হইয়াছে। সরকারি হিসাবমতেই গুলিবর্ষণে নিহতদের সংখ্যা এগারো জন।

অগণিত মানুষ আহত হইয়াছেন। দেড় হাজার ব্যক্তিকে কারাগারে নিক্ষেপ করা হইয়াছে। ঢাকাসহ প্রদেশের বিভিন্ন স্থানে ১৪৪ ধারা জারি করা হইয়াছে। জনতাকে শায়েস্তা করার উদ্দেশ্যে সামরিক ট্রায়ালের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। দমননীতির প্রয়োগে দেশব্যাপী ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করা হইয়াছে।

রাজবন্দিদের মুক্তি ও পূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের দাবিতে আওয়ামী লীগের আহ্বানে গত ৭ই জুন তারিখে প্রদেশের বিভিন্ন স্থানে শান্তিপূর্ণ হরতাল পালিত হয়। হরতালের সাফল্য শাসকচক্রকে হতচকিত করিয়া তোলে এবং ইহাকে বানচাল করার জন্য সরকার নিরস্ত্র জনসাধারণের উপর পুলিশ বাহিনী লেলাইয়া দেয় ও পুলিশ নির্বিচারে গুলিবর্ষণ করে। রুটি, রুজি ও গণতান্ত্রিক অধিকারের জন্য সংগ্রামরত জনতার উপর গুলিবর্ষণ ইহাই প্রথম নয়। ১৯৪৮ সালে চট্টগ্রামের মাদ্রাসায় কৃষকদের উপর; ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি ও ১৯৬২ সালের ১৭ই সেপ্টেম্বর ঢাকায় ছাত্রদের উপর; টংগী, খুলনা ও চট্টগ্রামে কালুরঘাট শ্রমিকদের উপর; সুশং, সানেশ্বর, নাচোল, মাগুরা ও বালিশিয়ার কৃষকদের উপর এবং ১৯৫০ সালের ২৪ এপ্রিল রাজশাহী জেলের

www.Educationblog24.Com

অভ্যন্তরে দেশপ্রেমিক রাজবন্দীদের উপর গুলি চালাইয়া ইতোপূর্বে শত শত ব্যক্তিকে হত্যা করা হইয়াছে।

পেশোয়ারের চারসাদ্দার জনসভার উপর গুলিবর্ষণ এবং বেলুচিস্তানের ঈদের জামাতে বোমা বর্ষণ করা হইয়াছে। পাঞ্জাব ও করাচীতে ছাত্র হত্যা করা হইয়াছে। বেলুচিস্তান ও সরহাদের ন্যাপ-নেতৃবৃন্দকে ফাঁসিকাষ্ঠে ঝুলানো হইয়াছে।

৭ই জুনের দমননীতি এই নির্মম দমননীতিরই অন্যতম বীভৎস নজির। গত ১৯ বৎসর যাবত পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠীর চরিত্রের স্বরূপ সাময়িক ব্যতিক্রম বাদে মোটামুটি একইরূপ হইলেও নৃশংসতায় বর্তমান সরকার তার পূর্বসূরীদের অনেক পিছনে ফেলিয়া আসিয়াছে। গদি রক্ষার তাগিদে ঈদের জামাত অথবা রাজপথের শান্তি পুর্ণ জনতার উপর পাশবিক হত্যালীলা চালাইতেও এই সরকার বিন্দুমাত্র দ্বিধা করে নাই।...

সূত্র : *স্বাধীনতার দলিলপত্র*, ২য় খন্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭১।

৮ জুন পাকিস্তান জাতীয় পরিষদের অধিবেশনে বিরোধীদল কর্তৃক উত্থাপিত পূর্ব পাকিস্তানে পুলিশের গুলিবর্ষণ সংক্রান্ত তিনটি মুলতবি প্রস্তাব স্পিকার বাতিল করেন। প্রতিবাদে বিরোধীদলীয় সদস্যগণ পরিষদকক্ষ বর্জন করেন। একই দিন প্রাদেশিক পরিষদের অধিবেশনেও মুলতবি প্রস্তাব প্রত্যাখ্যাত হলে বিরোধীদলীয় ও স্বতন্ত্র সদস্যগণ পরিষদকক্ষ বর্জন করেন।

৭ জুন পুলিশের গুলিবর্ষণের প্রতিবাদে ৮ জুন সংবাদ প্রকাশ করা হয়নি। ৯ জুনের সংবাদে এ প্রসঙ্গে নিম্নলিখিত ব্যাখা দেয়া হয় :

যে মর্মান্তিক বেদনাকে ভাষা দেয়া যায় না সেখানে নীরবতাই একমাত্র ভাষা। তাই গতকল্য 'সংবাদ' প্রকাশিত হইতে পারে নাই। আমাদের এই নীরব প্রতিবাদ একক হইলেও ইহাতে আমাদের পাঠকরাও শরিক হইলেন, ইহা আমরা ধরিয়া লইতেছি।

সরকারি দমন নীতি

৭ জুনের ঘটনার পর সরকার প্রতিহিংসাপরায়ণ হয়ে ওঠে। ১৯৬৬ সালের ১৩ জুনের মধ্যে আওয়ামী লীগের দ্বিতীয় স্তরের নেতারাও গ্রেফতার হয়ে গেলেন। ১৫ জুন 'ইত্তেফাক'-এর সম্পাদক তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়াকে গ্রেফতার করা হল। ১৬ জুন 'ইত্তেফাক' নিষিদ্ধ ঘোষণা করে নিউ নেশন প্রিন্টিং প্রেস বাজেয়াপ্ত করা হল। আওয়ামী লীগ কর্মী গ্রেফতার করা অব্যাহত থাকে। ১৯৬৬ সালের সেপ্টেম্বর মাসেই ৯,৩৩০ জন আওয়ামী লীগ কর্মীকে গ্রেফতার করা হয়।

ছয় দফার গুরুত্ব ও তাৎপর্য

পাকিস্তান আমলে বাঙালির স্বায়ত্তশাসন আন্দোলন চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছে ঐতিহাসিক ছয়দফা কর্মসূচি ঘোষণার মাধ্যমে। ছয়দফার মধ্য দিয়ে বাঙালির স্বাধিকার অর্জনের পর্যায় শুরু হয়। ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান সৃষ্টির পর থেকে কেন্দ্রীয় সরকার সর্বক্ষেত্রে পূর্ব পাকিস্তানীদের প্রতি যে চরম বৈষম্যমূলক আচরণ করে তার বিরুদ্ধে বলিষ্ঠ প্রতিবাদ উচ্চারিত হয ছয় দফা দাবি ঘোষণার মাধ্যমে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ছয়দফা দাবিকে 'বাঙালির বাঁচার দাবি' হিসেবে উল্লেখ করেছেন। ছয়দফা দাবির মাধ্যমে পূর্ব পাকিস্তানের নিজস্ব অর্থনৈতিক সম্পদ, আভ্যন্তরীণ রাজস্ব আয় ও

www.Educationblog24.Com

বৈদেশিক আয়ের উপর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ দাবি করা হয়। সর্বোপরি পূর্ব পাকিস্তানের জন্য নিজস্ব প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলার ক্ষমতাও দাবী করা হয়। ১৯৬৬ সালে ঘোষিত ছয় দফা দাবির সঙ্গে ১৯৪৭-৬৫ সময়ে ঘোষিত দাবির মধ্যে পার্থক্য এই যে, পূর্বে যেখানে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে পূর্ব পাকিস্তানের জন্য অধিকার সুযোগ-সুবিধাদানের দাবি জানান হয়, ছয় দফায় সেক্ষেত্রে পূর্ব পাকিস্তানের যেন নিজে নিজেই আর্থিক স্বাবলম্বিতা অর্জন করতে পারে কেন্দ্রের কাছে সে অধিকার চাওয়া হয়। অর্থাৎ ছয়দফা দাবির মাধ্যমে পূর্ব পাকিস্তানকে স্বাবলম্বী হওয়ার আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করা হয়।

ছয়দফা দাবিকে বাঙালির 'মুক্তিসনদ' বলা হয়। ছয়দফা আন্দোলনের মাধ্যমে কেন্দ্রীয় শাসক গোষ্ঠীর শোষণ ও অবিচারের বিরুদ্ধে বাঙালি ঐক্যবদ্ধ হয়। ইতোপূর্বে ভাষার দাবিতে ভাষা আন্দোলন, ছাত্রদের দাবি ভিত্তিক শিক্ষা আন্দোলন হলেও ছয়দফার আন্দোলন ছিল সর্বস্তর ও পেশার মানুষের অর্থনৈতিক মুক্তির আন্দোলন। পূর্বের আন্দোলনগুলির ছাত্ররাই মুখ্য ভূমিকা পালন করে। কিন্তু ছয়দফার আন্দোলন ছিল বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ পরিচালিত সুসংগঠিত আন্দোলন। এ আন্দোলনে মুখ্যভূমিকা পালন করে ছাত্রলীগ, ছাত্র ইউনিয়ন ও শ্রমিক সংগঠনসমূহ। বঙ্গবন্ধু স্বয়ং সারাদেশে জনসভা করে এ আন্দোলনকে প্রদেশব্যাপী ছড়িয়ে দেন। এ আন্দোলনের মাধ্যমে বঙ্গবন্ধু জাতীয় নেতার পরিণত হন। আওয়ামী লীগের জনপ্রিয়তাও বৃদ্ধি পায়। পাকিস্তান সরকার আওয়ামী লীগ নেতা কর্মীদেরকে ধরপাকড় ও জেল-জুলুমের মাধ্যমে সাময়িকভাবে আন্দোলনকে স্তিমিত করতে পারলেও ছয়দফা দাবিগুলোকে বাঙালির মন থেকে মুছে ফেলতে পারেনি। এর প্রমাণ হচ্ছে ১৯৬৯ সালের গণআন্দোলনের সময় ছাত্রদের যে এগারদফা দাবি ঘোষিত হয় তার মধ্যে ছয়দফার মূল বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত করা হয়। ১৯৭০ এর সাধারণ নির্বাচনের সময় আওয়ামী লীগের নির্বাচনী ইশতেহারে ছয়দফাকে দাবিসমূহে সন্নিবেশিত করা হয়। ছয়দফা এতোটাই জনসমর্থন লাভ করেছিল যে, বঙ্গবন্ধু ছয়দফাকেই নির্বাচনী ম্যান্ডেট হিসেবে ঘোষণা করেন। ছয়দফা ও এগার দফার আন্দোলনের সময় বাঙালির মধ্য যে সচেতনতা ও ঐক্য গড়ে ওঠে তার ফল পাওয়া যায় সত্তরের নির্বাচনে। নির্বাচনী প্রচারণায় বলা হয় যে, পাকিস্তানের দুই অংশের মধ্যে সৃষ্ট বৈষম্য দূর করা সম্ভব ছয়দফার বাস্তবায়নের মাধ্যমে। পূর্ব পাকিস্তানবাসী তা বিশ্বাস করে এবং নির্বাচনে আওয়ামী লীগকে ভোট দিয়ে জয়ী করে। আর ছয়দফার বিরোধীদের অপমানজনক পরাজয় ঘটে।

নির্বাচনের মাধ্যমে ছয়দফা কর্মসূচির প্রতি জনগণের রায় পাওয়ার পর বঙ্গবন্ধুর পক্ষে তা আর অগ্রাহ্য করার উপায় ছিল না। কিন্তু নির্বাচনে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পাওয়া সত্ত্বেও তাঁকে শাসন ক্ষমতা দেওয়া হয়নি। ফলে বাঙালির স্বাধিকার আন্দোলন স্বাধীনতার আন্দোলনে পরিণত হয়। সেকারণে বলা যেতে পারে যে, ছয়দফা আন্দোলনে স্বাধীনতার বীজ নিহিত ছিল।

২. আগরতলা মামলা

বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসে আগরতলা মামলাটি একটি মাইলফলক। পাকস্তিান সরকার ১৯৬৮ সালের ৬ জানুয়ারি ঘোষণা করে, পাকিস্তানকে বিচ্ছিন্ন করার

www.Educationblog24.Com

জন্য একটি ষড়যন্ত্র উদঘাটিত হয়েছে। এর সঙ্গে জড়িত থাকার অভিযোগে দুইজন আওয়ামী লীগ নেতা, সিভিল সার্ভিসের দুইজন কর্মকর্তাসহ ২৮ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। ১৮ জানুয়ারি ঘোষণা করা হয়, শেখ মুজিবুর রহমান এর সঙ্গে জড়িত এবং তাঁকে এক নম্বর আসামি করে মামলা দায়ের করা হয়। এর জন্য একটি স্পেশাল ট্রাইব্যুনাল গঠিত হয়। এই মামলার সরকারি নাম 'রাষ্ট্র বনাম শেখ মুজিবুর রহমান ও অন্যান্য'। লোকমুখে এই মামলা পরিচিতি লাভ করে 'আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা' হিসেবে। বঙ্গবন্ধু এই মামলার নামকরণ করেছিলেন 'ইসলামাবাদ ষড়যন্ত্র মামলা' নামে। প্রকৃতপক্ষে বাংলাদেশের মুক্তির জন্য ছিল এই প্রচেষ্টা, তাই এটি ষড়যন্ত্র হতে পারে না। সে জন্যই একে উল্লেখ করা হয়েছে শুধু আগরতলা মামলা নামে।

এই মামলায় অভিযোগ করা হয়েছিল– পাকিস্তান সেনাবাহিনীর কতিপয় সেনা অফিসারের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করে শেখ মুজিব ভারতের সহযোগিতায় সশস্ত্র উপায়ে পূর্ব পাকিস্তানকে বিচ্ছিন্ন করতে চেয়েছিলেন। এ জন্য ১৯৬২ সালে তিনি গোপনে ত্রিপুরার রাজধানী আগরতলা যান। ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী শচীন্দ্রলাল সিংহের সঙ্গে দেখা করেন এবং তাঁর মাধ্যমে ভারতের প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহেরুর সঙ্গেও যোগাযোগ হয়। সশস্ত্রবাহিনীর মধ্যে লে. কমান্ডার মোয়াজ্জেম হোসেনের ভূমিকা ছিল বেশি।

এখন এটি প্রমাণিত যে, এই মামলার ভিত্তি ছিল। তবে বিভিন্ন তথ্য দেখে, স্মৃতিচারণ পড়ে মনে হয়, পাকিস্তান সরকার বা কুশীলবরা যেভাবে বিষয়টি সাজিয়েছিল আসলে সেটি তেমন কিছু ছিল না। তবে, অভিযুক্তরা দেশকে মুক্ত করার জন্য ভেবেছিলেন, একটি পরিকল্পনা করেছিলেন, জীবনের ঝুঁকি নিয়েছিলেন। তাঁরা অবশ্যই জাতীয় বীর।

আগরতলা মামলায় অভিযুক্ত তৎকালীন ক্যাপ্টেন শওকত আলীর স্মৃতিকাহিনী পড়ে এ ধারণা হয় যে, তিনটি বিষয়কে একত্রিত করে পাকিস্তান সরকার মামলা সাজিয়েছিল। লে. কমান্ডার মোয়াজ্জেম হোসেন প্রধানত নৌ সদস্যদের নিয়ে আলোচনা করছিলেন ১৯৬২-৬৩ থেকে এবং অধিকাংশই ছিলেন নিম্ন পর্যায়ের অফিসার। ক্যাপ্টেন শওকতরা প্রধানত একই উদ্দেশ্যে আলাপ করছিলেন মূল বাহিনীর অফিসারদের সঙ্গে। সিভিল সার্ভিসের রুহুল কুদ্দুস, আহমেদ ফজলুর রহমান ও খান শামসুর রহমান অন্যান্যরা নিজেদের মধ্যে এ নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করছিলেন এবং শেখ মুজিবের সঙ্গেও হয়তো তাঁদের আলাপ হয়েছিল; কারণ এরা সবাই ছিলেন বাঙালি প্রেমী। কিন্তু ঐক্যবদ্ধ কোনো পরিকল্পনা তাঁরা নিতে পারেননি। শওকত আলীদের কাছে মনে হয়েছে মোয়াজ্জেম হোসেন তাড়াহুড়া করছেন এবং গোপনীয়তা সম্পর্কেও তিনি সজাগ নন। ফলে সেনা সদস্যরা ধরা পড়েন। বঙ্গবন্ধু এই প্রয়াসের সঙ্গে হয়তো সরাসরি যুক্ত ছিলেন না। প্রশ্রয় হয়তো ছিল। কিন্তু তিনি যে মুক্তির প্রচেষ্টায় আগরতলা গিয়েছিলেন তা তো সত্য; স্বাধীনতার কথা ভেবেছেন তাও তো সত্য। গোয়েন্দা দফতর তা জানত। পাকিস্তান সরকার তাঁকে হেনস্থা করার জন্য এ মামলা করেছিল। ধর্মভিত্তিক রাষ্ট্র পাকিস্তানে তারা প্রচার করতে চেয়েছিল– শেখ মুজিব ভারত বা হিন্দুদের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করে পাকিস্তান

www.Educationblog24.Com

ভাঙতে চাচ্ছেন।

এই মামলার ফল হয়েছিল উল্টো। বাঙালির মনে এই ধারণা হল যে শেখ মুজিব যেহেতু বাঙালির মুক্তিসনদ ছয়দফা আদায় করার জন্য লড়ছেন সে কারণেই তাঁকে ফাঁসানো হয়েছে। আর বঙ্গবন্ধু তো ১৯৬৬ সাল থেকে জেলে। এই সময় আইয়ুব খান-বিরোধী আন্দোলন দানা বাঁধছিল। এখন বঙ্গবন্ধুর মুক্তি ও আগরতলা মামলা প্রত্যাহারের দাবি প্রধান হয়ে উঠল। আওয়ামী লীগ, ন্যাপসহ কয়েকটি রাজনৈতিক দল মিলে গঠন করে 'ড্যাক'।

ইতোমধ্যে মামলার শুনানি শুরু হলে পত্রিকাগুলি ফলাও করে প্রচার করতে থাকে অভিযুক্তদের প্রতি কী অত্যাচার করা হচ্ছে। ফলে বঙ্গবন্ধুর মুক্তি ও আগরতলা মামলা প্রত্যাহারের দাবি জোরদার হতে থাকে। পাকিস্তান সরকারও আন্দোলন দমনে গুলির পথ বেছে নেয়। ইতোমধ্যে ছাত্রসহ কয়েকজন নিহত হয়েছেন। পুলিশের নিপীড়নে আহত হয়েছেন অনেকে। এরই মধ্যে ১৯৬৯ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারি আগরতলা মামলার অন্যতম আসামি সার্জেন্ট জহুরুল হক ও সার্জেন্ট মোহাম্মদ ফজলুল হককে গুলি করে হত্যার চেষ্টা হয়। হাসপাতালে জহুরুল হক মারা গেলে ১৬ ফেব্রুয়ারি ঢাকাবাসী রাস্তায় নেমে আসে। আইয়ুব খান পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার জন্য রাওয়ালপিন্ডিতে ১৯ ফেব্রুয়ারি এক গোলটেবিল বৈঠকের আহ্বান করেন ও প্যারোলে শেখ মুজিবকে যোগ দেওয়ার আমন্ত্রণ জানান। শেখ মুজিব তা প্রত্যাখ্যান করেন।

মাওলানা ভাসানীর নেতৃত্বে আন্দোলন আরো জোরদার হয়ে উঠলে ২২ ফেব্রুয়ারি সরকার আগরতলা মামলা শুধু প্রত্যাহার নয়, বিনা শর্তে সকল অভিযুক্তকেও মুক্তি দেয়। এই মামলার ৩৫ জন অভিযুক্তের মধ্যে ছিলেন। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, কমান্ডার মোয়াজ্জেম হোসেন, স্টুয়ার্ড মুজিবুর রহমান, অবসরপ্রাপ্ত এলএস সুলতান উদ্দিন আহমেদ এলএফসিডিআই নূর মোহাম্মদ, আহমেদ ফজলুর রহমান সিএসপি, ফ্লাইট সার্জেন্ট মাহফুজ উল্লাহ, অবসরপ্রাপ্ত কর্পোরাল আবদুস সামাদ, অবসরপ্রাপ্ত হাবিলদার দলিল উদ্দিন, রুহুল কুদ্দুস সিএসপি, ফ্লাইট সার্জেন্ট মো. ফজলুল হক, বিভূতিভূষণ চৌধুরী (মানিক চৌধুরী) বিধানকৃষ্ণ সেন, সুবেদার আবদুর রাজ্জাক, অবসরপ্রাপ্ত ক্লার্ক মুজিবুর রহমান, অবসরপ্রাপ্ত ফ্লাইট সার্জেন্ট মো. আবদুর রাজ্জাক, সার্জেন্ট জহুরুল হক, এবি খুরশীদ, খান মোহাম্মদ শামসুর রহমান সিএসপি, একেএম শামসুল হক, হাবিলদার আজিজুল হক, মাহফুজুল বারী, সার্জেন্ট শামসুল হক, শামসুল আলম, ক্যাপ্টেন মো. আবদুল মোতালেব, ক্যাপ্টেন শওকত আলী মিয়া, ক্যাপ্টেন খন্দকার নাজমুল হুদা, ক্যাপ্টেন এম নুরুজ্জামান, সার্জেন্ট আবদুল জলিল, মাহবুব উদ্দিন চৌধুরী, লেফটেন্যান্ট এম রহমান, অবসরপ্রাপ্ত সুবেদার তাজুল ইসলাম, আলী রেজা, ক্যাপ্টেন খুরশিদ উদ্দিন আহমেদ ও লেফটেন্যান্ট আব্দুর রউফ।

আগরতলা মামলার বিচারকার্য পরিচালনার জন্য বিশেষ ট্রাইব্যুনাল গঠন করা হয়। ১৯৬৮ সালের ১৯ জুন বেলা এগারটায় কুর্মিটোলা ক্যান্টনমেন্টের একটি বিশেষ কক্ষে মামলার শুনানি শুরু হয় পাকিস্তান দণ্ডবিধির ১২-ক এবং ১৩১ ধারা অনুসারে। মামলার

www.Educationblog24.Com

চার্জশিটে ছিল ১০০ অনুচ্ছেদ। সাক্ষীর সংখ্যা ছিল সরকার পক্ষে ১১ জন রাজসাক্ষীসহ মোট ২২৭ জন। প্রখ্যাত আইনজীবী আবদুস সালাম খানের নেতৃত্বে অভিযুক্তদের আইনজীবীদের নিয়ে একটি আত্মপক্ষ সমর্থকদের দল গঠন করা হয়। অন্যদিকে যুক্তরাজ্য প্রবাসী বাঙালিরা ব্রিটেনের প্রখ্যাত আইনজীবী স্যার টমাস উইলিয়াম এমপিকে বিশেষ ট্রাইব্যুনালে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আইনজীবী হিসেবে প্রেরণ করেন। তাঁকে সহযোগিতা করেন আবদুস সালাম খান, আতাউর রহমান খান প্রমুখ। পাকিস্তান সরকারের পক্ষে প্রধান কৌসুলী ছিলেন সাবেক পররাষ্ট্রমন্ত্রী মনজুর কাদের ও অ্যাডভোকেট জেনারেল টি. এইচ খান। ট্রাইব্যুনালের প্রধান বিচারপতি ছিলেন এস এ রহমান। অপর দুই বিচারপতি ছিলেন এম আর খান ও মকসুমুল হাকিম। ২৯ জুলাই ১৯৬৮ মামলার শুনানি শুরু হয়। এ সময় স্যার টমাস উইলিয়াম ট্রাইব্যুনালে উপস্থিত ছিলেন। তিনি ৫ জুলাই বঙ্গবন্ধুর পক্ষে বিশেষ ট্রাইব্যুনালে বৈধতা চ্যালেঞ্জ করে হাইকোর্টে রিট আবেদন দাখিল করেছিলেন। তবে বঙ্গবন্ধু মুক্তি পেয়ে গেলে ট্রাইব্যুনালের বৈধতা নিয়ে প্রশ্ন তোলার আর কিছু ছিলনা।

সহায়ক গ্রন্থ

মুনতাসীর মামুন, *বাংলাদেশ : বাঙালি মানুষ, রাষ্ট্র গঠন ও আধুনিকতা*, ঢাকা ২০০৭

হাসান হাফিজুর রহমান, *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ* ২য় খণ্ড।

www.Educationblog24.com

www.Educationblog24.Com

সপ্তম অধ্যায়
১৯৬৯-এর গণঅভ্যুত্থান ও ১১ দফা আন্দোলন

বাংলাদেশে অনেক গণআন্দোলন হয়েছে তবে ১৯৬৯ সালের গণআন্দোলনকেই একমাত্র ১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থানরূপে আখ্যা দেয়া হয়েছে। এর একটি কারণ বোধহয় এই যে ১৯৫২ সালের পর গণতন্ত্র রক্ষায় এবং তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের দাবি দাওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে এটিই ছিল একমাত্র আন্দোলন যা তৃণমূল পর্যায় পর্যন্ত পৌঁছেছিল।

১৯৬৯ সালের ঘটনাবলিই ১৯৬৯ সালের পটভূমি তৈরি করেছে। এ প্রসঙ্গে প্রথম উল্লেখ করতে হয় ১৯৬৫ সালের পাক-ভারত যুদ্ধের কথা। ঐ সময় অনবরত এ প্রচারই বারবার করা হয় যার মূল কথা হলো- "ইংরেজ শাসন থেকে মুক্তির চেয়ে হিন্দু জাতীয়তাবাদের ষড়যন্ত্র থেকে মুক্ত হয়ে ইসলামী মূল্যবোধ ও আদর্শের আলোকে পূর্ণ আত্মনিয়ন্ত্রণ ও আত্মবিশ্বাসের আকাঙ্খাই ছিল পাকিস্তান আন্দোলনের মূল কথা।

১৯৬৯ সালের যুদ্ধ শেষ হলো তাশখন্দ চুক্তির মাধ্যমে। পাকিস্তান যে কাঙ্খিত জয় পায়নি তার প্রমাণ তাশখন্দ চুক্তি করতে বাধ্য হওয়া। এ অঞ্চলের বাঙালি এতো প্রচার প্রপাগান্ডার পরও অনুধাবন করতে পেরেছিল পূর্ব পাকিস্তানকে অরক্ষিত রাখা হয়েছে। ভারত যদি পূর্ব পাকিস্তান আক্রমণ করত তাহলে নিমিষেই তা দখল করতে পারত। এতদিন কেন্দ্রীয় সরকার যে তত্ত্ব দিয়ে আসছিল তা হলো, পূর্ব পাকিস্তানের নিরাপত্তা পশ্চিম পাকিস্তানে নিহিত। এখন দেখা গেল তা শূন্যগর্ভ বক্তব্য মাত্র। পাকিস্তান ভারত যুদ্ধ এভাবে অভিঘাত ফেলেছিল বাঙালির ওপর।

এরপর বঙ্গবন্ধু প্রচার করলেন ছয়দফা। স্বায়ত্ত্বশাসনের এই দাবি মানুষকে উজ্জীবিত করেছিল। ১৯৬৮ সালে শুরু হলো আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা। শেখ মুজিবুর রহমান মামলার জবানবন্দীতে যা বলেছিলেন আসলে তাই ছিল যথার্থ কারণ-

> "কেবলমাত্র আমার উপর নির্যাতন চালাইবার জন্য এবং আমার দলকে লাঞ্ছিত, অপমানিত ও আমাদিগকে কুখ্যাত করিবার জঘন্য মনোবৃত্তি লইয়া আমাকে এই তথাকথিত ষড়যন্ত্র মামলায় মিথ্যা জড়িত করা হইয়াছে। ছয় দফার ভিত্তিতে পূর্ব পাকিস্তানের আঞ্চলিক স্বায়ত্ত্বশাসনের দাবিসহ রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, চাকরির সংখ্যা ও অন্যান্য ক্ষেত্রে সমতার ন্যায়সঙ্গত দাবি আদায়ের পথে বিঘ্ন সৃষ্টি করা ও নিষ্পেষণ করাই ইহার মূল উদ্দেশ্য।"

বাঙালির ধারণাও তা ছিল। এ প্রসঙ্গ আলোচিত হয়েছে পূর্ববর্তী অধ্যায়ে তাই এখানে তার পুনরাবৃত্তি করলাম না।

১৯৬৫ থেকে ১৯৬৮ সাল পর্যন্ত আরো কিছু ঘটনা ঘটেছে তা মূলত সাংস্কৃতিক

www.Educationblog24.Com

কিন্তু তাও মানুষের মনে ক্ষোভের সৃষ্টি করেছিল। অধ্যাপক জয়ন্তকুমার রায় ও অধ্যাপক মুনতাসীর মামুন তাদের লেখা বাংলাদেশ সিভিল সমাজের আন্দোলন গ্রন্থে লিখেছেন-

> রাজনৈতিক ফ্রন্টের ঘটনাবলীর সঙ্গে সঙ্গে সাংস্কৃতিক অঙ্গনেও এ সময় এমন কিছু ঘটনা ঘটে যা পূর্ব বঙ্গবাসীর বাঙালিবোধকে তীব্র ও সংহত করে তোলে এবং এক্ষেত্রে নেতৃত্ব দেন সাংস্কৃতিক কর্মী এবং বুদ্ধিজীবীরা। এখানে লক্ষণীয় যে, ১৯৪৭ থেকে এখন পর্যন্ত সাংস্কৃতিক ফ্রন্টে সব সময় একটি আদর্শগত লড়াই চলেছে। গত ৪৬ বছরে অধিকাংশ সময় ক্ষমতায় ছিল যে সব সরকার তারা সংস্কৃতিকে নিয়ন্ত্রণ করে সিভিল সমাজকে দমিত করতে চেয়েছে। অন্য দিকে, মধ্যবর্তী কারকরা সব সময় এর বিরুদ্ধে সোচ্চার প্রতিবাদ করেছে যাতে সায় দিয়েছে সাধারণ মানুষ। এ লড়াইয়ে প্রগতির ধারা জয়ী হয়েছে এবং বাঙালিবোধকে সব সময় বাঁচিয়ে রেখে রাজনীতিকে এগিয়ে নিতে সাহায্য করেছে।"

সংস্কৃতির এ বিষয়টি সবাই উপেক্ষা করেছেন ইতিহাস রচনায় যা যৌক্তিক নয়।

এসব ঘটনার প্রথমটি হলো রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে নিষিদ্ধ করা। জাতীয় সংসদে মুসলিম লীগ নেতা ও ১৯৭১ সালে দালাল খান এ সবুর উল্লেখ করেন, ১ বৈশাখ ও রবীন্দ্র জয়ন্তী উদযাপন বিদেশি [অর্থাৎ হিন্দু] সংস্কৃতির অনুপ্রবেশ। তথ্য মন্ত্রী খাজা শাহাবুদ্দিন বলেন রবীন্দ্রসঙ্গীত প্রচার রেডিও থেকে প্রায় কমিয়ে দেওয়া হয়েছে এবং পাকিস্তানি আদর্শের সঙ্গে না মিললে তা বন্ধ করে দেওয়া হবে। খাজা শাহাবুদ্দিনের পক্ষে পূর্ব পাকিস্তানে কিছু বুদ্ধিজীবী সক্রিয় হয়ে ওঠেন। এদের মূল বক্তব্য প্রতিফলিত হয়েছে দৈনিক আজাদ-এ–

> "রবীন্দ্রনাথ বহু সঙ্গীতে মুসলিম তমদ্দুনকে অবজ্ঞা প্রদর্শন করিয়া হিন্দু সংস্কৃতির জয়গান গাহিয়াছেন। সুতরাং পাকিস্তান সৃষ্টির প্রথম দিন হইতেই এই সকল সঙ্গীতের আবর্জনা হইতে রেডিও-টেলিভিশনকে পবিত্র রাখার প্রয়োজন ছিল।

বাঙালি এতে ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। এবং প্রবল ভাবে ঐ বছর রবীন্দ্রনাথের মৃত্যু বার্ষিকী পালন করে। এটি ছিল পশ্চিমা ও তার সহযোগীদের ইসলামের নামে সাংস্কৃতিক নিপীড়নে বিরুদ্ধে প্রতিবাদ।

এরপর বাংলা ভাষা সংস্কার করে 'জাতীয় ভাষা' সৃষ্টির প্রয়াস পায়।

১৯৬৮ সালে বাংলা ভাষা সংস্কারের জন্য সুপারিশ করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক কাউন্সিল। আইয়ুব খানও এ বিষয়ে বক্তৃতা করেন যার মূল কথা, "সকল আঞ্চলিক ভাষা একত্রিত করে যৌথভাবে একটি মহান পাকিস্তানী ভাষা উদ্ভাবন করা। এবারও সাংস্কৃতিক গোষ্ঠী, বুদ্ধিজীবীসহ অন্যান্যরা প্রতিবাদে এগিয়ে আসেন। সিভিল সমাজের প্রতিবাদে এবারও পিছু হটে যায় সরকার। এ পটভূমিতে ১৯৬৮ সালে, লেখক সংঘ পূর্বাঞ্চল শাখা ১৯৬৮ সালের জুলাই মাসে রবীন্দ্রনাথ, মীর্জা গালিব, ইকবাল, মাইকেল মধুসূদন ও কাজী নজরুলের ওপর পাঁচ দিনব্যাপী এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। আবুল হাশিম বক্তৃতা দিতে গিয়ে বলেন– "যাহারা ইসলাম ও পাকিস্তানী আদর্শের নামে রবীন্দ্রসঙ্গীত বর্জনের ওকালতি করিতেছেন, তাহারা শুধুই মূর্খ নহেন, দুষ্টবুদ্ধি-প্রণোদিতও। তাঁহারা না বোঝেন রবীন্দ্রনাথ, না বোঝেন ইসলাম। তাহারা

www.Educationblog24.Com

একটা বিশেষ উদ্দেশ্যের বশবর্তী হইয়া রবীন্দ্র-বিরোধিতায় মাতিয়া উঠিয়াছেন।"

আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা বাঙালি জাতীয়তাবাদকে এগিয়ে নিয়েছে। শেখ মুজিবকে গ্রেফতার করা হয় ১৮ জানুয়ারি। ১৯ জানুয়ারি জগন্নাথ কলেজের ছাত্ররা নেমে আসে রাস্তায়। ছাত্র নেতৃবৃন্দ ইতোমধ্যে আলোচনা শুরু করেন ছয় দফা আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা নিয়ে। আরো কিছু ঘটনা এ সময় ঘটে যা সামগ্রিকভাবে রাজনৈতিক পরিস্থিতিকে তপ্ত করে তোলে। মওলানা ভাসানী হরতালের আহবান জানান। ডিসেম্বরে কয়েকটি সফল হরতাল হয়। পুলিশের গুলিতে নিহত হয় কয়েকজন। এ পরিস্থিতিতে মওলানা ভাসানী 'ঘেরাও কর্মসূচী' নামে নতুন এক আন্দোলনের ডাক দেন বিভিন্ন দাবি আদায়ের লক্ষ্যে। এর সঙ্গে যুক্ত হয় ডাকসু ও চারটি ছাত্র সংগঠনের সাতজন নেতা প্রণীত ১১ দফা কর্মসূচী। ৪ জানুয়ারি, ১৯৬৯ সালে ছাত্র নেতৃবৃন্দ ১১ দফা ঘোষণা করেন। মূলত ৬ দফার বিস্তারিত রূপই ১১ দফা। কেন্দ্রীয় শাসন থেকে বাঙালিদের আর্থ-রাজনৈতিক ক্ষেত্রে স্বাধিকার অর্জনই ছিল এর মূল বক্তব্য। এগারো দফার সংক্ষিপ্ত সার এখানে দেয়া হলো-

১. সচ্ছল কলেজসমূহকে প্রাদেশিকীকরণের নীতি পরিত্যাগ করিতে হইবে, শিক্ষার ব্যাপক প্রসারের জন্য সর্বত্র বিশেষ করিয়া গ্রামাঞ্চলে স্কুল-কলেজ স্থাপন করিতে হইবে এবং বেসরকারি উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত স্কুল-কলেজসমূহকে সত্বর অনুমোদন দিতে হইবে। ছাত্র-বেতন শতকরা ৫০ ভাগ হ্রাস করিতে হইবে। হল হোস্টেলের ডাইনিং হল ও কেন্টিন খরচার শতকরা ৫০ ভাগ সরকার কর্তৃক 'সাবসিডি' হিসাবে প্রদান করিতে হইবে। মাতৃভাষার মাধ্যমে সর্বস্তরে শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে হইবে। অফিস আদালতে বাংলাভাষা চালু করিতে হইবে। অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষাকে অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক করিতে হইবে। নারী-শিক্ষার ব্যাপক প্রসার করিতে হইবে। ট্রেনে, স্টিমারে ও লঞ্চে ছাত্রদের 'আইডেন্টিটি কার্ড' দেখাইয়া শতকরা পঞ্চাশ ভাগ 'কনসেশনে' টিকেট দেওয়ার ব্যবস্থা করিতে হইবে। চাকুরির নিশ্চয়তা বিধান করিতে হইবে। কুখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয় অর্ডিন্যান্স সম্পূর্ণ বাতিল করিতে হইবে এবং বিশ্ববিদ্যালয়সহ অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন দিতে হইবে।

২. প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটে প্রত্যক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে পার্লামেন্টারি গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। বাক-স্বাধীনতা, ব্যক্তি-স্বাধীনতা এবং সংবাদপত্রের স্বাধীনতা দিতে হইবে।

৩. পূর্ব পাকিস্তানের পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন দিতে হইবে। দেশের শাসনতান্ত্রিক কাঠামো হইবে ফেডারেশন শাসনতান্ত্রিক রাষ্ট্রসংঘ এবং আইন পরিষদের ক্ষমতা হইবে সার্বভৌম। ফেডারেল সরকারের ক্ষমতা দেশরক্ষা, বৈদেশিক নীতি ও মুদ্রা-এই কয়টি বিষয়ে সীমাবদ্ধ থাকিবে। অপরাপর সকল বিষয়ে অঙ্গরাষ্ট্রগুলির ক্ষমতা হইবে নিরঙ্কুশ। দুই অঞ্চলের জন্য একই মুদ্রা থাকিবে। এই ব্যবস্থায় মুদ্রা কেন্দ্রের হাতে থাকিবে। কিন্তু এই অবস্থায় শাসনতন্ত্রে এমন সুনির্দিষ্ট বিধান থাকিতে হইবে যে, যাহাতে পূর্ব পাকিস্তানের মুদ্রা পশ্চিম পাকিস্তানে পাচার হইতে না পারে। এই বিধানে পাকিস্তানে একটি

www.Educationblog24.Com

ফেডারেল রিজার্ভ ব্যাংক থাকিবে। দুই অঞ্চলে দুইটি পৃথক রিজার্ভ ব্যাংক থাকিবে এবং পূর্ব পাকিস্তানের জন্য পৃথক অর্থনীতি প্রবর্তন করিতে হইবে। সকল প্রকার ট্যাক্স, খাজনা, কর ধার্য ও আদায়ের সকল ক্ষমতা থাকিবে আঞ্চলিক সরকারের হাতে। ফেডারেশনের প্রতিটি রাষ্ট্র বহি:বাণিজ্যের পৃথক হিসাব রক্ষা করিবে এবং বহি:বাণিজ্যের মাধ্যমে অর্জিত মুদ্রা অঙ্গরাষ্ট্রগুলির এখতিয়ারাধীন থাকিবে। পূর্ব পাকিস্তানকে মিলিশিয়া বা প্যারা-মিলিটারি রক্ষী বাহিনী গঠনের ক্ষমতা দিতে হইবে।

৪. পশ্চিম পাকিস্তানের বেলুচিস্তান, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, সিন্ধুসহ সকল প্রদেশের স্বায়ত্তশাসন প্রদান করত সাব-ফেডারেশন গঠন করিতে হইবে।

৫. ব্যাংক-বীমা, পাট ব্যবসা ও বৃহৎ শিল্প জাতীয়করণ করিতে হইবে।

৬. কৃষকের উপর হইতে খাজনা ও ট্যাক্সের হার হ্রাস করিতে হইবে এবং বকেয়া খাজনা ও ঋণ মওকুফ করিতে হইবে। সার্টিফিকেট প্রথা বাতিল ও তহশিলদারদের অত্যাচার বন্ধ করিতে হইবে। পাটের সর্বনিম্ন মূল্য মণপ্রতি ৪০ টাকা নির্ধারণ এবং আখের ন্যায্যমূল্য দিতে হইবে।

৭. শ্রমিকদের ন্যায্য মজুরি-বোনাস দিতে হইবে এবং শিক্ষা, বাসস্থান, চিকিৎসা ইত্যাদির ব্যবস্থা করিতে হইবে। শ্রমিক স্বার্থবিরোধী কালাকানুন প্রত্যাহার করিতে হইবে এবং ধর্মঘটের অধিকার ও ট্রেড ইউনিয়ন করার অধিকার প্রদান করিতে হইবে।

৮. পূর্ব-পাকিস্তানের বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও জলসম্পদের সার্বিক ব্যবহারের ব্যবস্থা করিতে হইবে।

৯. জরুরি আইন প্রত্যাহার, নিরাপত্তা আইন ও অন্যান্য নিবর্তনমূলক আইন প্রত্যাহার করিতে হইবে।

১০. সিয়াটো, সেন্টো, পাক-মার্কিন সামরিক চুক্তি বাতিল করিয়া জোট বহির্ভূত স্বাধীন ও নিরপেক্ষ পররাষ্ট্রনীতি কায়েম করিতে হইবে।

১১. দেশের বিভিন্ন কারাগারের আটক সকল ছাত্র, শ্রমিক, কৃষক, রাজনৈতিক কর্মী ও নেতৃবৃন্দের অবিলম্বে মুক্তি; গ্রেফতারি পরোয়ানা ও হুলিয়া প্রত্যাহার এবং আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলাসহ সকল রাজনৈতিক কারণে জারিকৃত মামলা প্রত্যাহার করিতে হইবে।

[সূত্র : স্বাধীনতার দলিলপত্র, ২য় খণ্ড , প্রাগুক্ত, পৃ. ৪০৫-৪০৮। দলিলপত্র গ্রন্থে ১১ দফা বিস্তারিত উল্লেখিত আছে। মাহবুবর রহমান এ-বাংলাদেশের ইতিহাস]

ঘোষণার তিনদিন পর ৮ জানুয়ারি আওয়ামী লীগ, ন্যাপ, জামায়াতে ইসলামী, কাউন্সিল মুসলিম লীগ ও জাতীয় গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট একটি যৌথ ফ্রন্ট গঠন করে। আইয়ুববিরোধী এ মোর্চার নাম দেয়া হয় 'গণতান্ত্রিক সংগ্রাম পরিষদ' বা 'ডেমোক্র্যাটিক অ্যাকশন কমিটি' বা 'ডাক'।

ন্যাপ ভাসানী ও ভুট্টোর পিপলস পার্টি এতে যোগ দিতে অস্বীকার করে। 'ডাক' ও ঘোষণা দেয় ৮ দফার। তারা দেশে "(ক) ফেডারেল প্রকৃতির পার্লামেন্টারি শাসন ব্যবস্থা কায়েম (খ) প্রাপ্তবয়স্কের ভোটে প্রত্যক্ষ নির্বাচন, (গ) অবিলম্বে জরুরি অবস্থা

www.Educationblog24.Com

প্রত্যাহার (ঘ) পূর্ণ নাগরিক অধিকার পুনঃ প্রতিষ্ঠা। সমস্ত কলাকানুন বিশেষ করে বিনা বিচারে আটক রাখার আইন ও বিশ্ববিদ্যালয় অর্ডিন্যান্স বাতিল (ঙ) খান আবদুল ওয়ালী খান, শেখ মুজিবুর রহমান, জুলফিকার আলী ভুট্টোসহ সকল রাজনৈতিক বন্দী, রাজনৈতিক কারণে জারীকৃত সব গ্রেফতারী পরোয়ানা প্রত্যাহার (চ) ফৌজদারী কার্যবিধির ধারার আওতায় জারীকৃত সকল নির্দেশ প্রত্যাহার (ছ) শ্রমিকদের ধর্মঘটের অধিকার পুনঃপ্রতিষ্ঠা (জ) নতুন ডিক্লারেশন দানের উপর বিধিনিষেধ প্রত্যাহার.... দাবি করেন। মওলানা ভাসানী ১৪ জানুয়ারি হাতিরদিয়ায় এক জনসভায় ঘোষণা করেন "জনসাধারণের ভোটাধিকার, লাহোর প্রস্তাবে উল্লিখিত পূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন অর্থনৈতিক অধিকার আদায়ের জন্য প্রয়োজন হইলে আমরা খাজনা-ট্যাক্স দেওয়া বন্ধ করিব।"

শেখ মুজিবের ৬ দফা, ছাত্রদের ১১ দফা ও রাজনৈতিক দলের ৮ দফা বাঙালিকে আবার উজ্জীবিত করে তোলে। ৬ দফা ও ৮ দফা, বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে ১১ দফার মধ্যেই ছিল। ঐ সময় ছাত্ররা ছিলেন চালিকাশক্তি। তাই আমরা দেখি আন্দোলনের নেতৃত্ব ছাত্রদের হাতেই। ১৯৬৮ সালের জানুয়ারিতে ছাত্ররা যে আন্দোলনের শুরু করে ১৯৬৯ সালের শুরুতেই দেখা যায় তা গণআন্দোলনে রূপ নেয়।

১৭ জানুয়ারি, ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ ১১ দফা দাবি আদায়ের জন্য ধর্মঘটের মাধ্যমে কর্মসূচী ঘোষণা করে। এর আগেই ১৪৪ ধারা জারি করা হয়েছিলো। পুলিশ যথারীতি ঝাঁপিয়ে পড়ে ছাত্রদের উপর। ১৮ জানুয়ারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ডাকা হয় ধর্মঘট। পুলিশী নির্যাতন অব্যাহত রাখা হয়। এ সময় সরকারী ছাত্রদল এনএসএফ দু'ভাগে ভাগ হয়ে যায়। ২০ জানুয়ারি এক মিছিলে নেতৃত্ব দেয়ার সময় ছাত্র ইউনিয়ন মেনন গ্রুপের নেতা আসাদুজ্জামান শহীদ হন। এ খবর ছড়িয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে পূর্ব পাকিস্তানের পরিস্থিতি সম্পূর্ণ বদলে যায়।

আসাদের শহীদ হওয়ার খবর ছড়িয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র আন্দোলনের চরিত্র পালটে যায়। বিকালে এক বিশাল শোক মিছিল ঢাকার রাজপথ প্রদক্ষিণ করে। ২১ তারিখ হরতাল ঘোষণা করা হয়। ঐ দিনও পুলিশ গুলিবর্ষণ করে। বিকেলে পল্টন ময়দানে অনুষ্ঠিত হয় গায়েবানা জানাজা। তারপর আসাদের রক্তাক্ত শার্ট নিয়ে বের হয় লক্ষাধিক লোকের মিছিল। লিখলেন কবি শামসুর রাহমান–

"আমাদের দুর্বলতা, ভীরুতা কলুষ আর লজ্জা
সমস্ত দিয়েছে ঢেকে একখণ্ড বস্ত্র মানবিক;
আসাদের শার্ট আজ আমাদের প্রাণের পতাকা।"

২১ থেকে ২৪ তারিখ পর্যন্ত ঢাকায় প্রতিদিনই মিছিল হয়েছে, পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষ হয়েছে। কিন্তু সিভিল সমাজ ক্ষুব্ধ হলে কি করতে পারে তার উদাহরণ ২৪ মার্চ। ঢাকা শহরের রাস্তায় সেদিন লক্ষ লক্ষ লোক নেমে আসে। পুলিশের গুলিতে নিহত হন ছাত্র মতিয়ুর, শ্রমিক রুস্তম। তৎকালীন ইকবাল হলের মাঠে লক্ষাধিক শোকাভিভূত জনতার সামনে মতিয়ুরের বাবা সামান্য একজন ব্যাংক কর্মচারী ঘোষণা করেন "এক মতিয়ুরকে

www.Educationblog24.Com

হারিয়ে আজ আমি হাজার মতিয়ুর পেয়েছি।" পরদিনও ইপিআর পুলিশ বাহিনীর তাণ্ডব ও গুলিবর্ষণে এক মহিলা নিহত হন।

আইয়ুব খান পরিস্থিতি বুঝে আলোচনার প্রস্তাব দেন। কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ ঘোষণা করে রাজবন্দীদের জেলে রেখে আলোচনা হবে না। ৬ ফেব্রুয়ারি আইয়ুব খান ঢাকায় এলে কালো পতাকায় ঢাকা শহর ছেয়ে যায়। তাঁর কুশপুত্তলিকা ও বই পোড়ানো হয়। ৯ ফেব্রুয়ারি ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের সভায় শুধু রাজবন্দীদের মুক্তি নয়, মোনায়েম খাঁরও পদত্যাগ দাবি করা হয় এবং ১১ দফা আন্দোলন চালিয়ে যাবার পক্ষে শপথ গ্রহণ করে ছাত্র-জনতা। জনতার ক্রোধের বহিঃপ্রকাশ ঘটে স্বতঃস্ফূর্তভাবে কিছু স্থানের নামকরণে। আইয়ুব নগরের নাম হয়ে যায় শেরে বাংলা নগর, আইয়ুব গেটের নাম রাখা হয় আসাদগেট, আইয়ুব চিলড্রেনস পার্কের নামকরণ করা হয় মতিয়ুর শিশুপার্ক।

১২ ফেব্রুয়ারি আইয়ুব খান ঢাকা ত্যাগ করলে 'ডাক' ১৪ ফেব্রুয়ারি সারা দেশে হরতাল আহ্বান করে। ১৫ ফেব্রুয়ারি ক্যান্টনমেন্টে ষড়যন্ত্রমূলকভাবে আগরতলা মামলার অন্যতম আসামী সার্জেন্ট জহুরুল হককে হত্যা করা হয়। মানুষ আবার রাস্তায় নেমে আসে। পল্টন ময়দানে মাওলানা ভাসানী ঘোষণা করেন, প্রয়োজনে জেলের তালা ভেঙ্গে শেখ মুজিবকে মুক্ত করা হবে। সে মুহূর্তে নতুন এক স্লোগানের জন্ম নেয়, 'জেলের তালা ভাঙবো, শেখ মুজিবকে আনবো।' সার্জেন্ট জহুরুল হকের গায়েবানা জানাজা শেষে লক্ষ মানুষ ঢাকার রাস্তায় ছড়িয়ে পড়ে। আগুন লাগিয়ে দেয় দু'জন প্রাদেশিক মন্ত্রী, প্রাদেশিক মুসলিম লীগের সভাপতি, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী খাজা শাহাবুদ্দিন ও আগরতলা মামলার প্রধান বিচারপতি এস,এ রহমানের বাসভবনে। শহরের পুরো নিয়ন্ত্রণ চলে যায় জনতার হাতে। সন্ধ্যায় জারি করা হয় কার্ফ্যু।

১৮ ফেব্রুয়ারি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ড. শামসুজ্জোহাকে সেনাবাহিনী বেয়নেট দিয়ে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে হত্যা করে। রাতে এ খবর ছড়িয়ে পড়ে ঢাকা শহরে। কার্ফ্যু ভেঙ্গে মানুষ নেমে আসে রাস্তায়। সরকারী সমস্ত নিয়ন্ত্রণ ভেঙ্গে পড়ে। ২২ ফেব্রুয়ারি শেখ মুজিবসহ আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার আসামীরা মুক্তিলাভ করেন। মুক্তি দেয়া হয় রাজবন্দীদেরও। ২৩ ফেব্রুয়ারি রেসকোর্স ময়দানে সংবর্ধনা দেওয়া হয় শেখ মুজিবকে। লক্ষ মানুষের সমাবেশে শেখ মুজিব ঘোষণা করেন ১১ দফা তিনি সমর্থন করেন কারণ এর মধ্যে অন্তর্গত ৬ দফাও। ছাত্রনেতা তোফায়েল আহমদ জনতার পক্ষ থেকে শেখ মুজিবকে ভূষিত করেন 'বঙ্গবন্ধু' উপাধিতে।

শুধু পূর্ব পাকিস্তানেই নয়, পরিস্থিতির অবনতি হচ্ছিলো পশ্চিম পাকিস্তানেও। লান্ডিকোটাল থেকে কিছু ছাত্র চোরাপথে আনীত কিছু পণ্য কিনে ফেরার পথে পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষ হয়। এই সংঘর্ষের জের ধরে জুলফিকার আলী ভুট্টো দৃশ্যপটে আসেন। এবং পূর্ব পাকিস্তানের মতো একইভাবে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে বিক্ষোভ শুরু হয়। তবে, তা পূর্ব পাকিস্তানের মাত্রায় পৌঁছেনি। এখানে উল্লেখ্য যে, উনসত্তরের ঘটনাবলী যা উনসত্তরের গণআন্দোলন নামে খ্যাত তা শুধু ঢাকাতেই কেন্দ্রীভূত থাকেনি, ছড়িয়ে পড়েছিলো পুরো পূর্ব পাকিস্তানে এবং তা গ্রহণ করেছিলো সহিংস রূপ। এ প্রসঙ্গে পরে

www.Educationblog24.Com

আলোচনা করবো।

রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাচ্ছে দেখে আইয়ুব খান আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা প্রত্যাহার করেছিলেন, সর্বজনীন ভোটাধিকারের দাবি মেনে নিয়েছিলেন। ২১ ফেব্রুয়ারি সরকারী ছুটি ঘোষণা করা হয়েছিলো, এমনকি আর প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে না দাঁড়ানোরও প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। একই সঙ্গে রাজনৈতিক নেতাদের নিয়ে গোলটেবিল বৈঠকে বসার আহ্বান জানিয়েছিলেন। ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের মত এর বিপক্ষে ছিল। মুক্তি পাবার পর শেখ মুজিবকে ছাত্র নেতৃবৃন্দ তাঁদের আপত্তির কথা জানিয়েছিলেন। কিন্তু শেখ মুজিব সম্মত হলেন গোলটেবিল বৈঠকে যোগ দিতে। এবং 'ডাক' নেতৃবৃন্দকে নিয়ে রাওয়ালপিন্ডিতে ২৬ ফেব্রুয়ারি গোলটেবিল বৈঠকে বসলেন। মওলানা ভাসানী গোলটেবিল বৈঠকের বিরোধিতা করে এতে যোগ দেননি। অন্তিমে গোলটেবিল বৈঠক ব্যর্থ হয়। ঢাকা ফিরে এসে ১৪ মার্চ এক সাংবাদিক সম্মেলনে শেখ মুজিব বলেন, পূর্ব পাকিস্তানের রাজনৈতিক নেতাদের সহযোগিতা পেলে তিনি ৬ দফা আদায় করে আসতে পারতেন। তা পারেননি বলেই বৈঠক ত্যাগ করেছেন। অসহযোগী যে কজন নেতাকে তিনি কুচক্রী বলে ঘোষণা করেন তাঁরা হলেন– হামিদুল হক চৌধুরী, আবদুস সালাম খান, ফরিদ আহমদ ও মাহমুদ আলী।

গোলটেবিল বৈঠক ব্যর্থ হওয়ায় পরিস্থিতির আরো অবনতি ঘটে। সম্পূর্ণ সিভিল সমাজ অস্থির, উত্তেজিত ও বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। মোনায়েম খানের অপসারণের দাবিতে হরতাল আহ্বান করা হয়। ২১ মার্চ ড. এম এন হুদাকে পূর্ব পাকিস্তানের নতুন গভর্নর নিযুক্ত করা হয়। এর আগে রাতে সপরিবারে মোনায়েম খান পালিয়ে যান। ২৪ মার্চ জেনারেল আইয়ুব খান জেনারেল ইয়াহিয়ার কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করে পদত্যাগ করেন। ২৫ মার্চ পাকিস্তানে আবার জারি করা হয় সামরিক আইন।

বাংলাদেশে সামগ্রিকভাবে সিভিল সমাজের সফল উত্থান হয়েছিলো ১৯৬৯ সালে। ১৯৫৮ সালে আইয়ুবী শাসন থেকে ১৯৬৯ সাল পর্যন্ত সিভিল সমাজ মাঝে মাঝে পিছু হটেছে বটে কিন্তু পর্যুদস্ত হয়নি। প্রাথমিক কারকরা প্রথম পর্যায়ে দোদুল্যমানতা, ভয় ও স্বার্থদ্বন্দ্বে মনপ্রাণ দিয়ে সিভিল সমাজ প্রতিষ্ঠায় অগ্রসর হননি। কিন্তু বাংলাদেশের সিভিল সমাজের অন্তর্নিহিত একটি শক্তি আছে যা প্রবাহিত হয় ফল্গুধারার মতো। এ ফল্গুধারার উৎস মধ্যবর্তী কারকদের অগ্রসরমান অংশ সংস্কৃতিকর্মী ও ছাত্ররা যা সব সময় সিভিল সমাজ প্রতিষ্ঠার আন্দোলনের ধারাবাহিকতা রক্ষা করেছে এবং কখনও পিছু হটেনি। গোটা উনসত্তরের আন্দোলন ছাত্ররাই সংগঠন করেছে, অনেক ক্ষেত্রে রাজনৈতিক নেতাদের বাধ্য করেছে ঐক্যবদ্ধ হতে। অন্তিমে, মধ্যবর্তী কারক ও প্রান্তিককারকদের চাপে পড়ে রাজনৈতিক নেতারা তাদের দায়িত্ব কাঁধে তুলে নিয়েছেন। এবং সিভিল সমাজ সম্পূর্ণভাবে প্রতিষ্ঠা বা বাংলাদেশ গঠনকে যৌক্তিক পরিণতির দিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার ভার যাঁর ওপর অর্পিত হয়েছিলো তিনি হলেন শেখ মুজিবুর রহমান যিনি অচিরেই পরিচিত হয়ে উঠলেন বাংলার বন্ধু বা 'বঙ্গবন্ধু' নামে। বাংলাদেশে সিভিল সমাজের প্রতীক হয়ে উঠলেন তিনি।

www.Educationblog24.Com

১৯৬০ থেকে ১৯৬৯ পর্যন্ত বাংলাদেশে সিভিল সমাজ প্রতিষ্ঠায় কতোজন আত্মাহুতি দিয়েছেন তার সঠিক হিসাব পাওয়া যায় না। মোহাম্মদ হাননান বিভিন্ন সূত্র থেকে একটি হিসাব দাঁড় করিয়েছেন। তাঁর হিসাব অনুযায়ী এই এক দশকে নিহত হয়েছেন ১২১ জন। এবং এর মধ্যে ৬৯ সালেই ৬১ জন। ৬১ জনের পেশাওয়ারী ভাগ এ রকম–

শ্রমিক	২৯	সৈনিক	১
ছাত্র	২১	গৃহবধূ	১
কৃষক	৩	অজ্ঞাত	১
শিক্ষক	২		
চাকুরিজীবী	৩		

এখানে অবশ্য উল্লেখ করতে হয় স্বাধীনতার দলিলপত্রে উল্লেখ করা হয়েছে ১৯৬৯ সালে নিহতের সংখ্যা প্রায় ১০০ জন। সুতরাং ঐ ভিত্তিতে জনাব হান্নানের হিসাবের সঙ্গে আরো ৩১ জন যোগ করনে ৯ বছরে নিহতের সংখ্যা দাঁড়ায় ১৫২ জন। ১৯৬৯ সালের নিহতের মধ্যে ছিলেন ৩৪ জন শ্রমিক, ২০ জন ছাত্র, ৭ জন সরকারি কর্মচারী, ৫ জন খুদে ব্যবসায়ী ও একজন স্কুল শিক্ষক।

লক্ষণীয় যে, চূড়ান্ত পর্যায়ে প্রান্তিক কারকরাই মুখ্য ভূমিকা পালন করেছিলো। অনেক সময় তা সহিংস রূপ ধারণ করেছিলো। মৌলিক গণতন্ত্রের ভিত ধ্বংস করার জন্য ছাত্রনেতারা আন্দোলনের সময় মৌলিক গণতন্ত্রীদের পদত্যাগ করতে বলেছিলেন। গ্রামাঞ্চলে, অনেক জায়গায় মৌলিক গণতন্ত্রীরা পদত্যাগে রাজি না হলে মানুষ তাদের বাধ্য করেছিলো পদত্যাগ করতে। মৌলিক গণতন্ত্রীদের সুনজরে দেখার কোনো কারণ ছিল না। অর্থনৈতিক শক্তির সঙ্গে সঙ্গে তারা রাজনৈতিক শক্তিরও অধিকারী হয়েছিলো। এবং এ দুটির মিলিত শিকার ছিল বঞ্চিত গ্রামবাসীরা। এ ছাড়া, চোর, ডাকাত, গরু চোর, টাউট এবং মৌলিক গণতন্ত্রীদের দালালদের অনেক ক্ষেত্রে গণআদালতে বিচার করে শাস্তি দেয়া হচ্ছিলো। অন্যদিকে স্বার্থান্বেষী কিছু ব্যক্তি এ সুযোগে নিজেদের স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য লুটপাটে অংশ নিচ্ছিলো। ছাত্র বা রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাচ্ছিলো ঘটনাবলী এবং এতে তারা হয়ে উঠেছিলেন উদ্বিগ্ন। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, প্রায় দশ হাজার মৌলিক গণতন্ত্রী পদত্যাগ করেছিলেন। এর মধ্যে স্বেচ্ছায় পদত্যাগকারীর সংখ্যা ছিল ২৫০০ থেকে ৩০০০ মাত্র।

১৯৬৯ সালের গণআন্দোলনের সূচনা ছাত্ররা করলেও মওলানা ভাসানী ছিলেন এর প্রাণপুরুষ। ১৯৬৩ সাল থেকে তিনি ছিলেন আইয়ুবের প্রচ্ছন্ন সমর্থক। হয়তো তাঁর ধারণা হয়েছিলো, চীনের সঙ্গে আইয়ুব খান বন্ধুত্ব করছেন, সুতরাং হয়তো পাকিস্তানেও সমাজতন্ত্রের উপাদানাবলীর ওপর গুরুত্ব দেবেন। ১৯৬৯ সালেই এ ধারণা তিনি পাল্টে ফেললেন এমনকি গোলটেবিল বৈঠকে যোগদানেরও বিরোধিতা করলেন। মফস্বলে মওলানা ভাসানী ঘেরাও আন্দোলনের সূচনা করেছিলেন যা আন্দোলনকে এক ধরনের বিপ্লবী ভাব দিয়েছিলো। 'ঘেরাও'র অর্থ দাবি আদায়ের জন্য প্রশাসনিক কর্মকর্তা বা

www.Educationblog24.com

ভূস্বামীর বাসগৃহ ঘেরাও এবং তাকে দাবি মানতে বাধ্য করা। ভাসানী সব সময় সমাজতন্ত্র ও বিপ্লবের কথা বলতেন, কিন্তু ঐ ধরনের লক্ষ্যে পৌঁছার জন্য যে ধরনের বুদ্ধিবৃত্তিক ক্ষমতা, বৈপ্লবিক সুসংগঠিত সংগঠন ও নীতি লাগে, লাগে স্থিরতা ও ধৈর্য্য তার ছিল না। ফলে, ঘেরাও হয়ে দাঁড়ালো জনতার স্বতঃস্ফূর্ত তাৎক্ষণিক মোকাবিলা করার হাতিয়ার যা এক সময় ভাসানীর নিয়ন্ত্রণেও রইলো না। আর ভাসানীর সমাজতন্ত্র ছিল ইসলামী সমাজতন্ত্র। ধর্মের সঙ্গে সমাজতন্ত্রের প্রত্যক্ষ মিশ্রণ হলে সমাজতন্ত্রের মৌল বৈশিষ্ট্যই পরিবর্তিত হয়ে যায়। ভাসানীর সারাটা রাজনৈতিক জীবন এ রকম বৈপরীত্যে ভরা। ১৯৫৬ সালের দিকেই ভাসানী পূর্ব পাকিস্তানের স্বাধীনতার কথা বলেছিলেন। আবার ১৯৬৬ সালে আওয়ামী লীগের ৬ দফার বিরোধিতা করেছিলেন যা ছিল স্বায়ত্তশাসনের দাবি। আইয়ুব খানের পতনের পর ইয়াহিয়া খান যখন সাধারণ নির্বাচনের ঘোষণা দিলেন তখন ভাসানী নির্বাচনে যোগ দিতে অনীহা প্রকাশ করলেন। হয়তো ভোটের থেকে সে মুহূর্তে তাঁর কাছে ভাতের দাবি বড় মনে হয়েছিলো বা সংসদীয় শান্তির বদলে অবিশ্রান্ত আন্দোলন চেয়েছিলেন। এ দিক বিবেচনা করলে ভাসানীর মধ্যে বাংলাদেশের সিভিল সমাজের দুর্বলতার দিকগুলি স্পষ্ট হয়ে উঠছে প্রতীকের মতো। সেগুলি হলো– প্রাথমিক রাজনৈতিক কারকের দোদুল্যমানতা, বিভ্রান্তি, সিদ্ধান্তহীনতা। ভাসানী তাঁর এই বৈপরীত্য ছড়িয়ে দিতে পেরেছিলেন ন্যাপের ছাত্র সংগঠনে যা ১৯৭০ সালে তিন ভাগে বিভক্ত হয়ে গিয়েছিলো। অন্যদিকে, জাতীয়তাবাদের প্রতীক হয়ে দাঁড়িয়েছিলো ছাত্রলীগ। জাতীয়তাবাদী ধারা বেগবান হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ছাত্রলীগও শক্তিশালী হয়ে উঠেছিলো এবং ১৯৭০ সাল থেকে তারা স্বাধীন বাংলাদেশের কথা বলা শুরু করে।

উপর্যুক্ত আলোচনায় যে বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে ওঠে, তাহলো, সিভিল সমাজ সম্পূর্ণভাবে সফল হয়েছে তখন, যখন সমাজের তিনটি পর্যায়ের দাবি ও ক্ষোভ একই মোহনায় মিশেছে। এবং এতে মধ্যবর্তী কারকরা, বিশেষ করে ছাত্ররা পালন করেছে সংযোগকারীর ভূমিকা। তবে প্রান্তিক পর্যায়কে আন্দোলনে সংযুক্ত না করা পর্যন্ত সিভিল সমাজের স্বপ্ন সে ভাবে পূরণ হয়নি। বাংলাদেশে এখনও যখন স্বৈরশাসনের বিরুদ্ধে সিভিল সমাজের প্রতিষ্ঠার আন্দোলনের কথা ওঠে, তখনই সবার মনে ভেসে ওঠে উনসত্তরের গণআন্দোলনের কথা।

সহায়ক গ্রন্থ

লেনিন আজাদ, *উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান : রাষ্ট্র, সমাজ ও রাজনীতি*, ঢাকা, ১৯৯৭
মেসবাহ কামাল, *উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান : শহীদ আসাদ ও শ্রেণী-রাজনীতি প্রসঙ্গ*, ঢাকা ১৯৮৬
মুনতাসীর মামুন ও জয়ন্তকুমার রায়, *বাংলাদেশে সিভিল সমাজ প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম*, ঢাকা ২০১৩ [নতুন সংস্করণ]
মোহাম্মদ ফরহাদ, *উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান*, ঢাকা, ১৯৮৯।

www.Educationblog24.Com

অষ্টম অধ্যায়

১৯৭০-এর নির্বাচন, অসহযোগ আন্দোলন ও বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতা ঘোষণা

১৯৬৯ সালের ২৫ মার্চ আইয়ুব খানের কাছে থেকে ক্ষমতা গ্রহণের পর ২৮ নভেম্বর ১৯৬৯ জেনারেল ইয়াহিয়া ঘোষণা করেন যে যত শীঘ্র সম্ভব তিনি প্রাপ্তবয়স্কদের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করবেন। এই নির্বাচিত প্রতিনিধিদের কাজ হবে দেশকে একটি ব্যবহারযোগ্য শাসনতন্ত্র দেয়া এবং যেসব রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক সমস্যা গণমনকে আলোড়িত করেছে তার একটা সমাধান বের করা। ক্ষমতা হস্তান্তরের প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে ইয়াহিয়া খান দুটি গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। প্রথমত তিনি পশ্চিম পাকিস্তানের এক ইউনিট ব্যবস্থা বাতিল করে সেখানে চারটি নতুন প্রদেশ সৃষ্টি করেন। দ্বিতীয়ত 'এক ব্যক্তি এক ভোট'– এই নীতিতে ভোট হবে বলে ঘোষণা করেন। প্রথম সিদ্ধান্তটি পাকিস্তানের আঞ্চলিকতাবাদে বিশ্বাসী জনগণকে সন্তুষ্ট করে। দ্বিতীয় সিদ্ধান্তের মাধ্যমে পূর্ব পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠতার দাবি মেনে নেয়া হয়।

প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান আরও কতগুলি বিষয়কে 'স্থিরীকৃত' বলে ঘোষণা করেন। এসব বিষয় হচ্ছে :

১. ফেডারেল পার্লামেন্টারি ধরনের সরকার।
২. প্রাপ্তবয়স্ক ভোটাধিকারভিত্তিক প্রত্যক্ষ নির্বাচন।
৩. নাগরিকদের মৌলিক অধিকার দান এবং আইন-আদালতের মাধ্যমে এই অধিকার রক্ষার নিশ্চয়তা বিধানের ব্যবস্থা
৪. বিচার বিভাগের স্বাধীনতা এবং তাকে শাসনতন্ত্র রক্ষকের ভূমিকা দেয়া।
৫. যে আদর্শের ভিত্তিতে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তা অক্ষুণ্ন রাখার জন্য একটি ইসলামি ভাবাদর্শভিত্তিক শাসনতন্ত্র প্রণয়ন।'

১৯৬৯ সালের ২৮ নভেম্বর ইয়াহিয়া খান ঘোষণা করেন যে, ১৯৭০ সালের ৫ অক্টোবর দেশে জাতীয় পরিষদের এবং ২২ অক্টোবর প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। উক্ত জাতীয় পরিষদের কাজ হবে দেশের জন্য একটি সংবিধান প্রণয়ন করা। তিনি ১৯৭০ সালের ২৮ মার্চ জাতির উদ্দেশে এক ভাষণে উক্ত নির্বাচনের 'আইন কাঠামো আদেশ' (Legal frame work order)-এর মূলধারাগুলো ঘোষণা করেন। উক্ত আদেশে নির্বাচন ও জাতীয় পরিষদ গঠন ও এর কার্যাবলি কেমন হবে তা ঘোষণা করেন। আইনগত কাঠামো আদেশের বৈশিষ্ট্য ছিল নিম্নরূপ :

১. পাকিস্তান জাতীয় পরিষদ ৩১৩ জন সদস্য সমন্বয়ে গঠিত হবে। এর মধ্যে ১৩টি আসন মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত থাকবে। মহিলারা সাধারণ আসনেও নির্বাচনের

www.Educationblog24.Com

জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারবেন। ১৯৬১ সালের আদমশুমারির লোকসংখ্যা অনুযায়ী প্রদেশসমূহের মধ্যে সদস্য সংখ্যা নিম্নলিখিতরূপে বন্টন করা হবে :

প্রদেশের নাম	সাধারণ	মহিলা
পূর্ব পাকিস্তান	১৬২	৭
পাঞ্জাব	৮২	৩
সিন্ধু	২৭	১
বেলুচিস্তান	৪	১
উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ	১৮	১
কেন্দ্র শাসিত উপজাতি এলাকা	৭	
মোট	৩০০	১৩

প্রাপ্তবয়স্কদের প্রত্যক্ষ ভোটে জাতীয় পরিষদের সদস্যগণ নির্বাচিত হবেন।

২. প্রত্যেক প্রদেশে একটি করে প্রাদেশিক পরিষদ থাকবে। প্রাদেশিক পরিষদের সদস্য সংখ্যা নিম্নরূপ :

প্রদেশের নাম	সাধারণ	মহিলা
পূর্ব পাকিস্তান	৩০০	১০
পাঞ্জাব	১৮০	৬
সিন্ধু	৬০	২
বেলুচিস্তান	২০	১
উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ	৪০	২
মোট	৬০০	২১

প্রাদেশিক পরিষদের সদস্যবৃন্দও প্রাপ্তবয়স্কদের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত হবেন।

৩. জাতীয় পরিষদে নির্বাচিত সদস্যগণ স্ব-স্ব প্রদেশের সংরক্ষিত মহিলা আসনের প্রার্থীগণকে নির্বাচিত করবেন। প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচিত সদস্যগণ সেই প্রদেশের জন্য সংরক্ষিত মহিলা আসনের প্রার্থীগণকে নির্বাচিত করবেন।

৪. জাতীয় পরিষদের কোনো আসন শূন্য হলে তিন সপ্তাহের মধ্যে উক্ত শূন্য আসন নির্বাচনের মাধ্যমে পূরণ করতে হবে।

৫. ২৫ বৎসর বয়স্ক যে কোনো পাকিস্তানী নাগরিক যার নাম ভোটার তালিকায় লিপিবদ্ধ আছে তিনি নির্বাচনে প্রার্থী হতে পারবেন। তবে আদালত কর্তৃক ঘোষিত বিকৃত মস্তিষ্ক কোনো ব্যক্তি, কিংবা আদালত কর্তৃক দুই বছরের বেশি সময়ের সাজাপ্রাপ্ত কোনো ব্যক্তি সাজা ভোগের পর পাঁচ বছর সময় অতিবাহিত না হয়ে থাকলে, কিংবা ১৯৬৯ সালের ১ আগস্টের পর কোনো- না-কোনো সময় মন্ত্রী

www.Educationblog24.com

www.Educationblog24.com

জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারবেন। ১৯৬১ সালের আদমশুমারির লোকসংখ্যা অনুযায়ী প্রদেশসমূহের মধ্যে সদস্য সংখ্যা নিম্নলিখিতরূপে বন্টন করা হবে :

প্রদেশের নাম	সাধারণ	মহিলা
পূর্ব পাকিস্তান	১৬২	৭
পাঞ্জাব	৮২	৩
সিন্ধু	২৭	১
বেলুচিস্তান	৪	১
উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ	১৮	১
কেন্দ্র শাসিত উপজাতি এলাকা	৭	
মোট	৩০০	১৩

প্রাপ্তবয়স্কদের প্রত্যক্ষ ভোটে জাতীয় পরিষদের সদস্যগণ নির্বাচিত হবেন।

২. প্রত্যেক প্রদেশে একটি করে প্রাদেশিক পরিষদ থাকবে। প্রাদেশিক পরিষদের সদস্য সংখ্যা নিম্নরূপ :

প্রদেশের নাম	সাধারণ	মহিলা
পূর্ব পাকিস্তান	৩০০	১০
পাঞ্জাব	১৮০	৬
সিন্ধু	৬০	২
বেলুচিস্তান	২০	১
উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ	৪০	২
মোট	৬০০	২১

প্রাদেশিক পরিষদের সদস্যবৃন্দও প্রাপ্তবয়স্কদের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত হবেন।

৩. জাতীয় পরিষদে নির্বাচিত সদস্যগণ স্ব-স্ব প্রদেশের সংরক্ষিত মহিলা আসনের প্রার্থীগণকে নির্বাচিত করবেন। প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচিত সদস্যগণ সেই প্রদেশের জন্য সংরক্ষিত মহিলা আসনের প্রার্থীগণকে নির্বাচিত করবেন।

৪. জাতীয় পরিষদের কোনো আসন শূন্য হলে তিন সপ্তাহের মধ্যে উক্ত শূন্য আসন নির্বাচনের মাধ্যমে পূরণ করতে হবে।

৫. ২৫ বৎসর বয়স্ক যে কোনো পাকিস্তানী নাগরিক যার নাম ভোটার তালিকায় লিপিবদ্ধ আছে তিনি নির্বাচনে প্রার্থী হতে পারবেন। তবে আদালত কর্তৃক ঘোষিত বিকৃত মস্তিষ্ক কোনো ব্যক্তি, কিংবা আদালত কর্তৃক দুই বছরের বেশি সময়ের সাজাপ্রাপ্ত কোনো ব্যক্তি সাজা ভোগের পর পাঁচ বছর সময় অতিবাহিত না হয়ে থাকলে, কিংবা ১৯৬৯ সালের ১ আগস্টের পর কোনো- না-কোনো সময় মন্ত্রী

www.Educationblog24.Com

ছিলেন অথচ মন্ত্রিত্বের অবসানের পর দুই বছর অথবা কোনো বিশেষ ক্ষেত্রে প্রেসিডেন্টের অনুমতি অনুসারে ২ বছরের কম কোনো নির্দিষ্ট সময় অতিবাহিত না হয়ে থাকে এমন ব্যক্তি, কিংবা সরকারি লাভজনক পদে অধিষ্ঠিত কোনো ব্যক্তি, কিংবা সরকারি চাকুরি থেকে বহিস্কৃত কোনো ব্যক্তি যদি বহিষ্কারের পর অন্তত পাঁচ বছর কিংবা কোনো বিশেষ ক্ষেত্রে প্রেসিডেন্টের অনুমতি অনুসারে ৫ বছরের কম কোনো নির্দিষ্ট সময় অতিবাহিত না হয়ে থাকে, কিংবা পাকিস্তানের কোনো সরকারি চাকুরের স্বামী বা স্ত্রী হন, কিংবা তিনি আগে দেউলিয়া হন এবং আদালত কর্তৃক দেউলিয়া ঘোষিত হবার পর ১০ বছর অতিক্রান্ত না হয়ে থাকে, ইত্যাদি এমন সকল প্রার্থী নির্বাচনে প্রার্থী হতে পারবেন না।

৬. কোনো ব্যক্তি একই সঙ্গে জাতীয় পরিষদের ও প্রাদেশিক পরিষদের প্রার্থী হতে পারবেন না। কেউ একই সঙ্গে কোনো পরিষদের একাধিক নির্বাচনী এলাকায় প্রার্থী হতে পারবেন তবে একাধিক আসনে নির্বাচিত হলে তাকে নির্বাচনের সরকারি ফলাফল ঘোষণার পনেরো দিনের মধ্যে একটি আসন রেখে বাকিগুলো ছেড়ে দিতে হবে। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে তিনি তা করতে ব্যর্থ হলে তার নির্বাচিত সবগুলি আসন শূন্য বলে বিবেচিত হবে।

৭. কোনো সাংসদ স্পিকার বরাবর স্বহস্তে লিখিত চিঠির মাধ্যমে পদত্যাগ করতে পারবেন। কোনো সদস্য স্পিকারের নিকট থেকে ছুটি না নিয়ে একাদিক্রমে পনেরোটি কার্যদিবসে অনুপস্থিত থাকলে তার সদস্যপদ শূন্য হয়ে যাবে। কোনো সদস্য নির্বাচিত হওয়ার পর সংসদের প্রথম অধিবেশনের সাত দিনের মধ্যে শপথ গ্রহণ করতে ব্যর্থ হলে তার সদস্যপদ শূন্য বলে গণ্য হবে। তবে স্পিকার নির্বাচনে বিলম্ব ঘটলে উপরিউক্ত সময়কাল বাড়ানো যাবে।

৮. জাতীয় পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়ার পর সংবিধান প্রণয়নের উদ্দেশ্যে প্রেসিডেন্ট তার পছন্দমতো দিন, সময় ও স্থানে জাতীয় পরিষদের সভা আহ্বান করবেন। প্রেসিডেন্ট জাতীয় পরিষদের অধিবেশনে ভাষণ দিতে পারবেন।

৯. জাতীয় পরিষদের সদস্যগণ তাদের নিজেদের মধ্য থেকে একজন স্পিকার ও একজন ডেপুটি স্পিকার নির্বাচিত করবেন। স্পিকার কিংবা ডেপুটি স্পিকার পদ শূন্য হলে জাতীয় পরিষদের সদস্যগণ অন্য আরেকজন সদস্যকে স্পিকার কিংবা ডেপুটি স্পিকার পদে নির্বাচিত করবেন। স্পিকার বা ডেপুটি স্পিকার নির্বাচিত না-হওয়া পর্যন্ত নির্বাচন কমিশনার জাতীয় পরিষদের অধিবেশনে সভাপতিত্ব করবেন। স্পিকারের পদ শূন্য হলে ডেপুটি স্পিকার কিংবা ডেপুটি স্পিকারের পদ শূন্য হলে উক্ত পদ পূরণ না-হওয়া পর্যন্ত কমিশনার স্পিকার/ডেপুটি স্পিকারের দায়িত্ব পালন করবেন। স্পিকার অনুপস্থিত থাকলে ডেপুটি স্পিকার, ডেপুটি স্পিকার অনুপস্থিত থাকলে পরিষদ-সদস্যদের কোনো (পরিষদের কার্যবিধান অনুযায়ী) একজন সদস্য স্পিকারের দায়িত্ব পালন করবেন। স্পিকার বা ডেপুটি স্পিকার পরিষদের সদস্যপদ হারালে কিংবা জাতীয় পরিষদ থেকে

www.Educationblog24.com

www.Educationblog24.com

পদত্যাগ করলে কিংবা ২/৩ অংশ পরিষদ-সদস্যদের আস্থা হারালে তার পদ শূন্য হয়ে যাবে।

১০. জাতীয় পরিষদের কোনো অধিবেশনে ১০০ জনের কম সংখ্যক সদস্য উপস্থিত থাকলে অধিবেশনের কাজ চালানো যাবে না, অধিবেশন চলতে চলতে সদস্য সংখ্যা ১০০ জনের কম হয়েছে বলে কোনো সদস্য স্পিকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করলে কোরাম পূর্ণ না-হওয়া পর্যন্ত অধিবেশন স্থগিত রাখবেন কিংবা মুলতবি করে দিবেন।

১১. সদস্যরা পরিষদে বাংলা, উর্দু কিংবা ইংরেজিতে বক্তৃতা দিবেন। পরিষদের কার্যবিবরণীর সরকারি রেকর্ড উর্দু, বাংলা এবং ইংরেজিতে রক্ষিত হবে।

১২. শাসনতন্ত্রে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য আইনকাঠামো আদেশে কতকগুলো মূলনীতি উল্লেখ করে দেয়া হয়। এসব মূলনীতির মধ্যে ছিল :

(১) "জনসংখ্যা এবং প্রাপ্তবয়স্ক ভোটাধিকারের ভিত্তিতে নির্দিষ্ট মেয়াদ পর পর ফেডারেল ও প্রাদেশিক পরিষদসমূহের অবাধ প্রত্যক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে গণতন্ত্রের মূলনীতিসমূহ অনুসরণের নিশ্চয়তা বিধান করা হবে।"

(২) "নাগরিকদের মৌলিক অধিকার বিধিবদ্ধ করা হবে এবং এই অধিকার ভোগের নিশ্চয়তা বিধান করা হবে।"

(৩) "মামলা-মোকদ্দমার বিচার এবং মৌলিক অধিকার রক্ষার ব্যাপারে বিচার বিভাগকে স্বাধীনতা দেয়া হবে।"

(৪) "আইন তৈরি সংক্রান্ত, প্রশাসনিক এবং আর্থিক ক্ষমতাসহ সব রকম ক্ষমতাই ফেডারেল সরকার এবং প্রদেশগুলোর মধ্যে এমনভাবে ভাগ করা হবে যে, প্রদেশগুলো সর্বাধিক স্বায়ত্তশাসন অর্থাৎ সর্বাধিক পরিমাণ আইন-প্রণয়ন সংক্রান্ত, প্রশাসনিক এবং আর্থিক ক্ষমতা ভোগ করবেন কিন্তু একই সঙ্গে ফেডারেল সরকার ও বাইরের ও আভ্যন্তরীণ বিষয়াদিতে তার দায়িত্ব পালন এবং দেশের স্বাধীনতা ও আঞ্চলিক অখন্ডতা অক্ষুন্ন রাখার জন্য পর্যাপ্ত আইন-প্রণয়ন ক্ষমতা, প্রশাসনিক ক্ষমতা এবং আর্থিক ক্ষমতা পাবেন।"

(৫) "নিশ্চয়তা বিধান করতে হবে যেন :

(ক) পাকিস্তানের সব এলাকার জনগণ সব রকম জাতীয় প্রচেষ্টায় পুরোপুরি অংশগ্রহণ করতে সক্ষম হয়। এবং

(খ) একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে আইন করে এবং অন্যান্য ব্যবস্থার মাধ্যমে বিভিন্ন প্রদেশের মধ্যে এবং প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন এলাকার মধ্যে অর্থনৈতিক এবং অন্য সব রকম বৈষম্য দূর করা হয়।"

(৬) "শাসনতন্ত্রের উপক্রমণিকায় এই মর্মে ঘোষণা থাকতে হবে যে– (ক) পাকিস্তানের মুসলমানরা ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত পর্যায়ে, পবিত্র কোরান ও সুন্না মোতাবেক ইসলামের শিক্ষা অনুসারে তাদের জীবন গড়ে তুলতে পারেন। এবং

www.Educationblog24.Com

(খ) সংখ্যালঘুরা অবাধে তাদের ধর্ম-পালন এবং পাকিস্তানের নাগরিক হিসেবে সব রকম অধিকার, সুযোগ-সুবিধা এবং নিরাপত্তা ভোগ করতে পারেন।"

১৩. ইয়াহিয়া খান ঘোষিত 'আইন কাঠামো আদেশ'-এর উপক্রমণিকায় উল্লেখ করা হয় যে এই আদেশের সঙ্গে সংগতি রেখে পাকিস্তানের শাসনতন্ত্র তৈরি করতে হবে। আদেশের ১৪(১) অনুচ্ছেদে বলা হয় যে, জাতীয় পরিষদ সাধারণ নির্বাচন শেষ হওয়ার পর পকিস্তানের শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করার জন্য প্রেসিডেন্ট তার বিবেচনামতো উপযুক্ত তারিখ, সময় ও স্থানে পরিষদের অধিবেশন ডাকবেন। জাতীয় পরিষদ তার প্রথম অধিবেশনের সময় থেকে ১২০ দিনের মধ্যে 'শাসনতন্ত্র বিল' নামক একটি বিলের আকারে শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করবেন এবং তা করতে ব্যর্থ হলে পরিষদ বাতিল হয়ে যাবে। জাতীয় পরিষদে পাসকৃত বিল প্রেসিডেন্টের অনুমোদনের জন্য পেশ করা হবে। উক্ত বিলে প্রেসিডেন্ট অনুমোদন না-দেয়া পর্যন্ত জাতীয় পরিষদ আইনসভা হিসেবে তার কাজ শুরু করতে পারবেন না। উক্ত বিল প্রেসিডেন্টের অনুমোদন লাভে ব্যর্থ হলে জাতীয় পরিষদ বিলুপ্ত হয়ে যাবে। শাসনতন্ত্র বিলে প্রেসিডেন্ট অনুমোদন না-দেয়া পর্যন্ত প্রাদেশিক পরিষদগুলোর অধিবেশন ডাকা হবে না।

আইন কাঠামো আদেশের সংশোধনী

আইন কাঠামো আদেশের অন্তর্ভুক্ত কোনো বিষয়ে ব্যাখা-বিশ্লেষণের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিলে তা প্রমাণ করবেন প্রেসিডেন্ট। এতদসংক্রান্ত প্রেসিডেন্টের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত গণ্য হবে এবং তাকে কোনো আদালতে চ্যালেঞ্জ করা যাবে না। প্রেসিডেন্ট কেবল এই আদেশের যে কোনো ধারা সংশোধন করতে পারবেন। এ বিষয়ে জাতীয় সংসদের কোনো ক্ষমতা থাকবে না।

আইন কাঠামো আদেশের প্রতিক্রিয়া

এই আদেশের মাধ্যমে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান যে জাতীয় সংসদের রূপরেখা ঘোষণা করেন তা ছিল এক দুর্বল জাতীয় সংসদ। জাতীয় সংসদের অস্তিত্ব নির্ভরশীল ছিল প্রেসিডেন্টের ইচ্ছের ওপর। একশো বিশ দিনের মধ্যে সংবিধান প্রণয়ন ও তাতে প্রেসিডেন্টের সম্মতি নিতে ব্যর্থ হলে যে জাতীয় সংসদ বিলুপ্ত হয়ে যাবে সে-সংসদকে সার্বভৌম সংসদ বলা যায় না। বস্তুত আইয়ুব খানের ন্যায় ইয়াহিয়া খানও সংসদীয় গণতন্ত্রে বিশ্বাসী ছিলেন না। ইয়াহিয়া খানের বিশ্বাস ছিল যে নির্বাচনে কোনো দলই নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করতে সক্ষম হবে না। সুতরাং একশো বিশ দিনের মধ্যে সংবিধান প্রণয়ন কোনো দলের পক্ষেই সম্ভব নয়। এই বিশ্বাস থেকেই তিনি আইন কাঠামো আদেশে সংসদীয় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার আশ্বাস দিয়ে একশো বিশ দিনের বাধ্যবাধকতা জুড়ে দেন। স্বভাবতই আওয়ামী লীগ ও ন্যাপ (উভয় গ্রুপ)সহ অনান্য গণতন্ত্রমনা দলসমূহ আইন কাঠামো আদেশ থেকে অগণতান্ত্রিক ধারাসমূহ বাদ দেয়ার দাবি জানান। তারা বিশেষ করে জাতীয় সংসদের সার্বভৌমত্ব ক্ষুন্নকারী ধারা ও জাতীয় সংসদ-সদস্যদের ক্ষমতা সংকোচন করে এমন ধারাসমূহের বিরোধিতা করেন। আইন

www.Educationblog24.com

www.Educationblog24.com

কাঠামো আদেশ থেকে অগণতান্ত্রিক ধারা ও সকল রাজবন্দিদের মুক্তির দাবিতে ন্যাপ (ওয়ালী) ২৬ এপ্রিল (১৯৭০) দাবি দিবস পালন করে। পক্ষান্তরে সকল ডানপন্থী দলসমূহ উক্ত আইন কাঠামো আদেশ মেনে নেয়। শেষ পর্যন্ত বিরোধীদলসমূহের কোনো দাবির প্রতি ইয়াহিয়া খান কর্ণপাত করেননি। তিনি ঘোষণা করেন যে জনগণের সার্বভৌম ক্ষমতা সংকোচন করার কোনো ইচ্ছে তার নেই। জাতীয় সংসদ যে সংবিধান প্রণয়ন করবে তাতে প্রেসিডেন্টের সম্মতি দেয়ার যে-বিধান আইন কাঠামো আদেশে উল্লেখ করা হয়েছে তাও চিরাচরিত প্রথা মাত্র।

ইয়াহিয়া খান ঘোষিত আইন কাঠামো আদেশের বিরূপ সমালোচনা করলেও ভাসানী ন্যাপ বাদে অন্য দলগুলি নির্বাচনে অংশগ্রহণের সিদ্ধান্ত নেয়। আওয়ামী লীগ নেতা শেখ মুজিবুর রহমান নির্বাচনে ব্যাপক জনসমর্থন বিষয়ে নিশ্চিত ছিলেন। তিনি নির্বাচনকে ৬ দফা ও ১১ দফা দাবিসমূহের ওপর 'রেফারেন্ডাম' হিসেবে অভিহিত করেন। তিনি নির্বাচনকে সকল শোষণ ও বঞ্চনার প্রতিবাদ করার সুযোগ বলে মনে করেন। তিনি ঘোষণা করেন যে, আসন্ন নির্বাচন হচ্ছে ব্যালটের মাধ্যমে পূর্ববাংলার জনগণের দাবি আদায়ের সর্বশেষ সংগ্রাম। ন্যাপ (ওয়ালী) নেতা অধ্যাপক মোজাফফর আহমেদ ঘোষণা করেন যে, নির্বাচনের মাধ্যমে একটি সংসদ প্রতিষ্ঠা করে নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে জনগণের দাবি আদায় করতে হবে। ন্যাপ-নেতা ওয়ালী খান জনগণকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে নির্বাচনের অংশগ্রহণের আহ্বান জানান। কিন্তু মওলানা ভাসানী নির্বাচনের ব্যাপারে পরস্পরবিরোধী বক্তব্য প্রদান করতে থাকেন। তিনি একদিকে সংসদীয় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার কথা বলেন, আবার 'ভোটের আগে ভাত চাই' স্লোগানও উত্থাপন করেন। তিনি নির্বাচনে তার দলের অংশগ্রহণের ব্যাপারে দুই পূর্বশর্ত আরোপ করেন : এক. জাতীয় সংসদে কৃষক ও শ্রমিকদের জন্য আসন নির্দিষ্ট করতে হবে; দুই. নির্বাচনের পূর্বেই ১৯৪০ সালের লাহোর প্রস্তাবের আলোকে পূর্ববাংলার স্বায়ত্তশাসনের প্রশ্নের মীমাংসা করতে হবে। শেষপর্যন্ত মওলানা ভাসানীর দল নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেনি। 'পাকিস্তান ন্যাশনাল লীগ'ও এই নির্বাচন বয়কট করে।

নির্বাচন

পাকিস্তানের প্রায় এগারোটি রাজনৈতিক দল এই নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে। তবে প্রায় সকল প্রধান দলসমূহ, যেগুলি সে-সময় শক্তিশালী রাজনৈতিক দল হিসেবে বিবেচিত হতো– সেগুলো মূলত ছিল আঞ্চলিক। যেমন, আওয়ামী লীগের জনপ্রিয়তা ছিল পূর্ব পাকিস্তানে কিন্তু পশ্চিম পাকিস্তানে এর কোনো সমর্থন ছিল না। তদনুরূপ ভুট্টোর পাকিস্তান পিপলস পার্টির জনসমর্থন ছিল সিন্ধু ও পাঞ্জাব প্রদেশদ্বয়ে, অন্যত্র তার সমর্থন ছিল না। ওয়ালী ন্যাপের সমর্থন বেশি ছিল বেলুচিস্তান ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে। অপরদিকে সর্বপাকিস্তান ভিত্তিক যে-দলগুলি তখন ছিল সেগুলি কেবল নামেই ছিল সর্বপাকিস্তানী, বাস্তবে কোনো প্রদেশেই এগুলির কোনো ব্যাপক জনসমর্থন ছিল না।

পূর্ব পাকিস্তানে যে-দলগুলি নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে সেগুলি হচ্ছে : আওয়ামী

www.Educationblog24.Com

লীগ, ন্যাপ (ওয়ালী), পাকিস্তান মুসলিম লীগ (কাইয়ুম), পাকিস্তান মুসলিম লীগ (কনভেনশন), পাকিস্তান মুসলিম লীগ (কাউন্সিল), পাকিস্তান ডেমোক্রেটিক পার্টি, জামায়াত-ই-ইসলামী প্রভৃতি।

১৯৭০ সালের ১ জানুয়ারি সকল রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করা হয়। ফলে সেদিন থেকেই নির্বাচনী প্রচারাভিযান শুরু হয়।

বিভিন্ন দলের নির্বাচনী মেনিফেস্টো

আওয়ামী লীগ

আওয়ামী লীগ ছয়দফাকে নির্বাচনী মেনিফেস্টো হিসেবে ঘোষণা করে। তারা নির্বাচনকে ছয়দফা ও এগারো দফার প্রশ্নে একটি গণভোট বলে অভিহিত করেন। নির্বাচনে জয়লাভ করলে ছয়দফার ভিত্তিতে পাকিস্তানের ভবিষ্যৎ সংবিধান প্রণয়ন করবে বলে প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়। আওয়ামী লীগ 'জয় বাংলা' স্লোগানকে বাঙালি জাতীয়তাবাদের প্রতীক হিসেবে গ্রহণ করে এবং এই স্লোগানটি ব্যাপক জনপ্রিয়তা অর্জন করে। ১ ডিসেম্বর ১৯৭০ রেডিও-টিভিতে শেখ মুজিব যে নির্বাচনী ভাষণ দেন তাতে তার দলের নির্বাচনী মেনিফেস্টো সংক্ষেপে নিম্নরূপ তুলে ধরেন :

...জনগণের ত্যাগ ও নিরবচ্ছিন্ন সংগ্রামের ফল হচ্ছে এই সাধারণ নির্বাচন। সারা দেশ ও দেশের মানুষকে তীব্র সংকট ও দুর্গতি থেকে চিরদিনের মতো মুক্ত করার সুযোগ এই নির্বাচনের মধ্যে দিয়ে গ্রহণ করা যেতে পারে। ...স্বাধীনতার তেইশ বছরের মধ্যে শাসনতন্ত্র প্রণয়নের মূল দায়িত্ব এবং অধিকার সর্বপ্রথম এবারই জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিরা লাভ করেছে। তাই এই নির্বাচনের গুরুত্ব অপরিসীম। ...ভোটাধিকারের নির্ভুল প্রয়োগের মাধ্যমে সেই মহাসুযোগ ও দায়িত্ব যদি আমরা কুচক্রীদের কাছ থেকে ছিনিয়ে আনতে পারি তাহলে কৃষক-শ্রমিক সর্বহারা মানুষের দুঃখ মোচন এবং বাঙলার মুক্তিসনদ ৬ দফা ও ১১ দফা বাস্তবায়িত করা যাবে।

আইয়ুব আমলে ঘোষিত ছয়দফা কর্মসূচি ইতোমধ্যে ব্যাপক জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। বস্তুত ছয়দফা ও এগারো দফার আন্দোলনের মাধ্যমে আইয়ুবের পতন ঘটে। এখন নির্বাচনের বিজয় অর্জনের মাধ্যমে ছয়দফা দাবির বাস্তবায়নের সুযোগ বাঙালি জনগোষ্ঠীর সামনে উপস্থিত হয়। শেখ মুজিব ঘোষণা করেন যে, ক্ষমতায় বসার জন্য নির্বাচনে জয়লাভ তার উদ্দেশ্য নয়, বাঙালির শোষণ ও বঞ্চনার অবসানের জন্যই নির্বাচনে জয়লাভ অত্যাবশ্যক। তিনি আরও ঘোষণা করেন যে, বাঙালিরা পাকিস্তানের মোট জনসংখ্যার ৫৬ ভাগ। সুতরাং আমরা সংখ্যালঘিষ্ঠদের উপনিবেশ হয়ে থাকতে চাই না। আমাদেরকে স্বশাসন প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

ন্যাপ (ওয়ালী)

ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (ওয়ালী)-এর পূর্ব পাকিস্তান শাখা পূর্ব পাকিস্তানের স্বায়ত্তশাসনের দাবিকে তাদের নির্বাচনী মেনিফেস্টোতে অগ্রাধিকার দিলেও ক্ষমতার বন্টন প্রশ্নে আওয়ামী লীগের ছয়দফা থেকে তাদের দাবি অনেক নমনীয় ছিল। ন্যাপ (ওয়ালী) কেন্দ্রের হাতে প্রতিরক্ষা, বৈদেশিক বিষয় ও মুদ্রা রেখে বাকি বিষয়গুলি প্রদেশের হাতে দেয়ার পক্ষপাতী ছিল। আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে তাদের অভিযোগ এই যে, এই দলটি বাঙালি বুর্জোয়াদের দল এবং তারা পশ্চিম পাকিস্তানী বুর্জোয়া গোষ্ঠীর

www.Educationblog24.com

একচেটিয়া সুযোগ সুবিধার অংশীদারিত্ব চায়। ন্যাপ (ওয়ালী) বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রে বিশ্বাসী ছিল। তবে তা অর্জনের লক্ষ্যে তারা একটি গণতান্ত্রিক ও ধর্মনিরপেক্ষ সরকার প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে নির্বাচনে অংশগ্রহণের সিদ্ধান্ত নেয়। তাদের নির্বাচনী স্লোগান ছিল : 'বাংলার কৃষক-শ্রমিক জাগো'। ইসলামি দলগুলির সমালোচনা করে ন্যাপ (ওয়ালী) বলে যে, তারা ধর্মের নামে জনগণকে ধোঁকা দেয়ার উদ্দেশ্যেই ইসলাম ব্যবহার করছে। প্রদেশের প্রতিক্রিয়াশীল ইসলামি দলগুলোর বিরুদ্ধে আওয়ামী লীগ ও দুই ন্যাপের নির্বাচনী ঐক্যজোট গঠনের জন্য ন্যাপ (ওয়ালী) উদ্যোগ গ্রহণ করে। কিন্তু আওয়ামী লীগ এ ধরনের জোট গঠনে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করলে ন্যাপের উদ্যোগ ব্যর্থ হয়।

ন্যাপ (ভাসানী)

নির্বাচনে অংশগ্রহণ করবে কি করবে না এই নিয়ে ভাসানী ন্যাপ বরাবরই দ্বিধাদ্বন্দ্বে ছিল। এই দলটি বিপ্লবের মাধ্যমে জনগণের অধিকার আদায়ের নীতিতে বিশ্বাসী ছিল। ইয়াহিয়া খান নির্বাচনের তারিখ ঘোষণা করলে এই দল নির্বাচনের পূর্বেই পূর্ব পাকিস্তানের জন্য আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন প্রদান এবং জাতীয় সংসদের কৃষক ও শ্রমিকের জন্য আসন বরাদ্দ প্রভৃতি পূর্বশর্ত আরোপ করে। অবশেষে ১৯৭০ সালে ১২ নভেম্বর দক্ষিণ বাংলায় যে ভয়াবহ সাইক্লোন সংঘটিত হয় তার পরিপ্রেক্ষিতে ভাসানী ন্যাপ নির্বাচন স্থগিত/বাতিল রাখার দাবি পেশ করেন।

পাকিস্তান ডেমোক্রেটিক পার্টি (পিডিপি)

পিডিপি কেন্দ্রকে শক্তিশালী রেখে প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন প্রদানের নীতিতে বিশ্বাসী ছিল। তারা কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে প্রতিরক্ষা, বৈদেশিক সম্পর্ক, অর্থ, মুদ্রা, আন্তঃপ্রাদেশিক ও বৈদেশিক বাণিজ্য এবং যোগাযোগ বিষয়ক ক্ষমতা অর্পণের নীতিতে বিশ্বাসী ছিল। পার্টি মেনিফেস্টোতে দাবি করা হয় যে, দুই প্রদেশের মধ্যে সকল ধরনের বৈষম্য যেন দশ বছরে দূর করা যায় সে লক্ষ্যে সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতা সংবিধানে উল্লেখ করা উচিত। এই দল বিশ্বাস করত যে কেবলমাত্র ধর্মীয় বন্ধনে পাকিস্তানের উভয় অংশের ঐক্য অটুট রাখা সম্ভব। পিডিপি নেতা নূরুল আমিন আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে বিচ্ছিন্নতাবাদিতার অভিযোগ উত্থাপন করে। তিনি বলেন যে, আওয়ামী লীগের ছয়দফা দাবিকে নির্বাচনী রেফারেন্ডাম হিসেবে গণ্য করায় আওয়ামী লীগ যদি পূর্ব পাকিস্তানে জনসমর্থন অর্জন সত্ত্বেও পশ্চিম পাকিস্তানে জনসমর্থন অর্জন করতে ব্যর্থ হয় সেক্ষেত্রে পাকিস্তানের দুই অংশের ঐক্য অটুট রাখা অসম্ভব হয়ে পড়বে।

জামায়াতে ইসলামি

এই দেশে ইসলামি শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার নীতিতে বিশ্বাসী ছিল। তারা অপরাপর ইসলামি দল এবং মুসলিম লীগের বিরুদ্ধে এই বলে অভিযোগ উত্থাপন করে যে ঐ সকল দল ইসলামকে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ব্যবহার করছে। জামায়াতে ইসলামির মতে পার্লামেন্ট কেন্দ্রীয় সরকারের অনুসৃত ভুল নীতির কারণে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে বৈষম্য বেড়েছে। জামায়াত ১৯৫৬ সালের সংবিধানের কিছু পরিবর্তন করে উক্ত সংবিধান পুনঃপ্রবর্তনের পক্ষে মত প্রকাশ করে। পূর্ব পাকিস্তানের স্বায়ত্তশাসনের দাবির

www.Educationblog24.Com

প্রশ্নে জামায়াতের অভিমত ছিল যে বিভিন্ন প্রদেশকে এতটুকু স্বায়ত্তশাসন প্রদান করা উচিত যা দেশের ঐক্য ও সংহতি বিনষ্ট করবে না। জামায়াত আওয়ামী লীগের ছয়দফার সমালোচনা করে বলে যে ছয়দফা কর্মসূচি পাকিস্তানের সংহতি বিনষ্ট করবে। পূর্ব পাকিস্তান জামাতের নেতা অধ্যাপক গোলাম আযম আওয়ামী লীগ নেতা শেখ মুজিবুর রহমান ও আওয়ামী লীগের ছয়দফা কর্মসূচির কঠোর সমালোচনা করে বলেন যে বাঙালি জাতীয়তাবাদের উন্মেষ পাকিস্তানের অখন্ডতার প্রতি হুমকিস্বরূপ। জামায়াত দৃঢ়ভাবে ঘোষণা করে যে, পূর্ব পাকিস্তানের অর্থনৈতিক ও অন্যান্য সমস্যার সমাধান সমাজতান্ত্রিক কিংবা ধর্মনিরপেক্ষ কর্মসূচির দ্বারা সম্ভব নয়, কেবলমাত্র ইসলামী অর্থনীতিই পারে পাকিস্তানের সকল সমস্যার সমাধান করতে।

কাউন্সিল মুসলিম লীগ

কাউন্সিল মুসলিম লীগ প্রধান পাঞ্জাবের মিঞা মমতাজ দৌলতানা পাকিস্তানে ইসলামি আদর্শ প্রতিষ্ঠার কথা বলেন, তিনি আওয়ামী লীগের ছয়দফার কঠোর সমালোচনা করেন এবং বলেন যে, ছয়দফার বাস্তবায়ন হলে পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকার দুর্বল ক্ষমতাহীন ও অকার্যকর হয়ে পড়বে। এই দল যে-কোনো ধরনের সমাজতন্ত্রের বিরোধী ছিল। দলের নেতৃবৃন্দ বাঙালি জাতীয়তাবাদ ও ধর্মনিরপেক্ষতা নীতির কঠোর সমালোচনা করে।

কনভেনশন মুসলিম লীগ

কনভেনশন মুসলিম লীগ শক্তিশালী কেন্দ্রীয় সরকারের নীতিতে বিশ্বাসী ছিল। তারা পাকিস্তানে ইসলামি আদর্শ অনুসরণের পক্ষপাতী ছিল। অন্য দুই মুসলিম লীগের ন্যায় এই দলও ভারত-বিরোধী পররাষ্ট্র নীতি অনুসরণের পক্ষপাতী ছিল। এই দলের নেতা ফজলুল কাদের চৌধুরী সমাজতন্ত্র ও বাঙালি জাতীয়তাবাদের ঘোর বিরোধী ছিলেন।

কাইয়ুম মুসলিম লীগ

এই দলও ভারত-বিরোধী ছিল। দলের নেতৃবৃন্দ শেখ মুজিবুর রহমানকে এই বলে অভিযুক্ত করেন যে, তিনি ভারতের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করে পাকিস্তানকে খন্ডিত করতে চান।

এই দল শক্তিশালী কেন্দ্রের পক্ষপাতী ছিল। দেশে ইসলামী শাসন প্রতিষ্ঠাই দলের লক্ষ্য বলে প্রচার করা হয়।

উপরে উল্লেখিত দলসমূহের কর্মসূচি বিশ্লেষণ করলে তৎকালীন রাজনৈতিক দলগুলিকে তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়– প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনে বিশ্বাসী দল, সমাজতন্ত্রে বিশ্বাসী দল ও ডানপন্থী দলসমূহ যারা শক্তিশালী কেন্দ্রীয় সরকার এবং ইসলামী ভাবধারার শাসনতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় বিশ্বাসী ছিল।

পূর্ব পাকিস্তান থেকে জাতীয় পরিষদে দলভিত্তিক প্রার্থী সংখ্যা

১৯৭০-এর নির্বাচনে জাতীয় পরিষদে আসনসংখ্যা ছিল সাধারণ ৩০০ এবং মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত ১৩টি। এর মধ্যে পূর্ব পাকিস্তানের জন্য নির্ধারিত হয়েছিল সাধারণ ১৬২ এবং মহিলা ৭টি। ১৬২টি আসনের জন্য দলভিত্তিক প্রার্থীসংখ্যা ছিল

www.Educationblog24.Com

নিম্নরূপ :

দল	নির্বাচনী প্রতীক	প্রার্থী সংখ্যা
আওয়ামী লীগ	নৌকা	১৬২
মুসলিম লীগ (কনভেনশন)	সাইকেল	৯৩
মুসলিম লীগ (কাইয়ুম)	বাঘ	৬৫
মুসলিম লীগ (কাউন্সিল)	হারিকেন	৫০
জামায়াতে ইসলামি	দাঁড়িপাল্লা	৬৯
জমিয়াতুল উলেমা ও নেজামে ইসলামি	বই	৪৫
জমিয়তে ওলামায়ে ইসলাম	খেজুর গাছ	১৩
শর্ষিনার পীরের ইসলামিক গণতন্ত্রী দল	গাভী	৫
পাকিস্তান দরদী সংঘ	গরুর গাড়ি	১
কৃষক-শ্রমিক পার্টি	হুঁকা	৩
ন্যাপ (ভাসানী)	ধানের শীষ	১৫
ন্যাপ (মোজাফফর)	কুঁড়েঘর	৩৬
পাকিস্তান ন্যাশনাল লীগ	লাঙ্গল	১৩
বেলুচিস্তান যুক্তফ্রন্ট	চেয়ার	১
পিডিপি	ছাতা	৮১
জাতীয় গণমুক্তি দল (সংখ্যালঘু)	মোমবাতি	৪
জাতীয় কংগ্রেস (সংখ্যালঘু)	কলম	৪
স্বতন্ত্র প্রার্থী		১০৯
	মোট	৭৬৯ জন

উপরের পরিসংখ্যান থেকে লক্ষ্য করা যায় যে, এক আওয়ামী লীগ ছাড়া অন্য আর কোনো দলই পূর্ব পাকিস্তানে সবকয়টি আসনে প্রার্থী দাঁড় করাতে পারেনি। আইয়ুবের কনভেনশন মুসলিম লীগ সবকয়টি আসনে প্রার্থী দিতে না পারলেও দ্বিতীয় বৃহত্তম দল ছিল। বামপন্থী দলগুলোর বিষয়ে ইত্তেফাক মন্তব্য করেছে যে:

'সমাজতন্ত্রী শিবিরে ব্যাহত বিরোধ পরিদৃষ্ট হইলেও ভিতরে ভিতরে তাহাদের মধ্যে যে একটি নির্বাচনী সমঝোতা আছে... কোনো আসনেই এক ন্যাপ অপর ন্যাপের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অবতীর্ণ হয়নি।

ইসলামপন্থী দলগুলির বিষয়ে ইত্তেফাকের মন্তব্য ছিল নিম্নরূপ:

ইসলাম-পছন্দ শিবির পাঁচটি দলে বিভক্ত। মুখে সকলেরই ইসলামের বাণী ও বুলি অথচ কেহ 'দাঁড়িপাল্লা', কেহ 'বই', কেহ 'খেজুর গাছ', কেহ 'গাভী', কেহ 'গরুর গাড়ি প্রতীক লইয়া নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতেছে। ইসলামের প্রশ্নে প্রতিপক্ষের বক্তব্যে তাহারা যত সমালোচনাই করুন না কেন, তাহাদের এই বিভেদ অর্থাৎ ভিন্ন ভিন্ন নির্বাচনী প্রতীকই

www.Educationblog24.Com

প্রমাণ করিয়াছে যে, রাজনীতির সহিত ধর্মকে জড়িত করা চলে না। করিলে ন্যায় ও সত্যের, শান্তি ও সুন্দরের ধর্ম ইসলাম বিতর্কের বস্তুতেই পরিণত হয়।

নির্বাচনে পাকিস্তানে মোট ভোটারের সংখ্যা ছিল ৫ কোটি ৬৪ লাখের উপর, তন্মধ্যে পূর্ব পাকিস্তানে ৩ কোটি ২২ লক্ষ এবং পশ্চিম পাকিস্তানে ২ কোটি ৫২ লক্ষ (মোট জনসংখ্যা ১১ কোটি ৫০ লক্ষ)। জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের সাধারণ আসনসমূহে সরাসরি বয়স্ক ভোটাধিকারের ভিত্তিতে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। সংরক্ষিত মহিলা আসনের প্রার্থীরা নির্বাচিত প্রতিনিধিদের দ্বারা পরে নির্বাচিত হন।

পাকিস্তানের প্রধান নির্বাচন কমিশনার ছিলেন বিচারপতি আবদুস সাত্তার। পাকিস্তান ন্যাশনাল লীগ প্রধান আতাউর রহমান খান নির্বাচন বয়কটের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করলেও এবং ভাসানী ন্যাপ নির্বাচন প্রত্যাখ্যান করলেও ব্যালট পেপারে তাদের নাম ছিল। নির্বাচনে মওলানা ভাসানী, আতাউর রহমান খান, ইউসুফ আলী চৌধুরী, কৃষক-শ্রমিক পার্টির সভাপতি এ. এস. এম, সোলায়মান ভোট দেননি।

১৯৭০ সালের নির্বাচনের ফলাফল এবং তা মেনে নিতে কেন্দ্রের অস্বীকৃতি

১৯৭০ সালের ৫ অক্টোবর জাতীয় পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু সেপ্টেম্বর মাসে পূর্ব পাকিস্তানে প্রবল বন্যা হয়। বন্যার জন্য ভোটারদের ভোট দানে অসুবিধার কথা বিবেচনা করে প্রেসিডেন্ট জাতীয় পরিষদের নির্বাচনের তারিখ ঠিক করেন ১৯৭০ সালের ৭ ডিসেম্বর এবং প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচনের তারিখ নির্দিষ্ট হয় ১৭ ডিসেম্বর। কিন্তু ১৯৭০ সালে ১২ নভেম্বর দক্ষিণ বাংলায় অনুষ্ঠিত এক ভয়াবহ ঘূর্ণিঝড় প্রায় দুই লক্ষ লোকের জীবন কেড়ে নেয়। অসংখ্য বাড়িঘর ধ্বংস হয়। ঘূর্ণিঝড় আক্রান্ত এলাকা এক ধ্বংসযজ্ঞে পরিণত হয়। এই বিপর্যয়ের পরিপ্রেক্ষিতে প্রায় সকল দল নির্বাচন পিছিয়ে দেয়ার দাবি জানান। কিন্তু আওয়ামী লীগ তার দৃঢ় প্রতিবাদ করে। আওয়ামী লীগ নেতা শেখ মুজিবুর রহমান ঘোষণা করেন :

If the polls are frustrated, the people of Bangladesh will owe it to the million who have died to make the supreme sacrifice of another million lives, if need be, so that we can live as a free people and so that Bangladesh can be the master of its own destiny. (Morning News. Nov. 27. 1970).

এই ঘূর্ণিঝড় বাঙালিদের প্রতি পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠীর অবহেলা ও উপেক্ষার মনোভাব নতুন করে প্রমাণ করে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এই সুযোগটি গ্রহণ করেন। তিনি দুর্গতদের প্রতি পাকিস্তান সরকারের অবজ্ঞা প্রদর্শনের কঠোর সমালোচনা করে বলেন।

A massive rescues and relief operation, if launched within 24 hours of the occurrence, could have saved thousands of lives. Thousand of survivors could have been saved from death due to starvation, exposure

www.Educationblog24.Com

and lack of medical attention. Had the navy rushed into the area it could have rescued thousand who had been swept into the sea. The failure to launch such a relief and rescues operation is unforgivable.... we are confirmed today in our convention that if we are to save the people of Bangladesh from the ravages of nature, as of their fellowmen we must attain full /regional autonomy of the basis of the 6 point/11 point formula.

নির্বাচনের ফলাফল

জাতীয় সংসদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় ১৯৭০ সালের ৭ ডিসেম্বর। পাকিস্তান জাতীয় পরিষদের নির্বাচনের ফলাফল প্রদেশ এবং দলভিত্তিক নিম্নরূপ:

দলের নাম	প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীরসংখ্যা	প্রদেশ অনুসারে ফলাফল							মোট মহিলাসহ
		পূর্ব পাক	পাঞ্জাব	সিন্ধু	উ.প. সী.প্রদ	বেলু চিস্তান	উপজাতির এলাকা	মহিলা	
আওয়ামী লীগ	১৬২	১৬০	×	×	×	×	×	৭	১৬৭
পাকিস্তান পিপলস পার্টি	১২২	×	৬৪	১৮	১	×	×	৫	৮৮
মুসলিম লীগ (কাইয়ুম)	১৩২	×	১	১	৭	×	×	×	৯
মুসলিম লীগ (কাউন্সিল)	১১৯	×	৭	×	×	×	×	×	৭
জামায়াত-উল-উলামায়ে ইসলাম	৯৩	×	×	×	৬	১	×	×	৭
মারকাজ-ই-জামায়াত-উল-উলামায়ে ইসলাম	?	×	৪	৩	×	×	×	×	৭
ন্যাপ (ওয়ালী)	৬১	×	×	×	৩	৩	×	১	৭
জামায়াতে ইসলাম	২০০	×	১	২	১	×	×	×	৪
মুসলিম লীগ (কনভেনশন)	১২৪	×	২	×	×	×	×	×	২
পাকিস্তান ডেমোক্রেটিক পার্টি	১০৮	১	×	×	×	×	×	×	১
স্বতন্ত্র প্রার্থী	৩০০	১	৩	৩	×	×	৭	×	১৪
মোট		১৬২	৮২	২৭	১৮	৪	৭	১৩	৩১৩

জাতীয় পরিষদ নির্বাচনে দুটি রাজনৈতিক দল প্রধান হয়ে দেখা দেয়। নির্বাচনে পূর্ব পাকিস্তানে আওয়ামী লীগ নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে। পূর্ব পাকিস্তানের জন্য নির্ধারিত ১৬৯টি আসনের মধ্যে ১৬৭টি আসন আওয়ামী লীগ লাভ করে। বাকি ২টি আসনের ১টি পায় পিডিপি নেতা নূরুল আমিন, অপরটি একজন স্বতন্ত্র সদস্য। ১০দিন পর অনুষ্ঠিত পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক পরিষদ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ ৩০০টি আসনের মধ্যে ২৮৮টি আসন লাভ করে। অপরপক্ষে জাতীয় পরিষদ নির্বাচনে পাকিস্তান পিপলস পার্টি পশ্চিম পাকিস্তানে ১৪৪টি আসনের মধ্যে ৮৮টি আসন লাভ করে।

www.Educationblog24.com

www.Educationblog24.Com

পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচনের ফলাফল

দলের নাম	সাধারণ আসন	সংরক্ষিত মহিলা আসন	মোট আসন
আওয়ামী লীগ	২৮৮	১০	২৯৮
পাকিস্তান ডেমোক্রেটিক পার্টি	২	×	২
পাকিস্তান পিপলস পার্টি	×	×	×
মুসলিম লীগ (কাউন্সিল)	×	×	×
মুসলিম লীগ (কনভেনশন)	×	×	×
মুসলিম লীগ (কাইয়ুম)	×	×	×
ন্যাপ (ওয়ালী)	১	×	১
জামায়াতে ইসলামি	×	×	×
নেজামে ইসলামি	×	×	×
জামায়াত-উল-উলামায়ে ইসলাম	×	×	×
মারকাজে আহলে হাদীস	×	×	×
জামায়েত-ই-উলামায়ে ইসলাম (হাজারী)	×	×	×
জামায়েত-ই-উলামায়ে ইসলাম (নূরানী)	×	×	×
স্বতন্ত্র প্রার্থী	৭	×	৭
মোট	৩০০	১০	৩১০

সংগঠনের দিক থেকে আওয়ামী লীগ ও পিপিপি-উভয়েই ছিল আঞ্চলিক। আওয়ামী লীগের প্রতিনিধিরা সকলেই পূর্ব পাকিস্তানী এবং পিপিপি'র সকলেই পশ্চিম পাকিস্তানী। পূর্ব পাকিস্তানে আওয়ামী লীগ জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের প্রায় সবগুলি আসন লাভ করলেও পশ্চিম পাকিস্তানে তারা কোনো আসন পায়নি। পক্ষান্তরে জুলফিকার আলী ভুট্টোর পাকিস্তান পিপলস পার্টি (পিপিপি) পূর্ব পাকিস্তানে কোনো প্রার্থী মনোনয়ন দিতে না পারলেও পশ্চিম পাকিস্তানে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে।

পূর্ব পাকিস্তানে আওয়ামী লীগের প্রতি এই বিপুল রায় ছিল প্রকারান্তরে ৬-দফা কর্মসূচির প্রতি গণরায়। এই গণরায় ছিল পূর্ববাংলার স্বায়ত্তশাসনের জন্য পূর্ববাংলাবাসীর ম্যান্ডেট স্বরূপ। আওয়ামী লীগের প্রতি জনগণের দেয়া এই ঐতিহাসিক রায়ের মাধ্যমে জনগণ অন্যান্য রাজনৈতিক দলসমূহের কর্মসূচিকে প্রত্যাখ্যান করে। পাকিস্তানে ইসলামি শাসন প্রতিষ্ঠা করতে হবে–ডানপন্থী দলসমূহের এই চিরাচরিত ভাঁওতাবাজিকে পূর্ববাংলার জনগণ প্রত্যাখ্যান করেন।

দুই প্রদেশে দুটি দল প্রাধান্য লাভ করায় পাকিস্তানে নির্বাচনোত্তর অবস্থা জটিল হয়ে পড়ে। নির্বাচনী ফলাফল ঘোষিত হওয়া মাত্র শেখ মুজিবুর রহমান ঘোষণা করেন :

> I warmly thank the people for having given a historic verdict in favour of our Six-point Programme. We pledge to implement this verdict. There can be no constitution except one which is based on the Six-point Programme.

www.Educationblog24.com

শেখ মুজিবের বিবৃতির পাল্টা জবাবে ভুট্টো বলেন, তার দলের সহযোগিতা ছাড়া কেন্দ্রে কোনো সরকার প্রতিষ্ঠা কিংবা সংবিধান প্রণয়ন করা সম্ভব হবে না। তিনি আরও বলেন যে, পিপলস পার্টি পাঞ্জাব ও সিন্ধু প্রাদেশিক পরিষদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করেছে। কেন্দ্রীয় ক্ষমতায় এই দুই প্রদেশের প্রতিনিধিত্ব অবশ্য থাকতে হবে। ভুট্টোর কথার পাল্টা জবাব দিয়ে আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক তাজউদ্দীন আহমেদ বলেন যে, আওয়ামী লীগ কেন্দ্রীয় সরকার গঠন করার সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়েছে এবং সংবিধান প্রণয়ন করতেও সে সক্ষম। তিনি বলেন যে, যেহেতু এক ব্যক্তি এক ভোট ভিত্তিতে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে সুতরাং কেন্দ্রীয় সরকারের পাঞ্জাব ও সিন্ধুর প্রতিনিধিত্ব আবশ্যক– ভুট্টোর এই দাবি ঠিক নিয়। ভুট্টো বলেন যে, জাতীয় সংহতি অক্ষুণ্ন রাখার পর প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের পরিমাণ নির্ধারণ করতে হবে। ভুট্টো দাবি করেন যে, নির্বাচনের পূর্বে ঘোষিত আইনকাঠামো আদেশে ক্ষমতার বন্টন সম্পর্কে যা উল্লেখিত আছে তারই আলোকে প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের বিষয়টি নির্ধারণ করতে হবে। উক্ত আদেশে বলা হয়েছিল:

> আইন তৈরি সংক্রান্ত, প্রশাসনিক এবং আর্থিক ক্ষমতাসহ সবরকম ক্ষমতাই ফেডারেল সরকার এবং প্রদেশগুলোর মধ্যে এমনভাবে ভাগ করা হবে যে, প্রদেশগুলো সর্বাধিক স্বায়ত্তশাসন অর্থাৎ সর্বাধিক পরিমাণ আইন-প্রণয়ন সংক্রান্ত প্রশাসনিক এবং আর্থিক ক্ষমতা ভোগ করবেন। কিন্তু একইসঙ্গে ফেডারেল সরকার ও বাইরের ও আভ্যন্তরীণ বিষয়াদিতে তার দায়িত্ব পালন এবং দেশের স্বাধীনতা ও আঞ্চলিক অখণ্ড তা অক্ষুণ্ন রাখার জন্য পর্যাপ্ত আইন-প্রণয়ন ক্ষমতা, প্রশাসনিক ক্ষমতা এবং আর্থিক ক্ষমতা পাবেন।

এইভাবে পাকিস্তানের রাজনৈতিক দলসমূহ প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন প্রশ্নে দুই মেরুতে অবস্থান গ্রহণ করে। আওয়ামী লীগ ছয়দফার ভিত্তিতে প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন প্রদানের দাবি অক্ষুণ্ন রাখে। অপরদিকে পিপিপি সহ অন্যান্য ডানপন্থী দলসমূহ শক্তিশালী কেন্দ্রীয় সরকার প্রতিষ্ঠার দাবি করতে থাকে। জাতীয় পরিষদে নির্বাচিত আওয়ামী লীগ সদস্যবৃন্দের শপথ গ্রহণ উপলক্ষে ১৯৭১ সালের ৩ জানুয়ারি অনুষ্ঠিত এক র‍্যালি সমাবেশে আওয়ামী লীগ নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ঘোষণা করেন;

সংবিধান প্রণয়ন করতে আমরা পশ্চিম পাকিস্তানী সদস্যদের সমর্থন ও সহযোগিতা চাই। কিন্তু মৌলিক নীতির প্রশ্নে কোনো আপোষ নেই।... আমরা অনেক কষ্ট ভোগ করছি, অবিচার সহ্য করছি। এর কী জ্বালা তা আমরা বুঝি। সুতরাং আমরা পশ্চিম পাকিস্তানীদের প্রতি ন্যায়বিচার করব।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান আরও বলেন যে, পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ ছয়দফা ও এগারো দফার প্রতি ম্যান্ডেট ঘোষণা করেছেন। তিনি বলেন যে, ৬-দফা এখন জনসাধারণের সম্পত্তি এবং তা রদবদল করা সম্ভব নয়। আওয়ামী লীগ এখন এর কোনো অংশ সংশোধন করতে পারে না। কেউই আমাদেরকে ছয়দফার ভিত্তিতে সংবিধান প্রণয়নের কাজ থেকে বিরত করতে পারবে না।

www.Educationblog24.Com

সংবিধান প্রণয়ন বিষয়ে আপোষ প্রচেষ্টা

১৯৭১ সালের মধ্য-জানুয়ারিতে ইয়াহিয়া খান ঢাকা এসে তিন দিন ধরে শেখ মুজিবুর রহমানের সঙ্গে পাকিস্তানের ভবিষ্যৎ সংবিধান প্রণয়ন ও ক্ষমতা হস্তান্তর বিষয়ে আলোচনা করেন। জুলফিকার আলী ভুট্টো ২৭ থেকে ২৯ জানুয়ারি ঢাকায় শেখ মুজিবের সঙ্গে একই বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন এবং আলোচনা শেষে ছয়দফার কেবলমাত্র প্রথম ও ষষ্ঠ দফাদ্বয় মেনে নিতে সম্মত হন। ফেব্রুয়ারির ১৪ তারিখে ইয়াহিয়া খান ঘোষণা করলেন যে, সংবিধান প্রণয়নের উদ্দেশ্যে জাতীয় সংসদের অধিবেশন ঢাকায় বসবে ৩ মার্চ, ১৯৭১। ভুট্টো তার মতামত গ্রহণের অঙ্গীকার না দিলে উক্ত অধিবেশন বয়কটের হুমকি দেন। তিনি বলেন যে, তার দল কেবলমাত্র অন্য একটি দল কর্তৃক ইতোমধ্যে প্রণীত একটি সংবিধানে সম্মতি দেয়ার জন্য ঢাকা যেতে পারে না।

ভুট্টোর এই বক্তব্য বেশ সমালোচিত হয়। পাকিস্তানে রাজনৈতিক সংকট অত্যাসন্ন বলে সংবাদপত্রগুলোতে আশঙ্কা প্রকাশ করা হয়। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্পষ্ট করে ঘোষণা করেন : 'আমাদের অবস্থান পরিষ্কার। যদি পশ্চিম পাকিস্তান তার দলের ৬ দফা কর্মসূচি পুরোপুরি মেনে না নেয়, তাহলে তিনি একাই শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করবেন। কিন্তু ইয়াহিয়া ভুট্টোর দাবির নিকট মাথা নত করেন। তিনি ১ মার্চ ১৯৭১ এক ঘোষণা জারির মাধ্যমে ৩ মার্চ (১৯৭১) অনুষ্ঠিতব্য জাতীয় সংসদের অধিবেশন স্থগিত ঘোষণা করেন। তিনি ঘোষণায় বলেন :

> সংক্ষেপে পরিস্থিতিটা এই যে, পশ্চিম পাকিস্তানের প্রধান দলটি এবং অন্যান্য কয়েকটি রাজনৈতিক দল ১৯৭১ সালের ৩রা মার্চ ঢাকায় অনুষ্ঠিত জাতীয় পরিষদের অধিবেশনে যোগদান করার ইচ্ছে নেই বলে ঘোষণা করেছেন। এর মধ্যে আবার হিন্দুস্থান যে উত্তেজনাপূর্ণ পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছে তা গোটা ব্যাপারটাকে আরো জটিল করে তুলেছে। সেজন্য আমি জাতীয় পরিষদের অধিবেশন আহ্বানের তারিখ পিছিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছি।

খ. অসহযোগ আন্দোলন, বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণ, অপারেশন সার্চলাইট

ইয়াহিয়ার এই ঘোষণার বিরূপ প্রতিক্রিয়া হয়। পূর্ব পাকিস্তানবাসী বিক্ষোভে ফেটে পড়ে। শেখ মুজিবুর রহমান ২ মার্চ (১৯৭১) ঢাকায় এবং তার পরদিন সারা প্রদেশে হরতাল ডাকেন। ১৯৭১ সালের ২ মার্চ এক বিবৃতিতে বঙ্গবন্ধু বলেন :

> এক গুরুত্বপূর্ণ সময়ে সরকারি কর্মচারীসহ, জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে প্রতিটি বাঙালির পবিত্র কর্তব্য হচ্ছে– গণবিরোধী শক্তির সঙ্গে সহযোগিতা না-করা। অধিকন্তু তাদের উচিত সবটুকু শক্তি দিয়ে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করে দেয়া।

২ এবং ৩ মার্চ হরতালের ফলে সকল সরকারি কর্মকাণ্ড অচল হয়ে পড়ে। প্রদেশটির যোগাযোগ সারা বিশ্ব থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। কোনো কোনো ছাত্র এবং শ্রমিক সংগঠন স্বাধীনতা ঘোষণার দাবি করেন। 'পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগ' ৩ মার্চ ১৯৭১ ঢাকায় পল্টন ময়দানে এক জনসভায় স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব গ্রহণ করে।

www.Educationblog24.Com

প্রস্তাবে বলা হয় :

...এই সভা পাকিস্তানী উপনিবেশবাদের কবল হইতে মুক্ত হইয়া স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা, শোষণহীন সমাজব্যবস্থা কায়েমের জন্য সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি ও নির্ভেজাল গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করিয়া স্বাধীন বাংলাদেশে কৃষক-শ্রমিক কায়েমের শপথ গ্রহণ করিতেছে। এই সভা স্বাধীন বাংলার জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের নেতৃত্বে পূর্ণ আস্থা রাখিয়া তাহার সকল সংগ্রাম চালাইয়া যাওয়ার জন্য সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতেছে। এই সভা দলমত নির্বিশেষে বাঙলার প্রতিটি নর-নারীকে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের নেতৃত্বে বাংলার স্বাধীনতা সংগ্রাম চালাইয়া যাওয়ার আহ্বান জানাইতেছে।

সভায় 'স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের ঘোষণা ও কর্মসূচি' শীর্ষক একটি ইশতেহার প্রচার করা হয় (ইশতেহার নং-এক)– এতে বলা হয় যে, তিনটি লক্ষ্য অর্জন করার জন্য স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশ গঠন করা হবে। লক্ষ্যগুলো হলো–

'স্বাধীন ও সার্বভৌম 'বাঙলাদেশ' গঠন করে পৃথিবীর বুকে একটি বলিষ্ঠ বাঙালি জাতি সৃষ্টি ও বাঙালির ভাষা, সাহিত্য, কৃষ্টি ও সংস্কৃতির পূর্ণ বিকাশের ব্যবস্থা করতে হবে।

স্বাধীন ও সার্বভৌম 'বাঙলাদেশ' গঠন করে অঞ্চলে অঞ্চলে ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে বৈষম্য নিরসনকল্পে সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি চালু করে কৃষক-শ্রমিক রাজ্য কায়েম করতে হবে।

স্বাধীন ও সার্বভৌম 'বাঙলাদেশ' গঠন করে ব্যক্তি, বাক ও সংবাদপত্রের স্বাধীনতাসহ নির্ভেজাল গণতন্ত্র কায়েম করতে হবে।

প্রস্তাবে বাংলাদেশের কথিত স্বাধীনতা আন্দোলন পরিচালনার জন্য নিম্নলিখিত কর্মপন্থা গ্রহণ করার কথা বলা হয় :

ক. বাংলাদেশের প্রতিটি গ্রাম, মহল্লা, থানা, মহকুমা, শহর ও জেলায় 'স্বাধীনতা সংগ্রাম কমিটি' গঠন করতে হবে।

খ. সকল শ্রেণীর জনসাধারণের সহযোগিতা কামনা ও তাদেরকে ঐক্যবদ্ধ করতে হবে।

গ. শ্রমিক এলাকায় শ্রমিক ও গ্রামাঞ্চলে কৃষকদের সুসংগঠিত করে গ্রামে গ্রামে, এলাকায় এলাকায় মুক্তিবাহিনী গঠন করতে হবে।

ঘ. হিন্দু-মুসলমান ও বাঙালি-অবাঙালি সাম্প্রদায়িক মনোভাব পরিহার করতে হবে এবং সম্প্রীতি বজায় রাখতে হবে।

ঙ. স্বাধীনতা সংগ্রামকে সুশৃঙ্খলার সাথে এগিয়ে নিয়ে যাবার জন্য পারস্পরিক যোগাযোগ রক্ষা করতে হবে এবং লুটতরাজসহ সকল প্রকার সমাজবিরোধী ও হিংসাত্মক কার্যকলাপ বন্ধ করতে হবে।

উক্ত ইশতেহারে উল্লেখ করা হয় যে, 'বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশের সর্বাধিনায়ক। ইশতেহারে নিম্নলিখিত স্লোগান উচ্চারণের আহ্বান জানানো হয় :

'স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ-দীর্ঘজীবী হউক; স্বাধীন কর স্বাধীন কর–

www.Educationblog24.Com

বাংলাদেশ স্বাধীন কর; স্বাধীন বাংলার মহান নেতা– বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব; গ্রামে গ্রামে দুর্গ কর–মুক্তিবাহিনী গঠন কর; বীর বাঙালি অস্ত্র ধর– বাংলাদেশ স্বাধীন কর; মুক্তি যদি পেতে চাও–বাঙালিরা এক হও।'

২ মার্চ পূর্ববাংলা শ্রমিক আন্দোলনের বিপ্লবী পরিষদ শেখ মুজিব ও আওয়ামী লীগের উদ্দেশে প্রচারিত এক খোলা চিঠিতে সশস্ত্র আন্দোলনের মাধ্যমে স্বাধীন দেশ প্রতিষ্ঠার আহ্বান জানানো হয়। খোলা চিঠিটির বক্তব্য ছিল নিম্নরূপ :

আপনার আপনার পার্টির ছয়দফা সংগ্রামের রক্তাক্ত ইতিহাস স্পষ্টভাবে প্রমাণ করেছে যে, ছয়দফার অর্থনৈতিক দাবিসমূহ বাস্তবায়ন সম্ভব সশস্ত্র সংগ্রামের মাধ্যমে। পূর্ববাংলাকে পাকিস্তান থেকে বিচ্ছিন্ন, মুক্ত ও স্বাধীন কর। আপনাকে ও আপনার পার্টিকে পূর্ববাংলার সাত কোটি জনসাধারণ ভোট প্রদান করেছে পূর্ববাংলার উপরস্থ পাকিস্তানের অবাঙালি শাসকগোষ্ঠীর ঔপনিবেশিক শাসন ও শোষণের অবসান করে স্বাধীন ও সার্বভৌম পূর্ববাংলা প্রজাতন্ত্র কায়েমের জন্য।

পূর্ববাংলার জনগণের এ আশা-আকাঙ্ক্ষা বাস্তবায়নের জন্য পূর্ববাংলা শ্রমিক আন্দোলন আপনার প্রতি ও আওয়ামী লীগের প্রতি নিম্নলিখিত প্রস্তাবাবলি পেশ করেছে :

পূর্ববাংলার জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধি হিসেবে এবং সংখ্যাগুরু জাতীয় পরিষদের নেতা হিসেবে স্বাধীন, গণতান্ত্রিক, শান্তিপূর্ণ, নিরপেক্ষ, প্রগতিশীল পূর্ববাংলার গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠা ঘোষণা করুন।

পূর্ববাংলার কৃষক-শ্রমিক প্রকাশ্য ও গোপনে কার্যরত পূর্ববাংলার দেশপ্রেমিক রাজনৈতিক পার্টি ও ব্যক্তিদের প্রতিনিধি সম্বলিত স্বাধীন, গণতান্ত্রিক শান্তিপূর্ণ, নিরপেক্ষ প্রগতিশীল পূর্ব বাংলার প্রজাতন্ত্রের অস্থায়ী সরকার কায়েম করুন।

২ মার্চের হরতালের সময় পুলিশের গুলিতে দুইজন নিহত এবং কয়েকজন গুরুতর আহত হলে শেখ মুজিব ঐ দিন সন্ধ্যায় এক প্রেস বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে নিন্দা প্রকাশ করেন এবং ৭ মার্চ পর্যন্ত আন্দোলনের নতুন কর্মসূচি ঘোষণা করেন। কর্মসূচিতে ছিল :

৩ মার্চ থেকে ৬ মার্চ (১৯৭১) পর্যন্ত প্রতিদিন সকাল ৬:০০টা থেকে বেলা ২:০০টা পর্যন্ত প্রদেশব্যাপী হরতাল। ৭ মার্চ বেলা ২টায় রেসকোর্স ময়দানে জনসভা। ৩ মার্চ শেখ মুজিব ছাত্রলীগ আয়োজিত এক জনসভায় তার নিকট ক্ষমতা হস্তান্তরের আহ্বান জানান। ক্ষমতা হস্তান্তরিত না হওয়া পর্যন্ত সকল ধরনের ট্যাক্স প্রদান বন্ধ রাখার জন্য তিনি জনগণকে নির্দেশ দেন। এমনি অবস্থায় প্রেসিডেন্ট শাসনতান্ত্রিক সংকট সমাধান করার উদ্দেশে ১৯৭১ সালের ৩ মার্চ জাতীয় পরিষদের পার্লামেন্টারি গ্রুপের ১২ জন নির্বাচিত সদস্যকে পরবর্তী ১০ মার্চ ঢাকায় মিলিত হবার আহ্বান জানান। আওয়ামী লীগ ঐ ধরনের বৈঠকে বসতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করে। শেখ মুজিব ছাড়াও নূরুল আমিনসহ জামায়াতে ইসলাম, জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম (হাজারভী গ্রুপ), কনভেনশন মুসলিম লীগ ও অন্যান্য অনেকগুলো দলের নেতৃবৃন্দ বৈঠকে যোগদানে অস্বীকার করায় প্রস্তাবিত এই বৈঠক বাতিল করে দেয়া হয়।

অগত্যা ইয়াহিয়া খান ১৯৭১ সালের ৬ মার্চ জাতির উদ্দেশে দেয়া ভাষণে ২৫ মার্চ

www.Educationblog24.Com

(১৯৭১) জাতীয় পরিষদের অধিবেশন আহ্বান করেন। ঘোষণায় প্রেসিডেন্ট বলেন:

'আমি এ-কথা পরিষ্কার বলে দিতে চাই যে, পরে কী ঘটবে তাতে কিছু যায় আসে না। কিন্তু পাকিস্তান সশস্ত্র বাহিনী যতদিন আমার কমান্ডে আছে এবং যতদিন আমি রাষ্ট্রপ্রধান আছি ততদিন আমি পাকিস্তানের পূর্ণ সংহতি বজায় রাখব। এ ব্যাপারে কেউ যেন কোনো সন্দেহ কিংবা ভ্রান্ত ধারণা পোষণ না করেন। পূর্ব এবং পশ্চিম পাকিস্তানের লক্ষ লক্ষ মানুষের কাছে এদেশ রক্ষা করার দায়িত্ব আমার রয়েছে। দেশবাসী আমার কাছ থেকে তা আশা করে এবং আমি তাদের নিরাশ করব না।

৬ মার্চ (১৯৭১) ইয়াহিয়া একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশাসনিক পরিবর্তন সাধন করেন। তিনি কঠোর প্রকৃতির সামরিক অফিসার জেনারেল টিক্কা খানকে পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর নিয়োগ করেন। শুধু তাই নয়, আলোচনার অন্তরালে শাসকগোষ্ঠী পূর্ব পাকিস্তানে সামরিক শক্তি বৃদ্ধি করা শুরু করে। নির্বাচনী ফলাফল ঘোষিত হওয়ার পর থেকেই জাতীয় সংস্থা পি.আই.এ-তে করে বেসামরিক পোশাকে পশ্চিম পাকিস্তান থেকে সৈন্য নিয়ে আসা হয়। সিনিয়র আর্মি অফিসার ও বড় বড় ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের পরিবারবর্গকে পাঠিয়ে দেওয়া হচ্ছিল পশ্চিম পাকিস্তানে। নগদ টাকাও ব্যাপকভাবে পশ্চিম পাকিস্তানে পাচার করা হচ্ছিল। শেখ মুজিবকে আরো জানানো হয় যে, সেনাবাহিনী প্রদেশের বিভিন্ন স্থানে অবাঙালি অধ্যুষিত এলাকাগুলোতে গোপনে অস্ত্রশস্ত্র বিতরণ করছে। পাকবাহিনীর এই প্রস্তুতির পরিপ্রেক্ষিতে মুজিবের উপর চারদিক থেকে এককভাবে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণার জন্য চাপ দেয়া হচ্ছিল। সেনাবাহিনীর বাঙালি অফিসার ও সৈন্য, পূর্ব পাকিস্তান রাইফেলস, পুলিশ সকলেই মুজিবকে গোপনে জানান যে, এ ধরনের ঘোষণা দিলে তারা মুজিবকে সমর্থন দেবেন।

৭ই মার্চের ভাষণ

এমনি প্রেক্ষাপটে শেখ মুজিব ৭ মার্চ (১৯৭১) রেসকোর্স ময়দানে তাঁর ঐতিহাসিক ভাষণ (যা 'বঙ্গবন্ধুর সাতই মার্চের' ভাষণ নামে অভিহিত হয়েছে) দেন।

উক্ত ভাষণ বিশ্লেষণ করলে আমরা শেখ মুজিবের দুটো উদ্দেশ্য লক্ষ্য করি :

এক. এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবার সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম– এই ঘোষণার মাধ্যমে তিনি পরোক্ষভাবে স্বাধীনতার ঘোষণা দেন।

দুই. শেখ মুজিব তার ৭ মার্চের মাধ্যমে ইয়াহিয়া কর্তৃক ঘোষিত জাতীয় পরিষদের অধিবেশনে যোগ দেয়ার প্রশ্নে চারটি পূর্বশর্ত আরোপ করেন।

অবিলম্বে সামরিক শাসন প্রত্যাহার করতে হবে;

অবিলম্বে সব সৈন্যবাহিনীকে ব্যারাকে ফিরিয়ে নিতে হবে;

প্রাণহানি সম্পর্কে তদন্ত করতে হবে;

জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের কাছে অবিলম্বে ক্ষমতা হস্তান্তর (জাতীয় পরিষদের অধিবেশনের পূর্বেই) করতে হবে।

তিনি এই দাবিগুলো উত্থাপন করে আলোচনার দ্বার উন্মুক্ত রাখেন।

এখানে উল্লেখ্য যে, এই শর্তগুলো মানলে যে আওয়ামী লীগ ২৫ মার্চ আহূত

www.Educationblog24.com

জাতীয় পরিষদের অধিবেশনে যোগ দেবে– এমন কোনো নিশ্চয়তা শেখ মুজিব ভাষণে দেননি। বরং তিনি বলেছেন যে এই শর্তগুলো গ্রহণ করা হলে, 'তখন বিবেচনা করে দেখব আমরা এসেমব্লিতে বসতে পারব কি পারব না'।

৭ মার্চের ভাষণে বঙ্গবন্ধু আন্দোলন চলতেই থাকবে বলে ঘোষণা দেন। তিনি ঘোষণা করেন যে, 'আজ থেকে এই বাংলাদেশে কোর্ট-কাচারি, আদালত-ফৌজদারী, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ থাকবে।'

৭ মার্চ ভিন্ন এক ঘোষণায় শেখ মুজিব পরবর্তী সাতদিন আন্দোলন চালিয়ে যাবার জন্য দশ দফা কর্মসূচি ঘোষণা করেন। এক স্টেটমেন্টে তিনি বলেন যে, সামরিক আইন প্রত্যাহার এবং নির্বাচিত প্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরিত না-হওয়া পর্যন্ত আন্দোলন চলতেই থাকবে। আন্দোলনের দশদফা কার্যক্রম ছিল নিম্নরূপ :

১. কর না-দেওয়ার আন্দোলন চালিয়ে যাওয়া হবে।
২. সমগ্র বাংলাদেশের সেক্রেটারিয়েট, সরকারি এবং আধা সরকারি দপ্তরগুলো, হাইকোর্ট ও অন্যান্য আদালতগুলিও ধর্মঘট পালন করবে। এর কোনো ব্যতিক্রম হলে তা মাঝে মাঝে ঘোষণা করা হবে।
৩. রেল এবং বন্দরগুলি কাজ চালিয়ে যেতে পারে। কিন্তু যদি জনগণের দমনের উদ্দেশে ব্যবহার করা হতে পারে এমন এবং সেনাবাহিনীর চলাচলের জন্য রেল অথবা বন্দর ব্যবহার করা হয়, তাহলে রেল কর্মচারী এবং বন্দর-শ্রমিকরা সহযোগিতা করবে না।
৪. রেডিও, টেলিভিশন এবং সংবাদপত্রগুলি আমাদের বিবৃতির পূর্ণ বিবরণ দেবে এবং গণআন্দোলনের সংবাদ কিছুই গোপন করবে না। এটা যদি পালন করা না হয়, তাহলে ধরা হবে যে এই প্রতিষ্ঠানগুলিতে কর্মরত বাঙালিরা কোনোরকম সহযোগিতা করছে না।
৫. কেবলমাত্র স্থানীয় এবং আন্তঃজেলার মধ্যে ট্রাঙ্ক, টেলিফোন যোগাযোগ চালু থাকবে।
৬. সব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বন্ধ থাকবে।
৭. স্টেট ব্যাংক বা অন্যকিছুর মাধ্যমে ব্যাংক পশ্চিম পাকিস্তানে টাকা পাঠাবে না।
৮. প্রতিদিন সব ভবনের উপরেই কালো পতাকা ওড়ানো হবে।
৯. অন্য সব ক্ষেত্রে ধর্মঘট প্রত্যাহার করা হল, কিন্তু পরিস্থিতি বুঝে যে কোনো মুহূর্তে পূর্ণ ধর্মঘট পালনের আহ্বান ঘোষণা করা যেতে পারে।
১০. প্রতিটি ইউনিয়ন, মহল্লা, থানা, মহকুমা এবং জেলায় স্থানীয় আওয়ামী লীগ ইউনিটের নেতৃত্বে একটি করে সংগ্রাম পরিষদ সংগঠন করা হবে।

অসহযোগ আন্দোলন সম্পর্কে অন্য দল ও সংগঠনের প্রতিক্রিয়া

পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগ

৮ মার্চ (১৯৭১) এক সভায় মিলিত হয়ে পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় সংসদ এই মর্মে প্রস্তাব করে যে :

www.Educationblog24.Com

আগামী কাউন্সিল অধিবেশন পর্যন্ত পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগের পরিবর্তে শুধুমাত্র 'ছাত্রলীগ' নাম ব্যবহৃত হবে। প্রত্যেক জেলা শহরে হতে প্রাথমিক শাখা পর্যন্ত শাখার সভাপতিকে আহ্বায়ক, সাধারণ সম্পাদককে সম্পাদক করিয়া এবং ৯ জন সদস্য সর্বমোট ১১ জনকে নিয়া 'স্বাধীন বাংলাদেশ ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ' গঠন করার প্রস্তাব গ্রহণ করিতেছে। ...দেশের সকল প্রেক্ষাগৃহে পাকিস্তানী পতাকা প্রদর্শন, পাকিস্তানী সংগীত বাজানো এবং উর্দু বই প্রদর্শন বন্ধ রাখার ব্যবস্থা গ্রহণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতেছে এবং বঙ্গবন্ধু নির্দেশিত সিনেমা করও প্রদান না-করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতেছে।

পূর্ব পাকিস্তান কমিউনিস্ট পার্টি

এই দল ৯ মার্চ (১৯৭১) এক প্রচারপত্রে স্বাধীন বাংলা প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম অব্যাহত রাখার আহ্বান জানায়।

...নির্বাচিত গণপ্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর, সামরিক শাসন প্রত্যাহার প্রভৃতি যে দাবিগুলি আওয়ামী লীগ প্রধান উত্থাপন করিয়াছেন, সেগুলি আদায় করিতে পারিলে 'স্বাধীন বাংলা' কায়েমের সংগ্রামের অগ্রগতির সুবিধা হইবে– ইহা উপলব্ধি করিয়া ঐ দাবিগুলির পিছনে কোটি কোটি জনগণকে সমবেত করা এবং ঐ দাবিগুলি পুরণে ইয়াহিয়া সরকারকে বাধ্য করা– ইহা হইল এই মুহূর্তে জরুরি কর্তব্য।

মওলানা ভাসানীর প্রচারপত্র

৯ মার্চ (১৯৭১) মওলানা ভাসানী 'পূর্ব পাকিস্তানের আজাদী রক্ষা ও মুক্তিসংগ্রামে ঝাঁপাইয়া পড়ুন' শীর্ষক এক প্রচারপত্র প্রকাশ করেন। তিনি বলেন :

প্রিয় দেশবাসী, আজ আমি সাত কোটি পূর্ববাংলার সাধারণ মানুষের কাছে এই জরুরি আহ্বান জানাইতে বাধ্য হচ্ছি যে, আপনারা দল, মত, ধর্ম ও শ্রেণী নির্বিশেষে প্রতিটি মানুষ একত্রে এবং একযোগে একটি সাধারণ কর্মসূচি গ্রহণ করুন, যার মূল লক্ষ্য হবে ২৩ বৎসরের অমানুষিক এবং শোষণকারী শাসকগোষ্ঠীর করাল কবল থেকে পূর্ববাংলাকে সম্পূর্ণ ও চূড়ান্তভাবে স্বাধীন ও সার্বভৌম রক্ষা করা।

মওলানা ভাসানী ১০ মার্চ (১৯৭১) পল্টনের এক জনসভায় ঘোষণা করেন যে, ২৫ মার্চের মধ্যে দাবি মেনে না নিলে তিনি শেখ মুজিবুর রহমানের সঙ্গে এক হয়ে বাঙালির স্বাধীনতার জন্য সর্বাত্মক সংগ্রাম শুরু করবেন। উক্ত জনসভায় মওলানা ভাসানী ১৪ দফা কর্মসূচি ঘোষণা করেন।

ছাত্র ইউনিয়ন

১১ মার্চ (১৯৭১) ছাত্র ইউনিয়ন এক প্রচারপত্রে শোষণমুক্ত স্বাধীন পূর্ব বাংলা কায়েমের সংগ্রাম আরও দুর্বার করে তোলার আহ্বান জানায়। ছাত্র ইউনিয়ন বর্তমানে করণীয় হিসেবে ছয়দফা কর্মসূচি ঘোষণা করে :

রাজনৈতিক প্রচার অব্যাহত রাখুন; গ্রাম অঞ্চলে কৃষকদের মধ্যে উহা ছড়াইয়া দিন' যে-কোনোরূপ দাঙ্গা-হাঙ্গামা-উস্কানি প্রতিরোধ করুন। শান্তি-শৃঙ্খলা নিজ উদ্যোগে বজায় রাখুন। এই সংগ্রামের সফলতার জন্য সকল গণতান্ত্রিক সংগ্রামী শক্তির একতা গঠনের

www.Educationblog24.Com

জোর আওয়াজ তুলুন।

পূর্ব পাকিস্তান কমিউনিস্ট (মার্কসবাদী-লেনিনবাদী)

এই দল ৯ই মার্চ (১৯৭১) এক প্রচারপত্রের মাধ্যমে পূর্ব বাংলার মুক্তির জন্য শান্তি পূর্ণ অসহযোগ আন্দোলন নয়, হরতাল ধর্মঘট নয়; অস্ত্র হাতে লড়াই করতে, শত শত মানুষের হত্যার বদলা নিতে এবং গ্রামে কৃষকদের গেরিলা লড়াই-এ সংগঠিত করার আহ্বান জানায়।

ভুট্টোর দুই সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের থিওরি

পূর্ব পাকিস্তানে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের দাবিতে যখন শেখ মুজিবের নেতৃত্বে অসহযোগ আন্দোলন চলছিল, গোটা বাঙালি জাতি যখন স্বাধীনতার দাবির দিকে অগ্রসর হচ্ছিল, এমনি মুহূর্তে ১৫ মার্চ পাকিস্তান পিপলস পার্টি প্রধান জুলফিকার আলী ভুট্টো পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানে দুই সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের হাতে ক্ষমতা দেবার থিওরি ঘোষণা করেন। ভুট্টো যুক্তি দেখান যে, পাকিস্তান পিপলস পার্টি পশ্চিম পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠ দল এবং পশ্চিম পাকিস্তানীদের প্রতিনিধি হিসেবে এই দল তাদের স্বার্থকে উপেক্ষা করে যেতে পারে না। ভুট্টো পাকিস্তানে 'দুই সরকার দুই প্রধানমন্ত্রী'র দাবি উত্থাপন করেন।

পশ্চিম পাকিস্তানে প্রতিক্রিয়া

জাতীয় পরিষদের অধিবেশন স্থগিত করা এবং নির্বাচিত প্রতিনিধিদের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তরে বিলম্ব করার কারণে এবং ভুট্টোর দুই সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের থিওরি পশ্চিম পাকিস্তানে বিভিন্ন রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ সমালোচনা করেন।

জামায়াতে ইসলামীর ভারপ্রাপ্ত আমীর মিয়া তোফায়েল মোহাম্মদ ভুট্টোর প্রস্তাবের সমালোচনা করে বলেন, পাকিস্তানের দুই অংশে দুই সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের সরকার গঠন অবাস্তব এবং তা আইনকাঠামো আদেশের পরিপন্থী। পশ্চিম পাকিস্তান ভেঙে চারটি প্রদেশ সৃষ্টি হলেও ভুট্টো অন্যায়ভাবে এক ইউনিটের কথা বলছেন।

কনভেনশন মুসলিম লীগের প্রেসিডেন্ট আলী আসগর শাহ বলেন যে, ভুট্টো ক্ষমতা পাবার লোভেই কেবল দুই সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের দুই সরকারের কথা বলছেন। অথচ পাকিস্তান কীভাবে রক্ষা পাবে সেই চেষ্টাই তার করা উচিত ছিল।

এয়ার মার্শাল (অব) আসগর খান শেখ মুজিবের হাতে ক্ষমতা দেয়ার দাবি জানান।

ওয়ালী ন্যাপের ইয়াহিয়া খান কর্তৃক জাতীয় পরিষদের অধিবেশন স্থগিত করাকে অগণতান্ত্রিক ও নিন্দনীয় বলে অভিহিত করেন। ওয়ালী ন্যাপ ৪ মার্চ কোয়েটায় হরতাল পালন করে।

পি.ডি.পি নেতা নওয়াবজাদা নসরুল্লাহ খান মুজিবের দাবিগুলি ন্যায়সঙ্গত বলে মন্তব্য করেন।

শেখ মুজিবুর রহমান কর্তৃক আন্দোলনের নতুন কর্মসূচি ঘোষণা

১৪ মার্চ (১৯৭১) শেখ মুজিবুর রহমান এক বিবৃতির মাধ্যমে এ যাবত কার্যকরী সকল নির্দেশাবলি বাতিল করে দেন। তদস্থলে ১৫ মার্চ থেকে নির্দেশ আকারে ঘোষিত

www.Educationblog24.Com

৩৫টি কার্যসূচি শুরু হবে বলে নির্দেশ দেন।

সর্বশেষ সমঝোতা অভিনয় : ১৫ মার্চ ইয়াহিয়া খানের ঢাকা আগমন

১৫ মার্চ কয়েকজন জেনারেলসহ ইয়াহিয়া খান ঢাকায় আসেন। উদ্দেশ্য শেখ মুজিবের সঙ্গে সমঝোতা করা। ১৬ থেকে ২৪ মার্চ পর্যন্ত মুজিব-ইয়াহিয়া বৈঠক করেন।

২১ মার্চ ভুট্টো ঢাকা আসেন এবং আলোচনায় অংশ নেন। এ সময় পরিপূর্ণ একটি শাসনতন্ত্র রচনার চাইতে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের প্রক্রিয়া নিয়েই বেশি আলোচনা করা হয়। ইয়াহিয়া খান দুই প্রদেশের দুই নেতা– ভুট্টো ও মুজিবের মধ্যে আপস মীমাংসা করতে ব্যর্থ হন। তিনি ভুট্টোর মতের বিরুদ্ধে যাওয়া সমীচীন মনে করেননি। কারণ তখন পাঞ্জাবে ভুট্টোর ব্যাপক জনসমর্থন ছিল। তাছাড়া পাকিস্তানে সামরিক ও বেসামরিক বাহিনীর অধিকাংশ সদস্য পাঞ্জাব থেকে আগত। পাঞ্জাবিরা কিছুতেই ছয়দফার বাস্তবায়নে সম্মত ছিল না। আওয়ামী লীগও ছয়দফার প্রশ্নে কোনো ছাড় দিতে রাজি নয়। ইতিমধ্যে ঢাকায় ২৩ মার্চ পাকিস্তান দিবসে পাকিস্তানী পতাকার পরিবর্তে বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলন করা হয়। এমতাবস্থায় ভুট্টো ও ইয়াহিয়া খান সংকটের সামরিক সমাধান দেওয়ার পরিকল্পনা করেন। তারা শেখ মুজিবের সঙ্গে আলোচনায় কালক্ষেপণ করে অলক্ষ্যে পশ্চিম পাকিস্তান থেকে পূর্ব পাকিস্তানে সেনা-সদস্য ও সামরিক সরঞ্জামাদি আনয়ন করেছিল। মওদুদ আহমেদ মন্তব্য করেছেন :

ইয়াহিয়া এবং মুজিবের মধ্যে যে সমঝোতাই হউক না কেন, বাস্তব অবস্থা ছিল এই যে, ইতোমধ্যে সেনাবাহিনী তাদের সব রকম যুদ্ধোপকরণ সজ্জিত করে যুদ্ধের পূর্ণপ্রস্তুতি গ্রহণ করে নেয়। অস্ত্রশস্ত্র ও গোলাবারুদ নিয়ে এমভি সোয়াত নামের জাহাজ ৩রা মার্চ থেকেই চট্টগ্রামে নোঙ্গরের অপেক্ষায় বঙ্গোপসাগরে অবস্থান করছিল। পি.আই.এ বিমানযোগে আরো ঘন ঘন ফ্লাইট-এ পশ্চিম পাকিস্তান থেকে বেসামরিক পোশাকে সৈন্য আমদানি করা হচ্ছিল। সৈন্য এবং যুদ্ধোপকরণ বহনকারী সি-১৩০৬ বিমানগুলো অবতরণ করছিল ঢাকা বিমানবন্দরে। স্ট্রাটেজিক পয়েন্টগুলোতে বসানো হয়েছিল ভারী কামান ও মেশিনগান। পাকিস্তানের সুকৌশলী এস.এম.জি কমান্ডো গ্রুপের ঢাকা আগমনের তথ্যও ঢাকার সাংবাদিকদের কাছে এসে পৌঁছাচ্ছিল। মুজিব এবং ইয়াহিয়া যেখানে দেনদরবার চালাচ্ছিলেন সেই গণভবনের ভেতরে ও বাইরে মোতায়েন করা হচ্ছিল ট্যাংক বহর। অন্যদিকে যত্রতত্র জনতার উপর সেনাবাহিনীর গুলিবর্ষণ এবং বাঙালি-অবাঙালিদের মধ্যে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা পরিস্থিতিকে নিয়ে যাচ্ছিল আরো অবনতির দিকে।

অবশেষে সকল প্রস্তুতি সম্পন্ন হলে ২৫ মার্চ রাতে পাকিস্তান সেনাবাহিনী ঢাকার নিরস্ত্র জগণের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। তারা ইতিহাসের বর্বরতম নরহত্যা সংগঠিত করে। পাকিস্তানবাহিনী তাদের এই পদক্ষেপ গ্রহণের পক্ষে যুক্তি দেখিয়ে বলে যে, আওয়ামী লীগ ২৬ মার্চ (১৯৭১) স্বাধীনতার ঘোষণা দিত। তাদেরকে এই কর্ম থেকে বিরত রাখার জন্যই ঢাকার রাজপথে সেনাবাহিনী নামাতে হয়। কিন্তু এর ফল হয় উল্টো। ঢাকার নিরস্ত্র জনগণের বিরুদ্ধে পাক-সেনাবাহিনীর এই অঘোষিত যুদ্ধের প্রতিবাদে বাংলাদেশে স্বাধীনতার যুদ্ধ শুরু হয়। পাকবাহিনী ২৫ মার্চ রাত ১টা ১০ মিনিটে (২৬ মার্চের প্রথম

www.Educationblog24.Com

প্রহর) শেখ মুজিবকে বন্দি করে এবং পরে গোপনে পশ্চিম পাকিস্তানে নিয়ে যায়। সেখানে মিয়ানওয়ালী কারাগারে তাঁকে বন্দি করে রাখা হয়। বিদেশী পত্র-পত্রিকায় তাঁর বন্দি হওয়ার খবর প্রকাশিত হয় ১ এপ্রিল।

বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা

বঙ্গবন্ধু বন্দি হওয়ার পূর্বেই চট্টগ্রামস্থ আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক জনাব এম.এ. হান্নানের নিকট স্বাধীনতার ঘোষণা বাণী প্রেরণ করেন। বাণীটি স্বাধীনতার দলিলপত্র তৃতীয় খণ্ডে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে (পৃ.১)। বাণীটি নিম্নরূপ :

"This may be my last message. from today Bangladesh is independent. I call upon the people of Bangladesh wherever you might be and with whatever you have to resist the army of occupation to the last. Your fight must go on until the last soldier of the Pakistan occupation army is expelled from the soil of Bangladesh and final victory is ahieved.

(বাংলা অনুবাদ) :' আজ থেকে বাংলাদেশ স্বাধীন। এই আমার শেষ কথা। যে যেখানেই থাকুন না কেন সকলের প্রতি আমার আবেদন রইল, যার কাছে যা আছে তাই নিয়ে দখলদার বাহিনীর মোকাবিলা করুন এবং বাংলার মাটি থেকে পাক দখলদার বাহিনীকে সমূলে উৎখাত করে চূড়ান্ত বিজয় না-হওয়া পর্যন্ত লড়ে যান।

২৭ মার্চ কালুরঘাটে স্থাপিত স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী বেতার কেন্দ্র (পরে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র) থেকে মেজর জিয়াউর রহমান শেখ মুজিবুর রহমানের পক্ষে স্বাধীনতার ঘোষণা পাঠ করেন। এই ঘোষণাটিও স্বাধীনতার দলিলপত্রে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। তবে পাদটীকায় মন্তব্য করা হয়েছে যে, 'মেজর জিয়াউর রহমানের ২৭ মার্চের স্বাধীনতার ঘোষণা পাঠের ঐতিহাসিক মূল কপিটি নিরাপত্তার কারণে নষ্ট করে ফেলা হয়েছিল। মেজর জিয়া পঠিত ঘোষণাপত্রটি ছিল নিম্নরূপ :

Major Zia, Provisional Commander-in-Chief of the Bangladesh Liberation Army. hereby proclaims, on behalf of Sheikh Mujibur Rahman, the independence of Bangladesh.

I also declare, we have already framed a soverign, legal government under Sheikh Mujibur Rahman which pledges to function as per law and the constitution. The new democratic Government is committed to a policy of non-alignment in international relations. It will seek friendship with all nations and strive for international peace. I appeal to all goverment to mobilize public opinion in their respective countries against be brutal genocide in Bangladesh.

The Government under Sheikh Mujibur Rahman is sovereign legal Government of Bangladesh and is entitled to recognition from all democratic nation of the world.'

পাক সেনাবাহিনীর অঘোষিত যুদ্ধের প্রতিবাদে বাংলাদেশে ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ থেকে যে স্বাধীনতার যুদ্ধ শুরু হয় তা চলে নয় মাস। অতঃপর ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর বাংলাদেশ শত্রুমুক্ত হয়ে বিজয় অর্জন করে।

www.Educationblog24.Com

সহায়ক গ্রন্থ

হাসান হাফিজুর রহমান (সম্পাদিত), *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্র : দ্বিতীয় খণ্ড, পটভূমি, ১৯৫৮-১৯৭১*, ঢাকা

পাকিস্তান সরকার, *পূর্ব পাকিস্তানের সংকট সম্পর্কে শ্বেতপত্র*, (৫ আগস্ট, ১৯৭১)

মুনতাসীর মামুন ও জয়ন্তকুমার রায়, *বাংলাদেশে সিভিল সমাজ প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম*, ঢাকা, ২০১৩

Morshed, Pakistan 1970 Elections and the Liberation of Bangladesh : A Political Analysis' *The Journal of the Institute of Bangladesh Studies*. Vol.XI (1988). pp.109-110.

www.Educationblog24.com

www.Educationblog24.Com

নবম অধ্যায়
মুক্তিযুদ্ধ ১৯৭১

স্বাধীনতা ঘোষণার পর পরই বঙ্গবন্ধু গ্রেফতার হলেন। তিনি একবার বলেছিলেন, "২৫শে মার্চ দিনটি হবে সংকটজনক।" (দৈনিক বাংলা, ১৯৭৩)। অন্যদিকে পাকিস্তানী সামরিক জান্তা অনেকদিন আগে থেকেই আলোচনা ভেঙ্গে গেলে শক্তির সাহায্যে বাঙালিকে দমন করার একটি পরিকল্পনা করে রেখেছিল। এর নাম দিয়েছিল তারা 'অপারেশন সার্চ লাইট। অন্যদিকে আমরা এর নাম দিয়েছি 'কালরাত্রি'।

২৫ মার্চ মধ্যরাত বা ২৬ মার্চ রাতটি হলো কালরাত্রি। বাঙালিদের দমন করার জন্য ৩ ব্যাটেলিয়ান সৈন্য 'অপারেশন সার্চলাইটে' অংশগ্রহণ করে। রাত ১১টার দিকে অপারেশন শুরু হয়। এই অপারেশনের অর্থ গণহত্যা ও অগ্নিসংযোগ। ঐ দিন পুরো ঢাকা শহর আক্রান্ত হয়। বিশেষ লক্ষ্য ছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। সেখানে শিক্ষক ছাত্রদের হত্যা করে জগন্নাথ হল, রোকেয়া হল বিভিন্ন জায়গায় গণকবর দেয়া হয়। সেই রাতে ৭ জন শিক্ষক শহীদ হয়েছিলেন যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন দার্শনিক গোবিন্দ চন্দ্র দেব। ইকবাল হল (বর্তমান সার্জেন্ট জহরুল হক হল) ছিল কামানের বিশেষ লক্ষ্যবস্তু। শাঁখারি বাজার, তাঁতিবাজার, নয়াবাজার পুড়িয়ে দেয়া হয়। সেদিন শুধু ঢাকা শহরে কতোজনকে হত্যা করা হয়েছিল তার হিসাব নেয়া যায়নি। কারণ, অনেক দেহ পুড়ে গিয়েছিল বা গণকবর দেয়া হয়েছিল। তবে, সে সংখ্যা কমপক্ষে দশ হাজারের বেশি।

লন্ডন থেকে প্রকাশিত ডেইলি টেলিগ্রাফ ৩১ মার্চ ১৯৭১ সালে এ সম্পর্কিত একটি প্রতিবেদন ছাপে :

> "আল্লাহ এবং পাকিস্তানের ঐক্যের নামে' ঢাকা আজ এক বিধ্বস্ত ও সন্ত্রস্ত নগরী। দীর্ঘ ২৪ ঘন্টার নৃশংস অভিযান, ঠাণ্ডা মাথায় বোমাবর্ষণ এবং গোলাগুলি চালিয়ে পাকিস্তান সেনাবাহিনী কমপক্ষে সাত হাজার মানুষ হত্যা করেছে। তারা বিশাল এলাকা মাটির সাথে মিশিয়ে দিয়েছে যাতে পূর্ব পাকিস্তানের স্বাধীনতার স্পৃহা শুরুতেই স্তব্ধ হয়ে যায়।...হাজার হাজার মানুষ গ্রামের দিকে ছুটে পালাচ্ছে। শহরের রাস্তাঘাটগুলি প্রায় জনশূন্য হয়ে পড়েছে এবং প্রদেশটির নানা জায়গা থেকে নির্বিচারে হত্যাকাণ্ডের খবর আসছে। ...সেনাবাহিনী গুলি করে মারছে সাধারণ মানুষকে এবং দালান-কোঠা গুড়িয়ে দিচ্ছে নির্বিচারভাবে।
>
> ...সেনাবাহিনীর এই বর্বর অভিযানকে আন্দাজ করা যাবে বিছানাতে ছাত্রদের রক্তাক্ত মৃতদেহ দেখে, ভস্মিভূত ঘর-বাড়িতে আগুনে পোড়া নারী ও শিশুর দেহ দেখে। পাকিস্তানের হিন্দু ধর্মাবলম্বী লোকজনদের যেখানেই পাওয়া গেছে সেখানেই গণহারে গুলি করে মারা হয়েছে। বাজার ও শপিংমলগুলি আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দেয়া হয়েছে।...."

www.Educationblog24.Com

২৫ মার্চ দিবাগত রাতে বা ২৬ বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতা ঘোষণা করেছিলেন। ঐ একই সময় বাঙালি দমনে অপারেশন সার্চ লাইট শুরু হয়। ঐ একই সময়ে বলা যেতে পারে বাঙালির প্রতিরোধ যুদ্ধ শুরু হয়, শুরু হয় স্বাধীনতার যুদ্ধ যা মুক্তিযুদ্ধ নামে পরিচিত।

মুক্তিযুদ্ধকে অনেকে বলেন স্বাধীনতাযুদ্ধও। আপাতদৃষ্টিতে অনেকের কাছে শব্দ দুটি সমার্থক মনে হলেও তফাৎ আছে প্রত্যয় দুটিতে। তফাৎটি আরো স্পষ্ট হয়ে ওঠে এ-কারণে যে, শেষোক্ত শব্দটি সরকারিভাবে ব্যবহার করা হয় শুরু হয় সামরিক শাসনামলে, গণপ্রতিনিধিত্বমূলক শাসনে নয়। সে-কারণে মুক্তিযুদ্ধ শব্দটির দ্যোতনা প্রাক ১৯৭১ প্রজন্মের কাছে যতটা ব্যঞ্জনাময়, স্বাধীনতাযুদ্ধ ততটা নয়।

মুক্তিযুদ্ধের বিষয়টি ব্যাপক, অর্থও। অন্যদিকে স্বাধীনতার বিষয়টি সংকীর্ণ, অর্থও। মুক্তিযুদ্ধ বলতে বোঝায় (বাংলাদেশের পরিপ্রেক্ষিতে) বাঙালির সার্বিক মুক্তি, সব অর্থে। এখানেই বিভক্ত হয়ে যায় জনপ্রতিনিধি আর সামরিক শাসকদের দৃষ্টিভঙ্গি। রাজনীতিবিদরা যেহেতু সাধারণ মানুষের মাঝ থেকে উঠে এসেছেন, ছিলেন তাদের প্রতিনিধি, তাই ১৯৭১ সালে তারা অনুধাবন করেছেন, মুক্তি কেন ছিল প্রধান প্রশ্ন। আর সামরিক সমাজের প্রতিনিধির কাছে আশু ছিল হানাদার পাকিস্তানি বাহিনীর হাত থেকে নির্দিষ্ট ভূখণ্ডের ভৌগোলিক মুক্তি। এই যে বিভাজনের সৃষ্টি, তা অব্যাহত এখনো। ১৯৪৭ থেকে ১৯৭১-এর সময়টুকুতেও দ্বন্দ্ব ছিল এ নিয়ে এবং এই যুদ্ধের নিরসন না হওয়ায়, এ পার্থক্যেই পরবর্তীকালে দ্বিখণ্ডিত করেছে সমাজ, রাজনীতি-সব।

এ-প্রসঙ্গে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, শিক্ষিত ও এলিট মহলে শব্দ দুটির দ্যোতনা দুরকম হতে পারে; কিন্তু একেবারে তৃণমূল পর্যায়ে মুক্তি, স্বাধীনতা শব্দগুলোর পার্থক্য বিশেষ দ্বন্দ্বের সৃষ্টি করে না। তাদের অনেকের কাছে ১৯৭১ সাল তো গণ্ডগোলের বছরও। তার অর্থ কি এই যে, সে মুক্তি বা স্বধীনতা চায়নি? তা নয়। তার প্রকাশভঙ্গিই এরকম। তার কাছে ১৯৭১, এ কারণে গণ্ডগোলের বছর যে, এর আগে সে অর্থাৎ বাঙালি এরকম সংঘাতের মুখোমুখি হয় নি। প্রকাশভঙ্গি যে-রকমই হোক, তাকে যদি শব্দ তিনটির মধ্যে কোনটি বেশি অর্থবহ চিহ্নিত করতে বলা হয়, তাহলে সে অবশ্যই ১৯৭১ সালকে চিহ্নিত করবে মুক্তিযুদ্ধ হিসেবে।

মুক্তি এবং তারপর মুক্তিযুদ্ধ শব্দটি যে হঠাৎ করে আমাদের শব্দাবলিতে চলে এসেছে তা নয়। সুতরাং ধরে নেয়া যেতে পারে, মুক্তিযুদ্ধও হঠাৎ করে ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ শুরু হয়নি। বহুদিনের পুঞ্জীভূত বঞ্চনা, নিপীড়ন থেকে মানুষ মুক্তি চেয়েছে সর্বতোভাবে– এই অনুভূতিই সৃষ্টি করেছে মুক্তিযুদ্ধ শব্দটির, একেবারে স্বতঃস্ফূর্তভাবে এবং যে প্রত্যক্ষ সমরে অংশগ্রহণ করেছে সে মুক্তিযোদ্ধা। সুতরাং এই শব্দটির (যা হয়ে ওঠে একটি প্রত্যয়) অন্তর্নিহিত অর্থ দাঁড়ায় সর্বক্ষেত্রে মানুষের বা বাঙালির মুক্তি।

মুক্তিযুদ্ধের পটভূমি সবার জানা। সে-কারণে, নতুনভাবে তা বিবৃত হওয়ার প্রয়োজন নেই।

মুক্তিযুদ্ধের প্রধান বৈশিষ্ট্য গণহত্যা। সভ্যতার বিপরীতে এর অবস্থান। গণহত্যার ইংরেজি হয় জেনোসাইড। গ্রিক জেনোস এবং লাতিন সাইড শব্দ দুটি মিলে

www.Educationblog24.Com

জেনোসাইড শব্দের সৃষ্টি। জেনোস অর্থে বোঝায় জাতি। বর্তমান আন্তর্জাতিক আইন অনুযায়ী গণহত্যার অর্থ কোন সরকার কর্তৃক ইচ্ছাকৃতভাবে জাতিগত, ধর্মীয় বা গোত্রীয় জনগণকে নিকাশ করা। ১৯৪৪ সালে জেনোসাইড শব্দটি তখন ব্যবহার করা হয়। গণহত্যা বর্তমানে আন্তর্জাতিক অপরাধ হিসেবে বিবেচিত যার কোন ক্ষমা নেই।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জার্মানি ইহুদী ও অন্যান্য জনগোষ্ঠীর ওপর যে হত্যাকাণ্ড চালিয়েছিল বা গণহত্যা করেছিল তার বিচার হয়েছিল যা নুরেমবার্গ ট্রায়াল হিসেবে পরিচিত। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ১৯৭১ সালে পাকিস্তান সরকার বাঙালিদের ওপর গণহত্যা চালায়। ত্রিশ লক্ষ মানুষকে তারা হত্যা করে। এত কম সময়ে এত বেশি মানুষ আর কোথাও হত্যা করা হয়নি। আর এসবই করা হয়েছিল ইসলামের নামে।

১৯৭৫ সালে জিয়াউর রহমান ক্ষমতায় আসার পর থেকে এই গণহত্যা নিয়ে বিভিন্নভাবে প্রচার চালিয়ে বিতর্ক সৃষ্টি করা হয়। পাকিস্তানীরাই প্রথম বিষয়টি সৃষ্টি করে। তাদের বক্তব্য, বাংলাদেশে ৩০ লক্ষ মানুষ শহীদ হয়নি। ৩ লক্ষও নয়। ডেভিড ফ্রস্টের সঙ্গে আলোচনাকালে শেখ মুজিব ৩ লক্ষকে ভুল ইংরেজিতে থ্রি মিলিয়ন বলেছিলেন।

আসলে বঙ্গবন্ধু তখন স্বীকৃত সংখ্যাটিই বলেছিলেন। মস্কো থেকে প্রকাশিত *প্রাভদা* পত্রিকায়ই প্রথম ৩০ লক্ষ সংখ্যাটি উল্লেখ করা হয়। আমরাও বিভিন্ন পর্যায়ে অনুসন্ধান করেছি। এবং আমাদের মনে হয়েছে এই সংখ্যা ত্রিশ লাখেরও বেশি।

১৯৭১ সালের পর বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে হানাদার পাকিস্তানী বাহিনী গণহত্যা শুরু করে। রাজাকার, শান্তি বাহিনী সংগঠিত হওয়ার পর গণহত্যার কার্যক্রম আরো পরিকল্পিতভাবে চলতে থাকে। ২৫ মার্চ ১৯৭১ সাল থেকে গণহত্যা শুরু হয় এবং তা চলে স্বাধীনতা অর্জন পর্যন্ত। বাংলাদেশের প্রায় প্রতিটি অঞ্চলেই গণহত্যা চালানো হয়েছিল। অনেক জায়গায় একসঙ্গে মৃতদেহ গর্ত করে পুতে রাখা হয়েছে যেগুলিকে আমরা গণকবর বলি। এছাড়া নির্দিষ্ট কিছু স্থানে নিয়েও মানুষ হত্যা করে ফেলে রাখা হতো। এগুলি পরিচিত বধ্যভূমি হিসেবে। যেমন ঢাকার রায়ের বাজার বা শিয়ালবাড়ি বধ্যভূমি। বাংলাদেশের প্রায় প্রতিটি অঞ্চলে গণকবর ও বধ্যভূমির সন্ধান পাওয়া যাবে। সংরক্ষণের অভাবে অবশ্য অনেক গণকবর বা বধ্যভূমি আজ বিলুপ্ত। আমাদের জরিপে ১০০০-এর বেশি গণহত্যা গণকবর ও বধ্যভূমির নাম পাওয়া গেছে। এখানে উদাহরণ হিসেবে একটি গণহত্যার বিবরণ দেব। বলা যেতে পারে এটি ছিল বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় গণহত্যা যেখানে একদিনে দশ হাজারেরও বেশি মানুষকে হত্যা করা হয়েছিল। এই গণহত্যা চুকনগর গণহত্যা হিসেবে পরিচিত।

চুকনগর খুলনা জেলার ডুমুরিয়া থানার অন্তর্গত। খুলনার উত্তরে যশোর ও ফরিদপুর, পূর্বে ফরিদপুর, বরিশাল ও পটুয়াখালি, পশ্চিমে ভারতের পশ্চিমবঙ্গ আর দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর। এখন পাকা সড়ক ধরে অনায়াসে স্বল্প সময়ে চুকনগর যাওয়া সম্ভব। ১৯৭১ সালে তা সম্ভব ছিল না। অধিকাংশ জমি ছিল নিচু, বিল, ডোবায় ভর্তি। তবে, চুকনগর থেকে সাতক্ষীরা সড়ক ধরে পশ্চিমবঙ্গে যাওয়ার একটি পথ আছে। ১৯৭১ সালে এ পথ ধরেই মানুষ বাংলাদেশ ত্যাগ করে পশ্চিমবঙ্গে যেতে চেয়েছেন।

www.Educationblog24.Com

ডুমুরিয়া থানার আটলিয়া ইউনিয়নের চুকনগর বাজারটি তখনও ছিল বেশ পরিচিত। তিন দিকে নদী ঘেরা চুকনগরের বাজার। খুলনা শহর থেকে প্রায় ৩২ কিলোমিটার পশ্চিমে ভদ্রা নদীর তীরে অবস্থিত। খুলনা, সাতক্ষীরা ও যশোর জেলার সঙ্গে নদী ও সড়ক পথে তুলনামূলক ভালো যোগাযোগ ব্যবস্থার জন্য চুকনগর ব্যবসা কেন্দ্র হিসেবে গড়ে ওঠে।

১৯৭১ সালে বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে হানাদারদের গণহত্যা শুরু হয়। রাজাকার, শান্তি বাহিনী সংগঠিত হওয়ার পর গণহত্যার কার্যক্রম আরো পরিকল্পিতভাবে চলতে থাকে। স্থানীয় বাঙালি ও বিহারী সহযোগীরা হানাদারদের থানা-ইউনিয়ন পর্যায়ে পথ দেখিয়ে নিয়ে আসতে থাকে। প্রধান টার্গেট হয় সংখ্যালঘু ও আওয়ামী লীগাররা। খুলনায় এ কার্যক্রম শুরু হয় এবং এরই সূত্র ধরে চুকনগর গণহত্যা সংঘটিত হয়।

চুকনগর গণহত্যার কারণ কী সুনির্দিষ্ট করে কেউ বলতে পারেনি। তবে, প্রত্যক্ষদর্শীদের বিভিন্ন বিবরণ থেকে এ সম্পর্কে খানিকটা ধারণা করা যেতে পারে। খুলনার বিভিন্ন থানায় হানাদারদের সহযোগীরা সাধারণ মানুষজনের ওপর অত্যাচার শুরু করে বিশেষ করে হিন্দুদের ওপর। ফলে, হিন্দু সম্প্রদায়ের অনেকে ভিটেমাটি ত্যাগ করে পশ্চিমবঙ্গে চলে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। তখন যাবার পথটি ছিল বিভিন্ন অঞ্চল থেকে এসে চুকনগর আসা। এবং তারপর দালাল অথবা মুক্তিযুদ্ধের প্রতি সহানুভূতি সম্পন্ন কারো সাহায্যে সীমান্তে পৌঁছা। হানাদার ও তাদের সহযোগীদের অত্যাচার বাড়লে, দলে দলে হিন্দু সম্প্রদায়ের মানুষ বাটিয়াঘাটা, দাকোপ, সাতক্ষীরা, বাগেরহাট থেকে রওয়ানা দেন। নদীপথ বেশি কার্যকর হওয়ায় এ পথেই মানুষ এসেছিলেন বেশি। এখন প্রশ্ন উঠতে পারে, একই দিন বিভিন্ন অঞ্চল থেকে এতো মানুষ চুকনগরে জমা হলেন কীভাবে? এপ্রিল মাসের শেষ দিকে রাজাকার ও হানাদার বাহিনীর সহযোগীদের অগ্নিসংযোগ, অত্যাচার, লুটপাট, নারী নির্যাতন, হত্যা চরম আতঙ্কের সৃষ্টি করে। স্থানীয় পূর্ববঙ্গ কমিউনিস্ট পার্টির সদস্যরাও শ্রেণী শত্রু নিধনের নামে একই কাজ শুরু করে। এ পরিপ্রেক্ষিতে ডুমুরিয়া, বাটিয়াঘাটা, দাকোপ, সাতক্ষীরা প্রভৃতি অঞ্চল থেকে মানুষ ভারতের পথে রওয়ানা দেন।

সাক্ষাৎকার থেকে জানা যায় বিভিন্ন দিনে, বিভিন্ন সময়, বিভিন্ন অঞ্চল থেকে মানুষ রওয়ানা হয়ে চুকনগর পৌঁছেন। যাদের যাওয়া সম্ভব হয়েছে তারা চলে গেছেন। বাকীরা ছিলেন যাওয়ার অপেক্ষায়। তাছাড়া হানাদাররা 'আক্রমণ করতে পারে' কিছু এলাকায় এই আশঙ্কার খবর ছড়িয়ে পড়লে ১৮/১৯ মে বিভিন্ন অঞ্চল থেকে মানুষজন রওয়ানা হন এবং ২০ তারিখ দেখা যায় চুকনগর এলাকা লোকে লোকারণ্য হয়ে গেছে।

বেশ কয়েকজন জানিয়েছেন, খেয়াঘাটের জনৈক বিহারী খানের সঙ্গে খেয়া পারাপারের মূল্য নিয়ে কারো কোন বচসা হয়েছিলো। সেই খান 'দেখে নেয়া'র বাসনায় হানাদারদের খবর দিয়েছিলো। হানাদারদের স্থানীয় সহযোগীরাও এতে ইন্ধন যুগিয়েছিলো। তাদের উদ্দেশ্য ছিল দ্বিবিধ–'মালাউন' বা বিধর্মীদের পাক দেশ থেকে বের করে দেওয়া এবং সম্ভব হলে তাদের টাকা, সোনাদানা লুট করা। এই হচ্ছে চুকনগর গণহত্যার পটভূমি।

www.Educationblog24.com

www.Educationblog24.Com

২০ মে, বৃহস্পতিবার, সকাল থেকেই সবাই যাত্রার আয়োজন করেছিলো। অধিকাংশ পরিবারের ইচ্ছা ছিল ১০-১১টার মধ্যে খেয়ে দেয়ে রওনা হবে। অন্যদিকে, চাপা আতঙ্ক ছিল খানিকটা। কারণ, বিহারী খানের সঙ্গে বচসা হয়েছিলো। বেলা দশটার দিকে সাতক্ষীরা সড়ক ধরে হানাদারদের দুটি ট্রাক বর্তমান চুকনগর কলেজের (৭১-এ কলেজ ছিল না) পশ্চিম পাশে কাউতলায় এসে পৌছায়। এই এলাকাটুকু তখন পাতখোলা নামে পরিচিত ছিল স্থানীয়দের কাছে। হানাদারদের সংখ্যা বেশি ছিল না। খুব সম্ভব এক প্লাটুন সৈন্য হয়ত এসেছিলো। হালকা অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে ট্রাক থেকে নেমেই তারা গুলি করতে শুরু করে এবং চুকনগর পরিণত হয় এক মৃত নগরীতে।

গণহত্যা সম্পর্কে সব প্রত্যক্ষদর্শীর সাক্ষ্য একই রকম। প্রত্যেকেই হানাদার বাহিনীর আগমন ও নির্বিচার হত্যার একই রকম বিবরণ দিয়েছেন। বিবরণের ডিটেলসে খানিকটা পার্থক্য আছে। একটির পর একটি বিবরণ যখন শুনেছি তখন গণহত্যার স্বরূপটি অনুভব করতে পেরেছি। 'ওরাল হিস্ট্রি' এভাবেই ইতিহাসকে জীবন্ত করে তোলে। ভাবতে অবাক লাগে, স্বজন-পরিজন হারিয়ে কীভাবে পরিবারগুলি বেঁচেছিলো! চুকনগরে এই সাক্ষাৎকার শুনতে শুনতে আবেগে আপ্লুত হয়ে জনকণ্ঠের রিপোর্টার ফজলুল বারী জনকণ্ঠে লিখেছিলেন, "লাশের ওপর লাশ, মায়ের কোলে শিশুর লাশ, স্বামীকে বাঁচাতে স্ত্রী জড়িয়ে ধরেছিল। বাবা মেয়েকে বাঁচাতে জড়িয়ে ধরেছিল। মুহূর্তে সবাই লাশ হয়ে যায়। ভদ্রা নদীর পানিতে বয় রক্তের বহর, ভদ্রা নদী হয়ে যায় লাশের নদী। কয়েক ঘণ্টা পর, পাকিস্তানীদের গুলির মজুত ফুরিয়ে গেলে গেয়নেট দিয়ে খুঁচিয়ে হত্যা করা হয়েছে।"

এই হত্যাকাণ্ড চালাবার মাঝেও হানাদাররা কিছু নারীকে ধর্ষণ করে। কয়েকজনকে ট্রাকে করে তুলেও নিয়ে যায়। হত্যাকাণ্ডের পর স্থানীয় লোকজন লাশ পরিষ্কারের কাজে নেমে পড়ে। অধিকাংশ লাশই ভদ্রা নদীতে ফেলে দেয়া হয়। কিছু গণকবরে সমাহিত করা হয়।

গণহত্যার সঙ্গে যুক্ত ধ্বংসযজ্ঞ। বাংলাদেশের প্রায় প্রতিটি অঞ্চলে ধ্বংসযজ্ঞের সঙ্গে চলে লুটপাট। বিভিন্ন এলাকায় অগ্নিসংযোগ করে ঘর বাড়ি সম্পদ ছাইয়ে পরিণত করেছিল পাকিস্তানী হানাদার বাহিনী ও তাদের দোসর রাজাকার আলবদররা। ১৯৭২ সালের পত্রিকায় প্রকাশিত বিভিন্ন প্রতিবেদন ও তথ্যের ভিত্তিতে কয়েকটি বিভিন্ন অঞ্চলে ধ্বংসপ্রাপ্ত ঘরবাড়ির সংখ্যা তুলে ধরছি–

নোয়াখালী ৭১ হাজার	নরসিংদী ৯০%
নওগাঁ ৫০ হাজার	শান্তাহার ৫ হাজার
জামালপুর ৭৫ হাজার	টাঙ্গাইল ২১৩৪৮ হাজার
বগুড়া ৮০ হাজার	

টুঙ্গিপাড়ায় বঙ্গবন্ধুর বাড়িটিও পুড়িয়ে দেয়া হয়েছিল। আনরডের (জাতিসংঘ) হিসেবে ছয় হাজার গ্রাম ধ্বংস করে দেয়া হয়েছিল।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের হিসাবটি দেখা যাক–

কুমিল্লা ১৪৬০	নওগাঁ ৩০ হাজার
সাতক্ষীরা ৭৫%	সিরাজগঞ্জ ৮০%

www.Educationblog24.Com

চট্টগ্রাম মাধ্যমিক স্কুলসমূহের ক্ষতির পরিমাণ ছিল ২৫ কোটি। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ২২ লাখ। মোট ৩৪৫৭টি প্রতিষ্ঠান ধ্বংস হয়েছিল যার ক্ষতির পরিমাণ ছিল ১৩৫ কোটি।

প্রতিষ্ঠানের ক্ষয়ক্ষতির যে বিবরণ পাই তাহলো–

বিআইডিসি ১০ কোটি
ডিআইটি ২ লাখ
শিল্প প্রতিষ্ঠান ১৫০টি
ইমারত বিভাগ ৩ কোটি
বাস ১০০০
সেতু ২৭৪
কৃষি পণ্য ৩৯৪ কোটি

বিভিন্ন অঞ্চলের ক্ষয়ক্ষতি সম্পর্কে প্রতিবেদনও ছাপা হয়েছিলো। যেমন :

রামগড় ৫ কোটি
রাজশাহী ৫ কোটি
ভৈরব শহর ১০০ কোটি
জামালপুর ১২ কোটি
ভৈরব বন্দর ৩০০ কোটি
চালনা বন্দর ১.৫০ কোটি

আনরডের হিসাব মতে বাংলাদেশের ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ ছিল ৯৩০ কোটি। ৪ লাখ শিশু সম্পূর্ণ নিঃস্ব হয়ে গিয়েছিল। সর্বস্বান্ত হয়ে গিয়েছিল কুমিল্লার ৪০ হাজার জেলে।

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে যখন বলা হয় ৩০ লক্ষ মানুষ নিহত হয়েছিলেন, আজকাল অনেক বাঙালিই তা মানতে চান না। এ বিষয়েও বিতর্কে মেতে ওঠেন। 'গণহত্যা' শিরোনামে আমরা এ বিষয়ে কিছু তথ্য পাই। অধিকাংশ প্রতিবেদনই ছিল ১৯৭২ সালের। আঞ্চলিকভাবে আমরা সামান্য যে হিসাব পাই তাতেই বিস্মিত হতে হয়। কয়েকটি উদাহরণ

[অঞ্চলভিত্তিক নিহতদের হিসাব]

দিনাজপুর ৭৫,০০০
কুষ্টিয়া ৪০, ০০০
চাঁদপুর ১০,০০০
নওগাঁ ২০,০০০
বরিশাল শহর ২৫,০০০
কুমিল্লা ২০,০০০
ঝালকাঠি ১০,০০০
নড়াইল ১০,০০০
রংপুর ৬০,০০০
বগুড়া শহর ২৫,০০০
আখাউড়া ২০,০০০
জামালপুর ১০,০০০
ঠাকুরগাঁও ৩০,০০০
চৌদ্দগ্রাম থানা ১,০০০
চট্টগ্রাম ১ লাখের ওপরে
স্বরূপকাঠি ও বানরীপাড়া ৫০০০
সেতাবগঞ্জ ৭০০০
মানিকগঞ্জ ১০০০
পার্বতীপুর ১০,০০০
নরসিংদী ১০১৯
সৈয়দপুর ১০,০০০
হাজিগঞ্জ ৩০,০০০
কুড়িগ্রাম ১০,০০০

এছাড়া হরিরামপুরে একটি পুকুরে পাওয়া গিয়েছিল ১০,০০০ নরমুণ্ড। কুমিল্লায় ১১ দিনে উদ্ধার করা হয়েছিল ৫০০, জয়পুরহাটে একদিনে ৫০০-এর বেশি, দিনাজপুরের

www.Educationblog24.Com

www.Educationblog24.com

দুটি গ্রামে ৩৭০০০, শেরপুর জেটিতে ২০০০০ যারা খবর আনা নেওয়া করতেন বা কুরিয়ার হিসেবে কাজ করতেন সে রকম ১৫০ জন গিয়েছিলেন বাঘের পেটে। স্বাধীনতার পর হানাদার বাহিনীর পেতে রাখা মাইন বিস্ফোরণে নিহত হয়েছিলেন ৯৬ জন। আরো জানা যায় নিয়াজী মন্তব্য করেছিলেন, বাংলাদেশে হত্যা করা হয়েছিল ১৫ লাখ মানুষকে। হানাদার বাহিনীর হিসাব যদি হয় ১৫ লাখ তাহলে ৩০ লক্ষ সংখ্যাটিতো খুব বেশি নয়।

যে কোন যুদ্ধে সবচেয়ে প্রথম এবং বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হন নারী। মুক্তিযুদ্ধেও এর ব্যতিক্রম নয়। ধর্ষিত বা নির্যাতিত নারীর সংখ্যা নিয়েও বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছে। সে সময় বিদেশী প্রতিবেদনেও এ সংখ্যা প্রায় ১০ লাখের মতো বলা হয়েছে। ডা. জিওফ্রে ডেভিসও যে সংখ্যা দিয়েছিলেন সাম্প্রতিক গবেষণায় তাও সঠিক মনে হয় না। 'বীরাঙ্গনা ১৯৭১' শীর্ষক গবেষণা করতে গিয়ে আমার মনে হয়েছে এ সংখ্যা আনুমানিক ৬ লক্ষের কাছাকাছি। মুক্তিযুদ্ধের ক্ষয়ক্ষতির ব্যাপকতা কমাতে পরবর্তীকালে বিশেষ করে পাকিস্তানী মানুষজন সেই সংখ্যা হ্রাস করতে বলাতে থাকেন। সম্প্রতি শর্মিলা বসু নামে এক গবেষক মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে প্রকাশিত তার গ্রন্থে এ সংখ্যা উল্লেখ করেছেন মাত্র ৩ হাজার। এ সবই সত্যের অপলাপ।

মুক্তিযুদ্ধের সময় নির্যাতিতা নারীদের বিষয়টি সব সময় উপেক্ষিত হয়েছে। বঙ্গবন্ধু তাদের যথাথ মর্যাদা দিতে চাইলেও তাতে সফল হননি। ১৯৭১-৭২ সাল পর্যন্ত পত্রিকায় নারী নির্যাতনের বিষয়টি এসেছে। কিন্তু ১৯৭২ সালের পর থেকে দেখি বিষয়টি সংবাদপত্রে উপেক্ষিত। বর্তমানে এ বিষয়টি আবার আলোচনায় আসছে এবং এ নিয়ে কিছু লেখালেখিও হয়েছে। সে কারণে বিষয়টির ওপরও সামান্য আলোকপাত করবো।

নির্যাতিতা নারীরা সব সময় অবমাননার শিকার। মুক্তিযুদ্ধের সময় প্রতিটি প্রহর তাদের কেটেছে আতঙ্কে, যারা নির্যাতিতা হয়েছে তাদের ভাগ্য তখনই নির্ধারিত হয়ে গেছে। স্বাধীন বাংলাদেশেও নির্যাতিতাদের হ্রাস হয়নি। ট্রাজেডি এখানেই। আমরা নাকি 'মা-বোনদের ইজ্জত' করি। বস্তুত এ ধরনের ভণ্ডামি আছে খুব কম সমাজেই। বঙ্গবন্ধু এদের 'বীরাঙ্গনা' অভিধায় ভূষিত করে সমাজে সম্মানের সঙ্গে পুনর্বাসন করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু অচিরেই দেখা গেল, সমাজ তাদের গ্রহণ করছে না। ভাস্কর ফেরদৌসী প্রিয়ভাষিনীর স্বামী আহসানউল্লাহর সংখ্যা দু'একজনের বেশি নয় যিনি প্রকাশ্যে গর্বের সঙ্গে বলতে পারেন, 'আমার সৌভাগ্য, আমি একজন মুক্তিযোদ্ধার সঙ্গে আছি। তিনি আমায় গ্রহণ করেছেন।' অধিকাংশই মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে, এমনকি পিতামাতাও। নীলিমা ইব্রাহিমের বইতে তার বিবরণ আছে। নির্যাতিত মহিলার সংখ্যা ছিল কেমন? এ সংখ্যা কখনো নির্দিষ্ট করা যায় নি, করা সম্ভবও নয়। আর আমরা যে সংখ্যাই বলি তাই চ্যালেঞ্জ করা হয়, এদেশেও। তাই আমি *বাংলার বাণীতে* ১৯৭২ সালে প্রকাশিত এক অস্ট্রেলিয়ান ডাক্তারের প্রতিবেদনের কিছু অংশ উদ্ধৃতি করছি। তাঁর নাম ডা. জিওফ্রে ডেভিস। ঐ সময় থেকে বাংলাদেশে এসেছিলেন তিনি নির্যাতিতা

www.Educationblog24.com

নারীদের সেবা প্রদানের জন্য। তাঁর মতে, মুক্তিযুদ্ধে নির্যাতিতা নারীর সংখ্যা চার লাখের কম নয়। এবং সেই হিসাবের তিনি একটা পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ দিয়েছেন– "ধর্ষিতাদের চিকিৎসার জন্য ফেব্রুয়ারি মাসে ঢাকায় একটি ক্লিনিক স্থাপন করা হয়। সরকারি কর্মচারীদের হিসাব মতে ধর্ষিত মহিলাদের আনুমানিক সংখ্যা ২ লাখ। ডা. ডেভিস বলেন, অন্তঃস্বত্বা মহিলার সংখ্যাই ২ লাখ।

অন্তঃস্বত্বা মহিলাদের সাহায্য সংক্রান্ত কর্মসূচি শুরু হবার আগেই দেড় লাখ থেকে ১ লাখ ৭০ হাজার মহিলা গর্ভপাত করেছেন। অবশিষ্ট ৩০ হাজারের মধ্যে কেউ কেউ আত্মহত্যা করেছেন, কেউ-কেউ তাদের শিশুদের নিজের কাছে রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।...

ধর্ষিত মহিলাদের যে হিসাব সরকারিভাবে দেয়া হয়েছে ডা. ডেভিসের মতে তা সঠিক নয়। সরকারি কর্মকর্তারা বাংলাদেশের জেলাওয়ারী হিসাব করেছেন। সারা দেশের ৪৮০টি থানা ২৭০ দিন পাক সেনাদের দখলে ছিল। প্রতিদিন গড়ে ২ জন করে নিখোঁজ মহিলার সংখ্যা অনুসারে লাঞ্ছিত মহিলার সংখ্যা দাঁড়ায় ২ লাখ। এই সংখ্যাকে চূড়ান্তভাবে নির্ভুল অঙ্করূপে গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। কিন্তু হানাদারবাহিনী গ্রামে গ্রামে হানা দেবার সময় যেসব তরুণীকে ধর্ষণ করেছে তার হিসার রক্ষণে সরকারি রেকর্ড ব্যর্থ হয়েছে। পৌনঃপুনিক লালসা চরিতার্থ করার জন্য হানাদার বাহিনী অনেক তরুণীকে তাদের শিবিরে নিয়ে যায়। এসব রক্ষিত তরুণীদের অন্তস্বত্বার লক্ষণ কিংবা রোগের প্রাদুর্ভাব দেখা দিলে হয় তাদের পরিত্যাগ করা হয়েছে, নয়ত হত্যা করা হয়েছে।"

বীরাঙ্গনাদের পুনর্বাসন কার্যক্রমের সঙ্গে জড়িত ছিলেন অধ্যাপিকা নীলিমা ইব্রাহিম। তাঁর অভিজ্ঞতার আলোকে 'আমি বীরাঙ্গনা বলছি' নামে দু'খণ্ডে এ সম্পর্কে তিনি গ্রন্থও রচনা করেছেন। তাঁর বিবরণে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী ও রাজাকারদের নারী নির্যাতনের অনেক বিবরণ আছে। যেমন– "আমাদের শাড়ি পরতে বা দোপাট্টা ব্যবহার করতে দেয়া হতো না। কোন ক্যাম্পে নাকি কোন মেয়ে গলায় শাড়ির ফাঁস লাগিয়ে আত্মহত্যা করেছে। তাই আমাদের পরনে শুধু পেটিকোট আর ব্লাউজ। যেমন ময়লা তেমনি ছেঁড়া-খোঁড়া। মাঝে মাঝে শহরের দোকান থেকে ঢালাও এনে আমাদের প্রতি ছুঁড়ে ছুঁড়ে দিত। যেমন দুর্গাপূজা বা ঈদের সময় ভিক্ষা দেয় অথবা জাকাত দেয় ভিখারিকে। চোখ জলে ভরে উঠত।"

শাহরিয়ার কবিরকে এক সাক্ষাতকারে তিনি জানিয়েছেন, বীরাঙ্গনাদের যে তালিকা ছিল স্বয়ং বঙ্গবন্ধু তা বিনষ্ট করে ফেলার জন্য বলছিলেন কারণ তিনি অনুধাবন করেছিলেন, মুক্তিযুদ্ধ হলেও সমাজের মৌল কোনো পরিবর্তন হয়নি। সমাজ এদের গ্রহণ করবে না।

বঙ্গবন্ধু সরকারই বীরাঙ্গনাদের পুনর্বাসনের জন্য যাবতীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিল। কিন্তু জেনারেল জিয়াউর রহমান ক্ষমতায় এসে সে সব পুনর্বাসন প্রকল্প স্থগিত করে দেন। এরপর থেকে বীরাঙ্গনারা শুধু উক্ষেপিত হয়েছেন এ সমাজে যা খুবই

www.Educationblog24.Com

বেদনাদায়ক।

এ ছাড়া কত লক্ষ মানুষ নির্যাতিত হয়েছিলেন, আহত হয়েছিলেন তার নির্দিষ্ট সংখ্যা কখনও নিরূপণ করা যাবে না।

মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম বৈশিষ্ট্য, বাঙালিদের দেশত্যাগ যাদের এক শব্দে শরণার্থী বলে উল্লেখ করা হয়। হানাদার পাকিস্তানী বাহিনী ও তার দোসরদের হত্যা, নিপীড়ন, ধর্ষণ এড়াতে ২৬ মার্চ থেকে মানুষজন প্রথমে গ্রামে এবং তারপর সীমান্ত পেরুতে থাকে শরণার্থী হিসেবে। শরণার্থী হিসেবে সীমান্ত অতিক্রম করার সময়ও অনেকে নিহত হন যাদের গণহত্যার অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে।

শরণার্থী বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের গতি প্রকৃতি অনেকখানি নিয়ন্ত্রণ করেছে। ১৯৪৭ সালের পর ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে এত মানুষ আর বাস্তুভিটা ত্যাগ করেননি। এর অনেকগুলি দিক ছিল। প্রথমতঃ বিপুল সংখ্যক শরণার্থী ভারতে শুধু অর্থনৈতিক নয় আরো নানাবিধ সমস্যার সৃষ্টি করে। এ সমস্যার সমাধানে একমাত্র উপায় ছিল পাকিস্তানের পরাজয় ও মুক্তিযুদ্ধের জয়। যে কারণ ভারত [আরো কারণের মধ্যে একটি] এর দ্রুত সমাধানের লক্ষ্যে অন্তিমে পাকিস্তানের সঙ্গে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে। দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধ চললে শরণার্থীর চাপ সহ্য করা সম্ভব হতো না ভারতের পক্ষে এবং স্থায়ীভাবে এত শরণার্থী রাখা সম্ভব ছিল না সীমান্তে। একটি উদাহরণ দিই। ত্রিপুরার মোট জনসংখ্যার প্রায় সমান ছিল শরণার্থীর সংখ্যা। ভারত সরকারকে প্রতিদিন দু'কোটি টাকা খরচ করতে হচ্ছিল শরণার্থীদের জন্য। দ্বিতীয়তঃ অনবরত শরণার্থী সীমান্ত পেরুনোতে পাকিস্তান একথা প্রমাণ করতে পারছিল না যে দেশে স্বাভাবিক অবস্থা বিরাজ করছে। ফলে বিশ্ব জনমত তার পক্ষে নেয়া সম্ভব হয়নি। তৃতীয়তঃ এই শরণার্থী সমস্যাকে প্রধান করে তুলে ভারত আবার বিশ্বজনমত তার পক্ষে আনতে পেরেছিল, মুক্তিযুদ্ধের পক্ষেও।

বাংলাদেশের একদিকে ভারত এবং এই সীমান্ত মোট সীমান্তের প্রায় ৯৪ ভাগ, অন্যদিকে মিয়ানমার সীমান্ত বাকি ৬ দফা। চট্টগ্রাম, পার্বত্য চট্টগ্রামের কিছু বাসিন্দা সীমান্ত পেরিয়ে গিয়েছিলেন মিয়ানমার এবং মিয়ানমার যেহেতু এই যুদ্ধ সহানুভূতির সঙ্গে দেখেনি এবং সেই সীমান্ত রেখা পেরুনো ছিল ঝুঁকিপূর্ণ তাই শরণার্থী সেখানে বেশি যায়নি। অন্যদিকে, ভারতীয় সীমান্ত ছিল খোলামেলা পেরুনো সহজ। পশ্চিমবঙ্গ, ত্রিপুরা, আসাম, মেঘালয়ের মানুষজন সহযোগিতা ও বন্ধুত্বের হাত বাড়িয়ে দিয়েছিল। উভয় অঞ্চলের ভাষাগত ও সাংস্কৃতিক মিল ছিল। অনেকের আত্মীয়স্বজনও ছিলেন ওপারে।

শরণার্থীদের স্রোত এপ্রিল থেকে প্রবল হয়ে ওঠে। কত শরণার্থী ভারতে আশ্রয় নিয়েছিলেন তার সঠিক হিসাব না পেলেও ভারতীয় হিসাব অনুযায়ী সে সংখ্যা ছিল ৯৮,৯৯,৩০৫ জন। এটি হচ্ছে ক্যাম্পের হিসাব। কিন্তু, ক্যাম্পের বাইরেও ছিলেন অনেক শরণার্থী। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর কোনো দেশ থেকে এতো কম সময়ে এতো মানুষ শরণার্থী হননি।

শরণার্থীদের আশ্রয় দেয়া হয়েছিল পশ্চিমবঙ্গ, আসাম, ত্রিপুরা, মেঘালয়, বিহার,

www.Educationblog24.com

মধ্যপ্রদেশ ও উত্তর প্রদেশে। তবে, চাপ বেশি ছিল পশ্চিমবঙ্গ ও ত্রিপুরায়। ভারত যথাসাধ্য চেষ্টা করেছে শরণার্থীদের সাহায্য দেয়ার ও শান্ত রাখার।

এক কোটি শরণার্থীকে স্বাভাবিকভাবেই মানবেতর জীবনযাপন করতে হয়েছে। কলেরা ও অন্যান্য রোগে মারা গেছেন অনেকে। তবে, শুধু ভারতবাসী নয়, শরণার্থীদের সাহায্যে এগিয়ে এসেছিলেন ভারতবর্ষের সাধারণ মানুষ। যে যতটুকু পেরেছেন তা দিয়ে শরণার্থীদের সাহায্য করেছেন। অন্যদিকে, প্রবাসী বাঙালিও বিশ্ববাসী ও এগিয়ে এসেছিলেন শরণার্থীদের সাহায্যে। সে দানও ছিল অপ্রতুল। তা সত্ত্বেও বলতে হবে, ভারত সরকার, ভারতীয় জনগণ, প্রবাসী বাঙালি, জাতিসংঘ ও বিশ্বের বিভিন্ন দেশের সাধারণ মানুষ যদি শরণার্থীদের সাহায্যে এগিয়ে না আসতেন তাহলে ভারতের সঙ্গে এ ভার বহন করা সম্ভব হতো না এবং আরো অনেকে যে মৃত্যুবরণ করতেন তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

১৬ ডিসেম্বর হানাদার বাহিনীর আত্মসমর্পণের পর মানুষ দেশে ফেরা শুরু করেন।

দুই

সরকার গঠন ও তার অধীনে মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনা ছিল আওয়ামী লীগ নেতৃত্বের বড় ধরনের দূরদর্শিতা। আর কোন দেশে যেখানে এ ধরনের যুদ্ধ হয়েছে সেখানে এতো দ্রুত [প্রবাসী সরকার এক অর্থে] সরকার গঠন সম্ভব হয়নি।

১৯৭১ সালের বাংলাদেশ সরকার 'মুজিবনগর সরকার' নামেই বেশি পরিচিত। অনেকে একে প্রবাসী সরকারও বলেন। তবে, বাংলাদেশে সরকার বা মুজিবনগর সরকার বলাটাই শ্রেয়। এ সরকারের অধীনে জনযুদ্ধ পরিচালিত হয়েছিলো এবং বাংলাদেশ স্বাধীনতা অর্জন করেছিলো। বস্তুত, বাংলাদেশের ইতিহাসে মুজিবনগর সরকারকে খাটো করে দেখার কোনো উপায় নেই যদিও অনেকে সে প্রচেষ্টা চালান।

২৫ মার্চের পর আওয়ামী লীগের প্রথম সারির অনেক নেতা, কর্মী, সেনা, প্রশাসনিক কর্মকর্তা সীমান্ত পেরিয়ে পশ্চিমবঙ্গে চলে যান। তাজউদ্দীন আহমেদ ৩০ মার্চ, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সঙ্গে যোগাযোগ করেন এবং ২ এপ্রিল দিল্লী যান প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে দেখা করতে। আলোচনা ফলপ্রসূ হয় এবং ফিরে এসে তাজউদ্দীন অন্যান্য নেতাদের সঙ্গে আলাপ করে সরকার গঠনের উদ্যোগ নেন। এ সরকার গঠন নিয়ে শুরুতে এবং পরে অনেক তিক্ততার সৃষ্টি হয়েছিলো কিন্তু তাজউদ্দীনের দৃঢ়তার ফলে সরকার গঠিত ও পরিচালিত হয়।

এ পরিপ্রেক্ষিতে তাজউদ্দীন ১০ এপ্রিল বাংলাদেশ সরকার গঠনের কথা ঘোষণা করেন ও ১১ এপ্রিল এক বেতার ভাষণ দেন। ১৭ এপ্রিল নতুন সরকার শপথ গ্রহণ করে কুষ্টিয়ার মেহেরপুর মহকুমার (বর্তমানে জেলা) ভবেরপাড়া গ্রামের বৈদ্যনাথতলায়। নতুন সরকার বৈদ্যনাথতলার নাম পাল্টে রাখেন মুজিবনগর। ১৭ তারিখের আগে সরকার ঘোষণার কথা কাউকে জানানো হয়নি। সাংবাদিকদের কলকাতা প্রেসক্লাব থেকে ভবেরপাড়া নেয়া হয়েছিলো না জানিয়ে।

www.Educationblog24.Com

সরকারের রাষ্ট্রপতি ঘোষণা করা হয় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে। উপ-রাষ্ট্রপতি (অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি) সৈয়দ নজরুল ইসলাম, তাজউদ্দীন আহমেদ প্রধানমন্ত্রী এবং খোন্দকার মোশতাক আহমেদ, ক্যাপ্টেন মনসুর আলী, এ.এইচ. এম কামরুজ্জামানকে মন্ত্রিপরিষদের সদস্য ও এম.এ.জি ওসমানীকে প্রধান সেনাপতি নিযুক্ত করা হয়। সরকার ছিল সংসদীয় সরকার। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হলো দেশের নামকরণ করা হয় 'গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ'। তৎকালীন কেবিনেট সচিব তওফিক ইমাম লিখেছেন, "অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী, অপর তিনমন্ত্রী এবং মন্ত্রিপরিষদের নির্দেশনায় আমরা, অর্থাৎ বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের/বিভাগের সচিববৃন্দ সরকারের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করতাম। প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় ও প্রধান সেনাপতি মুক্তিযুদ্ধ সংক্রান্ত যাবতীয় কর্মকান্ড পরিচালনা করতেন সেক্টর কমান্ডারদের মাধ্যমে।"

সরকারের মন্ত্রণালয় ও বিভাগের সংখ্যা ছিল বারোটি। যুদ্ধের সেক্টর ছিল ১১টি, এর সঙ্গে গঠিত হয় ১১টি আঞ্চলিক পরিষদ যার সদস্য ছিলেন মূলত : রাজনীতিবিদরা। এই কাউন্সিলকে সহায়তা করার জন্য নিয়োগ দেয়া হয় একজন আঞ্চলিক প্রশাসনিক কর্মকর্তার। পরবর্তীকালে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দকে নিয়ে একটি উপদেষ্টা পরিষদও গঠন করা হয় যা কখনও কার্যকর ছিল না। আনন্দবাজার এক আবেগপূর্ণ দীর্ঘ রিপোর্ট ছেপেছিলো ১৮ এপ্রিল। আনন্দবাজারে সাধারণত: এত বড় প্রতিবেদন ছাপা হতো না। এর শিরোনাম ছিল–'নতুন রাষ্ট্র নতুন জাতি জন্ম নিল'।

"একটি রাষ্ট্র আজ সকালে আনুষ্ঠানিকভাবে জন্ম নিল। এই নতুন নগরে সে রাষ্ট্রের নাম গণতান্ত্রিক বাংলাদেশ প্রজাতন্ত্র। সাড়ে সাত কোটি বাঙালির স্বাধীন সার্বভৌম দেশ। তার জন্মলগ্নে আকাশে থোকা থোকা মেঘ ছিল। তার জন্মলগ্নে চারটি ছেলে প্রাণ ঢেলে 'আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালবাসি' গানটি গাইল। তার জন্মলগ্নে পবিত্র কোরান থেকে তেলাওয়াত করা হল। তার জন্মলগ্নে সহস্র কণ্ঠে জয়ধ্বনি উঠল 'জয় বাংলা'।

মুজিবনগর সরকারের বড় কৃতিত্ব 'স্বাধীনতার ঘোষণা পত্র' দিয়ে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা। বিশ্বে যে ক'টি দেশ স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র দিয়ে যুদ্ধ করেছিল বাংলাদেশ তার মধ্যে অন্যতম। ১০ এপ্রিল ১৯৭১ তারিখে ইংরেজিতে প্রণীত প্রক্লেমেশন অব ইনডিপেনডেন্স ঘোষিত ও জারি করা হয় এবং ২৩শে মে ১৯৭২ তারিখে বাংলাদেশ গেজেটের অতিরিক্ত সংখ্যায় প্রকাশিত হয়।

"স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র (অনূদিত)

মুজিবনগর, বাংলাদেশ
১০ই এপ্রিল, ১৯৭১

যেহেতু একটি সংবিধান প্রণয়নের উদ্দেশ্যে প্রতিনিধি নির্বাচনের জন্য ১৯৭০ সনের ৭ই ডিসেম্বর হইতে ১৯৭১ সনের ১৭ই জানুয়ারী পর্যন্ত বাংলাদেশে অবাধ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়,

এবং

www.Educationblog24.Com

যেহেতু এই নির্বাচনে বাংলাদেশের জনগণ ১৬৯ জন প্রতিনিধির মধ্যে আওয়ামী লীগ দলীয় ১৬৭ জনকে নির্বাচিত করেন,

এবং

যেহেতু সংবিধান প্রণয়নের উদ্দেশ্যে জেনারেল ইয়াহিয়া খান জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিগণকে ১৯৭১ সালের ৩রা মার্চ তারিখে মিলিত হইবার জন্য আহ্বান করেন,

এবং

যেহেতু এই আহূত পরিষদ-সভা স্বেচ্ছাচারী ও বেআইনীভাবে অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত করা হয়,

এবং

যেহেতু পাকিস্তানী কর্তৃপক্ষ তাহাদের প্রতিশ্রুতি রক্ষার পরিবর্তে এবং বাংলাদেশের প্রতিনিধিগণের সহিত আলোচনা অব্যাহত থাকা অবস্থায় একটি অন্যায় ও বিশ্বাসঘাতকতামূলক যুদ্ধ ঘোষণা করে,

এবং

যেহেতু এইরূপ বিশ্বাসঘাতকতামূলক আচরণের পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষের অবিসংবাদিত নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশের জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রণের আইনানুগ অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ১৯৭১ সনের ২৬শে মার্চ তারিখে ঢাকায় যথাযথভাবে স্বাধীনতার ঘোষণা প্রদান করেন এবং বাংলাদেশের মর্যাদা ও অখণ্ডতা রক্ষার জন্য বাংলাদেশের জনগণের প্রতি উদাত্ত আহ্বান জানান,

এবং

যেহেতু একটি বর্বর ও নৃশংস যুদ্ধ পরিচালনায় পাকিস্তানী কর্তৃপক্ষ, অন্যান্যের মধ্যে, বাংলাদেশের বেসামরিক ও নিরস্ত্র জনগণের উপর নজিরবিহীন নির্যাতন ও গণহত্যার অসংখ্য অপরাধ সংঘটন করিয়াছে এবং এখনও অনবরত করিয়া চলিতেছে,

এবং

যেহেতু পাকিস্তান সরকার একটি অন্যায় যুদ্ধ চাপাইয়া দিয়া, গণহত্যা করিয়া এবং অন্যান্য দমনমূলক কার্যকলাপের মাধ্যমে বাংলাদেশের প্রতিনিধিগণের পক্ষে একত্রিত হইয়া একটি সংবিধান প্রণয়ন এবং নিজেদের জন্য একটি সরকার প্রতিষ্ঠা করা অসম্ভব করিয়া তুলিয়াছে,

এবং

যেহেতু বাংলাদেশের জনগণ তাহাদের বীরত্ব, সাহসিকতা ও বিপ্লবী উদ্দীপনার মাধ্যমে বাংলাদেশের ভূখে র উপর তাহাদের কার্যকর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করিয়াছে,

সেহেতু আমরা বাংলাদেশের নির্বাচিত প্রতিনিধিগণ, বাংলাদেশের সর্বোচ্চ ক্ষমতার অধিকারী জনগণ কর্তৃক আমাদিগকে প্রদত্ত কর্তৃত্বের মর্যাদা রক্ষার্থ, নিজেদের সমন্বয়ে যথাযথভাবে একটি গণপরিষদরূপে গঠন করিলাম,

এবং

পারস্পরিক আলোচনা করিয়া

www.Educationblog24.com

www.Educationblog24.Com

এবং

বাংলাদেশের জনগণের জন্য সাম্য, মানবিক মর্যাদা ও সামাজিক সুবিচার নিশ্চিত করণার্থ,

সার্বভৌম গণপ্রজাতন্ত্র রূপে বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠা ঘোষণা করিলাম এবং দ্বারা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কর্তৃক ইতিপূর্বে ঘোষিত স্বাধীনতা দৃঢ়ভাবে সমর্থন ও অনুমোদন করিলাম, এবং

এতদ্বারা দৃঢ়ভাবে ঘোষণা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতেছি যে, সংবিধান প্রণীত না হওয়া পর্যন্ত বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রপতি থাকবেন এবং সৈয়দ নজরুল ইসলাম প্রজাতন্ত্রের উপ-রাষ্ট্রপতি থাকিবেন, এবং

রাষ্ট্রপতি প্রজাতন্ত্রের সকল সশস্ত্র বাহিনীর সর্বাধিনায়ক হইবেন,

ক্ষমা প্রদর্শনের ক্ষমতাসহ প্রজাতন্ত্রের সকল নির্বাহী ও আইন প্রণয়ন ক্ষমতা প্রয়োগ করিবেন,

একজন প্রধানমন্ত্রী নিয়োগ এবং তাঁহার বিবেচনায় প্রয়োজনীয় অন্যান্য মন্ত্রী নিয়োগ ক্ষমতার অধিকারী হইবেন,

কর আরোপণ ও অর্থ ব্যয়ন ক্ষমতার অধিকারী হইবেন,

গণপরিষদ আহ্বান ও মুলতবিকরণ ক্ষমতার অধিকারী হইবেন এবং

বাংলাদেশের জনগণকে একটি নিয়মতান্ত্রিক ও ন্যায়ানুগ সরকার প্রদানের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় অন্যান্য সকল কার্য করিতে পারিবেন।

আমরা বাংলাদেশের জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিগণ আরও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতেছি যে, কোন কারণে রাষ্ট্রপতি না থাকা বা রাষ্ট্রপতি তাঁহার কার্যভার গ্রহণ করিতে অসমর্থ হওয়া বা তাঁহার ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে অসমর্থ হওয়ার ক্ষেত্রে, রাষ্ট্রপতির উপর এতদ্বারা অর্পিত সমুদয় ক্ষমতা, কর্তব্য ও দায়িত্ব উপ-রাষ্ট্রপতির থাকিবে এবং তিনি উহার প্রয়োগ ও পালন করিবেন।

আমরা আরও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতেছি যে, জাতিমণ্ডলীর সদস্য হিসাবে আমাদের উপর যে দায় ও দায়িত্ব বর্তাইবে উহা পালন ও বাস্তবায়ন করার এবং জাতিসংঘের সনদ মানিয়া চলার প্রতিশ্রুতি আমরা দিতেছি।

আমরা আরও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতেছি যে, স্বাধীনতার এই ঘোষণাপত্র ১৯৭১ সনের ২৬শে মার্চ তারিখে কার্যকর হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

আমরা আরও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতেছি যে, এই দলিল কার্যকর করার লক্ষ্যে এবং রাষ্ট্রপতি ও উপ-রাষ্ট্রপতির শপথ পরিচালনার জন্য আমরা অধ্যাপক ইউসুফ আলীকে আমাদের যথাযথ ক্ষমতাপ্রাপ্ত প্রতিনিধি নিয়োগ করিলাম।

অধ্যাপক ইউসুফ আলী
বাংলাদেশের গণপরিষদের ক্ষমতাবলে ও
তদধীনে যথাযথভাবে ক্ষমতাপ্রাপ্ত প্রতিনিধি।

[*সংবিধান* থেকে উদ্ধৃত]

www.Educationblog24.com

www.Educationblog24.com

স্বাধীনতার ঘোষণাটি গুরুত্বপূর্ণ এ কারণে যে, একটি সরকার এ ঘোষণা দিয়েছে এবং মুক্তিযুদ্ধ সেই সরকারের কর্তৃত্বেই পরিচালিত হয়েছে। ঘোষণাটি ২৪ অনুচ্ছেদের। ঘোষণায় মূলত যে বক্তব্য তুলে ধরা হয়েছিল, তা হলো–১৯৭০ সালের যুক্ত নির্বাচনে জনপ্রতিনিধিরা নির্বাচিত হয়েছিলেন দেশের শাসনতন্ত্র প্রণয়নের জন্য। ১৬৯ জনের মধ্যে আওয়ামী লীগের নির্বাচিত সদস্য সংখ্যা ছিল ১৬৭। এ কারণে জেনারেল ইয়াহিয়া ১৯৭১ সালের ৩রা মার্চ ঢাকায় জাতীয় পরিষদের অধিবেশন আহ্বান করেছিলেন; কিন্তু পরে বেআইনি ও একতরফাভাবে তা স্থগিত রাখা হয়। এই পরিপ্রেক্ষিতে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ২৬শে মার্চ ১৯৭১ সালে স্বাধীনতার ঘোষণা দেন এবং বাংলাদেশের মানুষকে বাংলাদেশের সম্মান ও সংহতি রক্ষার আহ্বান জানান। এ পটভূমিকায় গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার বঙ্গবন্ধুর সেই ঘোষণাকে অনুমোদন করছে।

ঘোষণাটি আইনের ভাষায় রচিত এবং তা রচনা করেছিলেন ব্যারিস্টার আমীরুল ইসলাম। এ ঘোষণায় গুরুত্বপূর্ণ দুটি বাক্য হচ্ছে–

"বাংলাদেশের জনগণের জন্য সাম্য, মানবিক মর্যাদা ও সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করা আমাদের পবিত্র কর্তব্য বিবেচনা করে আমরা বাংলাদেশকে সার্বভৌম গণপ্রজাতান্ত্রিক রাষ্ট্রে রূপান্তরিত করার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করছি এবং এতদ্বারা পূর্বাহ্নে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বাধীনতা ঘোষণা অনুমোদন করছি।"

বাংলাদেশের মানুষের শৃঙ্খলাপূর্ণ ও ন্যায়মূলক সরকার প্রদানের [জন্য] যা যা করা দরকার তা করবেন।

এ ঘোষণায়ই বাংলাদেশের স্বাধীনতা দিবসের তারিখ ঘোষিত হয় যা নিয়ে এখনও হাস্যকর সব বিতর্ক হয়। মুজিবনগর ঘোষণায় পরিষ্কারভাবে লেখা আছে– "আমরা আরও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করছি যে, আমাদের স্বাধীনতার এ ঘোষণা ১৯৭১ সালের ২৬শে মার্চ থেকে কার্যকরী বলে গণ্য হবে।"

এই তারিখে উপ-রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম "অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি কর্তৃক আইন বলবৎকরণ আদেশ" জারি করেন। এ আদেশের বলে বাংলাদেশের ওপর অস্থায়ী সরকারের আইনগত কর্তৃত্ব স্থাপিত হয়। শেষ হয় মুজিবনগর সরকার গঠনের প্রথম পর্যায়। এর পরের পর্যায় হলো সরকার গঠন, শপথ ও কার্যক্রম পরিচালনা।

১১ তারিখ প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমেদের একটি দীর্ঘ ভাষণ প্রচার করে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র। বক্তৃতার উপসংহারে তিনি যা বলেছিলেন ঠিক তাই ঘটেছিল মুক্তিযুদ্ধের আগে ও পরে। এ ভাষণটির কথা অনেকের মনে নেই; কারণ কোথাও এর উল্লেখ নেই। উপসংহারে যে মন্তব্যগুলো করেছিলেন তার মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ–

১. আমাদের যুদ্ধ দীর্ঘস্থায়ী হবে না বলে আমাদের স্থির বিশ্বাস।

২. আমাদের মুক্তিবাহিনীর হাতে শেষ পরাজয় মেনে নেয়ার আগে শত্রুরা আরও অনেক রক্তক্ষয় ও ধ্বংসলীলা সৃষ্টি করবে।

৩. এ যুদ্ধ গণযুদ্ধ...এ যুদ্ধ বাংলাদেশের দুঃখী মানুষের যুদ্ধ।

আনুষ্ঠানিকভাবে জন্ম নিল বাংলাদেশ। এরপরই মন্ত্রিসভা, মুক্তিবাহিনী পুনর্গঠন,

www.Educationblog24.Com

যুদ্ধ চালনা, সিভিল কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার কাজে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। এ সব ইতিহাস আমাদের জানা। মুজিবনগর সরকারের অধীন (যার প্রধান ছিলেন শেখ মুজিব) যুদ্ধ পরিচালিত হয়েছে, দেশ স্বাধীন হয়েছে। এক্ষেত্রে জনাব তাজউদ্দীনের নেতৃত্ব অবশ্যই ছিল গুরুত্বপূর্ণ।

প্রকাশ্যে শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানের পর ১৭ই এপ্রিল তাজউদ্দীন আহমদ দীর্ঘ এক প্রেস স্টেটমেন্ট প্রদান করেন, যার শিরোনাম ছিল 'টু দি পিপল অফ দি ওয়ার্ল্ড।'

দীর্ঘ এ প্রেস স্টেটমেন্টে বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণার পটভূমি বর্ণিত হয়েছে। এর মূল সূত্রগুলো ছিল এ রকম–

পশ্চিম পাকিস্তানের ঔপনিবেশিক নির্যাতনের বিরুদ্ধে স্বাধিকার রক্ষার জন্য জাতীয় স্বাধিকার সংগ্রামের পথ বেছে নিতে হয়েছে।

পাকিস্তান কাঠামোর ভেতর বাংলাদেশের স্বায়ত্তশাসনের জন্য ছয় দফা দেয়া হয়েছিল এবং ১৯৭০ নির্বাচনের ভিত্তিতে আওয়ামী লীগ জয়লাভ করেছিল।

এর আগে আর কোন দাবির প্রতি মানুষ এমন ব্যাপক সমর্থন জানায়নি। সিন্ধু ও পাঞ্জাবে যেখানে ভুট্টোর পাকিস্তান পিপলস্ পার্টি সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করেছিল সেখানে ছয় দফার কথা নির্বাচনের সময় উল্লেখ করা হয়নি। বালুচিস্তানে যেখানে ন্যাপ সংখ্যাগরিষ্ঠ সেখানে তারা ছয় দফার প্রতি অঙ্গীকারাবদ্ধ। উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের প্রাদেশিক পরিষদে ন্যাপ সংখ্যাগরিষ্ঠ, সেখানেও অধিকমাত্রায় স্বায়ত্বশাসনের কথা বলা হয়েছিল।

ইয়াহিয়া-ভুট্টোর ষড়যন্ত্র সত্ত্বেও পিপলস পার্টি ছাড়া পশ্চিম পাকিস্তানের অন্য নির্বাচিত সদস্য পূর্ব পাকিস্তানে জাতীয় পরিষদের অধিবেশনে অংশগ্রহণের জন্য প্রস্তুতি নিয়েছিলেন। কিন্তু ইয়াহিয়া এ্যাডমিরাল আহসানকে বরখাস্ত করেন। যাকে মডারেট মনে করা হতো। মন্ত্রিসভায় বাঙালি সদস্যদের বরখাস্ত করা হয়, যাতে ক্ষমতা একমাত্র পশ্চিম পাকিস্তানের সামরিক জান্তার হাতে কেন্দ্রীভূত থাকে।

ইয়াহিয়া-ভুট্টোর সঙ্গে আঁতাত করে এগুলো করেছেন; কারণ তারা চাননি পাকিস্তানের পার্লামেন্টই ক্ষমতার আসল উৎস হয়ে উঠুক।

এসব কারণে শেখ মুজিবুর রহমানকে স্বাধীনতার ঘোষণা দিতে হয়েছিল।

অসহযোগ আন্দোলনের সময় বেসামরিক প্রশাসন ও পুলিশ দ্ব্যর্থহীনভাবে সমর্থন জানিয়েছিল শেখ মুজিবকে এবং নিজেদের স্থাপন করেছিল তার কর্তৃত্বের অধীনে।

এ পরিপ্রেক্ষিতে অসহযোগ আন্দোলনের সময় আওয়ামী লগি বাধ্য হয়ে অর্থনীতি ও প্রশাসন সচল রাখার জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। শুধু মানুষ নয়, প্রশাসন ও ব্যবসায়িক সম্প্রদায়ও শর্তহীনভাবে সমর্থন দিয়েছে। তারা আওয়ামী লীগের নির্দেশ মেনে চলেছে এবং নিজেদের বিভিন্ন সমস্যা সমাধানে আওয়ামী লীগকেই একক কর্তৃত্ব হিসেবে মেনে নিয়েছে।

ইয়াহিয়া ৬ই মার্চ এক প্ররোচনামূলক বক্তৃতা দিয়েছিলেন এবং তিনি আশা করেছিলেন ৭ই মার্চ স্বাধীনতার ঘোষণা আসবে।

www.Educationblog24.Com

যদিও মানুষ স্বাধীনতা চাচ্ছিল; কিন্তু শেখ মুজিব আবারও রাজনৈতিক সমাধানের পথে যেতে চেয়েছিলেন।

তাজউদ্দীন এরপর ২৫ মার্চ পর্যন্ত ঘটনার বিবরণ দিয়ে বলেছেন, "লাশের পাহাড়ের নিচে পাকিস্তান এখন মৃত ও কবরস্থ এবং এসব ঘটনাবলি প্রমাণ করে যে ইয়াহিয়া ও তার সমর্থকরা অনেক আগে থেকেই দুই দেশের তত্ত্বে বিশ্বাসী ছিল।"

তাজউদ্দীন সবশেষে আশা ব্যক্ত করে বলেন, "বাংলাদেশ হবে পৃথিবীর অষ্টম জনবহুল দেশ এবং এর একমাত্র উদ্দেশ্য হবে ছাই থেকে এক নতুন দেশ গড়ে তোলা। তাই ছোট-বড় সকল শক্তির সহযোগিতা তার কাম্য–

We do not aspire to join any block or pact but will seek instance from those who give it in a spirit of goodwill free from any desire to control our destinies. We have struggled for too long for our self determination to permit ourselves to become any ones statelite."

স্বাধীনতার ঘোষণা ও তাজউদ্দীন আহমেদের বক্তব্য এ কথাটিই ধ্বনিত হয়েছিল যে, বাংলাদেশ গঠিত হয়েছে সমতা, মানবিক ও সামাজিক ন্যায় বিচার রক্ষাকল্পে এবং ন্যায়মূলক সরকার প্রতিষ্ঠার জন্য। আদর্শগুলো প্রতিফলিত হয়েছিল ১৯৭২ সালে বাংলাদেশের শাসনতন্ত্রে। শাসনতন্ত্রের চারটি মূল বৈশিষ্ট্যই ছিল– জাতীয়তাবাদ, ধর্মনিরপেক্ষতা, গণতন্ত্র এবং সমাজতন্ত্র। সে সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে এটিই বিবেচনা করা হত যে, সমাজতন্ত্র মানুষের সাম্য প্রতিষ্ঠা করে ও মানুষের সম্মান নিশ্চিত করে। ন্যায়মূলক সরকার হিসেবে বিবেচনা করা হতো সংসদীয় গণতন্ত্রকে। এ সমস্ত আদর্শ রক্ষা করা যাবে যদি কোন শক্তির লেজুড় না হওয়া যায়। এবং কোন জোটে আবদ্ধ না হওয়া যায়। যে কারণে বাংলাদেশ সরকার জোটনিরপেক্ষ নীতি গ্রহণ করেছিল।

তিন

সরকার গঠিত হওয়ার পর মুক্তিযুদ্ধ হয়েছিল তা নয়। এ যুদ্ধের তিনটি পর্যায় আছে। প্রথম পর্যায় হচ্ছে স্বতস্ফূর্ত প্রতিরোধ। দ্বিতীয় পর্যায় হচ্ছে সরকারের অধীনে সংঘটিত প্রতিরোধ। শেষ পর্যায় হচ্ছে যৌথ কমান্ডের অধীনে বিজয় অভিযান।

বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতা ঘোষণা এবং ঢাকার গণহত্যার খবর পৌঁছা মাত্র ঢাকার বাইরে প্রতিরোধ শুরু হয়। এর মধ্যে চট্টগ্রামে মেজর রফিক ও পরবর্তীকালে মেজর জিয়ার প্রতিরোধ উল্লেখযোগ্য। তারা অবশ্য পরে পিছু হটে যান। চুয়াডাঙ্গায় মেজর ওসমান তার ইপিআর বাহিনী নিয়ে প্রতিরোধ করেন। মেজর খালেদ মোশাররফ ব্রাহ্মণবাড়িয়ায়। সবচেয়ে আগে প্রতিরোধ শুরু করেন মেজর শফিউল্লাহ রাজেন্দ্রপুরে। এভাবে বিভিন্ন রেজিমেন্টে বাঙালি অফিসার যারা ছিলেন তাদের অনেকে স্বপক্ষ ত্যাগ করেন। তাদের কমান্ডের অধীনে বাঙালি সৈন্যদের নিয়ে প্রাথমিক প্রতিরোধ করেন। প্রায় ক্ষেত্রে স্থানীয় আওয়ামী লীগ নেতা, ছাত্র যুবক জনতা সংগৃহীত পুরনো আমলের অস্ত্র দিয়ে প্রতিরোধ করেন। অর্থাৎ এক কথায় বলা যায়, ২৬ মার্চ থেকেই স্বতস্ফূর্ত প্রাথমিক প্রতিরোধ শুরু হয়ে যায় যদিও এসব প্রতিরোধ এপ্রিলের প্রথম সপ্তাহের মধ্যে

www.Educationblog24.Com

পাকিস্তানী সেনাদের আক্রমণে ভেঙ্গে পড়ে। অনেকে তখন সীমান্ত পেরিয়ে যান নতুনভাবে সংগঠিত হওয়ার জন্য। অনেকে দেশের অভ্যন্তরে সংগঠিত হওয়ার পদক্ষেপ গ্রহণ করেন।

অসংগঠিত বা পরে সংগঠিত বাহিনীর সদস্য হিসেবে যারা লড়াই করেছিলেন তাদের সবাইকে মুক্তিফৌজ, বা মুক্তিসেনা নামেই অভিহিত করা হতো। পরে যারাই যুদ্ধ করেছেন তাদেরই মুক্তিযোদ্ধা এবং যোদ্ধাদের সংগঠিত বাহিনীতে মুক্তি বাহিনী হিসেবেই অভিহিত করা হয়েছে।

এপ্রিল মাসের ৪ তারিখে সিলেটের ডেলিয়াপাড়া চা-বাগানে পাকিস্তান ত্যাগী বাঙালি সেনা অফিসারদের এক বৈঠক হয়। সেখানে চারজন সিনিয়র অফিসারকে যুদ্ধের দায়িত্ব দেয়া হয়। ব্রাহ্মণবাড়িয়া সিলেট অঞ্চলের দায়িত্ব পান মেজর শফিউল্লাহ, কুমিল্লা-নোয়াখালীর মেজর খালেদ মোশাররফ, চট্টগ্রাম ও পার্বত্য চট্টগ্রামে মেজর জিয়াউর রহমান ও কুষ্টিয়া অঞ্চলে মেজর আবু ওসমান চৌধুরী। কর্নেল ওসমানীকে সেনানায়ক হিসেবে ঠিক করা হয়।

১০ এপ্রিল সরকার গঠনের পর সরকার যুদ্ধকে নিজের কর্তৃত্বে এনে সংহত করার দায়িত্ব নেন। ১০ থেকে ১৭ জুলাই সিনিয়র অফিসারদের এক সম্মেলন হয়। সম্মেলন শেষে সমগ্র বাংলাদেশকে ১১টি সেক্টরে ও বিভিন্ন সাব-সেক্টরে বিভিন্ন জনকে নিয়োগ দেয়া হয়। ১২ এপ্রিল থেকে সদর দফতরের কাজ শুরু হলে অবসরপ্রাপ্ত লে. কর্নেল এএম এ রবকে চীফ অব স্টাফ ও গ্রুপ ক্যাপ্টেন একে খন্দকারকে ডেপুটি চীফ অফ স্টাফ নিয়োগ করা হয়।

আরো কিছু দিন পর তিনটি ব্রিগেড সৃষ্টি করা হয়। ব্রিগেড প্রধানদের নামের আদ্যাক্ষর দিয়ে ব্রিগেডের নামকরণ করা হয়। মেজর জিয়া, মেজর শফিউল্লাহ মেজর খালেদ মোশাররফের নেতৃত্বে 'জেড', 'এস' ও 'কে' ফোর্স গঠন করা হয়। এখানে উল্লেখ্য, মেজর জিয়া ছাড়া সবাই সেক্টর কমান্ডারও ছিলেন।

মুক্তিবাহিনীর সদস্যরা অনিয়মিত ও নিয়মিত দুটি ভাগে বিভক্ত ছিল। অনিয়মিতদের গণবাহিনী বলা হতো। নিয়মিত বাহিনীর অন্তর্গত ছিল সৈন্যরা যারা পাকিস্তান সেনাবাহিনী বা ইপিআরের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। বাকিরা গণবাহিনীতে। ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রশিক্ষণ কেন্দ্র গড়ে তোলা হয়। প্রশিক্ষণের পর বিভিন্ন সেক্টরের অধীনে গণবাহিনীতে নিযুক্ত করা হতো।

বাংলাদেশের অভ্যন্তরেও অনেকে মুক্তি সেনাদের নিয়ে গেরিলা বাহিনী সৃষ্টি করেন। যেমন টাঙ্গাইলে কাদের সিদ্দিকীর কাদেরিয়া বাহিনী, সিরাজগঞ্জে রফিক মির্জা বাহিনী, ফরিদপুরের হেমায়েত বাহিনী, ঝিনাইদহের আকবর [হোসেন] বাহিনী, বরিশালের কুদ্দুস বাহিনী, ময়মনসিংহে আফসার বাহিনী প্রভৃতি।

ভারতীয় বাহিনীর মেজর জেনারেল ওবানের অধীনেও বঙ্গবন্ধুর নামে 'মুজিব বাহিনী' নামে আরেকটি বাহিনী গঠিত হয়।

বিভিন্ন সেক্টরের অন্তর্ভুক্ত মুক্তিবাহিনীর সদস্যরা প্রশিক্ষণের পর অবরুদ্ধ বাংলাদেশে প্রবেশ করে গেরিলা কার্যক্রম চালানোর জন্য এবং অচিরেই তারা হানাদার

www.Educationblog24.com

www.Educationblog24.Com

পাকিস্তানী বাহিনীকে নাস্তানাবুদ করে তোলে।

২৮ ডিসেম্বর এ কে খন্দকারের নেতৃত্বে গঠিত হয় বিমান বাহিনী। পাকিস্তান আগস্টে নৌ সেনাদের নিয়ে গঠিত হয় বাংলাদেশ নৌবাহিনী। ৯ নভেম্বর উদ্বোধন করা হয় প্রথম নৌবহর 'বঙ্গবন্ধু নৌবহর'। এ ছাড়া নৌ কমান্ডোও গঠিত হয়।

ভারত সরকার বাংলাদেশের মুক্তিযোদ্ধাদের অস্ত্র দিয়ে সাহায্য করে। প্রশিক্ষণের বন্দোবস্ত করে। প্রবাসীরাও অস্ত্র সংগ্রহে সহায়তা করেন। এছাড়া পাকিস্তানী সেনাদের থেকেও [যুদ্ধে পরাজিত] অস্ত্র যোগাড় করা হয়। এভাবে বিভিন্ন সেক্টরে পাকিস্তানী হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে সংগঠিতভাবে সম্মুখ যুদ্ধ ও গেরিলা যুদ্ধে লিপ্ত হয় মুক্তিবাহিনী যার পরিসমাপ্তি ঘটে যৌথ বাহিনীর কমান্ডে বিজয় অভিযানে।

চার

মুক্তিযুদ্ধে প্রচার ছিল জয়ের একটি হাতিয়ার। বিশ্ব জনমত বাংলাদেশের পক্ষে ছিল দেখে, জয় দ্রুত সম্ভব হয়েছে। বিশ্বের মানুষকে সরকারের প্রচার বিভাগ, বিদেশী প্রচার মাধ্যম অন্যান্য যুদ্ধের ভয়াবহতা বোঝাতে সক্ষম হয়েছিল। এবং এ ক্ষেত্রে প্রধান ভূমিকা রেখেছিল স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র।

২৫ মার্চ যখন যুদ্ধাবস্থা তখন থেকেই চট্টগ্রাম বেতারের বেশ কিছু কর্মী বেতার প্রচার নিয়ে চিন্তিত ছিলেন এবং আপদকালীন সময়ের জন্য মানসিকভাবে প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। ২৬ মার্চ বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতা ঘোষণা প্রচারের উদ্যোগ গ্রহণ করেন বেতার কর্মীরা যার মধ্যে অন্যতম ছিলেন বেলাল মোহাম্মদ। এই বেতার কেন্দ্র থেকে কিছু ঘোষণা করা হয়। পাকিস্তানী বাহিনী গোলাবর্ষণ শুরু করলে বেতার কর্মীরা চলে যান কালুরঘাট এবং সেখানকার এক কিলোওয়াট ট্রান্সমিটার থেকে প্রথম আওয়ামী লীগ নেতা এমএ হান্নানের কণ্ঠে বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতা ঘোষণা পাঠ করে শোনান। এবং তারা বেতার কেন্দ্রের নামকরণ করেন 'স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী বেতার কেন্দ্র'। ইতোমধ্যে জিয়াউর রহমান পিছু হটে কালুরঘাট পৌঁছেন। বেতার কর্মীরা একজন সেনা অফিসার খুঁজছিলেন স্বাধীনতার ঘোষণা পাঠের জন্য যাতে মানুষ উদ্দীপ্ত হয়। তারা মেজর জিয়াকে খুঁজে পান। জিয়া বেতার কেন্দ্রে অবস্থান নেন ২৭.২৮.৩০ মার্চ। এই কেন্দ্র থেকে তিনি স্বাধীনতার ঘোষণা পাঠ করে শোনান।

বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতা ঘোষণার বার্তা ইতিমধ্যে বিদেশী প্রচার মাধ্যমে প্রচারিত হতে থাকে। তার সঙ্গে একজন সেনা অফিসারের বেতার ভাষণ নতুন মাত্রা যুক্ত করে। বাংলাদেশে স্বতস্ফূর্ত প্রতিরোধের বার্তা মানুষের কাছে পৌঁছে যায়।

৩০ মার্চ পাকিস্তান বাহিনী কালুরঘাট বেতার কেন্দ্র আক্রমণ করলে জিয়াউর রহমান বেতার কর্মীদের ফেলে রেখে চলে যান। আবুল কাসেম সন্দ্বীপ, বেলাল মোহাম্মদ ও আরও কয়েকজন বেতার কর্মী এক কিলোওয়াট ট্রান্সমিটারটি প্রথমে রায়গড় তারপর আগরতলা নিয়ে যান। সেখান থেকে অনিয়মিতভাবে ২৪ মে পর্যন্ত স্বাধীন বাংলা কেন্দ্রের অনুষ্ঠান অনিয়মিতভাবে প্রচারিত হতে থাকে। উল্লেখ্য, জিয়াউর

www.Educationblog24.com

রহমান কালুরঘাটে ভাষণ প্রচারের সময় 'স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী বেতার কেন্দ্র' থেকে বিপ্লবী শব্দটি কেটে দেন।

বাংলাদেশে সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর সংসদ সদস্য আবদুল মান্নানকে দায়িত্ব দেয়া হয় বেতার কেন্দ্র সংগঠিত করার। ২০ মে ৫০ কিলোওয়াট মধ্যম তরঙ্গ ট্রান্সমিটার নিয়ে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র সম্প্রচার শুরু করে। সকাল সাতটায় এবং সন্ধ্যা সাতটায় দু'টি অধিবেশন সম্প্রচারিত হতো।

অচিরেই স্বাধীন বাংলা বেতারে যুদ্ধের খবরাখবর, গান এবং এমআর আর আখতার মুকুলের বিশেষ কথিকা অসম্ভব জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। যুদ্ধের খবরাখবর শুনে এবং তা ইতিবাচক হলে মানুষ আশায় বুক বাঁধতো। বেতার কেন্দ্র থেকে প্রচারিত গানগুলি মানুষের মন শুধু জয় নয় মানুষকে উজ্জীবিত করেছিল। এই গানগুলি এখনও জনপ্রিয়।

অবরুদ্ধ বাংলাদেশে মানুষ লুকিয়ে লুকিয়ে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র শুনতেন। মুক্তিযুদ্ধের ক্যাম্পে, শরণার্থী শিবিরে স্বাধীন বাংলা বেতার ছিল সহযোদ্ধা। যুদ্ধে ১১টি স্বীকৃত সেক্টর ছিল। কিন্তু স্বাধীন বাংলা বেতার যেভাবে মানুষকে আশান্বিত ও উজ্জীবিত করেছিল তা অভূতপূর্ব। তাই স্বাধীন বাংলা বেতারকে যদি মুক্তিযুদ্ধের ১২নং সেক্টর বলি তাহলে সত্যের অপলাপ হবে না।

মুক্তিযুদ্ধ শুরুর সঙ্গে সঙ্গে পাকিস্তানী সামরিক জুন্তা বিদেশী সাংবাদিকদের আটক করে। মার্চ মাস থেকেই বাংলাদেশের খবরাখবর বিদেশী প্রচার মাধ্যমে স্থান করে নিয়েছিল। ২৫ মার্চের পর থেকে বাংলাদেশের খবরাখবর আর পাওয়া যাচ্ছিল না। সাংবাদিকদের মধ্যে লন্ডনের *ডেইলি টেলিগ্রাফের* ২৭ বছর বয়সী সাইমন ড্রিংকও ছিলেন। তিনি গ্রেফতার এড়িয়ে ২৭ মার্চ তার আলোকচিত্র নিয়ে সারা শহর চষে বেড়ান এবং ২০ রোল ছবি তোলেন। কিছু ছবি জার্মান দূতাবাসের মাধ্যমে লন্ডন পাঠানোর বন্দোবস্ত করেন এবং তারপর ঢাকা ত্যাগ করেন।

লন্ডনে ফিরে *ডেইলি টেলিগ্রাফে* তিনি প্রথম ঢাকার গণহত্যার চিত্র তুলে ধরেন, সারা বিশ্বের মানুষজন প্রথম গণহত্যার খবর জানতে পারে। এরপর নানা বিধি নিষেধ থাকা সত্ত্বেও বিদেশী সংবাদ সংস্থাগুলি বাংলাদেশের খবরাখবর সংগ্রহ করে ছাপতে থাকে। মে মাসে পাকিস্তানী সাংবাদিক এ্যান্থনি ম্যাসকারেনহাস এখন সারাদেশে কীভাবে গণহত্যা চালানো হয়েছে তা তুলে ধরেন। তিনি পাকিস্তান সরকারের হয়ে বাংলাদেশ সফর করে লন্ডন চলে যান। ম্যাসকারেনহাসের প্রতিবেদনের পর সারা বিশ্বে গণহত্যার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ শুরু হয়।

১৯৭১ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত এমন কোনদিন ছিল না যেদিন বাংলাদেশ সংক্রান্ত কোন না কোন প্রতিবেদন বিশ্ব মিডিয়ায় স্থান করে নিত।

এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল বেতার মাধ্যম। বিদেশী বেতার কেন্দ্রগুলি বিশেষ করে বিবিসি, আকাশবাণী ও অস্ট্রেলিয়া বেতার বিশেষ ভূমিকা রেখেছিল। বিবিসির মার্ক টালির প্রতিবেদন ও আকাশবাণীতে দেবদুলাল বন্দোপাধ্যায়ের কণ্ঠে রাজনৈতিক ভাষ্য শোনার জন্য বাঙালি উন্মুখ হয়ে থাকতেন। বিবিসি শুনতে হতো গোপনে। বাংলাদেশের

www.Educationblog24.com

একটি এলাকার ছোট একটি বাজারে গোপনে মানুষজন বিবিসি শুনতেন। ঐ বাজারের নামই হয়ে গিয়েছিল বিবিসি বাজার।

এভাবে প্রচার মাধ্যমগুলি বাংলাদেশের পক্ষে বিশ্ব জনমত গঠন করতে পেরেছিল। তাদের প্রচারে ক্ষুব্ধ নাগরিক সমাজ বিভিন্ন দেশে নিজ নিজ সরকারের ওপর চাপ সৃষ্টি করতে থাকে বাংলাদেশের পক্ষে।

পাঁচ

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে সারা বিশ্ব এবং পরাশক্তিসমূহ দু'ভাগ হয়ে গিয়েছিল। সংক্ষেপে বলা যায়, পরাশক্তির মধ্যে পাকিস্তান ও চীন ছিল একপক্ষে, অন্যপক্ষে ছিল সোভিয়েত ইউনিয়ন। ইউরোপীয় দেশগুলি কম বেশি সমর্থন করেছে বাংলাদেশকে। মুসলিম অধ্যুষিত দেশগুলি পাকিস্তানকে।

দুঃখের হলেও সত্য যে, ইসলাম রক্ষার নামে পাকিস্তানীরা বাঙালি মুসলমান ও অন্যান্য সম্প্রদায়ের ওপর আক্রমণ করে। অথচ, বাংলাদেশ ছিল মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশ। পাকিস্তান প্রচার করে যে সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে পাকিস্তানের আভ্যন্তরীণ সমস্যা। কিন্তু হিন্দু ভারত পাকিস্তানের অখন্ডতা ক্ষুন্ন করতে চায় তাই গুটিকয় বাঙালির 'বিচ্ছিন্নতাবাদী' আন্দোলনকে তারা সমর্থন করছে। মুসলিম অধ্যুষিত দেশগুলি এই প্রচার মেনে নেয়। পাকিস্তানের গণহত্যার সমর্থনে এগিয়ে আসে সৌদি আরব, ইরান, ইরাক প্রভৃতি দেশসমূহ। ইসলামী রাষ্ট্রসমূহের সংস্থা ওআইসিও সমর্থন করে গণহত্যাকে। সংস্থাটি পাকিস্তানকে সমর্থন করতে বিশ্বের মুসলমানদের আহ্বান জানায়।

জাতিসংঘেও যে মুক্তিযুদ্ধ আলোচিত হয়নি তা নয়। কিন্তু স্থায়ী সদস্যদের মধ্যে তিন পরাশক্তির বিভাজনের কারণে জাতিসংঘ কোন ভূমিকা রাখতে পারেনি। তবে, জাতিসংঘের উদ্বাস্তু বিষয়ক প্রতিষ্ঠান ইউএনএইচসি আর শরণার্থীদের সহায়তা করেছিল।

পাশ্চাত্যের বা ইউরোপের সোভিয়েত বলয় ভুক্ত দেশসমূহ সরাসরি বাংলাদেশকে সমর্থন করেছে। মার্কিন বলয়ভুক্ত দেশসমূহ কিন্তু আবার মার্কিনী সরকারের মতো পাকিস্তানকে সমর্থন জানায়নি। তারা গণহত্যার নিন্দা করেছে। শরণার্থীদের সহায়তা করেছে, রাজনৈতিক মীমাংসার আহ্বান জানিয়েছে।

চীন পাকিস্তানকে সমর্থন করেছে। সোভিয়েত ইউনিয়ন প্রথম থেকেই ভারতকে সমর্থন করেছে এবং ভারতের সঙ্গে মৈত্রী চুক্তি করেছে। তবে চীনের গণহত্যা সমর্থন বিশ্বজুড়ে এমনকী ভারত ও বাংলাদেশের চীনাপন্থী কমিউনস্টদের বিপদে ফেলেছে।

সাধারণের কাছে পরাশক্তি ও বিভিন্ন দেশের সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা ছিল। বামপন্থী রাজনৈতিক দলের মধ্যে এ নিয়ে ছিল দ্বন্দ্ব। পরবর্তীকালে এ্যাকাডেমিশিয়ানদের মধ্যেও আমরা এ দ্বন্দ্ব লক্ষ্য করি। বিশেষ করে চীনকে সমর্থন করা না করা নিয়েই টানাপোড়েনটা বেশি ছিল। এ পরিপ্রেক্ষিতে কলকাতা থেকে

www.Educationblog24.Com

প্রকাশিত, কবি সমর সেন সম্পাদিত চরম বামপন্থী পত্রিকা *ফ্রন্টিয়ারে* প্রকাশিত দুটি চিঠির উল্লেখ করছি, একজন লিখেছিলেন–

'যতোই এ বিষয়ে বিশ্লেষণ করুন না কেন, অস্বীকার করার উপায় নেই যে, চীন ইসলামাবাদের শাসকগোষ্ঠীর পক্ষ নিয়েছে, বাংলাদেশের ৭৫ লক্ষ মানুষের পক্ষ অবলম্বন করেনি। ইতিহাসের কী পরিহাস!" (২৪.৪.১৯৭১)

অন্যজন লিখেছিলেন–

"বাংলাদেশে যা ঘটছে তা পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ ব্যাপার– এ ঘোষণার মাধ্যমে চীন বাস্তবে বাংলাদেশে সাম্রাজ্যবাদীদের অনুপ্রবেশের বিরুদ্ধাচরণ করছে। এভাবে চীন বাংলাদেশের বিপ্লবকে রক্ষা করছে, সুযোগ দিচ্ছে নিজস্ব উপাদানে বিকশিত হওয়ার।" (৮.৫.১৯৭১)

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র গোড়া থেকেই মুক্তিযুদ্ধের বিরোধী ছিল। সেই সময় *ফ্রন্টিয়ারে* বামপন্থী প্রবন্ধকার রবি চক্রবর্তী লিখেছিলেন– "আমেরিকা সব সময় পাকিস্তানের পক্ষে, ইয়াহিয়া খান তা জানেন কিন্তু বাংলাদেশের মুক্তিযোদ্ধারা তা জানেন না। এ কারণে পাকিস্তান সব সময় ভারতের সঙ্গে সংঘাত এবং এখন পূর্ববঙ্গে গণহত্যা নীতি কার্যকর করে খুন করে পার পেয়ে যাচ্ছে।" (২৯.৫.১৯৭১)

সাধারণ মানুষের কাছে মনে হয়েছিলো, বাংলাদেশ প্রশ্নে পৃথিবী দু'ভাগে ভাগ হয়ে গেছে। একভাগের নেতৃত্বে পাকিস্তান, চীন, আমেরিকা ও মুসলিম দেশসমূহ, অন্যদিকে ভারত, সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং জোট নিরপেক্ষ দেশসমূহ। কেনো কিছু দেশ পাকিস্তানের পক্ষে ছিল, কেনো কিছু বিরোধী ছিল সে নিয়ে নানা তর্ক চলতে পারে কিন্তু বাস্তব ছিল পরাশক্তির মধ্যে চীন ও আমেরিকা পাকিস্তানকে সমর্থন করেছিলো, সোভিয়েত ইউনিয়ন শুধু ভারত ও মুক্তিযুদ্ধকে সমর্থন করেছিলো।

অনেক অ্যাকাডেমিশিয়ান এ তত্ত্বই বিশ্বাস করেন যা লিখেছেন সৈয়দ আনোয়ার হোসেন তাঁর গ্রন্থ *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে পরাশক্তির ভূমিকায়* (১৯৮২)। উপসংহারে তিনি লিখেছেন, ১৯৭১ সালে চীন, সোভিয়েত ও যুক্তরাষ্ট্র অর্থাৎ তিন পরাশক্তির কেউই 'বাংলাদেশপন্থী' 'বাংলাদেশ বিরোধী' ছিল না সবাই নিজ নিজ স্বার্থ বিবেচনা করে অগ্রসর হয়েছে। ভারতও। "তাদের নীতি নির্ধারণে বহুল প্রচারিত বিভিন্ন আদর্শিক মতের কোনো স্থানই ছিল না।"

১৯৭১ সালে বাঙালিরা নিজেদের স্বার্থ দেখেছে, পাকিস্তান দেখেছে তার স্বার্থ, কিন্তু তার মধ্যে আদর্শিক ব্যাপার একেবারে থাকে না, তা নয়। সোভিয়েত ইউনিয়ন সব সময় তৃতীয় বিশ্বের মুক্তি সংগ্রামকে সমর্থন করেছে, যেমন, সৌদি আরব করে ইসলামপন্থী দেশগুলিকে। কমিউনিজমের প্রভাব বলয় বিস্তার করাও ছিল এক ধরনের আদর্শিক ব্যাপার। তা বাদ দিলেও সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেঙ্গে যাওয়ার পূর্ব পর্যন্ত স্বাধীনতাকামী দেশগুলি প্রায় ক্ষেত্রে সোভিয়েতের সহানুভূতি লাভ করেছে। অনুসরণ করেছে জোট নিরপেক্ষ নীতি।

অন্যদিকে, আনোয়ার হোসেন তাঁর গ্রন্থে যে বোম্বেটে কূটনীতির কথা বলেছেন তা

অনুসরণ করেছে যুক্তরাষ্ট্র। খুব কম ক্ষেত্রেই যুক্তরাষ্ট্রের সরকার এ সময় তৃতীয় বিশ্বের মুক্তিকামী মানুষকে সমর্থন করেছে। ১৯৬০ থেকে ১৯৭৬ পর্যন্ত আনোয়ার হোসেন যুক্তরাষ্ট্রের ও সোভিয়েতের 'বোম্বেটে' কূটনীতির একটি তালিকা প্রণয়ন করেছেন। তাতে দেখা যায়, ঐ সময় যুক্তরাষ্ট্র ৪২টি ঘটনার সঙ্গে আর সোভিয়েত ১৩টি ঘটনার সঙ্গে জড়িত। এ কথাও বিচার্য যে, যখন পরাশক্তিসমূহ বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের প্রতি তাদের নীতির রূপ দেয়নি, তখন গণহত্যার শুরুতেই ভারত এবং সোভিয়েত ইউনিয়ন জোরালো ভাষায় এর নিন্দা করেছিলো, যুক্তরাষ্ট্র নয়।

ছয়

বাংলাদেশে এতদিন ক্লাসরুমে যে ইতিহাস চর্চা হয়েছে সেখানে বাংলাদেশ বিরোধীদের ভূমিকা হয় উহ্য রাখা হয়েছে অথবা তাদের ভূমিকা খাটো করে দেখানো হয়েছে। এবং সেটি রাজনৈতিক কারণে। আজকের রাজনৈতিক জটিলতার কারণ, বাংলাদেশ বিরোধীদের ভূমিকাটি খাটো করে দেখার কারণে।

১৯৭০ সালের নির্বাচনেই এক ধরনের রাজনৈতিক মেরুকরণের সৃষ্টি করেছিল। আওয়ামী লীগ ছয় দফার ম্যান্ডেট চেয়েছিল, ন্যাপ, কমিউনিস্ট পার্টি ও ছোট ছোট মধ্য বা বামপন্থী দলগুলির সঙ্গে আওয়ামী লীগের রাজনৈতিক বিরোধী থাকলেও বাঙালির মুক্তির প্রশ্নে বিরোধ ছিল না। অন্যপক্ষে ছিল ইসলাম নিয়ে বা ধর্মের নামে যারা রাজনীতি করছিল তারা। এর মধ্যে প্রধান ছিল জামায়াতে ইসলামী, মুসলিম লীগের বিভিন্ন গ্রুপ, নেজামী ইসলাম, পিডিপি প্রভৃতি।

এপ্রিলের প্রথম সপ্তাহে যখন হানাদার পাকিস্তানী বাহিনী তাদের অবস্থান সংহত করে ফেলল তখন ইসলামপন্থী দলগুলি দখলদার বাহিনীর সহায়তায় এগিয়ে এলো। তারা অখণ্ড পাকিস্তানে ছিল বিশ্বাসী। আওয়ামী লীগকে মনে করতো হিন্দু ভারতের এজেন্ট এবং বামপন্থীদের ধর্মীয় ও দেশের শত্রু। তাদের স্ট্রাটেজি ছিল স্বাধীনতাকামী বাঙালিদের দৃঢ়হস্তে দমন করা, আওয়ামী লীগ ও বামপন্থীদের নিশ্চিহ্ন করা এবং যে রাজনৈতিক শূন্যতা সৃষ্টি হবে সেখানে নিজেদের স্থান করে নেয়া।

দখলদার বাহিনীকে সহযোগিতা করার জন্য তারা প্রতিষ্ঠা করে শান্তি কমিটি, গঠন করে আলবদর ও আল শামস এবং রাজাকার বাহিনী। এ সমস্ত কমিটি ও বাহিনীতে একচ্ছত্র আধিপত্য ছিল জামায়াতে ইসলামের। গোলাম আজমের নেতৃত্বে জামায়াত কর্মীরা প্রতিটি বাহিনীতে যোগ দেয়। মুসলিম লীগের ফজলুল কাদের চৌধুরী ও সবুর খান, নেজামে ইসলামীর ফরিদ আহমদ, পিডিপির নূরুল আমীন প্রমুখ স্বাধীনতা বিরোধীদের [যাদের সাধারণভাবে আখ্যা দেয়া হয়েছিল দালাল] নেতৃত্ব দেন। তাদের উৎসাহে তাদের দলের কর্মীরা বিভিন্ন বাহিনী ও কমিটিতে যোগ দেয় এবং দখলদার বাহিনীর সহযোগী হিসেবে নয় মাস গণহত্যা, ধর্ষণ ও লুটপাটে অংশ নেয়।

২৫ মার্চ মধ্যরাতে বা ২৬ মার্চ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীনতা ঘোষণা করলেন। প্রায় একই সঙ্গে বা তার একটু আগে পাকিস্তান বাহিনী তাদের হত্যাযজ্ঞ ও

www.Educationblog24.Com

ধ্বংসের কাজ শুরু করে। স্বাধীনতা বিরোধী বা দালালদের সঙ্গে হানাদার বাহিনীর নীতি নির্ধারকদের আগে থেকেই যোগাযোগ ছিল। পাকিস্তানী ট্যাংকের গোলা নিক্ষেপ তাদের মনে দারুণ উল্লাসের সৃষ্টি করেছিল। পাকিস্তানী নীতি নির্ধারকদের মতো তারাও মনে করতেন, কয়েক হাজার হত্যার পর বাঙালিরা স্তব্ধ হয়ে যাবে। তখন পাকিস্তানীদের সহযোগী হিসেবে তারাই ক্ষমতায় আসবেন। উল্লেখ্য এদের মধ্যে দু'একজন ছাড়া, বাকী কেউ কখনও নির্বাচনে জয়ী হতে পারেননি।

পাকিস্তানী বা তাদের সহযোগী দালালরা যা ভেবেছিল তা কিন্তু হয়নি। গণহত্যার খবর চাপা দেয়ার চেষ্টা করা সত্ত্বেও, কয়েকদিনের মধ্যে সে খবর ছড়িয়ে পড়তে থাকে সারা বিশ্বে। পূর্ব পাকিস্তানের সামরিক আইন প্রশাসক টিক্কা খান আগে থেকেই পরিচিত ছিলেন বালুচিস্তানের কসাই হিসেবে। ফলে, তার পক্ষে গণহত্যা সম্ভব এই ধারণা বদ্ধমূল হলো। নিজের বা পাকিস্তানের ইমেজ ফিরিয়ে আনার জন্য দরকার ছিল কিছু কর্মতৎপরতার। তাদের ধারণা হলো, বাঙালি রাজনীতিবিদরা তাদের সঙ্গে আছেন এ ধারণা সৃষ্টি করতে হবে এবং তাদের দিয়েই বাঙালিদের নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। দক্ষিণপন্থী বাঙালি রাজনীতিবিদরাও তাই চাচ্ছিলেন। কারণ, ক্ষমতায় যাওয়ার জন্য এই যোগাযোগকে ভেবেছিলেন তারা প্রথম পদক্ষেপ।

রাজনীতির সঙ্গে যারা যুক্ত ছিলেন তারা চলে যেতে চাননি। কারণ, পাকিস্তানী আদর্শ ও কেন্দ্রের সেনাবাহিনীর শক্তি তাদের কাছে ছিল অজেয়। তাদের মনে হয়েছিল, বাংলাদেশের আদর্শ জয়ী হলে তাদের স্থান হবে বিপন্ন। যে রাজনীতি করে তারা ক্ষমতার অংশীদার বা কায়েমী স্বার্থের অংশীদার হয়েছিলেন সেটি থাকবে না। নতুন বাংলাদেশে তাদের স্থান থাকবে না। এর চেয়ে পাকিস্তানে অধস্তন হিসেবে ক্ষমতার সহযোগী হওয়া ছিল শ্রেয়। এখানে আদর্শ বা ধর্মের প্রশ্ন আসতে পারে। কিন্তু সেটি গৌণ। সংখ্যাগরিষ্ঠ বাঙালি কি মুসলমান ছিল না? বা ইসলামে বিশ্বাস করত না? তবে, ধর্মটিকে ঢাল হিসেবে রাখা ছাড়া তাদের উপায় ছিল না। একটি উদাহরণ দিলেই তা স্পষ্ট হবে। তারা যা করেছে তা কি ইসলামি আদর্শে অনুমোদিত? ফলে, অস্তিত্বরক্ষার জন্য তারা নিজ নিজ অবস্থান থেকে যা করার করেছে। ড. সাজ্জাদ হোসায়েনের পক্ষে সম্ভব ছিল না, সাধারণ আল-বদরের মতো অস্ত্রহাতে ঘোরা। কিন্তু লক্ষ্য ছিল এক। ফলে, যার যার অবস্থান থেকে সে সে কাজ করে গেছে। এভাবে সৃষ্টি হয়েছে পাকিস্তানি দালালদের, দালালদের মধ্যে অবস্থাগত কারণে আবার বিভিন্ন গ্রুপের। এর মধ্যে সবচেয়ে হিংস্র ও ফ্যাসিস্ট হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে জামায়াত ইসলাম ও তার অঙ্গ সংগঠন ছাত্রসংঘ। পাকিস্তানের অ্যাকাডেমিশিয়ান আব্বাস রশীদ 'পাকিস্তান: মতাদর্শের পরিধি' শীর্ষক প্রবন্ধে এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করেছেন– "উলেমাগোষ্ঠীর নিকট আইউব খানের নির্ভরশীলতার মধ্য দিয়ে সামরিক বাহিনী এবং সনাতনপন্থী সংগঠনের মাঝে অসম হলেও পারস্পরিক ফলপ্রসূ সম্পর্কে গড়ে ওঠে। তবে, সনাতনপন্থীদের প্রতিনিধি হিসেবে অগঠিত, অসংঘবদ্ধ উলেমাগোষ্ঠী নয়, বরং তাদের স্থান ইতিমধ্যে দখল করে নেয় সুসংগঠিত জামাত-ই-ইসলামী। "জামাত-ই ইসলামীর নেতৃত্ব পূর্ব পাকিস্তানের

www.Educationblog24.com

সামরিক বাহিনীর ধ্বংসযজ্ঞকে কেবল সমর্থনই করেনি, তাদের কর্মী ও সদস্যরা শান্তি কমিটিতে সক্রিয় অংশগ্রহণ করে। সামরিক বাহিনী কর্তৃক সৃষ্ট এই শান্তিবাহিনীর দায়িত্ব ছিল বিদ্রোহ দমনে সামরিক কর্মকর্তাদের সহায়তা করা। আদর্শগত পর্যায়েও জামাত-ই ইসলামীর সমর্থন দুশ্চিন্তাগ্রস্ত সামরিক বাহিনী স্বাগত জানিয়েছিল সর্বান্তঃকরণ।" তাই আমরা দেখি, আল-বদর ও আল-শামসদের মধ্যে জামায়াতের কর্মীই বেশি।

এ পরিপ্রেক্ষিতে ১২ জন বাঙালি রাজনীতিবিদ টিক্কাখানের সঙ্গে দেখা করতে চাইলেন। টিক্কা খানও সানন্দে রাজি হলেন। ৪ এপ্রিল ১২জন আওয়ামীলীগ বিরোধী নেতা টিক্কা খানের সঙ্গে দেখা করলেন। নেতৃত্ব দিলেন পিডিপি প্রধান নূরুল আমিন। প্রতিনিধি দলে ছিলেন গোলাম আজম, ফরিদ আহমদ, খাজা খয়েরউদ্দিন, এ কিউ এম শফিকুল ইসলাম, আব্দুল মান্নান (দৈনিক ইনকিলাবের মালিক, বর্তমানে মৃত) প্রমুখ।

আলাপ আলোচনার পর প্রতিনিধি দলের পক্ষ থেকে "অবিলম্বে সমগ্র প্রদেশের সম্পূর্ণ স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়ে আনার ব্যাপারে সামরিক আইন প্রশাসনকে সম্পূর্ণ সহযোগিতার আশ্বাস এবং জনগণের মন থেকে ভিত্তিহীন ভয় দূর করার উদ্দেশ্যে ঢাকায় নাগরিক কমিটি গঠনের প্রস্তাব দেয়।"

টিক্কা খান এ প্রস্তাবে আনন্দ প্রকাশ করে "দুষ্কৃতকারী ও সমাজ বিরোধীদের [অর্থাৎ যারা বাংলাদেশ চায়] আশ্রয় না দেওয়া এবং সামরিক আইন কর্তৃপক্ষের কাছে এদের সম্পর্কে সংবাদ পৌঁছে দেয়ার" আহবান জানান। শুধু তাই নয় তাদের "শুধু বক্তৃতা বিবৃতির মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে দেশের অখ ণ্ড তা রক্ষায় ফলপ্রসূ কাজ করতে নির্দেশ দেন।"

পাকিস্তানিরা চেয়েছিল, তাদের পক্ষের সবাই একই প্ল্যাটফরমে কাজ করবে। কিন্তু বাঙালি বিরোধী অনেকে এক সঙ্গে কাজ করতে রাজি ছিলেন না। বিশেষ করে দলের ফরিদ আহমদ ও নুরুজ্জামান, গোলাম আজম বা জামায়াতের সঙ্গে একই প্ল্যাটফরমে এসে কাজ করতে রাজি ছিলেন না। ফলে ৬ এপ্রিল গোলাম আজম আবার টিক্কা খানের সঙ্গে দেখা করেন।

এ পরিপ্রেক্ষিতে জামায়াতে ইসলামীর মুখপত্র *দৈনিক সংগ্রামে* সামরিক বাহিনীর একটি বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়–

"পূর্ব পাকিস্তানের আরো কয়েকজন নেতা গতকাল মঙ্গলবার ঢাকা 'গ' অঞ্চলের সামরিক আইন প্রশাসকের সাথে সাক্ষাৎ করেন। নেতৃবৃন্দ সমগ্র প্রদেশের স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়ে আনার বিষয়ে তাঁকে পূর্ণ সহযোগিতার আশ্বাস দেন। সামরিক আইন কর্তৃপক্ষের এক হ্যান্ড আউটে বলা হয় যে, সাবেক পররাষ্ট্রমন্ত্রী জনাব হামিদুল হক চৌধুরী, পূর্ব পাকিস্তান জামায়াতে ইসলামীর সভাপতি অধ্যাপক গোলাম আজম, জায়াত ওলামায়ে ইসলামির পূর্ব পাকিস্তান শাখার সভাপতি পীর মহসীন উদ্দিন আহমেদ এবং একজন নেতৃস্থানীয় এডভোকেট এ-কে সাদিক (হবে সাদি) পৃথক পৃথকভাবে জেনারেল টিক্কা খানের সাথে সাক্ষাৎ করেন। নেতৃবৃন্দ পাকিস্তানের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে ভারতের অযাচিত হস্তক্ষেপ এবং পাকিস্তানে সশস্ত্র ভারতীয় অনুপ্রবেশে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ

www.Educationblog24.Com

করেন। তাঁরা বলেন যে, প্রদেশের দেশপ্রেমিক জনগণ ভারতের দূরভিসন্ধিকে বানচাল করার জন্য সেনাবাহিনীকে সহযোগিতা করবেন।"

একই দিন পত্রিকায় 'স্বাভাবিক জীবনযাত্রা' শিরোনামে একটি সম্পাদকীয় প্রকাশিত হয়। এই সম্পাদকীয়তে শান্তিকমিটি গঠনের যৌক্তিকতা তুলে ধরা হয়-

> "বিবেক-বুদ্ধি সম্পন্ন নাগরিকদের সমন্বয়ে শান্তিকমিটি গঠন এ ক্ষেত্রে খুবই ফলপ্রসূ হতে পারে। এ ধরনের শান্তি কমিটি যেমন দুস্কৃতিকারীদের হাত থেকে শান্তিকামী নাগরিকদের জান-মাল রক্ষার কাজে সহায়তা করতে পারবে। অপরদিকে তেমন দেশ ও জাতির স্বার্থবিরোধী যে কোনো মহলের যেকোনো প্রচেষ্টার প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখাও তাদের পক্ষে সম্ভব হবে। সুতরাং প্রতিটি বিবেক-বুদ্ধি সম্পন্ন নাগরিককে এ ব্যাপারে তাদের সহযোগিতার হস্ত সম্প্রসারণ করা উচিত।"

শান্তিকমিটির মূল উদ্দেশ্য ছিল বাঙালিদের পক্ষে যারা আছেন তাদের নিধন করা। পরের দিন জামায়াত নেতা গোলাম আজম, নুরুজ্জামান ও গোলাম সরোয়ারের একটি বিবৃতিই তা প্রমাণ করে। দীর্ঘ বিবৃতির শেষে তারা উল্লেখ করেন–

> "ভারতীয়দের জানা উচিত। এ দেশের জনগণ সশস্ত্র অনুপ্রবেশকারীদের কখনো ত্রাণকর্তা হিসেবে মনে করেন না। পূর্ব পাকিস্তানের দেশপ্রেমিক জনগণ সশস্ত্র অনুপ্রবেশকারীদের কোন স্থানে দেখামাত্র খতম করে দেবে বলে তারা দৃঢ় আস্থা পোষণ করেন।"

টিক্কা খান ৯ এপ্রিল প্রাদেশিক গভর্নর হিসেবে শপথ গ্রহণ করেন। তার পরপরই ১৪০ সদস্যের 'ঢাকা নাগরিক শান্তিকমিটি' গঠিত হয়। তবে, এই সংবাদটি প্রকাশিত হয় ১১ এপ্রিল–

> "ঢাকার দৈনন্দিন জীবন যাত্রায় স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়ে আনার উদ্দেশ্যে গতকাল শনিবার ১৪০ সদস্যের একটি নাগরিক শান্তিকমিটি গঠন করা হয়েছে। .... গতকাল কমিটির বৈঠকে পাকিস্তানের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে ভারতের নির্লজ্জ হস্তক্ষেপ এবং পূর্ব পাকিস্তানে সশস্ত্র অনুপ্রবেশের তীব্র নিন্দা করা হয়।... বৈঠকে আরও বলা হয়, ভারত পাকিস্তানের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করে আগুন নিয়ে খেলা করছে।...
>
> পূর্ব পাকিস্তান কাউন্সিল মুসলিম লীগের সভাপতি খাজা খয়েরউদ্দিনকে কমিটির আহবায়ক করা হয়েছে। কমিটিতে যে সকল নেতৃবৃন্দ রয়েছে তারা হলেন, জনাব একিউএম শফিকুল ইসলাম, মৌলভী ফরিদ আহম্মদ, অধ্যাপক গোলাম আজম, পীর মোহসেন উদ্দিন, জনাব মাহমুদ আলী, জনাব এএসএম সোলায়মান, জনাব আবুল কাসেম এবং জনাব আতাউল হক খান প্রমুখ।
>
> নাগরিক শান্তিকমিটি আগামী মঙ্গলবার ঢাকায় এক মিছিল বের করবে। মিছিলটি ঢাকার প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করবে।"

শান্তি কমিটি থেকে পরবর্তীকালে ফরিদ আহমদের নেতৃত্বে আরেকটি 'শান্তি ও কল্যাণ কমিটি' গঠিত হয়। কিন্তু মূল কমিটি আগেরটিই থেকে যায়। কেন্দ্রীয় শান্তি কমিটিতে ১৪০ জন সদস্য থাকলেও গোলাম আজমের নেতৃত্বই তা পরিচালিত হয়। তৃণমূল পর্যায় পর্যন্ত ও কমিটি গঠিত হওয়ায় তৃণমূল পর্যন্ত গণহত্যা, ধর্ষণে হানাদাররা তাদের সহায়তা পায়। জমি দখল, স্বাধীনতাকামীদের ধরিয়ে দেয়া প্রয়োজনে হত্যা, লুট

www.Educationblog24.com

প্রভৃতিতে শান্তি কমিটি হানাদার বাহিনীর সঙ্গে যৌথভাবে কখনও বা একক ভাবে কাজ করে।

এরপর ছিল রাজাকার। আসলে এর শুদ্ধ উচ্চারণ 'রেজাকার'–ফারসি শব্দ। 'রেজা' হল স্বেচ্ছাসেবী, 'কার' অর্থ কর্মী। এক কথায় স্বেচ্ছাসেবী। ১৯৪৭ সালে ভারত বিভাগের সময় হায়দ্রাবাদের নিজাম অনিচ্ছুক ছিলেন ভারতের সঙ্গে মিলনে। আত্মরক্ষার জন্য তিনি গঠন করেছিলেন একটি স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী যার নাম দেয়া হয়েছিলো রেজাকার বাহিনী।

মুক্তিযুদ্ধের সময় জামায়াত নেতা এ. কে. এম. ইউসুফ শব্দটি ধার করেন এবং খুলনায় রেজাকার বাহিনীর সূত্রপাত করেন। *একাত্তরের ঘাতক ও দালালরা কে কোথায়* গ্রন্থের তথ্য অনুযায়ী, ৯৬ জন জামায়াত কর্মী নিয়ে এই বাহিনীর সূত্রপাত যা পরে পুরো বাংলাদেশে ছড়িয়ে পড়ে। পূর্বোক্ত গ্রন্থ অনুযায়ী–"প্রশাসনিকভাবে এই বাহিনীতে সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর লোক অন্তর্ভুক্ত হলেও তাদেরকে তিনভাবে ভাগ করা যেতে পারে। প্রথমত: যারা 'পাকিস্তান' ও ইসলামকে রক্ষার জন্য বাঙালি হত্যা ও মুক্তিযোদ্ধাদের সাথে যুদ্ধ করাকে কর্তব্য মনে করেছিল, দ্বিতীয়ত: যারা লুটপাট, প্রতিশোধ গ্রহণ, নারী নির্যাতন করার একটি সুযোগ গ্রহণ করতে চেয়েছিল এবং তৃতীয়ত: গ্রামের দরিদ্র অশিক্ষিত জনগণ যারা সীমান্তের ওপারে চলে যেতে ব্যর্থ হয়–এ ধরনের লোককে প্রলুব্ধকরণ, বল প্রয়োগ বা ভীতি প্রদর্শনের মাধ্যমে রাজাকার বাহিনীতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়।"

রাজাকারদের বিভিন্ন স্থাপনা পাহারা দেয়া, মুক্তিবাহিনীর খোঁজ খবর প্রভৃতি কাজে ব্যবহার করা হতো। বাংলাদেশের গ্রামেগঞ্জে এরাই ছড়িয়ে পড়েছিল। সে কারণে, বাঙালিদের কাছে রাজাকার শব্দটি বেশি পরিচিত হয়ে ওঠে।

রাজাকার, আল-বদর, আল-শামসদের নিয়ে ১৯৮৭ সালে প্রকাশিত মুক্তিযুদ্ধ চেতনা বিকাশ কেন্দ্র কর্তৃক প্রকাশিত *একাত্তরের ঘাতক ও দালালরা কে কোথায়* শীর্ষক গ্রন্থে বিস্তারিত আলোচনা আছে। আমি সেই গ্রন্থ থেকে প্রাসঙ্গিক কিছু বিষয় মাত্র উদ্ধৃত করবো।

"মে-জুন মাস থেকে রাজাকারদের স্বীকৃতি দেয়ার জন্য কেন্দ্রীয় শান্তিবাহিনী আবেদন নিবেদন শুরু করে। মরহুম হাফেজ্জী হুজুর, 'মওলানা' সিদ্দিক আহমদ, 'মাওলানা আজিজুর রহমান নেসারবাদী প্রমুখ এ বিষয়ে বিবৃতি দিতে থাকেন। সামরিক আইন প্রশাসক টিক্কা খান আনসারদের রাজাকার পরিণত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন এবং এ পরিপ্রেক্ষিতে জুন মাসে 'পূর্ব পাকিস্তান রাজাকার অর্ডিন্যান্স ১৯৭১' জারি করে। এ ঘোষণা অনুযায়ী ১৯৫৮ সালে গঠিত আনসার বাহিনী বিলুপ্ত করা এবং সে বাহিনীর সম্পত্তি, মূলধন ও দায় এবং রেকর্ডপত্র রাজাকার বাহিনীর কাছে হস্তান্তর করা হয়। আনসার বাহিনীতে তখন পর্যন্ত থেকে যাওয়া এ্যাডজুট্যান্টদের রাজাকার এ্যাডজুট্যান্ট নিযুক্ত করা হয়। এ অর্ডিন্যান্সে আরও বলা হয়, প্রাদেশিক সরকারের সিদ্ধান্ত অনুসারে যে সমস্ত ব্যক্তিকে রাজাকার বাহিনীতে ভর্তি করা হবে তাদের ট্রেনিং ও অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত

www.Educationblog24.Com

করা হবে এবং নির্ধারিত ক্ষমতাবলে রাজাকাররা তাদের দায়িত্ব পালন করবে।

আনসার বিলুপ্ত করে রাজাকার বাহিনী গঠনের অন্যতম মূল উদ্দেশ্য ছিল আনসারে ভর্তি ও প্রশিক্ষণ গ্রহণের জন্য যে সমস্ত কড়াকড়ি ও বাধ্যবাধকতা ছিল তা দূর করা, যাতে যে কেউ রাজাকার বাহিনীতে নাম লেখাতে পারে। এর ফলে অতি দ্রুত সারাদেশের স্থানীয় গুণ্ডা, টাউট ও মাদরাসা ছাত্ররা এর অন্তর্ভুক্ত হয়। এই অবস্থায় পূর্বতন এ্যাডজুট্যান্টদের ওপর এই বাহিনীর দায়িত্ব দিয়ে রাখতে শান্তি কমিটি অনীহা প্রকাশ করে। ফলে পরবর্তীতে জামায়াতে ইসলামীর ছাত্রফ্রন্ট ইসলামী ছাত্রসংঘের জেলা নেতৃবৃন্দকে স্ব-স্ব জেলার রাজাকার বাহিনী প্রধান করা হয়। ছাত্রসংঘ নেতা মোহাম্মদ ইউনুসকে রাজাকার বাহিনীর সর্বাধিনায়ক করা হয়। রাজাকার বাহিনীর নেতৃবৃন্দ শান্তি কমিটির সভায় উপস্থিত থেকে বক্তব্য পেশ করত এবং গৃহীত সিদ্ধান্ত সমূহ বাস্তবায়ন করত।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বটতলা এবং ক্যাম্পাসের অন্যান্য মাঠগুলোকে রাজাকারদের প্রধান প্রশিক্ষণ স্থল করা হয় পি পি পি নেতাদের রাজাকার সমালোচনার প্রতিবাদে জামায়াতী নেতাদের ২৮ নভেম্বর তারিখে বক্তব্য থেকে জানা যায় কোম্পানি কমান্ডার পর্যন্ত জুনিয়র নেতৃত্ব ছিল রাজাকারদের নিজেদের, এর ওপরের নেতারা ছিল ছাত্রসংঘ কর্মীবৃন্দ। এরা একই সাথে ছিল রাজাকার এবং আল বদর। পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে এদের ট্রেনিং দেওয়া হত। ঢাকায় এই উচ্চপদস্থ রাজাকারদের ট্রেনিং মূলত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলাভবন সংগগ্ন মাঠ এবং ফিজিক্যাল ট্রেনিং কলেজের আল-বদর হেডকোয়ার্টারের মাঠে অনুষ্ঠিত হত।

আগস্টের শুরুর দিকে রাজাকার বাহিনী মোটামুটিভাবে একটি আধাসামরিক বাহিনীতে পরিণত হয়। এ সময় এদের সাংগঠনিক পরিচয় দিতে ১৪ আগস্ট 'আজাদী দিবসে' শান্তি কমিটির মিছিলের আগে আগে কুচকাওয়াজকারী রাজাকার দলের দৃষ্টান্ত দেওয়া যেতে পারে। ১৫ আগস্ট দৈনিক পাকিস্তানে এই মিছিলের বর্ণনা দিয়ে বলা হয়, 'মিছিলে কয়েকশত পুরো ইউনিফর্ম, বাহুতে ব্যাজ, মাথায় সবুজ টুপিধারী সশস্ত্র রাজাকার দৃপ্ত পদক্ষেপে কুচকাওয়াজ করে এগিয়ে যায়।'

রাজাকার বাহিনীর সদস্য সংখ্যা সম্পর্কে ধারণা দেওয়ার জন্য ১৭ অক্টোবর চট্টগ্রামে কেন্দ্রীয় শান্তি কমিটির সদস্য আবুল কাসেম, বলেন, 'ট্রেনিংপ্রাপ্ত ও প্রয়োজনীয় অস্ত্রে সজ্জিত রাজাকারের সংখ্যা এখন ৫৫ হাজার। রাজাকারদের সংখ্যা ১ লক্ষে বৃদ্ধির পরিকল্পনা রয়েছে এবং প্রত্যেক ইউনিয়নে পর্যাপ্ত রাজাকার মোতায়েন করা হবে, এছাড়া পুলিশ বাহিনী তো থাকবেই।

রাজাকার বাহিনীও এসময় সাংগঠনিকভাবে এত শক্তিশালী হয় যে ২৩ নভেম্বর রাজাকার ডিরেকটরেটের এক হ্যান্ড আউটে রাজাকারদের বেতন ও ভাতা বাড়িয়ে মুজাহিদদের সমান করার কথা ঘোষণা করা হয়। ঘোষণায় বলা হয় নয়া ব্যবস্থা অনুযায়ী রাজাকাররা সেনাবাহিনী ও মুজাহিদের মতো ফ্রি রেশন পাবে। ১ ডিসেম্বর থেকে কার্যকর এই ব্যবস্থা অনুযায়ী রাজাকারদের বেতনের হার নির্ধারণ করা হয়

www.Educationblog24.com

কোম্পানি কমান্ডার রেশনসহ ৩০০ টাকা ও রেশন ছাড়া ৩৫০ টাকা। প্লাটুন কমান্ডার রেশনসহ ১৩৫ টাকা ও রেশন ছাড়া ১৮০ টাকা; সাধারণ রাজাকার রেশনসহ ৫৭ টাকা ও রেশন ছাড়া ১২০ টাকা। সে সময়কার দ্রব্যমূল্য অনুযায়ী এই উচ্চ বেতনে নির্ধারণ করা হয়েছিল মূলত সাধারণ দরিদ্র মানুষকে বিপুল সংখ্যায় রাজাকারে ভর্তি হতে প্রলুব্ধ করতে।

রাজাকার বাহিনীতে নানা শ্রেণীর লোক ভর্তি হলেও এর মূল নেতৃত্ব ছিল জামায়াতের হাতে। ইসলামী ছাত্রসংঘের জেলা প্রধানরা ছিল স্ব স্ব জেলার রাজাকার প্রধান। সে সময় রাজাকারদের সমালোচনার জবাব-ও সে কারণেই জামায়াতে ইসলামীকে দিতে হয়েছে। এ প্রসঙ্গে দৈনিক সংগ্রামের সম্পাদকীয় অংশ বিশেষ উদ্ধৃত হতে পারে-

> ..... ঠিক এ কারণেই পাকিস্তানী বেতার রেজাকারদের প্রশংসায় পঞ্চমুখ। প্রত্যহ তারা রেজাকার, মোজাহেদ, ও আল বদর বাহিনীর অভাবনীয় সাফল্যের খবর পরিবেশন করছে। পাকসেনা নায়করা মায় সরকার রেজাকারদের কৃতিত্বে আনন্দিত ও গর্বিত।"

১৯৭১ সালের এপ্রিলে শেষের দিক থেকে আলবদর তৈরির প্রক্রিয়া শুরু হয় এবং কালক্রমে জামায়াত ইসলামীর ছাত্রসংগঠন ছাত্রসংঘকেই আলবদরে রূপান্তর করা হয়।

আলবদর গঠনের প্রক্রিয়া শুরু করেন হানাদার বাহিনীর মেজর রিয়াদ হুসাইন। তিনি বলেছেন, আলবদর নামেই সংঘের তরুণদের সংগঠিত করা হয়। আগস্টের মাসের মধ্যেই পুরো ছাত্রসংঘকে আলবদর বাহিনীতে রূপান্তর করা হয়। গবেষক রেজা নসর জানিয়েছেন, সেনাবাহিনীর সাহায্যে ইসলামী জনিয়ত ই তুনাবা (পাকিস্তান ছাত্রসংঘ) আলবদর ও আলশামস নামে দু'টি প্যারামিলিটারি ইউনিট গঠন করে।

আলবদরের প্রায় সব সদস্য ছিল তৃণাবদ্ধ। সে কারণে ছাত্রসংঘের নেতারাই ছিল আলবদর আলশাসসের কমান্ডার। এ ছাড়া তৃণমূল পর্যায় বা অপারেশন পর্যায়ে কমান্ডার ছিল। এবং এ কারণেই তুলাবার তৎকালীন নাজিম ই আলা প্রধান) মতিউর রহমান নিজামী ছিলেন আলবদরদের প্রধান। তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রসংঘের প্রধান হওয়ার কারণে আলী আহসান মুজাহিদ রূপান্তরিত হন পূর্ব পাকিস্তান আলবদর বাহিনীর প্রধান হিসেবে। নিজামী এক সাক্ষাৎকারে জানিয়েছেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রসংঘের সদস্যরাও এই দুই ইউনিটের সদস্য ছিল। তিনি লিখেছেন, "বিগত দু'বছর থেকে পাকিস্তানের একটি তরুণ কাফেলার ইসলামী পুনর্জাগরণ আন্দোলনের ছাত্র প্রতিষ্ঠান পাকিস্তান ইসলামী ছাত্রসংঘ এই ঐতিহাসিক বদর দিবস পালনের সূচনা করেছে। সারা পাকিস্তানে বিপুল উৎসাহ উদ্দীপনার সাথে এই দিবস উদযাপিত হওয়ার পেছনে এই তরুণ কাফেলার অবদান সবচেয়ে বেশি।' (দৈনিক সংগ্রাম, ১৪.১১.১৯৭১]

আলবদররা যে ভালো কাজ করছে সে সম্পর্কে সার্টিফিকেট দিয়েছিল জামায়াতের মুখপত্র দৈনিক সংগ্রাম-'দেশের প্রতিরক্ষা ও দুশমনদের সমুচিত শাস্তি দেবার জন্য আমাদের সশস্ত্র বাহিনী সব সময় প্রস্তুত রয়েছেন। শান্তিকমিটির কর্ম তৎপরতা এবং দুশমনদের উপর রেজাকার ও বদর বাহিনীর মারণাঘাত সে সচেতনতা বোধেরই বাস্তব

www.Educationblog24.com

কোম্পানি কমান্ডার রেশনসহ ৩০০ টাকা ও রেশন ছাড়া ৩৫০ টাকা। প্লাটুন কমান্ডার রেশনসহ ১৩৫ টাকা ও রেশন ছাড়া ১৮০ টাকা; সাধারণ রাজাকার রেশনসহ ৫৭ টাকা ও রেশন ছাড়া ১২০ টাকা। সে সময়কার দ্রব্যমূল্য অনুযায়ী এই উচ্চ বেতনে নির্ধারণ করা হয়েছিল মূলত সাধারণ দরিদ্র মানুষকে বিপুল সংখ্যায় রাজাকারে ভর্তি হতে প্রলুব্ধ করতে।

রাজাকার বাহিনীতে নানা শ্রেণীর লোক ভর্তি হলেও এর মূল নেতৃত্ব ছিল জামায়াতের হাতে। ইসলামী ছাত্রসংঘের জেলা প্রধানরা ছিল স্ব স্ব জেলার রাজাকার প্রধান। সে সময় রাজাকারদের সমালোচনার জবাব-ও সে কারণেই জামায়াতে ইসলামীকে দিতে হয়েছে। এ প্রসঙ্গে দৈনিক সংগ্রামের সম্পাদকীয় অংশ বিশেষ উদ্ধৃত হতে পারে-

> ..... ঠিক এ কারণেই পাকিস্তানী বেতার রেজাকারদের প্রশংসায় পঞ্চমুখ। প্রত্যহ তারা রেজাকার, মোজাহেদ, ও আল বদর বাহিনীর অভাবনীয় সাফল্যের খবর পরিবেশন করছে। পাকসেনা নায়করা মায় সরকার রেজাকারদের কৃতিত্বে আনন্দিত ও গর্বিত।"

১৯৭১ সালের এপ্রিলে শেষের দিক থেকে আলবদর তৈরির প্রক্রিয়া শুরু হয় এবং কালক্রমে জামায়াত ইসলামীর ছাত্রসংগঠন ছাত্রসংঘকেই আলবদরে রূপান্তর করা হয়।

আলবদর গঠনের প্রক্রিয়া শুরু করেন হানাদার বাহিনীর মেজর রিয়াদ হুসাইন। তিনি বলেছেন, আলবদর নামেই সংঘের তরুণদের সংগঠিত করা হয়। আগস্টের মাসের মধ্যেই পুরো ছাত্রসংঘকে আলবদর বাহিনীতে রূপান্তর করা হয়। গবেষক রেজা নসর জানিয়েছেন, সেনাবাহিনীর সাহায্যে ইসলামী জনিয়ত ই তুনাবা (পাকিস্তান ছাত্রসংঘ) আলবদর ও আলশামস নামে দু'টি প্যারামিলিটারি ইউনিট গঠন করে।

আলবদরের প্রায় সব সদস্য ছিল তৃণাবদ্ধ। সে কারণে ছাত্রসংঘের নেতারাই ছিল আলবদর আলশাসসের কমান্ডার। এ ছাড়া তৃণমূল পর্যায় বা অপারেশন পর্যায়ে কমান্ডার ছিল। এবং এ কারণেই তুলাবার তৎকালীন নাজিম ই আলা প্রধান) মতিউর রহমান নিজামী ছিলেন আলবদরদের প্রধান। তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রসংঘের প্রধান হওয়ার কারণে আলী আহসান মুজাহিদ রূপান্তরিত হন পূর্ব পাকিস্তান আলবদর বাহিনীর প্রধান হিসেবে। নিজামী এক সাক্ষাৎকারে জানিয়েছেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রসংঘের সদস্যরাও এই দুই ইউনিটের সদস্য ছিল। তিনি লিখেছেন, "বিগত দু'বছর থেকে পাকিস্তানের একটি তরুণ কাফেলার ইসলামী পুনর্জাগরণ আন্দোলনের ছাত্র প্রতিষ্ঠান পাকিস্তান ইসলামী ছাত্রসংঘ এই ঐতিহাসিক বদর দিবস পালনের সূচনা করেছে। সারা পাকিস্তানে বিপুল উৎসাহ উদ্দীপনার সাথে এই দিবস উদযাপিত হওয়ার পেছনে এই তরুণ কাফেলার অবদান সবচেয়ে বেশি।' (দৈনিক সংগ্রাম, ১৪.১১.১৯৭১]

আলবদররা যে ভালো কাজ করছে সে সম্পর্কে সার্টিফিকেট দিয়েছিল জামায়াতের মুখপত্র দৈনিক সংগ্রাম-'দেশের প্রতিরক্ষা ও দুশমনদের সমুচিত শাস্তি দেবার জন্য আমাদের সশস্ত্র বাহিনী সব সময় প্রস্তুত রয়েছেন। শান্তিকমিটির কর্ম তৎপরতা এবং দুশমনদের উপর রেজাকার ও বদর বাহিনীর মারণাঘাত সে সচেতনতা বোধেরই বাস্তব

www.Educationblog24.Com

স্বাক্ষর বহন করছে। আমাদের সশস্ত্র বাহিনীর পাশাপাশি বেসামরিক প্রতিরোধ আরও শক্তিশালী হয়ে উঠুক এ কামনাই আমরা করি।' (দৈনিক সংগ্রাম, ৬.৯.১৯৭১]

৭ই নভেম্বর আলবদর দিবস পালন করা হয়। 'আলবদর দিবস উপলক্ষে গতকাল রোববার ঢাকা শহর ইসলামী ছাত্রসংঘের উদ্যোগে এক বিরাট ছাত্র গণ-মিছিল বের করা হয়। পবিত্র রমজানের মধ্যে গতকালই প্রথম আলবদরের অনুপ্রেরণায় উজ্জীবিত মিছিলকারীদের পদভারে রাজধানীর রাজপথ প্রকম্পিত হয়ে ওঠে'। [সংগ্রাম, ৮.১১.৭১] সেখানে বক্তৃতা করেন, ছাত্রসংঘের ঢাকা শহরের সভাপতি শামসুল হক, পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রসংঘের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক আলী আহসান মোহাম্মদ মুজাহিদ ও মীর কাসেম আলী।

এখানে উল্লেখ্য এর চার বছর পর, বঙ্গবন্ধু ও চার জাতীয় নেতাকে হত্যার পর জিয়াউর রহমানের নেতৃত্বে ৭ই নভেম্বর সংঘটিত হয় 'সিপাহী বিপ্লব'। বলা যেতে পারে তা ছিল নতুনভাবে আলবদর দিবস পালন। আলবদর দিবস কিন্তু আলবদর নামে কেউ বক্তৃতা দেয়নি কেন? কারণ, ছাত্রসংগঠনইতো তখন আলবদর, এর নেতারাই আলবদরের নেতা।

আর একটি উদাহরণ দিয়েই এ পর্ব শেষ করব। রাজাকার আলবদরদের হিংস্রতায় খুব সম্ভব আশঙ্কিত হয়ে হানাদার বাহিনীর সহযোগী ফুলফিকার আলী ভুট্টো, কাওসার নিয়াজী ও মুফতি মাহমুদ বোধহয় কিছু মন্তব্য করেছিলেন [জমিয়াতে তুলাবার শক্ত ঘাঁটি ছিল লাহোরে। হয়ত তারা আশঙ্কা করছিলেন পাকিস্তানেও তুলাবা একই কাণ্ড শুরু করতে পারে]। এ কারণে আলী আহসান মুজাহিদ ক্ষিপ্ত হয়ে এক বিবৃতিতে ১৫ অক্টোবর বলেছিলেন–'পূর্ব পাকিস্তানে দেশপ্রেমিক যুবকেরা ভারতীয় চরদের হাত থেকে দেশকে রক্ষার করার জন্য এগিয়ে এসেছে এবং রাজাকার, আলবদর ও অন্যান্য স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর সদস্য হিসেবে জাতির সেবা করছে। অথচ, সাম্প্রতিক কালে দেখা যাচ্ছে কতিপয় রাজনৈতিক নেতা জনাব জেড এ ভুট্টো, কাউসার নিয়াজী, মুফতি মাহমুদ ও আসগর খান রাজাকার আলবদর ও অন্যান্য দেশ হিতৈষী স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর বিরুদ্ধে আপত্তিকর মন্তব্য করে বিষোদগার করছেন। এসেব নেতার এ ধরনের কার্যকলাপ বন্ধ করার জন্য এবং এ ব্যাপারে কঠোর মনোভাব গ্রহণ করার জন্য সরকারের প্রতি আবেদন জানান।' সেনাবাহিনীকে সহায়তা করার জন্য আলবদর বাহিনীর সদস্যদের নির্দেশ দেন। [সংগ্রাম, ১৫.১০.১৯৭১]

১৯৭১ সালের মে মাসেই আলবদর বাহিনী হানাদার পাকিস্তান বাহিনীর সহযোগী বাহিনী হিসেবে গঠিত হয়। পাকিস্তান সরকার থেকে আলবদর বেতন পেত।

আলবদররা মে মাস থেকেই 'দুস্কৃতিকারি' দমনের নামে হত্যা শুরু করে। তাদের বিশেষ টার্গেট ছিলেন বুদ্ধিজীবীরা। ১৪ ডিসেম্বর এ কারণে বুদ্ধিজীবী দিবস পালন করা হয়। ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহে বুদ্ধিজীবীদের একটি বড় অংশকে বাড়ি থেকে অপহরণ করা হয়। ১৪ ডিসেম্বর তাই বুদ্ধিজীবী হত্যাদিবস, গণহত্যাকে স্মরণ করেই।

বুদ্ধিজীবী কারা? বাংলা একাডেমী, 'শহীদ বুদ্ধিজীবী কোষ' নামে যে গ্রন্থ প্রকাশ

www.Educationblog24.com

করেছে তাতে বুদ্ধিজীবীদের যে সংজ্ঞা দেয়া হয়েছে আমরা তা গ্রহণ করতে পারি। 'বুদ্ধিজীবী অর্থ লেখক, বিজ্ঞানী চিত্রশিল্পী, কণ্ঠশিল্পী, সকল পর্যায়ের শিক্ষক, গবেষক, সাংবাদিক, রাজনীতিক, আইনজীবী, চিকিৎসক, প্রকৌশলী, স্থপতি, ভাস্কর, সরকারি ও বেসরকারি কর্মচারী, চলচ্চিত্র ও নাটকের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি, সমাজসেবী ও সংস্কৃতিসেবী।

পাকিস্তানীরা বুদ্ধিজীবীদের টার্গেট করেছিল কেন? এর একটি কারণ পাকিস্তানী শাসকচক্র বাঙালি মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উত্থান ও প্রভাবকে মেনে নিতে পারেনি। তাদের ধারণা ছিল, এ শ্রেণীর প্রেরণাদাতা হচ্ছে বুদ্ধিজীবীরা। জেনারেল ফজল মুকিম খান ১৯৭৩ সালে লিখেছিলেন, বাঙালিদের সাংস্কৃতিক সংগঠনগুলো ষাটের দশকে সারা পূর্ববাংলায় ছড়িয়ে পড়ে মানুষকে প্রভাবিত করে তোলে পাকিস্তানী শাসনের বিরুদ্ধে। এ কথাগুলো সত্যি, যে ১৯৫২ থেকে ১৯৭১, এমনকি ১৯৭১ থেকে এখন পর্যন্ত সমস্ত গণতান্ত্রিক আন্দোলনে সংস্কৃতিসেবীরা অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছিলেন। আমাদের অনেকেরই চোখে তা এড়িয়ে গেছে। পাকিস্তানীরা তা ঠিকই পর্যবেক্ষণ করেছে। ফলে, একধরনের বিশেষ ক্রোধ ছিল বুদ্ধিজীবীদের ওপর।

অপর আরেকটি কারণ হলো যদি, বাঙালিরা জিতেই যায় তারা যেন নেতৃত্বহীন থাকে। এ পরিপ্রেক্ষিতে 'কোষগ্রন্থ'-এ যে যুক্তিটি দেয়া হয়েছে তা যুক্তিযুক্ত-'এটা অবধারিত হয়, বুদ্ধিজীবীরাই জাগিয়ে রাখেন জাতির বিবেক, জাগিয়ে রাখেন তাদের রচনাবলির মাধ্যমে, সাংবাদিকদের কলমে, গানের সুরে, শিক্ষালয়গুলোতে পাঠদানে, চিকিৎসা প্রকৌশল রাজনীতি ইত্যাদির মাধ্যমে জনগণের সান্নিধ্যে এসে। একটি জাতিকে নির্বীর্য করে দেবার প্রথম উপায় বুদ্ধিজীবী শূন্য করে দেয়া। ২৫ মার্চ রাতে এই প্রক্রিয়া শুরু হয়েছিল অতর্কিত, তারপর ধীরে ধীরে, শেষে পরাজয় অনিবার্য জেনে ডিসেম্বর ১০ তারিখ থেকে ১৫ ডিসেম্বরের মধ্যে দ্রুতগতিতে।'

'স্বভাবতই পাকিস্তানি সেনাপতি ও সি.আই.এ-চরদের মধ্যেকার এই যোগাযোগ গোপন ব্যাপার ছিল। আল-বদরবাহিনীর সাধারণ কর্মীরা এ-সম্পর্কে কিছুই জানত না। আবার এই সন্ত্রাসবাদী সংস্থার হোতারা এবং জামাতে ইসলামী দলের নেতারা অনুগামীদের মনোবল বাড়ানোর আশায় আমেরিকা ও পিকিং নেতাদের সাথে পাকিস্তানের সামরিক একনায়কের ঘনিষ্ঠ রাজনৈতিক সম্পর্কের কথা প্রচার করত। ১৯৭১ সালের ১২ ডিসেম্বর ঢাকায় জামাতে ইসলামীর সম্পাদক প্রকাশিত এক প্রচারপত্রের ভাষা হলো: বিদেশে আমাদের বন্ধুরা আছেন। চীন ও আমেরিকা আমাদের সমর্থক বন্ধু-দেশ।"

[একাত্তরের ঘাতক দালালরা কে কোথায় থেকে উদ্ধৃত]

বুদ্ধিজীবী হত্যায় প্রধান ভূমিকা পালন করেছিল আল-বদরবাহিনী। সারা পাকিস্তান আল-বদরবাহিনীর প্রধান ছিলেন মতিউর রহমান নিজামী। আল-বদর হাইকমান্ডের যারা এখন স্বাচ্ছন্দে টাকা-পয়সা করে রাজনীতি করছে তাদের মধ্যে নিজামী ছাড়াও আছে জামাতের আলী আহসান মুহাম্মদ মুজাহিদ, মীর কাসেম আলী, মোহাম্মদ ইউনুস,

www.Educationblog24.Com

মোহাম্মদ কামরুজ্জামান, আশরাফ হোসাইন, মোহাম্মদ শামসুল হক, এ.এস.এম. রুহুল কুদ্দুস, সরদার আবদুস সালাম, আবদুল জাহের, মোহাম্মদ আবু নাসের প্রমুখ। জেনারেল জিয়া ওদের পুনর্বাসিত করেন।

এদের মধ্যে আরো ছিলো খালেক মজুমদার, 'মওলানা' মান্নান, আবদুল আলীম, চৌধুরী মঈনুদ্দিন প্রমুখ। সারাদেশে, বিশেষ করে ঢাকায় এরকম অনেক ছোট আলবদর ছিল [সংকলন দেখুন]। আল-বদরদের সঠিক সংখ্যা জানা যায়নি। জানার বা তালিকা প্রণয়নের প্রচেষ্টাও করা হয়নি। ১৪-৯-৭১ তারিখে জামাতের মুখপত্র *সংগ্রামে* একটি বিশেষ প্রতিবেদন প্রকাশিত হয় যাতে লেখা ছিল-

"আল-বদর একটি নাম! একটি বিস্ময়! আল-বদর একটি প্রতিজ্ঞা! যেখানে তথাকথিত মুক্তিবাহিনী আল-বদর সেখানেই। যেখানেই দুস্কৃতকারী আল-বদর সেখানেই। ভারতীয় চর কিংবা দুস্কৃতকারীদের কাছে আল-বদর সাক্ষাৎ আজরাইল।" আল-বদর ও আল-শামস গঠিত হয়েছিল প্রধানত জামাতে ইসলাম ও ছাত্র শিবিরের কর্মী ও সমর্থকদের দ্বারা। সারা বছর ধরে তারা হত্যাকাণ্ড চালালেও পরাজয় আসন্ন জেনে ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহেই তারা মরণ-কামড় দেয়। এ সম্পর্কে সে-সময়কার দৈনিক বাংলায় ১৯ ডিসেম্বর প্রকাশিত হয়েছিল একটি প্রতিবেদন-

"এই নৃশংস হত্যাকাণ্ড চালিয়েছে গত সপ্তাহ ধরে জামাতে ইসলামীর আল-বদর। 'শহরের কয়েকশ' বুদ্ধিজীবী ও যুবককে এরা ধরে নিয়ে গিয়ে অমানুষিকভাবে হত্যা করেছে।"

'গতকাল রায়ের বাজার ও ধানমন্ডি এলাকার বিভিন্ন গর্ত হতে বহুসংখ্যক লাশ উদ্ধার করা হয়। এদের মধ্যে অধ্যাপক ডাক্তার, সাংবাদিক ও সাহিত্যিকদের লাশও রয়েছে। এ পর্যন্ত কতিপয় ব্যক্তির লাশ শনাক্ত করা গেছে। অনেক লাশই বিকৃত হয়ে গেছে, চেনার উপায় নাই। গত এক সপ্তাহে যতজন নিখোঁজ হয়েছেন অনুমান করা হচ্ছে যে, এদের একজনকেও আল-বদর রেহাই দেয়নি।

'ফ্যাসিবাদী রাজনৈতিক দল জামাতে ইসলামীর ছাত্রসংস্থা ইসলামী ছাত্রসংঘের সশস্ত্র গ্রুপ আল-বদর সেই বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকা নগরী মুক্ত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত এক সপ্তাহে শহরের কয়েকশত বুদ্ধিজীবী ও যুবককে ধরে নিয়ে যায়।"

আলবদরদের হিংস্রতার দু'টি বিবরণ দিয়ে শেষ করব। ১৬ ডিসেম্বর দেশ মুক্ত হলে আলবদরদের দ্বারা অপহৃতদের লাশ খুঁজতে বের হন আত্মীয় স্বজনরা। প্রধানত: রায়ের বাজার এবং মিরপুরের সেলে অগণিত লাশ, কংকাল, লেখিকা হামিদা রহমান ১৬ ডিসেম্বর রায়ের বাজার ঘুরে এসে লিখেছিলেন-

"আর একটু এগিয়ে যেতেই সামনে বড় বড় দুটো মস্ত মানুষ, নাক কাটা, কান কাটা, মুখের কাছ থেকে কে যেন খামচিয়ে মাংস তুলে নিয়েছে হাত-পা-বাঁধা।...

"আর একটু এগিয়ে যেতেই বাঁ হাতের যে মাটির ঢিবিটা ছিল তারই পাদদেশে একটি মেয়ের লাশ। মেয়েটির চোখ বাঁধা। মুখ ও নাকের কোনো আকৃতি নেই কে যেন অস্ত্র দিয়ে তা কেটে খামচিয়ে তুলে নিয়েছে। স্তনের একটি অংশ কাটা.... মেয়েটি সেলিনা পারভীন।

www.Educationblog24.Com

শিলালিপির এডিটর।.....

"মাঠের পর মাঠ চলে গিয়েছে। প্রতিটি ফলার পাশে হাজার হাজার মাটির ঢিবির মধ্যস্থ কঙ্কাল সাক্ষ্য দিচ্ছে কত লোককে যে এই মাঠে হত্যা করা হয়েছে।"

তৎকালীন বিখ্যাত সাংবাদিক নিকোলাস টোমালিনের একটি বিবরণ (বঙ্গানুবাদ)-

.... বধ্যভূমিটি হচ্ছে ঢাকা শহরের মধ্যবিত্তদের আবাসিক এলাকা ধানমণ্ডির কাছে একটি ইটখোলা এটি একটি অদ্ভুত নির্জন জায়গা; যদিও নীলচে-শাদা এঁদো জলাশয়গুলোতে কচুরিপানা ভেসে বেড়ায়। 'শত শত ঢাকাবাসী আজ এখানে এসেছিলেন। মৃতদেহগুলো দেখার জন্য কাদামাটির পথ ধরে হাঁটতে থাকা লোকদের অনেকেই নিজেদের আত্মীয়স্বজনের লাশ খুঁজছিলেন।'

.... এখানে এই বুদ্ধিজীবীরা এখনো শুয়ে আছেন; তাদের শরীরের ওপর জমেছে ধুলো-কাদা, দেহগুলো গলতে শুরু করেছে। একটি বাঁধের ওপর একটি কঙ্কাল পড়ে রয়েছে; ঢাকার কুকুরগুলো নাটকীয়ভাবে দেহটিকে মাংসমুক্ত করে ফেলেছে।

'বাঙালি জনতা এই ডোবাগুলোতে এক অদ্ভুত শান্ত ভঙ্গিমায় চলাচল করছে। এখানে তাদেরকে ক্রোধান্বিত মনে হয় না। অন্যত্র তারা ক্রোধোন্মত্ত। কিন্তু এখানে তারা হাঁটছে, মৃদু ফিসফিস করে কথা বলছে, তারা যেন গির্জা পরিদর্শনরত পর্যটক।"

রাজাকার; আলবদর, শান্তি কমিটির সদস্য, ইসলামপন্থি বলে কথিত পাকিস্তান সমর্থন রাজনৈতিক দল জামায়াত, মুসলিম লীগ প্রভৃতি এভাবে হানাদার পাকিস্তানি বাহিনীর সহযোগী হিসেবে একাত্তরের নয়মাস বাংলাদেশে রক্তগঙ্গা বইয়ে দেয়। বাঙালি জাতির কলঙ্ক এরা। ১৯৭২ সাল থেকে সরকার এদের বিচারের আওতায় আনে। ১৯৭৫ সালে সপরিবারে বঙ্গবন্ধু শহীদ হলে জিয়াউর রহমান ক্ষমতায় আসেন। তিনি রাজাকার, দালাল, আলবদর, জামায়াত ইসলাম প্রভৃতির ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করেন ও দণ্ডিতদের মুক্তি দিয়ে আবার রাজনীতি করার সুযোগ দেন এবং তাদের ক্ষমতায় আনেন সমন্বয়ের রাজনীতির নামে। এ ভাবে ১৯৭১ জাতির ঐক্যবদ্ধ বাঙালি জাতিকে দ্বিখণ্ডিত করার প্রয়াস নেন এবং সফল হন।

এদের মধ্যে যারা যুদ্ধাপরাধী তাদের শাস্তির দাবিতে গত চারদশক আন্দোলন হয়। বাঙালি জাতির কলঙ্ক মোচনের জন্য ২০১১ সালে গোলাম আজম, মতিউর রহমান নিজামী, আলী আহসান মুজাহিদ, সালাউদ্দিন কাদের চৌধুরী, আবদুল আলীম, কাদের মোল্লা প্রমুখ যুদ্ধাপরাধীদের বিচর শুরু হয়েছে।

সাত

১৯৭১ সালের ২৫ মার্চের মধ্যরাতে বঙ্গবন্ধুকে গ্রেফতার করে হানাদার পাকিস্তানী বাহিনী। তাকে নিয়ে যাওয়া হয় পাকিস্তানের লায়ালপুরে। সেখানে কারাগারে এক ফাঁসির প্রকোষ্ঠে তাঁকে রাখা হয়।

প্রথমদিকে সবার ধারণা ছিল বঙ্গবন্ধু জীবিত আছেন। পরে পাকিস্তানে সংবাদপত্রে তার ছবি দেখে সবাই জানলেন তিনি পাকিস্তানের কারাগারে বন্দী। তখন থেকেই তাঁর

www.Educationblog24.com

মুক্তির দাবি জানানো শুরু হয়। অন্যদিকে ইয়াহিয়া খান পুরো নয়টি মাস বঙ্গবন্ধুকে বিচার, হত্যার হুমকি দিতে থাকেন।

জুলাই মাসে ইয়াহিয়া খান এক সংবাদদাতাকে বলেন, "শেখ মুজিবুর রহমান জীবিত এবং পাকিস্তানের যে কোনো কারাগারে আছেন। তবে আজকের পর কাল শেখ মুজিবের জীবনে কী ঘটবে সেটা আমি হলফ করে বলতে পারব না। তার বিচার করা হবে এবং এর মানে এই নয় যে, আগামী কালই আমি তাকে গুলি করে হত্যা করার। তার স্বাভাবিক মৃত্যু ও ঘটতে পারে। সেক্ষেত্রে আমার কী বা করার আছে? সামরিক আদালতে শেখ মুজিবের বিচার ও মৃত্যুদণ্ডের ব্যবস্থা করার জন্য আমার জেনারেলরা চাপ দিচ্ছেন। আমি সম্মত হয়েছি। খুব শিগগিরই বিচার অনুষ্ঠিত হবে।"

বাংলাদেশ সরকার গঠিত হওয়ার পর প্রথমেই বঙ্গবন্ধুর মুক্তি চেয়েছে এবং সে দাবি সব সময় অব্যাহত রেখেছে। ইন্দিরা গান্ধী জাতিসংঘ ও বিশ্বের বিভিন্ন রাষ্ট্রপ্রধানের কাছে বঙ্গবন্ধুর জীবন বাঁচানোর আবেদন জানিয়ে চিঠি লেখেন। সারা বিশ্ব থেকে ইয়াহিয়া খানের প্রতি দাবি জানানো হয় শেখ মুজিবের মুক্তির। এমনকি জাতিসংঘের মহাসচিব উ থান্টও এক বিবৃতিতে বলেন, 'শেখ মুজিবুর রহমানের ভাগ্যে যা ঘটবে তা অবধারিতভাবেই পাকিস্তানের সীমানার বাইরেও প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করবে।

২ আগস্ট ইয়াহিয়অ খান ঘোষণা করেন ১১ আগস্ট বঙ্গবন্ধুর বিচার শুরু হবে। তিনি ঘোষণা করেন, "শেখ মুজিবের বিচার করা হবে এবং রাষ্ট্রদ্রোহিতার অপরাধে রাষ্ট্রের আইন অনুসারে তার বিচার হবে।"

গোপন বিচার কক্ষে বঙ্গবন্ধু বলেন, তিনি বেসামরিক লোক অথচ বিচার হবে সামরিক ট্রাইব্যুনালে এটা বৈধ নয়।" আমাকে বা আমার জনগণকে বিচার করার কোনো অধিকার এদের নেই।" বিচার সেদিন স্থগিত করা হয়।

৭ সেপ্টেম্বর থেকে ৩ ডিসেম্বর বিচারের নামে প্রহসন চলে এবং বঙ্গবন্ধুকে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হয়। ইতোমধ্যে যুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে। তার মধ্যে বঙ্গবন্ধুর মুক্তির দাবি উঠতে থাকে। আমেরিকা পর্যন্ত ইয়াহিয়াকে মুজিবকে হত্যা করতে নিষেধ করে। এরপর পাকিস্তান আত্মসমর্পণ করে। আন্তর্জাতিক চাপে পড়ে ৮ জানুয়ারি ১৯৭২ সালে পাকিস্তান সরকার বঙ্গবন্ধুকে মুক্তি দিতে বাধ্য হয়। ১০ জানুয়ারি, ১৯৭২ সালে তিনি ফিরে আসেন দেশে।

আট

মুক্তিযুদ্ধ সফল হতো না যদি না সাধারণ মানুষ মুক্তিযুদ্ধ সমর্থন করতেন। মুক্তিযুদ্ধে এতো দ্রুত বাঙালিরা জয় লাভ করতেন না যদি না প্রবাসী বাঙালি, বিশ্বের বিভিন্ন দেশের নাগরিক সমাজ ও ভারত অবদান রাখত।

১৯৭১ সালের ৭ মার্চ বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ভাষণের পর সংখ্যাগরিষ্ঠ বাঙালি মানসিকভাবে স্বাধীনতার জন্য প্রস্তুত হয়ে ওঠে। হত্যা, তারা হয়ত ভাবেনি হানাদার বাহিনী ও তাদের সহযোগী বাঙালি দালালরা এমনভাবে গণহত্যায় মেতে উঠবে। প্রাথমিক বিপর্যয় কাটিয়ে বাঙালি তারপর প্রস্তুতি গ্রহণ করে যার কথা আগেই উল্লেখ করেছি।

www.Educationblog24.com

২০ মার্চের পর এক কোটি মানুষ বাস্তুভিটা ত্যাগ করে শরণার্থী হয়ে যান। বাকি ৬ কোটি দেশে থেকে যান। অবরুদ্ধে বাংলাদেশে তারা এমন এক আতংকময় জীবন যাপন করেন যা অন্তত যারা দেশ ছেড়ে গিয়েছিলেন তাদের ছিল না। অহর্নিশ তারা পরিবার পরিজন নিয়ে সন্ত্রস্ত থাকতেন। যাদের পরিবারে তরুণ-তরুণী ছিল তারা সব সময়ই মৃত্যুর আশঙ্কা করতেন।

গণহত্যার প্রাথমিক ধাক্কা সামলাবার পর অবরুদ্ধ দেশে দৈনন্দিন কাজ শুরু হয়। একদিকে অফিস আদালত চালু হয়, সংসারের রুটিন কাজ শুরু হয় তবে সারা দেশের অস্বাভাবিকতা বোঝা যেত। শিক্ষালয়গুলি ছিল প্রায় খালি। সন্ধ্যার পর রাস্তায় লোক চলাচল করতেন না। এক অঞ্চল থেকে আরেক অঞ্চলে মানুষজন বেশি যেতেন না। অফিস-আদালতের উপস্থিতি ছিল কম। যে কারণে পাকিস্তান সরকার বিশ্ববাসীর কাছে কখনও প্রমাণিত করতে পারেনি যে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে স্বাভাবিক আস্থা বিরাজ করছে।

অন্যদিকে, শরণার্থী হওয়া ছাড়াও তরুণদের একাংশ যাদের মধ্যে ছাত্র-কৃষক, শ্রমিক ও সাধারণের সংখ্যা ছিল বেশি তারা মুক্তিযোদ্ধা হয়ে যান এবং প্রশিক্ষণ থেকে গেরিলা আক্রমণের জন্য দেশে ফিরতে থাকেন। সাধারণ মানুষজন তাদের আশ্রয় ও খাদ্য যোগাতেন। বিভিন্ন অপারেশনে সাহায্য করতেন, গোপন তথ্য সরবরাহ করতেন। অনেকে ঔষধ বস্ত্র যোগাড় করতেন শরণার্থী, মুক্তিযোদ্ধা ও আহতদের সাহায্যের জন্য। গোপন পত্র-পত্রিকা লিখেই প্রকাশ করতেন সাধারণ মানুষের মনোবল অক্ষুণ্ন রাখার জন্য। বাঙালি দালালদের কর্মকান্ডে সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ কখনওই যোগ দেননি। এসবই ছিল পাকিস্তান সরকারের বিরুদ্ধে নীরব প্রতিবাদ ও মুক্তিযুদ্ধ সমর্থন। এভাবে মুক্তিযুদ্ধ পরিণত হয় একটি জনযুদ্ধে।

যে কোন যুদ্ধে নারী সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হন। মুক্তিযুদ্ধও এর ব্যতিক্রম নয়। নারী ধর্ষিত হয়েছেন, সন্তানহারা, স্বামী হারা হয়েছেন, পরিবারের পুরুষরা যুদ্ধে গেলে সংসার সামলেছেন, মুক্তিযোদ্ধাদের আশ্রয়-খাদ্য দিয়েছেন, সেবিকা হিসেবে কাজ করেছেন এবং অনেকে যুদ্ধ করেছেন ও যুদ্ধের বিভিন্ন কর্মকান্ডে সহায়তা করেছেন। প্রবাসেও নারীরা মুক্তিযুদ্ধের সাহায্যার্থে বিভিন্ন কর্মকান্ডে অংশ নিয়েছেন। সুতরাং, মুক্তিযুদ্ধে নারীর অবদান খাটো করে দেখার উপায় নেই। আসলে, সেই সঙ্গে গুটিকয় বাঙালি ছাড়া সবাই মুক্তিযোদ্ধা। একেকজন একে ফ্রন্টে কাজ করেছেন মাত্র। তবে, অবদান বেশি যারা অস্ত্র হাতে হানাদার বাহিনীও তার সহযোগীদের মোকাবেলা করেছেন।

গণহত্যা যখন শুরু হয় তখন থেকেই প্রবাসী বাঙালিরা মুক্তিযুদ্ধের সহায়তায় এগিয়ে আসেন। এর মধ্যে লন্ডন, নিউইয়র্ক, ওয়াশিংটনে [যেখানে বাঙালিরা বেশি ছিলেন] বাঙালিরা একদিকে সরকারের ওপর চাপ সৃষ্টির জন্য বিভিন্ন প্রতিবাদ সভার আয়োজন করেন। স্মারক লিপি প্রদান করেন, সংসদ সদস্যদের কাছে ধর্ণা দেন অন্যদিকে মুক্তিযোদ্ধা ও শরণার্থীদের সাহায্যের জন্য অর্থ সংগ্রহ করেন। লন্ডনকে অভিহিত করা হয় মুক্তিযুদ্ধের তৃতীয় যুদ্ধ ক্ষেত্র। ভারতকে দ্বিতীয়, লন্ডনে ইউরোপের

www.Educationblog24.Com

অন্যান্য প্রবাসী বাঙালিরা এসে মিলিত হতেন। লন্ডনে প্রবাসী বাঙালিদের নেতৃত্ব দেন বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী।

প্রবাসী বাঙালিদের মধ্যে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের নাগরিক সমাজ বাঙালিদের সমর্থনে এগিয়ে এসেছে। সারা বিশ্বের বিভিন্ন সমাজ যে ভাবে সমবাণী ছিল আগে তা কোনও দেশের স্বাধীনতার জন্য হয়েছে কি না সন্দেহ। যুক্তরাষ্ট্র সরকার ছিল পাকিস্তানের পক্ষে। কিন্তু সে দেশের নাগরিকরা বাঙালিদের সমর্থন করে সরকারের ওপর এমন চাপ সৃষ্টি করেছিলেন যে মার্কিন সরকার ইচ্ছে থাকলেও সরাসরি যুদ্ধে জড়ায় নি। যুক্তরাজ্যে নাগরিকরা সব সময় রাস্তায় থেকেছেন বাঙালিদের সঙ্গে। পাকিস্তানে সিভিল সমাজের অনেকে বাঙালিদের সমর্থন করতে গিয়ে জেলে গেছেন। ইন্দোনেশিয়ার সরকার ছিল পাকিস্তানের পক্ষে কিন্তু ছাত্র বা বুদ্ধিজীবীরা ছিল বাংলাদেশের পক্ষে। প্রবাসীদের এই ভূমিকা তেমন ভাবে লিপিবদ্ধ হয়নি। কোথায় ইকুয়েডর সেখানেও একজন পত্রিকায় বাংলাদেশের পক্ষে লিখছেন। অষ্ট্রেলিয়ায় এক কবি আরো সমব্যথীদের নিয়ে বাঙালিদের জন্য এক মাসেরও বেশি অনশন করেছেন, উদ্দেশ্য অস্ট্রেলিয়া সরকার যেন বাঙালি শরণার্থীদের জন্য দানের পরিমাণ আরো বাড়িয়ে দেয়। বুয়েনস আয়ার্সে নোবেলজয়ী লেখক বোহের্স, রবীন্দ্রনাথের স্নেহধন্য বুদ্ধিজীবী ভিক্টোরিয়া ওকাম্পো বাংলাদেশের সমর্থনে মিছিল করেছেন। জার্মানীর এক গ্রামে, গ্রামবাসীরা জমায়েত হয়ে একদিনে বাংলাদেশের জন্য সংগ্রহ করেছিলেন ৩০ হাজার মার্ক। আনা টেইলর হোয়াইট হাউসের সামনে অনশন করেছেন। বিখ্যাত শিল্পী ভিরমিয়রের ছবি এক প্রদর্শনী থেকে চুরি করেছিলেন বেলজিয়ামের এক যুবক। ছবির মুক্তিপণ চেয়েছিলেন বাঙালিদের জন্য। প্যারিসে এক যুবক ছিনতাই করেছিলেন পাকিস্তানের বিমান, সেখানে ছিল ঔষুধপত্র। তার দাবি ছিল তা বাঙালি শরণার্থীদের দিতে হবে। লন্ডনের কাগজে একজন ইংরেজ বিজ্ঞাপন দিয়ে জানিয়েছিলেন তিনি যে কোন সাহায্যে প্রস্তুত। জন লেনন ও রবিশঙ্কর নিউইয়র্কের ম্যাডিসন স্কোয়ারে বাঙালিদের জন্য কনসার্টের জন্য আয়োজন করেছিলেন যা ছিল অভূতপূর্ব। জোন বেজ বাংলাদেশের জন্য গেয়েছিলেন। অ্যালেন গিনসবার্গের মতো কবি লিখেছিলেন বাংলাদেশের জন্য কবিতা। চলচ্চিত্র নির্মিত হয়েছিল ভারতে। ইউরোপে শিশুরা তাদের দুপুরের খাবারের পয়সা বাঁচিয়ে সাহায্য করেছিল শরণার্থীদের। জাপানের একজন চাকরি ছেড়ে গাড়ি করে সারাদেশ ঘুরে বেড়িয়েছেন বাঙালিদের পক্ষে জনমত সংগঠনে। স্বাধীন বাংলা বেতার যদি হয় ১২ নং সেক্টর তাহলে বিদেশী নাগরিক সমাজ হচ্ছে মুক্তিযুদ্ধের ১৩ নং সেক্টর। ২০১১-১৩ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশ সরকার যেসব বিদেশী বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সমর্থনে অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছিলেন তাদের মুক্তিযুদ্ধ সম্মাননা দিয়েছেন।

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে সবচেয়ে বেশি অবদান বিদেশীদের মধ্যে ভারত ও ভারতীয় বিশেষ করে বাংলাদেশের সীমান্তবর্তী অঞ্চলের জনগণ। ভারতের বিভিন্ন রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যে বিভিন্ন বিষয়ে মতভেদ ছিল কিন্তু বাংলাদেশ প্রশ্নে তারা ছিল একমত। ভারতের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী সর্বক্ষেত্রে সহায়তা দিয়ে বাঙালির মুক্তিযুদ্ধ এগিয়ে

www.Educationblog24.Com

নিয়েছেন। এ কথা অস্বীকার ইতিহাস বিকৃতি মাত্র।

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে ভারতীয় সাহায্য সহযোগিতাকে গবেষকরা বিভিন্ন তাত্ত্বিক ফ্রেমের আলোকে বিচার করেছেন। এর মধ্যে প্রাধান্য বিস্তার করে আছে বৃহৎ ও ক্ষুদ্র রাষ্ট্র এবং নিজ স্বার্থতত্ত্ব। অর্থাৎ ভারত নিজ স্বার্থে মুক্তিযুদ্ধ সমর্থন করেছেন।

পাকিস্তানকে দ্বিখণ্ডিত করেছে। প্রতিটি রাষ্ট্রই নিজ স্বার্থে কাজ করবে সেটি স্বাভাবিক। ভারত সরকার পাকিস্তানকে শায়েস্তা করার সুযোগ ছাড়বে না সেটিই সত্য। কিন্তু, প্রশ্ন হলো এ সুযোগ কি ভারত সৃষ্টি করেছে না পাকিস্তান? পাকিস্তান গণহত্যা শুরু না করলে বিপুল সংখ্যক শরণার্থী ভারত যেতো না, আওয়ামী লীগ মুজিবনগর সরকার গড়ত না, মুক্তিযুদ্ধও হতো না। এরপরও কথা থাকে, শুধু নিজ স্বার্থই নয়, বাংলাদেশের মানুষের জন্য সারা ভারত জুড়ে একটি আবেগের সৃষ্টি হয়েছিলো।

বাংলাদেশ থেকে অধিকাংশ শরণার্থী গিয়েছিলেন পূর্বভারতের বিভিন্ন অঞ্চল যেমন ত্রিপুরা, পশ্চিমবঙ্গ, আসাম, মেঘালয় প্রভৃতি অঞ্চলে। এসব অঞ্চলের অনেক মানুষ ছিলেন যাদের বাড়ি ছিল পূর্ববঙ্গে, আত্মীয়স্বজনও ছিলেন। এ অঞ্চলের ভাষা, খাদ্যাভাস, সংস্কৃতি প্রায় একই। ফলে, এ গণহত্যা নিজ আত্মীয়কে হত্যা হিসেবে তারা নিয়েছিলেন। বিপুল সংখ্যক মানুষকে আশ্রয়, খাদ্য দেয়ার জন্য সব রকমের সহযোগিতা তারা করেছিলেন

অন্য দিকে ষাট দশকের মধ্যভাগ থেকে বিশ্বজুড়ে উদারনীতির হাওয়া বইতে শুরু করে। ভিয়েতনাম, কম্বোডিয়ার যুদ্ধের বিরুদ্ধে মানুষ প্রতিবাদী হয়ে উঠে। এর প্রভাব এ অঞ্চলেও পড়েছিলো। যে কারণে, শুধু পূর্বাঞ্চল নয়, সারা ভারত জুড়ে রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক কর্মীরা বাংলাদেশের মানুষের সাহায্যের জন্য পথে নেমেছিলেন। এদের অনেকের বাংলাদেশ সম্পর্কে ধারণাও ছিল না। এ উদারনীতি ও আবেগের কারণে, অভিনেত্রী ওয়াহিয়া রেহমান মুম্বাইতে সাহায্য তহবিল খুলতে এগিয়ে এসেছিলেন, শিল্পী হুসাইন ও অন্যান্য শিল্পীরা ছবি বিক্রি করতে রাস্তায় দাঁড়িয়ে ছিলেন। দলমত নির্বিশেষে কংগ্রেস সরকারকে তারা চাপ দিচ্ছিলেন বাংলাদেশকে সহায়তা দেবার জন্য। এপ্রিল মাস থেকেই তারা দাবি জানাচ্ছিলেন বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়ার।

ভারত সরকার অতোটা আবেগে আপ্লুত হয়নি। তারা তাদের নির্ধারিত পরিকল্পনা ধরে এগিয়েছে। তবে, জনমত সম্পূর্ণভাবে বাংলাদেশের পক্ষে থাকায় তাদের সুবিধা হয়েছিলো। সরকার এ জনমতকে পুঁজি করে নিজ পরিকল্পনা অনুসারে কাজ করেছিলো। ভারতীয়দের এ আবেগ সৃষ্টি না হলে, ভারত সরকারের পক্ষে কাজ করা সম্ভব হতো না। সুতরাং, মুক্তিযুদ্ধে ভারতের সহায়তাকে আটোসাটো বিদ্যমান তাত্ত্বিক ফ্রেমের পরিপ্রেক্ষিতে দেখলে চলবে না। আর যদি দেখতে হয়, তাহলে সেই তত্ত্বে, জনগণের আবেগও একটি উপাদান হিসেবে বিবেচিত হবে।

মুক্তিযুদ্ধের সময় আমরা যারা ছিলাম অবরুদ্ধ বাংলাদেশে, তাদের অধিকাংশের প্রধান প্রার্থনা ছিল ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ কবে বাঁধবে। আজ চর্তুদিকে পাকিস্তান আমলের মতো ভারত বিরোধিতা দেখি যা বিএনপি ও ডানপন্থি দলগুলি উশকিয়ে

www.Educationblog24.Com

তুলছে। কিন্তু, ১৯৭১ সালে আর্তিটি ছিল ভারত কি আমাদের শরণার্থীদের সাহায্য করবে, অস্ত্র দেবে, থাকতে দেবে? এসব অনুভূতি আজ অনেকেই অস্বীকার করতে পারেন কিন্তু তাই ছিল সত্য। এবং সেই পটভূমিকায়-ই ১৯৭১ সালের পাকিস্তান-ভারত যুদ্ধকে বিচার করতে হবে।

১৯৭১ সালের আগে ভারতের সঙ্গে পাকিস্তানের দু'টি বড় রকমের যুদ্ধ হয়েছিলো। ১৯৬৫ সালে শেষ যুদ্ধের পর তাশখন্দ চুক্তি হয়। ১৯৭১ সালে মুজিবনগর সরকার গঠনের পরই মোটামুটি স্পষ্ট হয়ে যায় যে, ভারত-পাকিস্তান সংঘাত হবেই। এপ্রিল থেকেই, পূর্ব সীমান্তে এক আধটু সংঘাত হচ্ছিলো এবং ক্রমেই সে সংঘাতের সংখ্যা বাড়ছিলো। মুক্তিযোদ্ধারা সীমান্ত ফাঁড়িগুলি কখনও কখনও দখল করেও নিচ্ছিলো এবং পাকিস্তান ভারত-কে দোষী করে আসছিলো। ভারতও যে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছিলো না তা নয়। পাকিস্তানও প্রস্তুতি নিচ্ছিলো এবং একসময় তা স্নায়ুর যুদ্ধে পরিণত হয়েছিলো।

নয়

একদিকে অবরুদ্ধ বাংলাদেশে চলছে গণহত্যা, ধর্ষণ, লুটপাট। অন্যদিকে, মুক্তিযোদ্ধারা গেরিলা আক্রমণ ও সম্মুখ যুদ্ধে পাকিস্তান বাহিনীকে পর্যদুস্ত করে ইঞ্চি ইঞ্চি এগোচ্ছেন। ডিসেম্বরে প্রথম সপ্তাহে সুসংবদ্ধ আক্রমণ শুরু হলো।

৩ ডিসেম্বর ১৯৭১ সালে ইন্দিরা গান্ধী কলকাতায় এসেছিলেন শরণার্থী শিবির পরিদর্শন ও জনসভায় বক্তৃতা দিতে। এ সময়ই তিনি জানতে পারেন পাকিস্তান পশ্চিম সীমান্ত আক্রমণ করেছে। সঙ্গে সঙ্গে তিনি দিল্লি ফিরে যান ও যুদ্ধের ঘোষণা দেন। ভারত সরকার সিদ্ধান্ত নেয় দুই ফ্রন্টে যুদ্ধ করার।

পূর্বাঞ্চলে বা মুক্তিযুদ্ধের বিজয় সম্পন্ন করার জন্য ভারত ও বাংলাদেশ সেনাবাহিনী নিয়ে গঠিত হয় যৌথ কমান্ড। ভারতের সেনাপতি জেনারেল মানেকশ্ হন যৌথ কমান্ডের প্রধান। পূর্বাঞ্চলের নেতৃত্ব দেন লে. জে. জগজিৎ সি অরোরা। অচিরেই পাকিস্তান বুঝতে পারে এ যুদ্ধে তাদের টিকে থাকা সম্ভব নয়। অন্য দিকে, পূর্ব সীমান্তে ভারত বাংলাদেশ যৌথ বাহিনী দুর্বারগতিতে অগ্রসর হয় ঢাকার দিকে। একটির পর একটি এলাকা মুক্ত হতে থাকে। এক সপ্তাহের মধ্যে তারা ঢাকার উপকণ্ঠে পৌছে যায়। ১৬ ডিসেম্বর অপরাজেয় রমনার মাঠে [বর্তমান সোহরাওয়াদী উদ্যান] পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর প্রধান লে. জে. এ কে নিয়াজি, যৌথ কমান্ডের কাছে ৯৩ হাজার সৈন্য ও সহযোগীদের নিয়ে আত্মসমর্পণ করে। বস্তুত পাকিস্তান কর্তৃক ভারত আক্রমণ এই যুদ্ধকে ত্বরান্বিত করে এবং ভারতও পূর্ব সীমান্তে প্রকাশ্যে বাংলাদেশকে সহায়তা করার সুযোগ পায়। বলা যেতে পারে পাকিস্তান-ভারত বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ ত্বরান্বিত করে।

ডিসেম্বরের শেষ সপ্তাহে বাংলাদেশ সরকার এসে দায়িত্ব গ্রহণ করে। বঙ্গবন্ধুর ঘোষণার মধ্যে দিয়ে যে যুদ্ধ শুরু হয়েছিল বাঙালি মুক্তির জন্য তার পরিসমাপ্তি ঘটে

www.Educationblog24.com

www.Educationblog24.Com

সরকারের দায়িত্ব ভার গ্রহণে। ঐ সময়ে *দৈনিক আনন্দবাজারের* একটি প্রতিবেদনে লেখা হয়-

"পুরোনো পল্টনের আকাশ-বাতাস কাঁপিয়ে আজ ঢাকা সেক্রেটারিয়েটের দশ হাজার কর্মচারী হাত তুলে শপথ নিয়েছেন, বঙ্গবন্ধুর প্রদর্শিত পথে দেশ পুনর্গঠনের জন্য তারা জীবন উৎসর্গ করবেন। প্রধানমন্ত্রী শ্রী তাজুদ্দীনের সঙ্গে গলা মিলিয়ে ওরা বলেছেন, 'তোমার দেশ আমার দেশ, বাংলাদেশ বাংলাদেশ'। এই ঢাকা সেক্রেটারিয়েটের কর্মীরাই গত মার্চ মাসে অসহযোগ আন্দোলনের পুরোভাগে দাঁড়িয়ে সরকারি প্রশাসন যন্ত্র অচল করে দিয়েছিলেন। বহু নিপীড়ন ও সন্ত্রাসের তমসা অতিক্রম করে পুরোনো পল্টনে আবার মুক্তির আনন্দ উত্তাল হয়ে উঠেছে। প্রধানমন্ত্রী শ্রী তাজুদ্দিন, অর্থমন্ত্রী শ্রী মনসুর আলি, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী কামরুজ্জামান ও পররাষ্ট্র মন্ত্রী খন্দকার মুশতাক সেক্রেটারিয়েটে উপস্থিত হলে দিকবিদিক প্রতিধ্বনি করে ওরা আওয়াজ তোলে, জয় বাংলা। তোমার নেতা আমার নেতা শেখ মুজিব, শেখ মুজিব।"

বঙ্গবন্ধু ১০ জানুয়ারি ফিরে এলে মুক্তিযুদ্ধের সমাপ্তি হয় বলা যেতে পারে। 'জয়বাংলা' ধ্বনি তুলে বাঙালি যুদ্ধ করেছিল, শহীদ হয়েছিল, ধর্ষিত হয়েছে, লুণ্ঠিত হয়েছে, সন্তানহারা হয়েছে। এতো আত্মত্যাগ খুব কম জাতি করেছে স্বাধীনতার জন্য। তাই বলি, স্বাধীনতা শুধু চার অক্ষরের শব্দ মাত্র নয়।

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের অনেকগুলি গুরুত্বপূর্ণ দিক বা বৈশিষ্ট্য আছে। এগুলি মনে রাখলে মুক্তিযুদ্ধের রূপরেখাটা বোঝা সহজ হবে।

১. অনেক সময় দেখা যায় একটি রাষ্ট্রে যারা সংখ্যায় বেশি [সংখ্যাগরিষ্ঠ] তারা যারা সংখ্যায় কম [সংখ্যালঘু] তাদের দমিয়ে রাখে। তাদের অধিকারে বাধা দেয়। বাংলাদেশের ক্ষেত্রে হয়েছে উল্টোটা, বাঙালি ছিল সংখ্যাগরিষ্ঠ, তাদের দমিয়ে রেখেছিল অবাঙালি সংখ্যালঘুরা। সংখ্যায় বাঙালিদের যুদ্ধ করে তাদের অধিকার আদায় করে নিতে হয়েছে।

২. পৃথিবীর যে ক'টা দেশ স্বাধীনতা ঘোষণা করে যুদ্ধ করেছে এবং জয়লাভ করেছে বাংলাদেশ তার মধ্যে অন্যতম। দক্ষিণ এশিয়ায় একমাত্র দেশ।

৩. দক্ষিণ এশিয়ায় বাংলাদেশ একমাত্র দেশ না সশস্ত্র যুদ্ধের মাধ্যমে স্বাধীন হয়েছে। সামরিক বাহিনীর সৈন্যরা শুধু যুদ্ধ করেনি, সাধারণ মানুষও যুদ্ধ করেছে। তাই এই যুদ্ধকে বলা হয় জনযুদ্ধ। আর এই যুদ্ধ পরিচালনা করেছেন রাজনীতিবিদরা।

৪. বাংলাদেশ একমাত্র দেশ যে দেশের নেতা যুদ্ধের সময় অন্য দেশের কারাগারে বন্দী ছিলেন। আমি বঙ্গবন্ধুর কথা বলছি। সেই নেতার নাম নিয়ে মানুষ যুদ্ধ করেছে।

৫. পৃথিবীর আর কোন দেশে [যা এতো ছোট] এতো বড় গণহত্যা চালানো হয়নি। ত্রিশ লাখ মানুষ শহীদ হয়েছেন মুক্তিযুদ্ধে।

৬. আর কোন দেশ এতো অল্পসময়ে যুদ্ধ করে স্বাধীন হয়নি এবং এত হাজার সৈন্য ও কর্মচারির আত্মসমর্পণের ঘটনা ঘটেনি।

৭. দেশকে মেধাশূন্য করার জন্য আর কোথাও এতো বুদ্ধিজীবী হত্যা করা হয়নি।

www.Educationblog24.Com

ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত, শহীদুল্লাহ কায়সার, গোবিন্দচন্দ্র দেব, মুনীর চৌধুরী, আনোয়ার পাশা, ডা. আলিম চৌধুরী, নিজামুদ্দিন আহমেদ, সেলিনা পারভীন প্রমুখ বিভিন্ন পেশার মানুষদের হত্যা করেছিল পাকিস্তানি সৈন্য ও আলবদররা।

৮. স্বাধীনতা যুদ্ধ চলাকালীন এতো লোক একেবারে বিদেশে চলে গেছেন শরণার্থী হয়ে এবং যুদ্ধ শেষে আবার ফিরে এসেছেন-এমন ঘটনাও ঘটেনি।

৯. পৃথিবীর বড় বড় শক্তিশালী দেশগুলি পাকিস্তানের পক্ষে ছিল। তারপরও বাংলাদেশের মানুষ এতো অল্প সময়ে জিতেছে এমন ঘটনাও কম ঘটেছে।

১০. শত্রু আক্রমণের দু'সপ্তাহের মধ্যে আর কোন দেশ সরকার গঠন করে যুদ্ধ চালাতে পারেনি।

১১. ইসলামের নামে আর কখনও এতোগুলি ইসলামি রাষ্ট্র [পাকিস্তান, সৌদী আরব, মধ্যপ্রাচ্য, ইরান, ইন্দোনেশিয়া প্রভৃতি] ক্ষুদ্র একটি মুসলমান অধ্যুষিত এলাকায় এতো মুসলমান হত্যার ঘটনা আগে কখনও ঘটায়নি। ইসলামের ইতিহাসে এটি একমাত্র ব্যতিক্রমী ঘটনা।

বাংলাদেশের স্বপ্ন অনেকে দেখেছেন। কিন্তু হয়ত স্বপ্নই দেখেছেন। স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করার দায়িত্ব নিজের কাঁধে তুলে নিয়েছিলেন তিনি। মুসলিম লীগের রাজনীতি দিয়ে তার যাত্রা শুরু কিন্তু মনে প্রাণে ছিলেন অসাম্প্রদায়িক। তাই ঢাকায় ফিরে মুসলিম লীগের বিরুদ্ধেই তরুণদের সংগঠিত করেন। ছাত্রলীগ ও আওয়ামী লীগ গঠনে ভূমিকা রাখেন। ভাষা আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে জড়িত ছিলেন। যুক্তফ্রন্ট গঠন ও মন্ত্রী হিসেবেও কতটুকু সম্ভব অবদান রেখেছিলেন।

১৯৬৬ সালে তাঁর ঘোষিত ছয় দফা তাঁর এবং পূর্ববঙ্গের রাজনীতির মোড় ঘুরিয়ে দেয়। ছয় দফা কালক্রমে পরিণত হয় বাঙালির মুক্তি সনদে। পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকার বাঙালি রাজনীতিবিদদের মধ্যে তাঁকেই ভয় এবং সমীহ করতো। কারণ, পদ সম্পদ কোন কিছু দিয়েই তাঁকে কেনা সম্ভব হয়নি। রাজনৈতিকভাবে তাঁকে শেষ করে দেয়ার জন্য ১৯৬৮ সালে তাকে আগরতলা ম মলায় জড়ানো হয়। ১৯৬৯ সালে জনগণ তাঁকে মুক্ত করে এনে ভালবেসে উপাধি দেয় 'বঙ্গবন্ধু'।

১৯৭০ সালের নির্বাচনে বঙ্গবন্ধু বাঙালি জাতির নেতা হয়ে উঠলেন। বাঙালি আর কখনও এতো ঐক্যবদ্ধ হয়নি। যা হয়েছিল তাঁর ডাকে। মুক্তিযুদ্ধ হয়েছিল তাঁর নামেই।

১৯৭২-৭৫ তিনি দেশ শাসন করেছেন। এ সময় তাঁর সবচেয়ে বড় কৃতিত্ব ধ্বংসস্তূপ থেকে একটি দেশকে পুর্নগঠন করা এবং দেশকে মাত্র নয় মাসের মধ্যে একটি সংবিধান উপহার দেয়া। যে সংবিধানে তাঁর সারাজীবনের আদর্শ, লক্ষ্য বিধৃত হয়েছিল।

তাঁর মতো আত্মত্যাগ খুব বাঙালি রাজনীতিবিদই করেছেন। জীবনের ১১ বছর কেটেছে জেলে। সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য নিজেও পাননি। পরিবারকেও দিতে পারেননি কিন্তু নিজ লক্ষ্য থেকে এক চুলও সরেননি। তাঁর আত্মজীবনী 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী' একটি অসাধারণ গ্রন্থ। বড় মাপের এই মানুষটিকে বুঝতে হলে তার আত্মজীবনী অবশ্য পাঠ্য।

www.Educationblog24.com

শেখ মুজিবের সবচেয়ে বড় কৃতিত্ব তিনি প্রতিষ্ঠানের মর্যাদা বুঝেছিলেন যা তাঁর সোনার বাংলা গড়ার জন্য ছিল প্রয়োজন। এসব প্রতিষ্ঠান হতে পারে সংবিধান, নির্বাচন, ভোট, আমলাতন্ত্র, পার্লামেন্ট। তাঁর সবচেয়ে বড় কৃতিত্ব তিনি এসবের কিছু সূচনা করেছিলেন যা সৃষ্টি করতে পারত সিভিল সমাজ আর বাংলাদেশতো প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল একটি সিভিল সমাজ গঠনের জন্যই। এই সিভিল সমাজ ভাঙার কাজটি শুরু করেছিলেন জে. জিয়া, যাতে সমাজে অস্ত্রধারীদের প্রভাব থাকে, জে.এরশাদ সে কাজটি করেছিলেন সম্পন্ন এবং এখনো তা থেকে আমরা মুক্ত নই এবং সে কারণেই আবার ফিরে আসছেন আলোচনায় বার বার বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।

মুজিব হত্যাকাণ্ড তো একমাত্র তুলনীয় হতে পারে হানাদার বাহিনীর হত্যাযজ্ঞের সঙ্গে। বঙ্গবন্ধু হত্যার প্রায় দু-দশক পর মানুষ আবার অনুভব করেছে শেখ মুজিব কী ছিলেন। কেন তিনি 'বঙ্গবন্ধু' উপাধি পেয়েছিলেন। মানুষ আজ বুঝতে পেরেছে, তিনি বাঙালিকে বড় করতে চেয়েছিলেন, আর মানুষকে বড় করার একটি পথ নিরস্ত্র মানুষের মর্যাদা ফিরিয়ে দেওয়া। তাঁর হত্যার পর কতদল ও কতজন শাসন করলো বাংলাদেশ কিন্তু মানুষের মন থেকেতো তাঁকে মোছা গেল না, যে চেষ্টা এখনো অব্যাহত। কারণ, আজ আমরা দেখছি, আমরা একবারই সে মর্যাদা পেয়েছিলাম, সে পথ একবারই উন্মুক্ত হয়েছিল আমাদের জন্য ১৯৭১ সালে, যখন শেখ মুজিবুর রহমান নামে একজন নিরস্ত্র বাঙালির নেতৃত্বে আমরা সব ধরনের সশস্ত্রদের হটিয়ে দিয়েছিলাম।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের শত ত্রুটি, শত সমালোচনা সত্ত্বেও আমাদের বলতে হবে, যা লিখেছেন শেখ মুজিব ও আওয়ামী লীগের বিরোধী মওদুদ আহমদ– "শেখ মুজিবের আবির্ভাব বাংলাদেশের জাতীয় ইতিহাসের সবচাইতে বড় ঘটনা। তাঁর মৃত্যুর মধ্য দিয়েই তাঁর সমাধি রচিত হয়নি। বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসে শেখ মুজিবের চাইতেও প্রজ্ঞাবান, দক্ষতর, সুযোগ্য ও গতিশীল রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের অভ্যুদয় ঘটেছে বা ঘটবে, কিন্তু বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম ও জাতীয় পরিচিতি নির্ধারণে তাঁর চাইতে বেশি অবদান রেখেছেন এমন কাউকে খুঁজে পাওয়া কঠিন হবে।" আজীবন তিনি বাঙালির স্বার্থে কাজ করেছেন এবং লক্ষ্য পূরণ না হওয়া পর্যন্ত আপস করেননি, যে কারণে বাঙালি ভালবেসে তাঁর নাম দিয়েছে 'বঙ্গবন্ধু', আবেগে 'জাতির পিতা'।

আবহমান সাধারণ বাঙালির মতোই ছিল তাঁর জীবনচর্যা, যে কারণে সব সময় তাঁর যোগ ছিল প্রবল সাধারণ মানুষ, সম্প্রদায়ের সঙ্গে। যতই তিনি পরিবৃত হয়েছেন চাটুকার ও স্বার্থান্বেষীদের দ্বারা, ততই এই সূত্র ছিন্ন হয়ে পড়ছিল এবং পরিস্থিতি অনুধাবনে ব্যর্থ হচ্ছিলেন। সাধারণ বাঙালির সব বৈশিষ্ট্যই তিনি ধারণ করেছিলেন, কিন্তু অসাধারণ ছিল তার মানুষ ও দেশের প্রতি ভালবাসা, যা ছিল অন্ধ। বলতেন তিনি, 'আমার শক্তি এই যে, আমি মানুষকে ভালোবাসি। আমার দুর্বলতা এই যে, আমি তাদের খুব ভালোবাসি।"

যখন তিনি রাষ্ট্রপতি হন, 'বাকশাল' গঠন করেন, তখনও কিন্তু এই ধারণাই তাঁর মনে কাজ করেছে যে তিনি দেশের স্বার্থে, জনের স্বার্থে কাজ করছেন।

প্রাক-১৯৭১ এবং ১৯৭১-৭৫ এর ঘটনাবলী বিশ্লেষণ করলে স্পষ্ট হয়ে ওঠে

www.Educationblog24.Com

বাংলাদেশের সিভিল সমাজে শেখ মুজিবের অবস্থা কোথায় আর অন্যান্য কারকদের অবস্থান কোথায়। তাঁকে বাদ দিয়ে প্রাক ও উত্তর বাংলাদেশের ইতিহাস রচনা অসম্ভব। এ শতাব্দীতে দু-জন শ্রেষ্ঠ বাঙালির নাম বাঙালির জনমানসে ভাস্বর হয়ে থাকবে। একজন কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, অন্যজন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। একজন বাংলা ভাষাকে রূপ দিয়েছিলেন, যাঁর গান বাংলাদেশের জাতীয় সঙ্গীত; অন্যজন বাঙালির অনেক বছরের স্বপ্নকে বাস্তবে রূপ দিয়েছিলেন, সৃষ্টিতে সহায়তা করেছিলেন এ জাতির জন্য স্বাধীন এক ভূখণ্ডের, যার নাম বাংলাদেশ। এ জন্য আমি গর্বিত, আমার উত্তরসূরিও হবে গর্বিত। বাঙালি ও বাংলাদেশ নামটাই বেঁচে থাকবে সে জন্য। আর এ কারণেই অন্নদাশংকর রায় লিখেছিলেন–

'যতদিন রবে পদ্মা মেঘনা গৌরি যমুনা বহমান।
ততদিন রবে কীর্তি তোমার শেখ মুজিবুর রহমান।'

সহায়ক গ্রন্থ

আবুল মাল আবদুল মুহিত, *বাংলাদেশ : জাতি রাষ্ট্রের উদ্ভব*, ঢাকা
হারুন-অর-রশিদ, *বাঙালির রাষ্ট্র চিন্তা ও স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়*, ঢাকা. ২০০৩
মুনতাসীর মামুন, *বঙ্গবন্ধু কীভাবে আমাদের স্বাধীনতা এনেছিলেন*, ঢাকা. ২০১৩
মুনতাসীর মামুন, *রাজাকারের মন* (দুই খণ্ড), ঢাকা
মুনতাসীর মামুন, *পাকিস্তানী জেনারেলদের মন*, ঢাকা, ২০১০
মুনতাসীর মামুন, *মুক্তিযুদ্ধ ১৯৭১*, ঢাকা. ২০১০
মুনতাসীর মামুন (সম্পাদিত) *মুক্তিযুদ্ধ কোষ*, ১২ খণ্ড, ঢাকা, ২০১৩
মুনতাসীর মামুন *শান্তিকমিটি ১৯৭১*, ঢাকা ২০১১
মুনতাসীর মামুন, *আলবদর ১৯৭১*, ঢাকা. ২০১২
মুনতাসীর মামুন, *বীরাঙ্গনা ১৯৭১*, ঢাকা. ২০১২।

www.Educationblog24.com

www.Educationblog24.Com

দশম অধ্যায়

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের শাসনকাল, ১৯৭২-১৯৭৫

১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর পাকিস্তান বাহিনীর আত্মসমর্পণ অনুষ্ঠানের কয়েকদিনের মধ্যেই মুজিবনগর প্রশাসনের সিনিয়র আমলাবৃন্দ (সচিব রুহুল কুদ্দুসের নেতৃত্বে) ঢাকায় এসে প্রশাসনের নিয়ন্ত্রণভার গ্রহণ করেন। ২২ ডিসেম্বর মুজিবনগর সরকারের সদস্যবৃন্দ ঢাকায় আসেন। ঢাকায় পৌঁছে তাজউদ্দীন আহমদ তাঁর অবস্থান সুদৃঢ় করার পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। প্রথম প্রচেষ্টা হিসেবে 'তিনি খোন্দকার মোশতাক আহমদকে পররাষ্ট্রমন্ত্রীর গুরুত্বপূর্ণ পদ থেকে অপসারিত করে আব্দুস সামাদ আজাদকে তার স্থলাভিষিক্ত করেন' (তবে খোন্দকার মোশতাক আইন ও সংসদীয় বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে বহাল থাকেন)। এমনি প্রেক্ষাপটে বঙ্গবন্ধু ৮ জানুয়ারি (১৯৭২) পাকিস্তান কারাগার থেকে মুক্তি পান এবং লন্ডন ও দিল্লী হয়ে ১০ জানুয়ারি ঢাকা পৌঁছেন।

মুক্তিযুদ্ধের সময় পাকিস্তান কারাগারে আটক থাকলেও তিনি মুজিবনগর সরকারের প্রেসিডেন্ট পদে বহাল ছিলেন। সুতরাং ১০ জানুয়ারি (১৯৭২) তিনি প্রেসিডেন্ট হিসেবেই নিজ মাতৃভূমিতে প্রত্যাবর্তন করেন। বঙ্গবন্ধুর শাসনভার গ্রহণের সাংবিধানিক ভিত্তি ছিল ১৯৭১ সালের ১৭ এপ্রিল মুজিবগরে ঘোষিত স্বাধীনতার সনদ। স্বাধীন বাংলাদেশে প্রেসিডেন্ট হিসেবে বঙ্গবন্ধু সর্বপ্রথম যে কাজটি করেন তাহলো ১১.০১.৭২ তারিখে 'অস্থায়ী সংবিধান আদেশ' জারির মাধ্যমে দেশে সংসদীয় পদ্ধতির সরকার ব্যবস্থা প্রবর্তন। বঙ্গবন্ধুর আজন্মলালিত স্বপ্ন ছিল একটি সংসদীয় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার। সেই লক্ষ্যে অস্থায়ী সংবিধান আদেশ জারির পর ১২ জানুয়ারি বঙ্গবন্ধু প্রধান বিচারপতির কাছে প্রথমে দেশের রাষ্ট্রপতি হিসেবে শপথ গ্রহণ করেন এবং পদত্যাগ করে প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব গ্রহণ করেন। এভাবেই ১৯৭২ সালের ১২ জানুয়ারি শুরু হয় বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে আওয়ামী লীগের শাসনামল বা 'বঙ্গবন্ধুর শাসনামল'। ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট সপরিবারে বঙ্গবন্ধুকে নৃশংসভাবে হত্যা করা হলে ঐ শাসনামলের অবসান ঘটে। সুতরাং, বলা যেতে পারে যে, বঙ্গবন্ধুর শাসনামল মাত্র ৩ বৎসর ৭ মাস ৩ দিন স্থায়ী ছিল।

বঙ্গবন্ধু সরকারের শাসনভার গ্রহণের সময় যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশের চিত্র

বঙ্গবন্ধু যখন সদ্য স্বাধীন বাংলাদেশের শাসনভার গ্রহণ করেন সেসময় এই দেশটি নয় মাস ব্যাপী মুক্তিযুদ্ধ ও পাকিস্তান বাহিনীর জ্বালাও পোড়াও নীতির ফলে হয়ে পড়েছিল এক যুদ্ধ-বিধ্বস্ত ভূখণ্ড। এর প্রশাসনিক ও অর্থনৈতিক অবকাঠামো বিপর্যস্ত হয়ে

www.Educationblog24.Com

পড়েছিল। দেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ব্যবসা-বাণিজ্য, শিল্প-কলকারখানা সবকিছুই তখন ছিল বন্ধ। আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য পুলিশ ও নিরাপত্তা বাহিনীর শক্তি ছিল নামে মাত্র। সারা দেশে ডাক বিভাগ ছিল বন্ধ, তার বিভাগ হয়ে পড়েছিল অচল, অসংখ্য কালভার্ট-ব্রীজ-সেতু ধ্বংসপ্রাপ্ত হওয়ায় যোগাযোগ ব্যবস্থা ছিল বিধ্বস্ত। মাইন পোতার কারণে নৌবন্দরগুলি ছিল অচল। ব্যাংকগুলি ছিল বন্ধ এবং তহবিল শূন্য। বাংলাদেশের প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা রিপোর্টে সদ্য স্বাধীন বাংলাদেশের নিম্নরূপ চিত্র উপস্থাপন করা হয়েছে :

> Bangladesh inherited a poor, undiversified economy, characterised by an under-developed infra-structure, stagnant agriculture, and a rapidly growing population. She had suffered from years of colonial exploitation and missed opportunities with debilitating effects on initiative and enterprise. Superimposed on all these were the effects of the war of liberation, which caused serious damage to physical infrastructure, dislocation in managerial and organisational apparatus and disruption in established external trading partnership.

যুদ্ধ-বিধ্বস্ত বাংলাদেশের খাতওয়ারি ক্ষয়-ক্ষতির সংক্ষিপ্ত বর্ণনা নিম্নে দেয়া হলো :

(১) কৃষি ক্ষেত্রে

মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন সময়ে খাদ্য শস্য উৎপাদন এমনিতেই বিঘ্নিত হয়েছিল, উপরন্তু পাকিস্তান বাহিনী পরাজয়ের পূর্ব মুহূর্তে সরকারি গুদামে মওজুদ খাদ্যশস্য, শস্যবীজ, সার, কীটনাশক ঔষধ এবং মাঠের গভীর ও অগভীর নলকূপ ধ্বংস করেছিল। মুক্তিযুদ্ধের নয়মাসে আয় উপার্জন ব্যাহত হওয়ায় কৃষি উপকরণ সংগ্রহ করে আবাদ করার টাকা-পয়সা কৃষকের হাতে ছিল না। তাছাড়া মুক্তিযুদ্ধের সময় পাকিস্তান বাহিনী ও রাজাকার-দালালরা কয়েক লক্ষ হালের বলদ ও গাভী জবেহ করে গোশত খেয়েছে। ফলে হাল চাষের জন্য গবাদি পশুর সংকট দেখা দেয়। এসব সমস্যা সমাধানের জন্য নতুন সরকারকে জরুরি ভিত্তিতে কৃষি ঋণ প্রদান, বীজ সংগ্রহ করা, গভীর ও অগভীর নলকূপ মেরামত বা পুর্নখনন করা, কয়েক লক্ষ গরু আমদানি করা ইত্যাদি বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হয়। উদ্ভূত পরিস্থিতিতে কৃষি পুনর্বাসন কাজ ছিল এক কঠিন চ্যালেঞ্জ। পাকিস্তান আমলে ভূমি উন্নয়ন ও সেচ কার্যক্রমের কোন উদ্যোগ গ্রহণ না করায় ১৯৭১ সালে ৭৪% আবাদি জমি ছিল এক ফসলি এবং মাত্র ২৬% জমি ছিল দো-ফসলি ও তিন ফসলি। বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও জলসেচের ব্যবস্থাও ছিল সামান্য।

(২) খাদ্য সংকট

বঙ্গবন্ধু সরকারের শাসনভার গ্রহণের সময় দেশে খাদ্য ঘাটতি ছিল প্রায় ৪০ লক্ষ টন। সরকার মাত্র ৪ লাখ টন খাদ্য শস্য মজুদ পান। এমনি সংকটময় পরিস্থিতিতেও সরকারকে প্রায় নব্বই হাজার পাকিস্তানি যুদ্ধবন্দি, আটককৃত ৫০-৬০ হাজার রাজাকার ও দালাল এবং প্রায় সোয়া-লক্ষ ভারতীয় সৈন্যবাহিনীর জন্য খাদ্য সরবরাহের এক কঠিন চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হতে হয়।

www.Educationblog24.Com

(৩) ধ্বংসপ্রাপ্ত সরকারি-বেসরকারি ভবন ও শরণার্থী পুনর্বাসন

পাকিস্তানী বাহিনী সারা বাংলাদেশে প্রায় ৪৩ লক্ষ বসতবাড়ি, ৩ হাজার অফিস ভবন, ১৮ হাজার প্রাইমারি স্কুল, ৬ হাজার হাই স্কুল ও মাদ্রাসা, ৯ শত কলেজ ভবন ও ১৯ হাজার গ্রাম্য হাট-বাজার পুড়িয়ে দেয়। এগুলো নতুন করে নির্মাণের জন্য প্রয়োজন ছিল প্রচুর পরিমাণ অর্থের এবং নির্মাণ সামগ্রী যেমন বাঁশ, কাঠ, টিন ইত্যাদি। উপরন্তু মুক্তিযুদ্ধের সময় ভারতে আশ্রয়গ্রহণকারী প্রায় ১ কোটি শরণার্থী ও দেশের অভ্যন্তরে উদ্বাস্তু হওয়া লক্ষ লক্ষ পরিবারকে পুনর্বাসন করার এক কঠিন দায়িত্ব এসে যায় সরকারের সামনে।

(৪) বিপর্যস্ত শিক্ষা কার্যক্রম

মুক্তিযুদ্ধের সময় সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কার্যত বন্ধ ছিল। সে সময় পুড়িয়ে দেয়া শিক্ষাভবনগুলো পুনর্নির্মাণ এবং ধ্বংসপ্রাপ্ত আসবাবপত্র, বেঞ্চ, টেবিল, চেয়ার ইত্যাদি মেরামত বা নতুন করে নির্মাণ করে ক্লাশ শুরু করা নতুন সরকারের জন্য ছিল এক বড়ো দায়িত্ব। তাছাড়া স্বাধীন বাংলাদেশের উপযোগী পাঠ্য বই রচনা ও প্রকাশের এক গুরু দায়িত্বও সরকারকে পালন করতে হয়। মুক্তিযুদ্ধের সময় অসংখ্য শিক্ষক শহীদ হওয়ায় সে পদগুলো পূরণের প্রয়োজন হয়। শিক্ষকদের ৯ মাসের বেতন বন্ধ ছিল। তা পরিশোধ করাও ছিল এক গুরু দায়িত্ব।

(৫) বিধ্বস্ত যোগাযোগ ব্যবস্থা

মুক্তিযুদ্ধের সময় সারা দেশে ২৭৪টি ছোট বড় সড়ক সেতু ও ৩০০টি রেল সেতু ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। সে সময় ৪৫ মাইল রেল লাইনের সম্পূর্ণ অংশ এবং ১৩০ মাইল রেল লাইনের আংশিক ক্ষতি সাধিত হয়। ১৫০টি বগি ও বেশ কয়েকটি রেল ইঞ্জিন অকেজো হয়। রেল ইঞ্জিন ও বগি মেরামতের কারখানাগুলো সম্পূর্ণ ধ্বংস করা হয়। সরকারি পরিবহনের শত শত বাস ও ট্রাক ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। ধ্বংসপ্রাপ্ত বেসরকারি বাস ও ট্রাকের সংখ্যা বেহিসেবি। সারা দেশে প্রায় ৩০০০ মালবাহী নৌকা ডুবিয়ে দেয়া হয়। দেশের শতকরা ৮৫টি জলযান ধ্বংস হয়। মাল পরিবহনের সরকারি কার্গোগুলোও নিমজ্জিত হয়। চট্টগ্রাম ও চালনা বন্দরে মাইন পোতার কারণে বন্দর দুটি অকার্যকর হয়েছিল। দেশের বিমান বন্দরসমূহের রানওয়ের ক্ষতি সাধন করা হয়। অভ্যন্তরীণ যোগাযোগের জন্য বেসামরিক যাত্রীবাহী কোন বিমান সরকারের হাতে ছিল না।

(৬) বিধ্বংস টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থা

মুক্তিযুদ্ধের সময় ঢাকার সাথে বিভিন্ন জেলা শহরসহ বিদেশের টেলি-যোগাযোগ ব্যবস্থা ধ্বংস হয়। আত্মসমর্পণের পূর্বে টেলিফোন এক্সচেঞ্জ ভবনগুলোতে পাহারারত পাকিস্তান বাহিনী ট্রাঙ্কব্যবস্থা বিনষ্ট করে দেয়। তারা টেলিফোন সংস্থার নথিপত্র পুড়িয়ে দেয়। টেলিফোন ব্যবস্থা সচল করার জন্য তাৎক্ষণিকভাবে প্রয়োজন ছিল ঢাকা শহরের জন্য কমপক্ষে ৫০০০ টেলিফোন সেট, ৩১টি ট্রাঙ্ক লাইন নতুন করে স্থাপন, এক্সচেঞ্জের জন্য যন্ত্রপাতি আমদানি করা, ২০০০ কিমি দীর্ঘ টেলিফোন তার আমদানি করা, কমপক্ষে ১০০০ দক্ষ টেলিফোন কর্মী ইত্যাদি।

www.Educationblog24.Com

www.Educationblog24.Com

(৭) বিদ্যুৎ ব্যবস্থা

সারা দেশে বিদ্যুৎ সাব-স্টেশনগুলো ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছিল। অনেকস্থানে বিদ্যুৎ লাইন বিচ্ছিন্ন ও বিদ্যুৎ পোলগুলো বিনষ্ট হয়েছিল। বঙ্গবন্ধুর সরকার দায়িত্ব গ্রহণের সময় গোডাউনগুলোতে বিদ্যুৎ খুঁটি ও তার কিছুই মজুদ ছিল না।

(৮) অর্থনৈতিক অবস্থা

আত্মসমর্পণের পূর্বে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর ব্যাংকসমূহে গচ্ছিত কাগজের নোটগুলো পুড়িয়ে দেয় এবং গচ্ছিত সোনা লুট করে। উপরন্তু ব্যাংকের নথিপত্রও তারা বিনষ্ট করে। পাকিস্তান আমলে বাংলাদেশ অংশের ব্যাংকগুলোতে কর্মরত উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের ৬০% এবং নিম্নস্তরের কর্মচারীদের ২০% ছিল অবাঙালি। মুক্তিযুদ্ধের পর অবাঙালি কর্মকর্তা-কর্মচারীরা কর্মস্থলে অনুপস্থিত হলে ব্যাংকগুলোতে দক্ষ জনবলের অভাব দেখা দেয়।

মুক্তিযুদ্ধের সময় শিল্প-কল-কারখানাগুলো প্রায় বন্ধ ছিল। ফলে অনেক মিল অকেজো হয়ে পড়ে। এগুলো চালু করার মত স্পেয়ারপার্টস ও কাঁচামাল কোন গুদামেই মজুদ ছিল না। উপরন্তু বিভিন্ন মিলে কর্মরত অবাঙালি শ্রমিকেরা আত্মগোপনে বা রিফুজি ক্যাম্পে আশ্রয় নেয়ায় দক্ষ শ্রমিকের অভাব দেখা দেয়। কাঁচামাল আমদানির জন্য বৈদেশিক মুদ্রার প্রয়োজন হয়।

(৯) বিপর্যস্ত প্রশাসনিক কাঠামো ও দক্ষ প্রশাসকের অভাব

দেশ পুনর্গঠনের জন্য তাৎক্ষণিকভাবে প্রয়োজন ছিল দক্ষ প্রকৌশলী, কৃষিবিদ, ব্যাংকার এবং অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ব্যবসায়ীদের। ডাক, তার, রেল, মিল-কল-কারখানা প্রভৃতি সেক্টরে অভিজ্ঞ কর্মীর প্রয়োজন ছিল। পাকিস্তান আমলে অবাঙালিরা এসব ক্ষেত্র নিয়ন্ত্রণ করতো বিধায় নতুন রাষ্ট্রে দক্ষ কর্মীর অভাব দেখা দেয়।

(১০) সংবিধান ও আইনের শূন্যতা

নতুন সরকারের হাতে কোন সংবিধান ছিল না। ছিল উপনিবেশিক আইন ব্যবস্থা। স্বল্প সময়ে সংবিধান প্রণয়ন ও যুগোপযোগী আইন প্রণয়নের গুরু দায়িত্ব বঙ্গবন্ধুর সরকারকে পালন করতে হয়।

উপর্যুক্ত সমস্যাগুলো মোকাবিলা করা ছাড়াও নতুন সরকারকে তাৎক্ষণিকভাবে আরও যে সকল চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করতে হয় তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল :

(ক) মুক্তিযোদ্ধাদের কাছ থেকে অস্ত্র উদ্ধার ও মুক্তিযোদ্ধাদের পুনর্বাসন করা। শহীদ ও আহত মুক্তিযোদ্ধা পরিবারবর্গকে আর্থিক সহযোগিতা প্রদান করাও ছিল বঙ্গবন্ধুর সামনে অন্যতম গুরু দায়িত্ব;
(খ) মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতাকারী দালালদের আটক করে বিচারের সম্মুখীন করা;
(গ) পাকিস্তানে আটক প্রায় ৪ লক্ষ বাঙালিকে ফিরিয়ে আনা;
(ঘ) বাংলাদেশে অবস্থানরত প্রায় সোয়া লক্ষ ভারতীয় সৈন্যকে ভারতে ফেরত পাঠানো;
(ঙ) স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশের স্বীকৃতি লাভ করা;
(চ) জাতিসংঘসহ সকল আন্তর্জাতিক সংস্থার সদস্যপদ অর্জন করা;
(ছ) যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশের পুনর্গঠনের জন্য আন্তর্জাতিক অনুদান লাভ করা;

www.Educationblog24.com

(জ) বিরোধী রাজনীতিকে মোকাবিলা করা। সেসময় সর্বহারা পার্টি ও জাসদের সরকার বিরোধী কার্যকলাপ নতুন সরকারের সামনে কঠিন চ্যালেঞ্জ হিসেবে দেখা দিয়েছিল;

(ঝ) সীমান্তে চোরাচালান বন্ধ করা;

(ঞ) আন্তর্জাতিক তেলের বাজারে মূল্যবৃদ্ধিজনিত প্রভাব, বাংলাদেশকে ঘিরে সৃষ্ট আন্তর্জাতিক চক্রান্ত, মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বিনাশের ষড়যন্ত্র ইত্যাদি মোকাবিলা করা। এসব বঙ্গবন্ধুর সরকারের সামনে কঠিন চ্যালেঞ্জ হিসেবে দেখা দেয়;

(ট) সর্বোপরি, দেশের জনগণের আকাশচুম্বী আশা-আকাঙ্ক্ষার বাস্তবায়ন করা, ঐতিহাসিক ১১ দফায় উল্লেখিত দাবিগুলো—যেমন, ৮ম শ্রেণী পর্যন্ত অবৈতনিক শিক্ষার সুযোগ, ব্যাংক-বীমা, পাট ব্যবসা ও বৃহৎ শিল্প জাতীয়করণ করা, কৃষকদের উপর থেকে খাজনা হ্রাস করা, বকেয়া খাজনা মওকুফ করা, ইত্যাদি বাস্তবায়ন করা।

বঙ্গবন্ধুর সরকার যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশ গঠনের কঠিন চ্যালেঞ্জ অত্যন্ত সাহসিকতার সঙ্গে মোকাবিলা করেন।

বঙ্গবন্ধুর প্রশাসনিক নীতি ও পরিকল্পনার ভিত্তি এবং পূর্ব প্রস্তুতি

বলা হয়ে থাকে যে, বঙ্গবন্ধু সুদীর্ঘকাল আন্দোলন-সংগ্রাম করেছেন, কিন্তু প্রশাসনিক অভিজ্ঞতা তাঁর ছিল না। সুতরাং সরকার প্রধানের দায়িত্ব গ্রহণের সময় তাঁর সরকারের লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও নীতি কি হওয়া উচিত সে বিষয়ে সুনির্দিষ্ট কোন পূর্ব পরিকল্পনা তাঁর ছিল না। অর্থাৎ তাঁর আজন্মলালিত সোনার বাংলা গঠনের জন্য, কিংবা যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশ পুনর্গঠন করে দেশবাসীর আকাশচুম্বী আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণের জন্য তিনি কি ধরনের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা অনুসরণ করবেন, কিভাবে তিনি কৃষি, শিল্প, শিক্ষা ও অন্যান্য সামাজিক সংস্কার সাধন করবেন সে বিষয়ে তাঁর নিজস্ব কোন কর্মপরিকল্পনা, কিংবা তাঁর রাজনৈতিক দল আওয়ামী লীগের কোন ম্যানিফেস্টো ছিল না বলে অপপ্রচার করা হয়। যেমন বলা হয়ে থাকে যে, বঙ্গবন্ধুর সরকার যে ব্যাপক জাতীয়করণ নীতি অবলম্বন করেন তা তিনি করেছিলেন বামপন্থীদের চাপে কিংবা সোভিয়েট প্রভাবে। আওয়ামী লীগের শ্রেণী চরিত্র ও আওয়ামী লীগ নেতাদের আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপট বিশ্লেষণ করলে বঙ্গবন্ধুর সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা অনুসরণের বিষয়টি মেলে না বলেই অমন ভুল ধারণার সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু আমরা যদি পাকিস্তান আমলের বিভিন্ন আন্দোলন সংগ্রামে আওয়ামী লীগের উত্থাপিত বিভিন্ন দাবি-দাওয়া, ঐতিহাসিক ৬ দফা ও ১১ দফা দাবি, সত্তরের নির্বাচনের সময় ঘোষিত আওয়ামী লীগের নির্বাচনী ইশতেহার এবং মুজিবনগর সরকারের গৃহীত পদক্ষেপসমূহ বিশ্লেষণ করি তাহলে এটা সুস্পষ্ট করে বলা যায় যে, রাষ্ট্রপরিচালনার সুনির্দিষ্ট নীতিমালা, আদর্শিক ভিত্তি ও দর্শন বঙ্গবন্ধুর সামনে ছিল। কিছু উদাহরণ দেয়া যেতে পারে। যেমন:

(১) ১৯৫৪ সালের পূর্ব বাংলা ব্যবস্থাপক পরিষদের নির্বাচনের সময় আওয়ামী লীগ নেতৃত্বাধীন যুক্তফ্রন্ট যে ঐতিহাসিক ২১ দফা কর্মসূচি ঘোষণা করেছিল তার ১২নং

www.Educationblog24.Com

দাবিতে পাটশিল্প জাতীয়করণের প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছিল;

(২) ৬ দফার অনুসরণে প্রণীত ১১ দফা দাবিতে ব্যাংক, বীমা ও সকল বৃহৎ শিল্প প্রতিষ্ঠান জাতীয়করণ করার মত অর্থনৈতিক দাবি অর্ন্তভূক্ত করা হয়েছিল। তাছাড়া চাষীদের জন্য কর হ্রাস, কিংবা শ্রমিকদের জন্য ন্যায্য বেতন ও বোনাসের দাবিও ১১ দফাতে ছিল। আওয়ামী লীগ সত্তরের নির্বাচনে ৬ দফা ও ১১ দফার প্রতি গণরায় লাভ করে;

(৩) ১৯৭০-এর নির্বাচনে আওয়ামী লীগের নির্বাচনী ইশতেহারে উল্লেখ করা হযেছিল যে,'মানুষে মানুষে বিদ্যমান অর্থনৈতিক অবিচার দূরীভূত করার' লক্ষ্যে অগ্রাধিকারভিত্তিতে ব্যাংক, বীমা, বৃহৎ শিল্প, বৈদেশিক বাণিজ্য, পাট ও তুলা বাণিজ্য, শিপিংসহ অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক নৌপরিবহন ব্যবস্থা এবং অন্যান্য বৃহৎ শিল্পের জাতীয়করণের বিষয়টি পরিকল্পনা প্রণয়নকারী সংস্থাসমূহের মাধ্যমে স্থির করা হবে'। এছাড়াও ইশতেহারে ২৫ বিঘা পর্যন্ত জমির খাজনা মওকুফ করার প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়।

(৪) প্রবাসী সরকার গঠনের পর দশ এপ্রিল ৯.৩০ মিনিটে অল ইন্ডিয়া রেডিও-র শিলিগুড়ি কেন্দ্র থেকে প্রচারিত ভাষণে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে তাজউদ্দীন আহমদ যে ভাষণ দেন তাতে তিনি বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের লক্ষ্য নিম্নরূপভাবে স্থির করেন:

> বাংলাদেশের নিরন্ন দুঃখী মানুষের জন্য রচিত হোক এই নতুন পৃথিবী, যেখানে মানুষকে শোষণ করবে না। আমাদের প্রতিজ্ঞা হোক ক্ষুধা, রোগ, বেকারত্ব আর অজ্ঞানতার অভিশাপ থেকে মুক্তি। এই পবিত্র দায়িত্বে নিয়োজিত হোক সাড়ে সাত কোটি বীর বাঙালি ভাই-বোনের সম্মিলিত মনোবল, অসীম শক্তি। যাঁরা আজ রক্ত দিয়ে উর্বর করেছে বাংলাদেশের মাটি, যেখানে উৎকর্ষিত হচ্ছে স্বাধীন বাংলাদেশের নতুন মানুষ। তাঁদের রক্ত আর ঘামে ভেজা মাটি থেকে গড়ে উঠুক নতুন গণতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা; গণমানুষের কল্যাণে সাম্য আর সুবিচারের ভিত্তিপ্রস্তরে লেখা হোক 'জয় বাংলা', 'জয় স্বাধীন বাংলাদেশ'।

(৫) বাংলাদেশ স্বাধীন করার পিছনে বঙ্গবন্ধুর যেমন একটা দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা ছিল, যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশ গঠন করার জন্যও বঙ্গবন্ধুর মনে যেন একটা কর্ম কৌশল তৈরি করারই ছিল—তা তাঁর স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের দিন (১০.১.৭২) থেকে পরবর্তী ২/৩ দিন প্রদত্ত বক্তব্য বিবৃতি থেকে অনুধাবন করা যায়। মুক্তিযুদ্ধের ৯ মাস বঙ্গবন্ধু পাকিস্তানের কারাগারে এমনিভাবে আটক ছিলেন যে তখন তিনি গোটা বিশ্বের ঘটনা প্রবাহ থেকে বিচ্ছিন্ন ছিলেন। ৮ জানুয়ারি (১৯৭২) মুক্তি পেয়ে লন্ডন-দিল্লী হয়ে ১০ জানুয়ারি ঢাকা পৌছা পর্যন্ত দলীয় নেতা-কর্মীদের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ হয়নি, অথচ ঢাকা পৌছেই তিনি যে বক্তব্য দিলেন তাতে তাঁর সমস্ত পরিকল্পনার কথা এমনভাবে ব্যক্ত করলেন যেন সেগুলো তিনি পূর্ব থেকেই মনের কোণে রচনা করে রেখেছিলেন।

প্রথমেই তিনি বাংলাদেশের স্বাধীনতা অক্ষুণ্ন রাখার দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করে বলেন :

> গত ৭ মার্চ আমি এই রেসকোর্সে বলেছিলাম, 'দুর্গ গড়ে তোল', আজ আবার

www.Educationblog24.Com

বলছি,'আপনারা একতা বজায় রাখুন' আমি বলেছিলাম 'বাংলাদেশকে মুক্ত করে ছাড়ব'। বাংলাদেশ আজ মুক্ত স্বাধীন।' একজন বাঙালি বেঁচে থাকতেও এই স্বাধীনতা নষ্ট হতে দেব না। বাংলাদেশ ইতিহাসে স্বাধীন দেশরূপেই বেঁচে থাকবে। বাংলাকে দাবিয়ে রাখতে পারে এমন কোন ব্যক্তি নাই।

বাংলাদেশে অবস্থানরত ভারতীয় সেনাবাহিনী ফেরত পাঠানো প্রসঙ্গে ১০ জানুয়ারি (১৯৭২) তিনি বলেন,

আমি যখনই বলব, ভারতীয় সেনাবাহিনী তখনই দেশে ফেরত যাবে। এখনই আস্তে আস্তে অনেককে ফেরত পাঠানো হচ্ছে।

দেশের স্বাধীনতা রক্ষা প্রশ্নে তিনি আরও বলেন:

এখন যদি কেউ বাংলাদেশের স্বাধীনতা হরণ করতে চায়, তাহলে সে স্বাধীনতা রক্ষা করার জন্যে মুজিব সর্বপ্রথম তার প্রাণ দেবে। বাঙালি আর স্বাধীনতা হারাতে পারে না।

যুদ্ধাপরাধী-দালালদের বিচার প্রসঙ্গে বাংলার মাটিতে পা রেখেই বঙ্গবন্ধু সেদিন দৃঢ়কণ্ঠে উচ্চারণ করেছিলেন:

গত ২৫শে মার্চ থেকে এ পর্যন্তদীর্ঘ ৯ মাসে বর্বর পাকিস্তানি সেনাবাহিনী এ দেশের প্রায় সব বুদ্ধিজীবীকে হত্যা করেছে। তারা আমার মানুষকে হত্যা করেছে। হাজার হাজার মা-বোনের সম্ভ্রম নষ্ট করেছে। বিশ্ব এসব ঘটনার সামান্য কিছুমাত্র জানে। বিশ্বকে মানব ইতিহাসের জঘন্যতম কুকীর্তির তদন্ত অবশ্যই করতে হবে। একটি নিরপেক্ষ আন্তর্জাতিক ট্রাইবুনাল গঠন করে বর্বর পাক বাহিনীর কার্যকলাপের সুষ্ঠু তদন্ত করার জন্য আবেদন জানাচ্ছি।

এ দেশীয় দালালদের প্রসঙ্গে বঙ্গবন্ধু বলেন:

ইয়াহিয়া সরকারের সাথে যারা সক্রিয়ভাবে সহায়তা করেছে তাদের বিরুদ্ধে যথাসময়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে। এদের বিচার হবে। সে ভার সরকারের ওপর ন্যস্ত রাখুন।

দেশের ভবিষ্যত রাষ্ট্রনীতি সম্পর্কে সেদিন বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন :

আমি স্পষ্ট ভাষায় বলে দিতে চাই যে, বাংলাদেশ একটি আদর্শ রাষ্ট্র হবে। আর তার ভিত্তি বিশেষ কোন ধর্মভিত্তিক হবে না। রাষ্ট্রের ভিত্তি হবে গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতা। এদেশের কৃষক-শ্রমিক, হিন্দু-মুসলমান সুখে থাকবে, শান্তিতে থাকবে।

দেশের স্বাধীনতা অর্থবহ করার জন্য তিনি দৃঢ় প্রত্যয় ঘোষণা করেন :

বাংলাদেশকে একটি সুখী ও সমৃদ্ধশালী দেশ হিসেবে গড়ে তুলতে হবে।

এভাবে দেখা যায় যে, বঙ্গবন্ধু ১০ জানুয়ারি (১৯৭২) ঢাকা পৌঁছে লাখ লাখ জনতার যে প্রাণঢালা অভিনন্দন পান তার প্রতিক্রিয়ায় তিনি তাৎক্ষণিকভাবে যে সংক্ষিপ্ত বক্তৃতা দেন তাতে নতুন সরকারের করণীয় অনেক বিষয়েরই উল্লেখ ছিল। এরপর প্রধানমন্ত্রী হিসেবে ১৪ জানুয়ারি তিনি সাংবাদিক সম্মেলনে যে বক্তৃতা দেন তাতে তাঁর সরকারের নীতি ও ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা বিষয়ে স্পষ্ট দিক-নির্দেশনা ছিল।

তাঁর সরকারের অর্থনৈতিক নীতি বিষয়ে তিনি বলেন :

www.Educationblog24.Com

সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি প্রতিষ্ঠাই তাঁহার চূড়ান্ত লক্ষ্য। বর্তমান মুহূর্তে পুনর্বাসন ও জাতীয় অর্থনীতি পুনর্গঠনই সবচেয়ে জরুরী কাজ বলিয়া ঘোষণা করিয়া তিনি সমগ্র বিশ্বের সাহায্য কামনা করেন এবং এক প্রশ্নের জবাবে বলেন যে, আমরা যেকোন দেশেরই সাহায্যই গ্রহণ করতে প্রস্তুত-তবে সেই সাহায্য হবে শর্তহীন।

অর্থনীতিকে পুনর্নির্মাণ ও গতিশীল করা বিষয়ে তিনি উল্লেখ করেন :

অর্থনীতিকে পুনর্নির্মাণ ও গতিশীল করাই সবচাইতে জরুরী কর্তব্য। অর্থনীতিকে পুনরায় সচল করিয়া তুলিতে হইবে। খাদ্য, আশ্রয় ও পরিধানের বস্ত্রের ব্যবস্থা করিতে হইবে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি পুনরায় চালু করা হইবে এবং সকল শ্রেণীর মানুষের পক্ষে শিক্ষিত হওয়ার সুযোগ গড়িয়া তোলা হইবে। জরুরী ভিত্তিতে সাহায্য ও পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা হইবে।

সংবাদ সম্মেলনে 'মুজিববাদ' সম্পর্কে মন্তব্য করতে বলা হলে বঙ্গবন্ধু বলেন :

'আমি এখন বলিতে পারিব না'।

সংবাদ সম্মেলনে বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশকে প্রাচ্যের সুইজারল্যান্ড হিসাবে গঠন করার অভিপ্রায় ব্যক্ত করেন।

পররাষ্ট্রনীতি সম্পর্কে তাঁর সুস্পষ্ট ঘোষণা ছিল যে,

আমরা শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থানের নীতিতে বিশ্বাসী। আমাদের নীতি হইতেছে সকলের সহিত বন্ধুত্ব। কাহারো সহিত বিদ্বেষ পরায়ণতা নয়। আমাদের পররাষ্ট্র নীতি হইবে জোট নিরপেক্ষ।

বাংলাদেশ ভারতের প্রভাবিত একটি রাষ্ট্র কি-না সে বিষয়ে সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে বঙ্গবন্ধু বলেন,

বাংলাদেশ একটি স্বাধীন রাষ্ট্র।

এভাবে বঙ্গবন্ধু বিভিন্ন বক্তৃতা-বিবৃতি ও সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে ক্ষমতা গ্রহণের মাত্র এক সপ্তাহের মধ্যেই তাঁর সরকারের কর্মপরিকল্পনা জাতির সামনে তুলে ধরেন। যেমন :

(১) ১৪ জানুয়ারি ঢাকা মেডিকেল কলেজে আহত মুক্তিযোদ্ধাদের পাশে উপস্থিত হয়ে ঘোষণা করেন, 'দেশের মুক্তির জন্য যে-সকল যুবক সংগ্রাম করিয়াছেন তাহাদের সমাজে যোগ্য স্থান দেওয়া হইবে',

(২) ১৬ জানুয়ারি (১৯৭২) সমগ্র দেশব্যাপী জাতীয় শোক দিবস পালনের প্রাক্কালে (১৫ জানুয়ারি) তিনি ঘোষণা করেন যে,'মাতৃভূমির মুক্তিযুদ্ধে দেশমাতৃকার যেসব কৃতী সন্তান শহীদ হইয়াছেন তাঁহাদের স্মরণে ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে জাতীয় স্মৃতিসৌধ নির্মাণ করা হইবে'

(৩) ১৭ জানুয়ারি এক সরকারি হ্যান্ড আউটের মাধ্যমে বঙ্গবন্ধু ১০ দিনের মধ্যে সকল অস্ত্র জমা দেওয়ার নির্দেশ জারি করেন;

অতএব, উপরের আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায় যে, শাসনভার গ্রহণ করার সময় বঙ্গবন্ধু সরকার তার কর্তব্য-কর্ম বিষয়ে অত্যন্ত সজাগ ছিলেন। বঙ্গবন্ধুর কাছে এটা

www.Educationblog24.com

www.Educationblog24.Com

স্পষ্ট ছিল যে যুদ্ধ-বিধ্বস্ত দেশকে পুনর্গঠন করতে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে তারা কি কি কাজ করতে হবে এবং কত দ্রুততার সাথে তা করতে হবে। তাঁর সুদীর্ঘ রাজনৈতিক জীবনের অভিজ্ঞতা, ১৯৫৪ সালের ২১ দফা, ঐতিহাসিক ৬ ও ১১ দফা, সত্তরের নির্বাচনী ইশতেহার, স্বাধীনতা সনদ-ইত্যাদি ছিল তার রাষ্ট্র পরিচালনা নীতি নির্ধারণের সহায়ক।

বঙ্গবন্ধুর সরকার পরিচালনা

মন্ত্রী পরিষদ : আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি যে, ১২ জানুয়ারি ১৯৭২ বঙ্গবন্ধু প্রধান বিচারপতির নিকট দেশের প্রেসিডেন্ট হিসেবে শপথ গ্রহণ করেন এবং পদত্যাগ করে প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তখন বাংলাদেশের প্রেসিডেন্ট নিযুক্ত হন বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী। প্রধান বিচারপতি মনোনীত হন বিচারপতি আবু সাদত মোহাম্মদ সায়েম। ১২ জানুয়ারি বঙ্গবন্ধু ১২ সদস্য বিশিষ্ট মন্ত্রীসভা গঠন করেন।

বঙ্গবন্ধু মন্ত্রীপরিষদের প্রথম সভা অনুষ্ঠিত হয় ১৩ জানুয়ারি (১৯৭২)। ঐ সভায় কতকগুলো মৌলিক সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। যেমন :

(১) ১৯৭১ সালের মার্চ মাস থেকে প্রচলিত বাংলাদেশের পতাকার নকশা থেকে বাংলাদেশের মানচিত্র তুলে সবুজের মাঝখানে শুধু লাল গোলক রেখে বাংলাদেশের জাতীয় পতাকা অনুমোদন করা হয়।

(২) বাংলাদেশের জাতীয় সঙ্গীত কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালবাসি' নির্ধারণ করা হয়।

(৩) বিদ্রোহী কবি নজরুল ইসলামের 'চল চল চল ঊর্ধ্ব গগণে বাজে মাদল' গানটি বাংলাদেশের রণসঙ্গীত হিসেবে নির্ধারণ করা হয়।'

আলোচনার এই পর্যায়ে আমরা বঙ্গবন্ধুর সরকারের সাড়ে তিন বছরের কর্মকাণ্ড বিষয়ভিত্তিক আলোচনা করব।

ক. সংবিধান প্রণয়ন

আমরা ইতোপূর্বে উল্লেখ করেছি যে, ১৯৭১ সালের ১৭ এপ্রিল ঘোষিত স্বাধীনতার সনদ মুক্তিযুদ্ধকালীন সময়ে বাংলাদেশে মৌলিক আইনের ভিত্তি হিসেবে কাজ করেছে। 'এই সনদ ছিলো আইনের মূল সূতিকাগার এবং সরকারের সমস্ত কর্তৃত্ব ও ক্ষমতার উৎস। ১৯৭২ সালের ১৬ ডিসেম্বর দেশের সংবিধান কার্যকর না হওয়া পর্যন্ত এটিই ছিলো দেশের সংবিধান'। এই সনদে রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার পদ্ধতির বিধান করা হয়েছিল এবং বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে রাষ্ট্রপতি হিসেবে দেশের শাসনপদ্ধতিতে পরিবর্তন আনার ক্ষমতা দেয়া হয়েছিল। উক্ত ক্ষমতাবলে বঙ্গবন্ধু ঢাকা প্রত্যাবর্তনের পরের দিন ১১ জানুয়ারি (১৯৭২) 'অস্থায়ী সংবিধান আদেশ' জারি করেন। অস্থায়ী সংবিধান আদেশে সংসদীয় সরকার পদ্ধতির প্রবর্তন করা হয়। এটি ছিল জনগণকে প্রদত্ত বঙ্গবন্ধুর দৃঢ় প্রতিশ্রুতির বাস্তবায়ন। ১৯৪৯ সালে জন্মলগ্ন থেকে আওয়ামী লীগ ছিল দেশে সংসদীয় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। ১৯৫৪ সালের ২১ দফায়, ৬ ও ১১ দফায় এবং ৭০-এর নির্বাচনে আওয়ামী লীগ সংসদীয় পদ্ধতির দাবী করেছে।

www.Educationblog24.com

'অস্থায়ী সংবিধান আদেশ' বলে বাংলাদেশের সংবিধান প্রণয়নের লক্ষ্যে সরকার ১৯৭২ সালের ২৩ মার্চ 'গণপরিষদ আদেশ' ও 'বাংলাদেশ গণপরিষদ সদস্য (সদস্যপদ বাতিল) আদেশ' নামক ২টি আদেশ জারি করে। প্রথমটির মাধ্যমে ১৯৭০ সালে তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানে নির্বাচিত জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদ সদস্যগণকে নিয়ে গণপরিষদ গঠন করা হয়। গণপরিষদের একমাত্র দায়িত্ব ছিল বাংলাদেশের জন্য একটি সংবিধান প্রণয়ন করা। আইনসভা হিসেবে কাজ করার কোন ক্ষমতা গণপরিষদের ছিল না। এই আদেশটি ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ থেকে কার্যকর করা হয়। দ্বিতীয় আদেশ অনুযায়ী গণপরিষদের কোন সদস্য তার রাজনৈতিক দল (অর্থাৎ যে দলের মনোনয়ন পেয়ে তিনি নির্বাচনে প্রার্থী হয়েছিলেন) থেকে পদত্যাগ করেন, কিংবা উক্ত দল থেকে বহিস্কৃত হন তাহলে তাঁর সদস্যপদ বাতিল হয়ে যাবে।'

এ দুটি আদেশ জারির পরপরই সংবিধান প্রণয়ন প্রক্রিয়া শুরু হয়। শেখ মুজিবুর রহমান ৯ এপ্রিল আওয়ামী লীগ পার্লামেন্টারি পার্টি কর্তৃক গণপরিষদের দলীয় নেতা নির্বাচিত হন। সৈয়দ নজরুল ইসলামকে সহকারী নেতা নির্বাচন করা হয়। রাষ্ট্রপতি ১০ এপ্রিল গণপরিষদের অধিবেশন উদ্বোধন করেন। তাঁর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে শাহ আবদুল হামিদ ও মোহাম্মদউল্লাহ বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় গণপরিষদের যথাক্রমে স্পিকার ও ডেপুটি স্পিকার নির্বাচিত হন। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ৪১৪ জন সদস্য উপস্থিত ছিলেন। সংবিধানের খসড়া প্রণয়নের লক্ষ্যে ১১ এপ্রিল একটি কমিটি গঠন করা হয়। ৩৪ সদস্য বিশিষ্ট এই কমিটির আহ্বায়ক ছিলেন ড. কামাল হোসেন। এই কমিটিতে একমাত্র বিরোধীদলীয় সদস্য ছিলেন ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি-ন্যাপ (মোজাফ্ফর) থেকে ১৯৭০ সালে প্রাদেশিক পরিষদে নির্বাচিত সদস্য সুরঞ্জিত সেনগুপ্ত। কমিটিতে একজন মহিলা গণপরিষদ সদস্য (মোট মহিলা সদস্যসংখ্যা ছিল ৭ জন) অর্ন্তভূক্ত করা হয়। কমিটিতে পরবর্তী ১০ জুনের (১৯৭২) মধ্যে গণপরিষদে সংবিধানের খসড়া উপস্থাপন করতে বলা হয়। সে অনুযায়ী কমিটি অত্যন্ত দ্রুত সংবিধানের খসড়া প্রণয়নের কাজ শুরু করে। ১৭ এপ্রিল কমিটির প্রথম সভা অনুষ্ঠিত হয়। ঐ বৈঠকে দেশের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ ও বিভিন্ন সংবিধান বিশেষজ্ঞের কাছ থেকে সংবিধান বিষয়ে প্রস্তাব আহ্বান করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। কমিটির ঘোষিত শেষ তারিখের (৮ মে ১৯৭২) মধ্যে কমিটি ৯৮টি সুপারিশমালা লাভ করে। পূর্বনির্ধারিত ১০ জুনের মধ্যে কমিটি সংবিধানের খসড়া প্রণয়ন করতে সক্ষম হয়। সংবিধানটিকে পূর্ণাঙ্গ ও উত্তম করার উদ্দেশ্যে কমিটির সভাপতি ড. কামাল হোসেন ভারত ও ইংল্যান্ড সফর করে সেখানকার পার্লামেন্টের কার্যকারিতা প্রত্যক্ষ করেন। তাছাড়া সংবিধানটিকে ত্রুটিমুক্ত করার উদ্দেশ্যে কমিটি একজন ব্রিটিশ বিশেষজ্ঞের পরামর্শ গ্রহণ করে। ১৯৭২ সালের ১১ অক্টোবরের মধ্যে কমিটি সংবিধানের খসড়া চূড়ান্তভাবে প্রণয়ন করে। সংবিধানের খসড়া চূড়ান্ত করার পূর্বে ৯ অক্টোবর তা আওয়ামী লীগের সংসদীয় দলের বৈঠকে উপস্থাপিত ও আলোচিত হয়েছিল। এভাবে প্রণীত চূড়ান্ত খসড়াটি কমিটির সভাপতি এবং দেশের আইনমন্ত্রী ড. কামাল হোসেন সংবিধানের বিলের আকারে

www.Educationblog24.com

www.Educationblog24.Com

গণপরিষদের অধিবেশনে উপস্থাপন করেন। ১৩ অক্টোবর গণপরিষদ নিজস্ব কার্যপ্রণালীর বিধিমালা গ্রহণ করে। ১৮ অক্টোবর থেকে গণপরিষদে সংবিধান বিল সম্পর্কে সাধারণ আলোচনা শুরু হয় এবং ৩০ অক্টোবর তা সমাপ্ত হয়। ২০ অক্টোবর বাংলাদেশ কমিউনিস্ট পার্টির সভাপতি মণি সিংহ ড. কামাল হোসেনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে সংবিধানের বিষয়ে তার পার্টির সুপারিশ উপস্থাপন করেন। ৩১ অক্টোবর থেকে গণপরিষদে খসড়া সংবিধানের ধারাওয়ারি আলোচনা শুরু হয়। ৩ নভেম্বর পর্যন্তসে আলোচনা চলে। আলোচনাকালে আওয়ামী লীগ দলীয় সদস্যগণ কর্তৃক আনীত কতিপয় সংশোধনী গ্রহণ করা হয়। সংবিধানের ৭৩নং অনুচ্ছেদ সম্পর্কে সুরঞ্জিত সেনগুপ্ত কর্তৃক আনীত একটি সংশোধনী প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়।

১৯৭২ সালের ৪ নভেম্বর গণপরিষদে সংবিধান বিল পাশ হয়। ১৪ ডিসেম্বর (১৯৭২) স্পিকার, প্রধানমন্ত্রী, মন্ত্রিসভার সদস্যবৃন্দ ও গণপরিষদ সদস্যগণ সংবিধানের বাংলা ও ইংরেজি কপিতে স্বাক্ষর দান করেন। তবে একমাত্র বিরোধী দলীয় সদস্য সুরঞ্জিত সেনগুপ্ত সংবিধান বইতে স্বাক্ষর দানে বিরত থাকেন। ১৯৭২ সালের ১৬ ডিসেম্বর বিজয় দিবস থেকে সংবিধানটি কার্যকর করা হয়। এরপর গণপরিষদ ভেঙে দেয়া হয়। গণপরিষদের প্রথম স্পিকার শাহ আব্দুল হামিদ মৃত্যুবরণ করায় (১২ অক্টোবর ১৯৭২) ইতোমধ্যে মোহাম্মদউল্লাহকে স্পিকার ও বায়তুল্লাহকে ডেপুটি স্পিকার নির্বাচিত করা হয়েছিল। গণপরিষদ ভেঙে দেয়ার আগেই প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমান গণপরিষদে ঘোষণা করেন যে, বিধিবদ্ধ সংবিধানের আওতায় দেশে ১৯৭৩ সালের ৭ মার্চ সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে।

সংবিধান প্রণয়নকালীন সময়ে বিভিন্ন রাজনৈতিক নেতা ও দলের প্রতিক্রিয়া ও মতামত

সংবিধান প্রণয়নের লক্ষ্যে গণপরিষদ গঠনের ঘোষণা দেওয়ার পর সরকারকে রাজনৈতিক বিতর্কের সম্মুখীন হতে হয়। বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলো ১৯৭০ সালের নির্বাচনে নির্বাচিত জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের সদস্যদের নিয়ে গণপরিষদ গঠনের বৈধতা নিয়ে প্রশ্ন তোলে। তাদের যুক্তি ছিল যে ১৯৭০ সালের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছিল পাকিস্তান সরকার কর্তৃক প্রণীত 'আইন শাসন কাঠামো' আদেশবলে। উক্ত নির্বাচনে আওয়ামী লীগ পাকিস্তানের শাসন কাঠামোর মধ্যে ৬ দফার ভিত্তিতে একটি সংবিধান প্রণয়ন করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ছিল। স্বাধীন সার্বভৌম দেশ হিসেবে বাংলাদেশের অভ্যুদয় ঘটার সাথে সাথে ১৯৭০ সালের নির্বাচন ও ঐ নির্বাচনে নির্বাচিত সদস্যগণ গ্রহণযোগ্যতা হারিয়েছেন। সুতরাং তারা দাবি করেন যে বাংলাদেশের জন্য একটি সংবিধান রচনা করতে হলে একটি নতুন সাংবিধানিক পরিষদ গঠন করতে হবে। এই দাবি নিয়ে ন্যাপ (ভাসানী) দলের নেতা মওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী একটি সরকার বিরোধী আন্দোলন গড়ে তোলার চেষ্টা করেন। ১৯৭২ সালের ৩ সেপ্টেম্বর এক জনসভায় তিনি সরকারের পদত্যাগ ও একটি জাতীয় সরকার প্রতিষ্ঠার দাবি উত্থাপন করেন। কিন্তু সে সময় শেখ মুজিবুর রহমানের জনপ্রিয়তা তুঙ্গে থাকায় মওলানা

www.Educationblog24.Com

ভাসানীর আহ্বানে তেমন জনসমর্থন পাওয়া যায়নি।

সংবিধান সম্পর্কে প্রতিক্রিয়া

গণপরিষদে সংবিধান গৃহীত হওয়ার পর এর বিরুদ্ধে কোন জোরালো বিক্ষোভ বা আন্দোলন গড়ে ওঠেনি। কোন রাজনৈতিক দলই সংবিধানে অর্ন্তভূক্ত রাষ্ট্রীয় চার মূলনীতির বিরুদ্ধে কোন মতামত প্রকাশ করেনি বা সংবিধানের মূল বৈশিষ্ট্য নিয়ে বিকল্প কোন প্রস্তাব উত্থাপন করেনি। জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (জাসদ) ঐ সংবিধানকে একটি 'বাজে সংবিধান' হিসেবে অভিহিত করে। এই দলের মতে সংবিধানে মৌলিক অধিকারের উপর নানা বাধা নিষেধ আরোপ করে দেশে নিয়ন্ত্রিত গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে এবং অর্থনৈতিক বৈষম্য দূর করার কোন দিক নির্দেশনা সংবিধানে দেয়া হয়নি। তবে দলটি এই মর্মে সন্তোষ প্রকাশ করে যে দেশে কোন সংবিধান না থাকার চেয়ে একটি বাজে সংবিধান থাকাও শ্রেয়। বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি ও ন্যাপ (মোজাফ্ফর) সংবিধানের কিছু কিছু সংশোধনীর প্রস্তাব করলেও সংবিধানকে স্বাগত জানায়। সেসময় ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক দলগুলো নিষিদ্ধ থাকায় কিংবা আন্ডারগ্রাউন্ডে থাকায় সংবিধান বিষয়ে খোলাখুলি কোন মন্তব্য বা সুপারিশ পেশ করতে পারেনি।

সংবিধানের বৈশিষ্ট্যাবলি

১৯৭২ সালের সংবিধান একটি লিখিত দলিল। এই সংবিধানে সংযোজন করা হয় একটি প্রস্তাবনা, ১১টি ভাগ ও ৪টি তফসিল। এর প্রথম ভাগে প্রজাতন্ত্রের বৈশিষ্ট্যসমূহ, দ্বিতীয় ভাগে রাষ্ট্রপরিচালনার মূলনীতিসমূহ, তৃতীয় ভাগে মৌলিক অধিকারসমূহ, চতুর্থ ভাগে নির্বাহী বিভাগ, পঞ্চম ভাগে জাতীয় সংসদ, ষষ্ঠ ভাগে বিচার বিভাগ, সপ্তম ভাগে নির্বাচন, অষ্টম ভাগে মহাহিসাব নিরীক্ষণ ও নিয়ন্ত্রক, নবম ভাগে কর্মকমিশন, দশম ভাগে সংবিধান সংশোধন ও একাদশ ভাগে বিবিধ বিষয়াবলি আলোচিত হয়েছে।

১৯৭২ সালের সংবিধানের প্রস্তাবনায় রাষ্ট্রপরিচালনার মূলনীতি হিসেবে ৪টি আদর্শকে গ্রহণ করা হয়েছে, যেমন: জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র এবং ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ। এর মূল লক্ষ্য ছিল:

> এমন এক সমাজ প্রতিষ্ঠা, যেখানে সকল নাগরিকের জন্য আইনের শাসন, মৌলিক মানবাধিকার এবং রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক সাম্য, স্বাধীনতা ও সুবিচার নিশ্চিত হবে।

সংবিধানে বাংলাভাষাকে একমাত্র রাষ্ট্রীয়ভাষা হিসেবে ও বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'আমার সোনার বাংলা' গানটির প্রথম ১০ চরণ বাংলাদেশের জাতীয় সঙ্গীত হিসেবে গ্রহণ করা হয়। ১৯৭২ সালের সংবিধানে দেশের নাগরিকদের বাঙালি হিসেবে উল্লেখ করা হয়। অর্থাৎ জাতীয়তাবাদ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বাঙালি জাতীয়তাবাদকে প্রাধান্য দেয়া হয়। ঐ সংবিধানে উল্লিখিত সমাজতন্ত্র যে উদ্দেশ্যে উল্লেখ করা হয়েছিল তা হচ্ছে: 'মানুষের উপর মানুষের শোষণবিহীন ন্যায়ভিত্তিক সমাজব্যবস্থা প্রবর্তনের লক্ষ্যে একটি সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থার প্রবর্তন করা' (অনুচ্ছেদ ১০)। গণতন্ত্রের ব্যাখ্যায় উল্লেখ করা হয় যে, 'প্রজাতন্ত্র হবে একটি গণতন্ত্র, যেখানে মৌলিক

www.Educationblog24.Com

মানবাধিকার ও স্বাধীনতার নিশ্চয়তা থাকবে। মানবসত্তার মর্যাদা ও মূল্যের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ নিশ্চিত হবে এবং প্রশাসনের সকল পর্যায়ে নির্বাচিত গণপ্রতিনিধিদের মাধ্যমে জনগণের কার্যকর অংশগ্রহণ নিশ্চিত হবে' (অনুচ্ছেদ ১১)। সংবিধানে উল্লেখিত ধর্মনিরপেক্ষতার অর্থ ছিল সাম্প্রদায়িকতা পরিহার করা, কোন বিশেষ ধর্মকে রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতা প্রদান না করা, ধর্মকে রাজনৈতিক হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার না করা এবং বিশেষ ধর্মের প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ প্রদর্শন না করা। সংবিধানের তৃতীয় ভাগে জনগণের সব ধরনের মৌলিক অধিকারের নিশ্চয়তা দেয়া হয়। সংবিধানের ৪৪নং অনুচ্ছেদ দ্বারা সুপ্রিম কোর্টকে সকল ধরনের মৌলিক অধিকার নিশ্চিত করার রক্ষাকবচ করা হয়েছে। ১৯৭২ সালের সংবিধানে মন্ত্রীপরিষদ শাসিত শাসনব্যবস্থার প্রবর্তন করে প্রধানমন্ত্রীর হাতেই প্রকৃত শাসন ক্ষমতা ন্যস্ত করে। উক্ত সংবিধান রাষ্ট্রপতিকে উপাধিসর্বস্ব করে। সংবিধানে একটি এক কক্ষ বিশিষ্ট এবং ৩০০ সদস্য ও সংরক্ষিত আসনে নির্বাচিত ১৫ জন মহিলা সদস্য সমন্বয়ে আইন সভা গঠনের বিধান করা হয়। আইন সভার নাম দেয়া হয় 'জাতীয় সংসদ'। ১৯৭২ সালে সংবিধানে মহিলা আসনগুলো ১০ বছরের জন্য সংরক্ষিত রাখা হয়। এই সংবিধানে বিধিবদ্ধ করা হয় যে, ১৯৭২ সালের বাংলাদেশ দালাল আদেশের অধীনে কেউ যে কোন অপরাধের জন্য যে কোন মেয়াদের জন্য দণ্ডিত হন তাহলে তিনি সংসদ সদস্য হবার অযোগ্য হবেন (৬৬ ৬ ধারা যা ১৯৭৮ সালে বিলুপ্ত করা হয়)। সংবিধানে একটি স্বাধীন নিরপেক্ষ বিচার বিভাগ প্রতিষ্ঠা বিষয়ে বলা হয় যে,'মুক্ত ও স্বাধীন একটি বিচার বিভাগ গঠনের লক্ষ্যে' 'সংবিধানের বিধানাবলি সাপেক্ষে প্রধান বিচারপতি এবং অন্যান্য বিচারপতিগণ স্বাধীন অবস্থায় থেকে বিচারকার্য পরিচালনা করবেন' (অনুচ্ছেদ ৯৪ (৪)। সংবিধানে নির্বাচন কমিশন, মহাহিসাব নিরীক্ষক, পাবলিক সার্ভিস কমিশন গঠন, ন্যায়পাল নিয়োগ প্রভৃতি বিষয়ে বিধান করা হয়।

১৯৭২-৭৫ সময়কালে আওয়ামী লীগ সরকারের শাসনকালে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য সাফল্য ছিল বাংলাদেশের জন্য একটি সংবিধান প্রণয়ন করা। সংবিধান বিষয়ে মওদুদ আহমদের মন্তব্য এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে:

> মাত্র এক বছরের মধ্যে সংবিধান প্রণয়নের জন্য আওয়ামী লীগকে প্রশংসা না করে পারা যায় না। এটি ছিল একটি ব্যাপক, সুলিখিত দলিল এবং এই উপমহাদেশের অন্যান্য সংবিধানের তুলনায় উন্নত মানের। কোনো কোনো ক্ষেত্রে দ্বন্দ্ব এবং দুর্বলতা থাকলেও এই সংবিধান জনগণের তৎকালীন আশা আকাঙ্ক্ষা বহুলভাবে প্রতিফলিত করেছিলো। সুদীর্ঘ-কালীন সংগ্রামে আওয়ামী লীগ জাতির সামনে যে অসংখ্য প্রতিশ্রুতি তুলে ধরেছিলো, এই সংবিধানের মাধ্যমে সেগুলো এক বিরাট অংশের বাস্তবায়ন ঘটানোর প্রচেষ্টা চালানো হয়েছে।

সংবিধানের সংশোধনী

আওয়ামী লীগ শাসনামলে (১২.১.১৯৭২—১৪.৮.৭৫) ১৯৭২ সালের সংবিধানকে ৪ বার সংশোধন করা হয়। প্রথম সংশোধনী গৃহীত হয় ১৯৭৩ সালের ১৫

www.Educationblog24.Com

জুলাই। যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের লক্ষ্যে সংবিধানের ৪৭নং অনুচ্ছেদে সংশোধনী আনা হয়। সংবিধানের ৪৭ নং অনুচ্ছেদের সঙ্গে নিম্নরূপভাবে ৪৭-ক অনুচ্ছেদ সংযোজিত হয় :

> এই সংবিধানে যাহা বলা হইয়াছে, তাহা সত্ত্বেও গণত্যাজনিত অপরাধ, মানবতা বিরোধী আপরাধ বা যুদ্ধাপরাধ এবং আন্তর্জাতিক আইনের অধীন অন্যান্য অপরাধের জন্য কোন সশস্ত্রবাহিনী বা প্রতিরক্ষা বাহিনী বা সহায়ক বাহিনী সদস্য কিংবা যুদ্ধবন্দীকে আটক, ফৌজদারিতে সোপর্দ কিংবা দ দান করিবার বিধান সংবলিত কোন আইন বা আইনের বিধান এই সংবিধানের কোন বিধানের সহিত অসামঞ্জস্য বা তাহার পরিপন্থী, এই কারণে বাতিল বা বেআইনী বলিয়া গণ্য হইবে না কিংবা কখনও বাতিল বা বেআইনী হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে না।'

সংবিধানের দ্বিতীয় সংশোধনী গৃহীত হয় ১৯৭৩ সালের ২২ সেপ্টেম্বর। এই সংশোধনীর মাধ্যমে সংবিধানে জরুরি বিধানাবলি সংযোজিত হয়। সংবিধানে তৃতীয় সংশোধনী গৃহীত হয় ১৯৭৪ সালের ২৮ নভেম্বর। এটি বাংলাদেশের সীমানা সংশোধনী সংক্রান্ত। ১৯৭৪ সালের ১৬ মে দিল্লীতে বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে দু দেশের ভূমি সীমানা সংক্রান্ত যে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় তাই কার্যকর করার উদ্দেশ্যে সংবিধানের তৃতীয় সংশোধনী গৃহীত হয় (অনুচ্ছেদ ২)। সংবিধানের চতুর্থ সংশোধনী আওয়ামী লীগ তথা বঙ্গবন্ধুর শাসনামলের সবচেয়ে সমালোচিত বিষয়। সংশোধনীটি গৃহীত হয় ১৯৭৫ সালের ২৫ জানুয়ারি। এই সংশোধনীতে সংবিধানে সংসদীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার পরিবর্তে রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার ব্যবস্থার প্রবর্তন করা হয়। ফলে মন্ত্রীপরিষদ ও জাতীয় সংসদ ক্ষমতাহীন হয়ে পড়ে। চতুর্থ সংশোধনীর মাধ্যমে বিচার বিভাগকে নির্বাহী বিভাগের নিয়ন্ত্রণে আনা হয়। মূল সংবিধানে প্রদত্ত মৌলিক অধিকার সংক্রান্ত সমস্ত অধিকার রক্ষা ও প্রয়োগের যে সকল ক্ষমতা সুপ্রিম কোর্টকে দেয়া হয়েছিল চতুর্থ সংশোধনীতে তা প্রত্যাহার করে নেয়া হয় এবং মৌলিক অধিকারসমূহ প্রয়োগের জন্য একটি সুপ্রিম সাংবিধানিক আদালত গঠনের বিধান করা হয়। তাছাড়া চতুর্থ সংশোধনীতে হাইকোর্ট কর্তৃক অন্তর্বর্তীকালীন নিষেধাজ্ঞা জারির বিধানও প্রত্যাহার করা হয়। চতুর্থ সংশোধনীর মাধ্যমে দেশে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক একক জাতীয় দল গঠনের ঘোষণা দেয়া এবং অন্যান্য রাজনৈতিক দল বিলুপ্ত করার বিধান প্রণীত হয়।

সংবিধানের চতুর্থ সংশোধনীর যৌক্তিকতা

উপরের আলোচনায় আমরা দেখেছি যে, ১৯৭২ সালের সংবিধানের চতুর্থ সংশোধনীতে মূল সংবিধানে কাঠামোতে অনেক পরিবর্তন সাধন করা হয়। সংসদীয় সরকার পদ্ধতির পরিবর্তে রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার পদ্ধতির প্রবর্তন, রাষ্ট্রপতির হাতে সমস্ত ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত করে মন্ত্রীপরিষদ ও জাতীয় সংসদকে ক্ষমতাহীন করা, বিচার বিভাগের উপর রাষ্ট্রপতির কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করা, একটি মাত্র রাজনৈতিক দলের সৃষ্টি ইত্যাদিই ছিল চতুর্থ সংশোধনীর মূল বিষয়বস্তু। ১৯৭২-এর সংবিধানের উল্লিখিত পরিবর্তনগুলো ছিল নিঃসন্দেহে অগণতান্ত্রিক প্রকৃতির। স্বভাবতই প্রশ্ন জাগে কেন এই পরিবর্তন?

www.Educationblog24.Com

জাতীয় সংসদে চতুর্থ সংশোধনী গৃহীত হওয়ার অব্যবহিত পরেই বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ঐ পরিবর্তনের অপরিহার্যতা সম্পর্কে বিস্তারিত ব্যাখ্যা প্রদান করেন। তিনি এই মর্মে মন্তব্য করেন যে, দেশের অর্থনৈতিক মুক্তি, শোষণহীন সমাজব্যবস্থা, শোষিতের সমাজতন্ত্র ও গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার মহৎ লক্ষ্য অর্জনের জন্য সংবিধানের চতুর্থ সংশোধনী অনিবার্য হয়েছিল। দেশের বিরাজমান নৈরাজ্যকর অবস্থার অবসান ঘটানো, জনগণের জানমালের পূর্ণ নিরাপত্তা বিধান করা ও সকল শোষণ-অবিচার নির্যাতন দূর করার জন্যই সংবিধানের মৌলিক পরিবর্তন সাধন করতে তিনি বাধ্য হয়েছেন।

এ প্রসঙ্গে মওদুদ আহমদ চতুর্থ সংশোধনীর অপরিহার্যতা বিষয়ে কিছু যুক্তি উপস্থাপন করেছেন। যেমন:

১. ব্রিটিশদের রেখে যাওয়া বিদ্যমান আমলাতান্ত্রিক প্রশাসন পদ্ধতি। সবসময় তিনি প্রশাসনের সংস্কারমুখী পরিবর্তন সাধনের পক্ষপাতী ছিলেন;

২. ক্রমবর্ধমান রাজনৈতিক গুপ্তহত্যা যা ইতিমধ্যেই সংসদের ৪ জন আওয়ামী লীগ প্রতিনিধিসহ দলের অসংখ্য নেতাকর্মীর প্রাণহানির কারণ হয়েছিল;

৩. গুপ্তহত্যা, অর্থনীতির ব্যাপক ধ্বংসসাধন, ধ্বংসমূলক তৎপরতা ও বাংলাদেশের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের ব্যাপারে দালালদের কথিত ভূমিকা;

৪. জাসদসহ দেশের বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও গুপ্ত বিপ্লবী সংগঠনগুলোর ভূমিকা এবং তাদের বিধ্বংসী তৎপরতা;

৫. গোষ্ঠীবিশেষের হাতে আগ্নেয়াস্ত্রের অবস্থিতি এবং সরকারবিরোধী কাজে তা ব্যবহারের অব্যাহত প্রবণতা;

৬. দুর্যোগময় অর্থনৈতিক পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে দেশে দুর্ভিক্ষের মরণাঘাত, খাদ্যাভাব এবং বৈদেশিক সাহায্যের ওপর ক্রমবর্ধমান নির্ভরশীলতা;

৭. শিক্ষিত শ্রেণীই ছিল দেশের সবচাইতে সুবিধাভোগী শ্রেণী এবং তারাই ছিল সমাজের মূল শোষক। জনগণের শ্রমলব্ধ অর্থে সুশিক্ষিত হয়েও তারা জনকল্যাণের লক্ষ্যে সেই প্রাপ্ত শিক্ষা ব্যবস্থাতে নিদারুণভাবে উদাসীন ছিলেন, সর্বোপরি ব্যাপ্ত দুর্নীতির সাথে দেশের দরিদ্র জনগণ জড়িত ছিলেন না অথচ তার মতে দেশের ৫০% জনগোষ্ঠী শিক্ষিত শ্রেণীই ছিলো সমস্ত দুর্নীতির ধারক ও বাহক;

৮. প্রশাসন, শিল্প এবং শিক্ষাব্যবস্থার ক্রমবর্ধমান বিশৃঙ্খলা;

৯. বিদ্যমান বিচার ব্যবস্থা ছিলো উপনিবেশবাদী ধারার বাহক এবং জনগণের প্রয়োজন মেটানোর লক্ষ্যে তার সংস্কারমুখী পরিবর্তন ছিলো অপরিহার্য;

১০. মুষ্টিমেয় শ্রেণীর মাধ্যমে ব্যাপক জনগোষ্ঠীর ওপর অব্যাহত শোষণ; এবং

১১. চোরাচালান, অবৈধ মজুদদারি ও কালোবাজারির ক্রমবর্ধমান প্রবণতা।

সমাজের বুকে বিদ্যমান এসব দুষ্টক্ষত নিরাময়ের জন্যই শেখ মুজিব প্রশাসনিক পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন। বিদ্যমান শাসন ব্যবস্থা দিয়ে পরিস্থিতির নিয়ন্ত্রণ সম্ভব হচ্ছিল না বিধায় শেখ মুজিব জনগণের ঐক্যবদ্ধতা এবং অর্থনৈতিক ব্যবস্থার সামগ্রিক পরিবর্তন সাধন করে তাঁর স্বপ্নের 'সোনার বাংলা'র

www.Educationblog24.Com

বাস্তবায়ন করতে চেয়েছিলেন। অতএব বলা যায় যে, সময়ের বিচারে সংবিধানের চতুর্থ সংশোধনীকে যুক্তিযুক্ত বলা যায়। কিন্তু এর পুরোপুরি বাস্তবায়ন ও ফলাফল প্রাপ্তির পূর্বেই শেখ মুজিবকে হত্যা করা হয়। তাই চতুর্থ সংশোধনীর ফলাফল বিষয়ে কোনরূপ মন্তব্য করা সম্ভব নয়।

আইন প্রণয়ন

বঙ্গবন্ধু সরকার বিরাজমান বিভিন্ন সমস্যা মোকাবেলা করার জন্য সরকার গঠনের প্রথম এক বছরেই প্রায় দেড়শ আইন প্রণয়ন করে। উল্লেখযোগ্য আইনগুলো নিচে আলোচনা করা হলো:

পরিত্যক্ত সম্পত্তি দখলীকরণ আইন

মুক্তিযুদ্ধে বাংলাদেশের বিজয় নিশ্চিত হবার পর অসংখ্য শিল্প ও বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানের অবাঙালি মালিকগণ দেশ ত্যাগ করলে সেগুলোর নিয়ন্ত্রণ ও ব্যবস্থাপনার দখল সংক্রান্ত এই আইনটি ১৯৭২ সালের ৩ জানুয়ারি প্রণীত হয়। এটি ১৯৭২ সালের ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রপতির ১নং আদেশ (APO-1) নামে পরিচিত। এই আইনের বিষয়বস্তু ছিল নিম্নরূপ: [৮]

(১) যে সমস্ত প্রতিষ্ঠানের মালিক, পরিচালকম লী অথবা ব্যবস্থাপকবৃন্দ কিংবা তাদের অধিকাংশ বাংলাদেশ পরিত্যাগ করছেন কিংবা প্রতিষ্ঠান চালানোর জন্য উপস্থিত নেই, সরকার সে সকল প্রতিষ্ঠানের নিয়ন্ত্রণ ও ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব গ্রহণ করবেন;

(২) এ সমস্ত প্রতিষ্ঠানের পরিচালনার ভার এবং এগুলোর হিসাবরক্ষণের দায়িত্ব সরকার মনোনীত ব্যবস্থাপকমণ্ডলী অথবা প্রশাসকদের হাতে কিংবা অন্যান্য কর্তৃপক্ষের হাতে ন্যস্ত থাকবে;

(৩) ১৯৭২ সালের ২রা ফেব্রুয়ারি জারিকৃত রাষ্ট্রপতির ১৬ নং-আদেশ (PO 16)-এর মাধ্যমে পরিত্যক্ত সম্পত্তি শুধু দখল নয়, তার বিক্রয়ের অধিকারও সরকারের হাতে ন্যস্ত হয়;

(৪) পরিত্যক্ত সম্পত্তির কাছে কোন প্রতিষ্ঠানের ঋণ পাওনা থাকলে সে বিষয়ে সরকারের হিসাব চূড়ান্ত বলে গণ হবে;

(৫) PO 16-এর মাধ্যমে সরকার ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চের পর সম্পাদিত সম্পত্তির যেকোন ইজারা বা চুক্তি অযোগ্য বলে বিবেচিত করতে পারতেন;

(৬) সরকারের হাতে কোন পরিত্যক্ত সম্পত্তির দখলিস্বত্ব যাওয়ার পর আদালত এ ব্যাপারে কোন নিষেধাজ্ঞা জারি করতে পারবে না;

(৭) সরকার ভুলক্রমে কোন সম্পত্তি পরিত্যক্ত সম্পত্তি হিসেবে দখল করে থাকলে, ক্ষতিগ্রস্ত লোকদের প্রতিকার বিধানের ব্যবস্থা PO 16 তে রাখা হয়।

(৮) PO 16-এর মাধ্যমে 'শুধুমাত্র পাকিস্তানীদের পরিত্যক্ত সম্পত্তির উপরই নয়, দেশের নাগরিকদের যে কোন সম্পত্তি দখল করার ব্যাপারেও সরকারকে অনন্য সাধারণ ক্ষমতা প্রদান করা হয়'।

মুক্তিযুদ্ধে বিজয়ের অব্যবহিত পূর্বে 'পাকিস্তানীরা ২৮৮.৬০ কোটি টাকা মূল্যের ৭২৫টি শিল্প ইউনিট পরিত্যক্ত রেখে পালিয়ে যান'। এগুলো ছিল বাংলাদেশের আধুনিক

www.Educationblog24.Com

শিল্পসমূহের মোট অংশের ৪৭% এবং বেসরকারি খাতের মোট শিল্পের ৩১%। এর অন্তর্ভুক্ত ছিল ৬টি বাণিজ্যিক ব্যাংক যেগুলো এ অঞ্চলের মোট ডিপোজিটের ৭০% নিয়ন্ত্রণ করতো'। APO 1-এবং PO 16-এর মাধ্যমে সরকার পরিত্যক্ত সম্পত্তিগুলোর 'মালিকানা স্বহস্তে গ্রহণের মাধ্যমে সেগুলো লুটপাটের হাত থেকে বহুলাংশে রক্ষা করতে সক্ষম হয়। আমলাতন্ত্রের দুর্বলতার সুযোগে কিছু সম্পত্তি লুটপাট হয়েছে, কিছু ক্ষেত্রে মালিক উপস্থিত থাকা সত্ত্বেও কেবল অবাঙালি হওয়ার কারণে তার সম্পত্তি পরিত্যক্ত ঘোষণা করে সরকারি মালিকানায় বা ব্যক্তিনামে দখল করা হয়েছে।

বাংলাদেশ দালাল অধ্যাদেশ, ১৯৭২

একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের সময় পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর দুঃসহ নির্যাতন, গণহত্যা, নারী নির্যাতন, লুটপাট, গৃহে অগ্নিসংযোগ এবং অন্যান্য দুষ্কর্মে সহযোগিতা করার জন্য রাজাকার ও আলবদর বাহিনী গঠন করা হয়েছিল। সারাদেশে গ্রাম পর্যায় পর্যন্ত গঠিত হয়েছিল 'পিস কমিটি'-যার সদস্যরা 'দালাল' নামে পরিচিত। এদের বিচার করার উদ্দেশ্যে ১৯৭২ সালের ১ জানুয়ারি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত মন্ত্রিসভার বৈঠকে গণহত্যা তদন্ত কমিশন গঠনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। 'এতে বলা হয়, হাইকোর্টের কর্মরত কিংবা অবসরপ্রাপ্ত কিংবা সমপর্যায়ের মনোনীত কোনও ব্যক্তির নেতৃত্বে এই কমিশন গঠিত হবে, যার কাজ হবে পাকিস্তানি সশস্ত্র বাহিনী ও তাদের সহযোগীদের দ্বারা ক্ষতিগ্রস্তদের সাক্ষাৎকার গ্রহণের ভিত্তিতে প্রতিবেদন প্রণয়ন করা'। এভাবেই দালালদের বিচারের উদ্যোগের সূচনা ঘটে।

বঙ্গবন্ধু স্বদেশ ফিরেই ঘোষণা করেছিলেন: 'বিশ্বকে মানব ইতিহাসের জঘন্যতম কুকীর্তির তদন্ত অবশ্যই করতে হবে।' '১৮ জানুয়ারী (১৯৭২) প্রখ্যাত সাংবাদিক ডেভিড ফ্রস্টকে (পরবর্তীতে স্যার) দেয়া এক সাক্ষাৎকারে বঙ্গবন্ধু যুদ্ধাপরাধী রাজাকার আলবদরদের বিচার প্রসঙ্গে বলেছিলেন: 'আমি সবসময় ক্ষমা এবং ভুলে যাওয়ায় বিশ্বাস করি। কিন্তু ক্ষমা করা এবং ভুলে যাওয়া এখন আমার পক্ষে অসম্ভব, কারণ, এগুলো ঠাণ্ডা মাথার এবং পরিকল্পিত ধরনের হত্যা, আমার মানুষের উপর গণহত্যা। আপনি কি মনে করেন কোন মানুষ এগুলো মেনে নিতে পারে? এই লোকগুলোকে শাস্তি দিতেই হবে। এ ব্যাপারে কোন প্রশ্ন নেই'।

অতএব বলা যায়, দালালদের বিচার প্রসঙ্গ বঙ্গবন্ধুর কাছে অত্যন্ত গুরুত্ব লাভ করেছিল। তাই শাসনভার গ্রহণের ২ সপ্তাহের মধ্যেই বঙ্গবন্ধু ২৪.১.১৯৭২ তারিখে জারি করেন 'বাংলাদেশ দালাল (বিশেষ ট্রাইবুনাল) অধ্যাদেশ, ১৯৭২'। এই আদেশ জারির প্রয়োজনীয়তা প্রসঙ্গে অধ্যাদেশের প্রস্তাবনায় নিম্নরূপ কারণ ও যুক্তি উপস্থাপন করা হয়েছিল :

> কতিপয় ব্যক্তি অথবা কোন সংগঠন বিশেষের সদস্যগণ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে পাকিস্তান সশস্ত্র বাহিনীর দালালরূপে গণহত্যা, নির্যাতন, নারী ও শিশু নিধন ও বাংলাদেশের জনগণের সম্পত্তি ও সম্মান হরণের জন্য পাক বাহিনীকে সাহায্য করেছেন। এ ধরনের ব্যক্তিরা তাদের ঘৃণ্য তৎপরতা দিয়ে বাংলাদেশে একটি সন্ত্রাসের

www.Educationblog24.Com

রাজত্ব কায়েম করেছিলেন এবং মানবতার বিরুদ্ধে তারা এমন জঘন্য অপরাধ করেছেন যে, বাংলাদেশের জনগণ এবং বিশ্ব বিবেকের কাছে তা জঘন্যতম তৎপরতা হিসেবে পরিচিহ্নিত হয়েছে। সে জন্যই তাদের কার্যধারার যথাযথ এবং কার্যকর প্রতিবিধান এবং তাদের তৎপরতা অনুসারে আইনের ভিত্তিতে শাস্তি প্রদান করা একটি অবশ্য পালনীয় বিষয় হিসেবেই পরিগণিত হয়েছে।

আইনে কোনো ব্যক্তিবিশেষকে দালাল হিসেবে চিহ্নিত করার জন্য নিম্নলিখিত কারণগুলো চিহ্নিত করা হয় :

(১) যাঁরা বাংলাদেশে অবস্থানরত হানাদার বাহিনীকে তাদের অবৈধ অবস্থানে সহায়তা, সমর্থন, সংরক্ষণ এবং জোরদার করণে সাহায্য করেছেন: (২) যাঁরা তাদের প্রতিশ্রুতি, আকার-ইঙ্গিত বা আচরণের মাধ্যমে হানাদার বাহিনীকে যেকোনোভাবে বৈষয়িক সহায়তা দিয়েছেন; (৩) যাঁরা গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের জনগণের বিরুদ্ধে যুদ্ধরত হয়েছেন অথবা যুদ্ধে রত হতে সহায়তা করেছেন; (৪) যারা পাক-হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে সংগ্রামরত বাংলাদেশের জনগণের কোনো প্রচেষ্টা প্রতিহত কিংবা ধবংস করেছেন; এবং (৫) যাঁরা পাক হানাদার বাহিনীকে বাংলাদেশে তাঁদের অবৈধ অবস্থান সুদৃঢ়করণে সহায়তা করতে গিয়ে গণবিজ্ঞপ্তি দিয়েছেন কিংবা দেশের অভ্যন্তরে বা বাইরে স্বেচ্ছাপ্রণোদিতভাবে অপপ্রচার করেছেন কিংবা হানাদার বাহিনীর কোনো প্রতিনিধিদলে প্রতিনিধত্ব করেছেন বা বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের জন্যে পরিচালিত উপনির্বাচনে অংশ গ্রহণ করেছেন।

মূল আইনের অপরাধের সংখ্যা ৬০টি নির্ধারণ করা হয়েছিল। ১৯৭২ সালের জুন মাসে প্রণীত সংশোধনীতে অপরাধের সংখ্যা বাড়িয়ে ৬৯টি স্থির করা হয়। এই ৬৯টি অভিযোগের যে কোন অপরাধের সঙ্গে জড়িত যে কোনো ব্যক্তিকে 'দালাল বলে যুক্তিসঙ্গতভাবে সন্দেহ করা হলে যে কোনো পুলিশ অফিসার কিংবা সরকার কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত যে কোনো ব্যক্তি তাকে বিনা ওয়ারেন্টে গ্রেফতার করতে পারতেন'। এভাবে গ্রেফতারকৃত ব্যক্তিকে ছয়মাস অন্তরীণ রাখা যেত। প্রয়োজনে এই সময়সীমা আরো বাড়ানো যেত। এই আইন প্রণয়নের পূর্বে দালাল সন্দেহে আটককৃত ব্যক্তিদেরকেও এই আইনের আওতায় আনা হয়। প্রথমে মহকুমা ম্যাজিস্ট্রেটের হাতে বিচারের ক্ষমতা প্রদান করা হয়। পরে নির্দিষ্ট অপরাধের বিচার করার জন্য সেশন জজ বা অতিরিক্ত সেশন জজ, বা সহকারী সেশন জজ দ্বারা গঠিত এক সদস্যের বিশেষ ট্রাইবুনাল গঠন করা হয়। পরবর্তী কালে দালাল আইনের এক সংশোধনীবলে বিশেষ ম্যাজিস্ট্রেট ট্রাইবুনাল গঠন করা হয়। পলাতক দালালদের অনুপস্থিতিতেই বিচার পরিচালনার বিধান করা হয়। কোনো দালালের অপরাধ প্রমাণের জন্য আইনে (সংশোধনী ১০ (ক)) নিম্নরূপ বিধান করা হয়:

কোন ময়নাতদন্ত রিপোর্ট, মেডিকেল রিপোর্ট কিংবা রাসায়নিক পরীক্ষার অন্য কোনো রিপোর্ট পাওয়া না গেলে, কিংবা পুলিশের কাছে কোনো অভিযোগ দায়ের করা না হলে, কিংবা তা বিলম্বে করা হলে, অথবা মৃতদেহের কোনো খোঁজ পাওয়া না গেলেও, কোনো অপরাধ প্রমাণের অযোগ্য বলে বিবেচিত করা হবে না। হানাদার বাহিনীকে সহায়তা প্রদান সংক্রান্ত কোনো দলিল যথাযোগ্য প্রমাণ সহকারে আদালতে পেশ করা

www.Educationblog24.Com

হলে এবং এ বিষয়ে কোনো প্রতিবাদ উত্থাপন না করা হলে, সেসমস্ত দলিল গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত করা হয়। বিশেষ করে: আল-বদর, আল-শামস বা রাজাকারবাহিনীর লোকদের বিচার করার সময়ে এ অনুচ্ছেদ ব্যবহার করা হতো।

দালাল আইনের আওতায় সারাদেশে ৭৩টি বিশেষ ট্রাইবুনাল গঠন করা হয়। এই আইনে অভিযুক্ত ব্যক্তির সাজা ছিল মৃত্যুদণ্ড থেকে শুরু করে কমপক্ষে তিন বছরের কারাদণ্ড প্রদান। এ আইন সম্পর্কে মওদুদ আহমদের মূল্যায়ন নিম্নরূপ :

> এই আইনের প্রতিটি বিধানই ছিল অত্যন্ত স্বচ্ছ এবং সেকারণে উচ্চতর আদালতগুলো অনেকগুলো ক্ষেত্রে দালাল আইনে গ্রেফতারকৃত ও অভ্যন্তরীণ ব্যক্তিকে জামিন প্রদানে অস্বীকার করে। এ ব্যাপারে সুপ্রীম কোর্টের আপীলেট ডিভিশনের মতামত হলো, আইনের ১৪ নং অনুচ্ছেদ বলে হাইকোর্ট দালাল আইনে অভিযুক্ত কাউকে জামিন প্রদান করতে পারে না, কারণ আইনে বর্ণিত বিধানগুলো ছিলো অত্যন্ত পরিষ্কার এবং অ-বিতর্কিত।

দালাল আইনের প্রতি জনগণের প্রতিক্রিয়া ও এ আইনের প্রভাব সম্পর্কে মওদুদ আহমদ লিখেছেন:

> সারা জাতির এক উত্তেজনা মুহূর্তে দালাল আদেশ জারী করা হয়। প্রথম মুহূর্তে জনগণের বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ এই আইনকে স্বাগত জানায়। কারণ জনগণ স্বভাবতই দালালদের শাস্তি কামনা করেছিলেন। অন্যদিকে দালাল এবং অবাঙালিদের ন্যায় দালালীর অভিযোগে অভিযুক্ত ব্যক্তিদের জন্যও এই আইন যথেষ্ট আশীর্বাদ বহন করে আনে। এই আইন উত্তেজিত জনগণের ক্রোধ ও প্রতিহিংসা থেকে তাদের রক্ষা করে ... এই আইন যত নমনীয় কিংবা অনমনীয়ই হোক না কেন, 'আইনের মাধ্যমে সুবিচারের প্রক্রিয়া অবশ্যই ছিল আইনশূন্যতার চাইতে অনেক উত্তম'।

মওদুদ আহমদ-এর হিসাব মতে দালাল আইনে গ্রেফতারকৃত ব্যক্তির আনুমানিক সংখ্যা ছিল ৫০ থেকে ৬০ হাজার এবং সমান সংখ্যক ব্যক্তি পলাতক ছিলেন বলে ধরণা করা হয়। অন্য আরেক হিসেব মতে ২৪.০১.৭২ থেকে ৩০.১১.৭৩ পর্যন্ত ৩৭,৪৭১ জন দালাল গ্রেফতার করা হয়। এ সময় ৭৫২জন দালাল দণ্ডিত হয়।

দালালদের বিচার প্রক্রিয়া শুরু হলে বঙ্গবন্ধু অভ্যন্তরীণ চাপের সম্মুখীন হন। অনেক মুক্তিযোদ্ধার আত্মীয় ছিল দালাল। এদের মুক্তির জন্য প্রচণ্ড তদবির শুরু হয়। তাছাড়া সে সময় পাকিস্তানে প্রায় সাড়ে চার লক্ষ বাঙালি (১,৬০,০০০ সরকারি কর্মচারী, ৩৩,০০০ সেনাবাহিনীর সদস্য) আটকা পড়েছিল, তাদেরকে ফিরিয়ে আনার জন্য বঙ্গবন্ধুর উপর প্রচণ্ড চাপ আসতে থাকে। পরিস্থিতি এমন দাঁড়ায় যে, প্রয়োজনে দালালদের মুক্তি দিয়ে হলেও পাকিস্তানে আটকে পড়া বাঙালিদের ফিরিয়ে আনতে হবে। এমনি পরিস্থিতিতে বঙ্গবন্ধু ৩০.১১.৭৩ তারিখে সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করেন। তবে ধর্ষণ, খুন, খুনের চেষ্টা, ঘরবাড়ি অথবা জাহাজে অগ্নিসংযোগের দায়ে দণ্ডিত অভিযুক্ত ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে সাধারণ ক্ষমা প্রযোজ্য হবে না বলে সিদ্ধান্ত হয়। ক্ষমা ঘোষণার পর গ্রেফতারকৃত ৩৭,০০০ ব্যক্তির মধ্যে ২৬,০০০ মুক্তি পেলেও ১১,০০০ ব্যক্তি নির্দিষ্ট অপরাধে কারাগারে আটক ছিল যাদেরকে ছেড়ে দিয়েছিলেন জেনারেল জিয়াউর রহমান। "১৯৭৫-এর ৩১ ডিসেম্বর জিয়াউর রহমান দালাল আইন বাতিল

www.Educationblog24.com

www.Educationblog24.com

করেন ordinance no. 63 of 1975-এর মাধ্যমে। '৭৫-এর ৩১ ডিসেম্বর দ্বিতীয় ঘোষণার মাধ্যমে জেনারেল জিয়ার সামরিক সরকার দালাল আইনের নিরাপত্তা কবজটি ছুঁড়ে ফেলে দেন।'৭৬ সালেই জিয়া সংবিধানের ৩৮ নং অনুচ্ছেদ সংশোধন করে ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক দল করার উপর নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করেন। একই সঙ্গে জিয়া একাত্তরের ঘাতক দালালদের ভোটার হওয়ার সুযোগ করে দেন। যেসব শীর্ষ স্থানীয় দালাল, রাজাকার, আলবদরদের নাগরিকত্ব বাতিল করা হয়েছিল তাদের জন্য '৭৬-এর জানুয়ারি স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সার্কুলার জারী করে যাতে বলা হয় এসব ব্যক্তি নাগরিকত্ব ফেরত পাওয়ার জন্য মামলা করতে পারে"।

গ. যুদ্ধ বিধ্বস্ত দেশ পুনর্গঠন

পুনর্বাসন পদক্ষেপ

পুনর্বাসনের বিশাল দায়িত্ব কাঁধে নিয়ে বঙ্গবন্ধু শাসনকার্য শুরু করেছিলেন। ভারতে আশ্রয়গ্রহণকারী প্রায় এককোটি শরণার্থীকে পুনর্বাসন করা, দেশের অভ্যন্তরে প্রায় ৪৩ লক্ষ বিধ্বস্ত বাসগৃহ পুনর্নির্মাণ করা এবং এদেরকে খাদ্যসহ অন্যান্য নিত্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী সরবরাহ করা ছিল সরকারের বিরাট দায়িত্ব। সেসময় প্রশাসনিক কাঠামো ভেঙে পড়েছিল। স্থানীয় পরিষদগুলো ছিল পাকিস্তানপন্থীদের দখলে। নতুন সরকার প্রচুর পরিমাণ আন্তর্জাতিক ত্রাণ সামগ্রী লাভ করলেও সেগুলির সুষ্ঠু বিতরণ করা বিদ্যমান প্রশাসনিক কাঠামো দিয়ে অসম্ভব ছিল। এমনি পরিস্থিতিতে সরকার রেডক্রস সোসাইটিকে জাতীয় পর্যায় থেকে নিম্নতর স্তর পর্যন্ত পুনর্গঠিত করেন। পাশাপাশি গ্রাম থেকে শুরু করে জেলা পর্যায় পর্যন্ত ত্রাণ কমিটি গঠনের রূপরেখা প্রণয়ন করা হয় (৯.১.১৯৭২)। গ্রামের আয়তন ও লোকসংখ্যার ভিত্তিতে ৫ থেকে ১০ সদস্যের 'ত্রাণ ও পুনর্বাসন কমিটি' গঠন করা হয়। আওয়ামীলীগপন্থী স্থানীয় নেতৃবৃন্দ, শিক্ষক, মুক্তিযোদ্ধা সমন্বয়ে গ্রাম পর্যায়ে 'ত্রাণ কমিটি' গঠিত হয়। এভাবে ইউনিয়ন থানা ও জেলা ত্রাণ কমিটি গঠন করা হয়। কমিটির সদস্য ও চেয়ারম্যান নিয়োগে প্রাদেশিক ও জাতীয় পরিষদের নির্বাচিত সদস্যরা মুখ্য ভূমিকা পালন করেন। কমিটিগুলোর মাধ্যমে সারাদেশে ত্রাণ সামগ্রী বিতরণ করা হয়। ইউনিয়ন পরিষদগুলোর চেয়ারম্যান ও সদস্যরা পাকিস্তান আমলে নির্বাচিত হয়েছিলেন—এই যুক্তিতে ১৯৭২ সালের ১ জানুয়ারি দেশের সব স্থানীয় পরিষদ ভেঙে দেওয়া হয়। ফলে ত্রাণ কমিটিগুলো আরো শক্তিশালী হয়ে ওঠে। স্বভাবতই অনেক স্থানে ত্রাণ কমিটির সদস্যরা দুর্নীতিতে জড়িয়ে পড়েন এর ফলে আওয়ামী লীগের দুর্নাম হয়। ১৯৭৩ সালের ৪ মার্চ সংবাদপত্রসমূহে প্রকাশিত আওয়ামী লীগের ক্রোড়পত্রে দাবি করা হয় যে ঐ সময় পর্যন্ত সরকার ধ্বংসপ্রাপ্ত প্রায় ৯ লক্ষ ঘরবাড়ি পুর্নর্নির্মাণ করেছেন। একই সময়ে সামগ্রিক পুনর্বাসন কর্মকাণ্ডে মোট ব্যয় ৭২ কোটি ৭৫ লাখ টাকা।

জাতীয়করণ কর্মসূচি

বঙ্গবন্ধুর সরকার স্বাধীনতার প্রথম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীতে (২৬.০৩.১৯৭২-এ) পাট,

www.Educationblog24.Com

বস্ত্র, চিনিকল, ব্যাংক ও বীমা প্রতিষ্ঠানসমূহ জাতীয়করণের আইন পাশ করে। বাংলাদেশ ব্যাংক (জাতীয়করণ) আদেশের আওতায় সমস্ত শাখাসহ ১২টি ব্যাংকের দখলিস্বত্ত্ব সরকার গ্রহণ করে এবং সেগুলো সমন্বয় করে ৬টি নতুন ব্যাংকে রূপান্তর করে। ৩.১.১৯৭২ তারিখে জারিকৃত ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রপতির ১নং আদেশ (APO 1) এবং ২৮.২.১৯৭২ তারিখে ঘোষিত রাষ্ট্রপতির ১৬নং আদেশ (PO 16)-এর আওতায় অবাঙালি তথা পাকিস্তানি মালিকানার প্রায় ৮৫% শিল্প-কল-কারখানা ও বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান পরিত্যক্ত ঘোষণা করা হয় এবং রাষ্ট্র সেগুলোর মালিকানা এবং দখল গ্রহণ করে। এই 'পরিত্যক্ত সম্পত্তিগুলো' জাতীয়করণ আইনের মাধ্যমে 'রাষ্ট্রায়ত্ত খাত' হিসেবে অভিহিত হয়। পরিত্যক্ত সম্পত্তি আদেশের (PO 16) আওতায় সম্পত্তির মালিকানা ফিরে পাওয়ার জন্য সরকারের কাছে আবেদন করার সুযোগ ছিল কিন্তু জাতীয়করণকৃত সম্পত্তি ফিরে পাওয়ার কোন সুযোগ ছিল না, কাউকে সম্পত্তি ফিরিয়ে দেয়ার ব্যাপারেও সরকারের কোন ক্ষমতা ছিল না। জাতীয়করণ আইনের আওতায় ৬৭টি পাটকল, ৬৪টি বস্ত্রকল এবং ১৫টি চিনিকল জাতীয়করণ করা হয়। জাতীয় বিমান সংস্থা ও জাতীয় শিপিং সংস্থা—যা পূর্বেও সরকারি মালিকানায় ছিল—আনুষ্ঠানিকভাবে রাষ্ট্রায়াত্ত খাতের অধীনে আনা হয়। এভাবে ১৫ কোটি টাকা মূল্যের স্থায়ী সম্পদ বিশিষ্ট পরিত্যক্ত ও অনুপস্থিত মালিকদের শিল্প প্রতিষ্ঠান ও বৈদেশিক বাণিজ্য জাতীয়করণ করা হয়।

জাতীয়করণ কর্মসূচি বঙ্গবন্ধুর সরকার হঠাৎ করেই গ্রহণ করেননি। এটি ছিল সত্তরের নির্বাচনের সময় ঘোষিত আওয়ামী লীগের নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি। তাছাড়া ছাত্রদের ১১ দফা দাবিতেও দেশের পাট, বস্ত্র, চিনিকল ও ব্যাংক-বীমা প্রতিষ্ঠানসমূহ জাতীয়করণের (৫নং দাবী) দাবি অন্তর্ভুক্ত ছিল। এমনকি ১৯৫৪ সালে যুক্তফ্রন্টের দেয়া ঐতিহাসিক ২১-দফা কর্মসূচিতেও পাটশিল্প জাতীয়করণের প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছিল।

যেহেতু জাতীয়করণকৃত সম্পদের পূর্ব মালিকরা প্রায় সকলেই অবাঙালি ছিলেন স্বভাবতই বাঙালিদের পক্ষ থেকে জাতীয়করণ সমর্থন করা হয়। তবে বঙ্গবন্ধুর সরকারের পক্ষে জাতীয়করণ কর্মসূচির সফল বাস্তবায়ন সম্ভব ছিল না। দুর্বল আর্থ-সামাজিক অবকাঠামো এবং জাতীয়করণ পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করার মত রাজনৈতিক শাসনযন্ত্র সরকারের ছিল না। মওদুদ আহমদ আশঙ্কা প্রকাশ করে মন্তব্য করেছেন:

> 'এমনকি ন্যাপ (ভাসানী), ন্যাপ (মোজাফফর) এবং জাসদের মতো সমাজতান্ত্রিক দলগুলোকেও এই আর্থ-সামাজিক অবস্থা এবং সমসাময়িক প্রশাসনিক কাঠামোতে এ ধরনের পরিকল্পনা বাস্তবায়নের সুযোগ দিলে তারা কতটুকু সফলকাম হতো, সে নিয়েও সন্দেহের যথেষ্ট অবকাশ রয়েছে'।

কৃষি সংস্কার

বঙ্গবন্ধু কর্তৃক শাসনভার গ্রহণের সময় শতকরা ৮৫ ভাগ লোক কৃষির উপর নির্ভরশীল ছিল। জাতীয় আয়ের অর্ধেকেরও বেশি ছিল কৃষিখাত নির্ভর। বঙ্গবন্ধু জানতেন যে কৃষিপণ্য উৎপাদন বৃদ্ধি করতে না পারলে দেশের অর্থনৈতিক মেরুদণ্ড

www.Educationblog24.Com

সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারবে না। এজন্য তিনি সুবজ বিপ্লবের ডাক দিয়েছিলেন। 'কৃষক বাঁচলে দেশ বাঁচবে'-এ শ্লোগানকে শুধু শ্লোগান হিসেবেই ব্যবহার করেনি বঙ্গবন্ধু নেতৃত্বাধীন সরকার। মুক্তিযুদ্ধের পর ২২ লক্ষেরও বেশি কৃষক পরিবারকে পুনর্বাসন করার দায়িত্ব বর্তেছিল। সে দায়িত্ব দক্ষতার সাথেই পালন করেছিল বঙ্গবন্ধুর সরকার। 'এই পুনবার্সন ছিল সত্যিকার অর্থেই পুনর্বাসন। শুধু বসতবাড়ির জন্য কয়েকটি টিন কিংবা একটি লাঙ্গল কেনার টাকা দিয়ে দায়সারাভাবে কাজ সারা হয়নি। তাদের কৃষিযন্ত্রপাতি ও অন্যান্য কৃষিবিষয়ক মৌলিক কাঠামো নির্মাণে সহায়তাদানের পাশাপাশি নামমাত্র মূল্যে কিংবা কোন কোন ক্ষেত্রে বিনামূল্যে কৃষি উপকরণ, বীজ, সার, কীটনাশক সরবরাহ করেছিল'। কৃষি ক্ষেত্রে বঙ্গবন্ধুর সংস্কার নিম্নে আলোচনা করা হলো:

(১) জমির সমস্ত বকেয়া খাজনা মওকুফসহ ২৫ বিঘা পর্যন্ত জমির খাজনা মওকুফ করেন (২৬.৩.১৯৭২);

(২) পরিবার পিছু সর্বাধিক ১০০ বিঘা পর্যন্ত জমির মালিকানা সিলিং নির্ধারণ করেন;

(৩) দখলদার পাকিস্তানি শাসনামলে রুজু করা ১০ লক্ষ সার্টিফিকেট মামলা থেকে ঋণী কৃষককে মুক্তি দেয়া হয় এবং তাঁদের সকল বকেয়া ঋণ সুদসহ মাফ করে দেয়া হয়;

(৪) ১৯৭২ সালের শেষ নাগাদ সারাদেশে হ্রাসকৃতমূল্যে ৪০ হাজার শক্তিচালিত লো-লিফট পাম্প, ২৯০০ গভীর নলকূপ ও ৩০০০ অগভীর নলকূপের ব্যবস্থা করা হয়। এর ফলে সেচের আওতাধীন জমির পরিমাণ ১৯৬৮-৬৯ সালের তুলনায় ১৯৭৪-৭৫ সনে এক তৃতীয়াংশ বৃদ্ধি পেয়ে ৩৬ লক্ষ একরে উন্নীত হয়। সেচ সুবিধে বৃদ্ধির পাশাপাশি কৃষকদের মধ্যে ১৯৭২ সালেই কেবল মাত্র অধিক ফলনশীল ১৬,১২৫টন ধানবীজ, ৪৫৪ টন পাট বীজ এবং ১,০৩৭ টন গম বীজ বিতরণ করা হয়। পাশাপাশি সারের দাম বিশ্ববাজারের চেয়ে হ্রাসকৃত মূল্যে সরবরাহের ব্যবস্থা করা হয়। ১৯৭২ সালে ইউরিয়া, পটাশ ও টিএসপি সারের মূল্য মণ প্রতি ছিল যথাক্রমে ২০ টাকা, ১৫ টাকা ও ১০ টাকা। ফলে ১৯৬৯–৭০ সালের তুলনায় ১৯৭৩–৭৪ সনে রাসায়নিক সারের ব্যবহার গড়ে ৭০ শতাংশ, কীটনাশক ৪০ শতাংশ, উন্নত বীজ ২৫ শতাংশ বৃদ্ধি পায়।

(৫) ধান, পাট, তামাক ও আখসহ গুরুত্বপূর্ণ কৃষি পণ্যের ন্যায্য মূল্য প্রাপ্তির লক্ষ্যে এসব পণ্যের ন্যূনতম ন্যায্য বিক্রয়মূল্য ধার্য করে দেয়া হয়;

(৬) কৃষি গবেষণাকেও বঙ্গবন্ধু গুরুত্ব দেন। কৃষি বিষয়ক উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও গবেষণা প্রতিষ্ঠানগুলো পুনর্গঠনের জন্য বিশেষ উদ্যোগ গৃহীত হয়;

(৭) বঙ্গবন্ধু ১৯৭৩ সালের আট মাসের মধ্যে গঙ্গা-কপোতাক্ষ সেচ প্রকল্প পুর্ণোদ্যমে চালুর ব্যবস্থা করেন;

(৮) ফারাক্কা বিষয়ে আলোচনার জন্য বঙ্গবন্ধু বিশিষ্ট পানি বিজ্ঞানী বি এম আব্বাসকে ২১.১.৭২ তারিখে দিল্লী পাঠান এবং শুকনো মওসুমে পদ্মা নদীতে ৫৪,০০০

www.Educationblog24.com

কিউসেক পানি সরবরাহের নিশ্চয়তা লাভ করেন। পরবর্তী কোন সরকারই সে লক্ষ্য মাত্রার ধারে কাছেও যেতে পারেনি;

(৯) সরকারিভাবে খাদ্য মজুদ গড়ে তোলার লক্ষ্যে ১৯৭২ সালের মধ্যেই ১০০টি খাদ্য গুদাম নির্মাণ করা হয়;

(১০) কৃষকদের মধ্যে ১ লক্ষ বলদ ও ৫০ হাজার গাভী এবং ৩০ কোটি টাকার কৃষি ঋণ বিতরণ করা হয়;

কৃষি উন্নয়নে কৃষকদের উদ্বুদ্ধ করার জন্য বঙ্গবন্ধু সরকার জাতীয় পর্যায়ে 'বঙ্গবন্ধু পুরস্কার' নামে কৃষকদের জন্য সর্বশ্রেষ্ঠ পুরস্কার ঘোষণা করেন।

এভাবে কৃষক-দরদি নীতি গ্রহণের ফলে কৃষিক্ষেত্রে অগ্রগতির যে ধারা সূচিত হয় তারই ফলশ্রুতিতে আজ কৃষি ক্ষেত্রে শক্তিশালী ধারা সৃষ্টি হয়েছে।

শিক্ষা সংস্কার

দেশের মানব সম্পদ উন্নয়নের উপর জাতীয় অগ্রগতি নির্ভরশীল। বঙ্গবন্ধু সেই যুদ্ধবিধ্বস্ত পরিবেশেও মানব সম্পদের উন্নতির লক্ষ্যে শিক্ষার বিকাশের উপর জোর দেন। এমনকি ১৯৭২ সালের সংবিধানেও সর্বজনীন শিক্ষা প্রবর্তনের অঙ্গীকার সন্নিবেশিত হয়েছিল:

> (১) একই পদ্ধতির গণমুখী ও সর্বজনীন শিক্ষাব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য এবং আইনের দ্বারা নির্ধারিত স্তর পর্যন্তসকল বালক বালিকাকে অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষাদানের জন্য, (২) সমাজের প্রয়োজনের সহিত শিক্ষাকে সঙ্গতিপূর্ণ করিবার জন্য এবং সেই প্রয়োজন সিদ্ধ করিবার উদ্দেশ্যে যথাযথ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ও সদিচ্ছা প্রণোদিত নাগরিক সৃষ্টির জন্য, (৩) আইনের দ্বারা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে নিরক্ষরতা দূর করিবার জন্য কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন'।

শাসনভার গ্রহণের মাত্র ৬ মাসের মধ্যেই বঙ্গবন্ধু ১৯৭২ সালের ২৬ জুলাই বিশিষ্ট বিজ্ঞানী ড. কুদরত-ই-খুদার নেতৃত্বে বাংলাদেশ শিক্ষা কমিশন নিয়োগ করেন। কুদরত-ই-খুদা কমিশন দেড় বছর কঠোর পরিশ্রম করে ব্যাপক জরিপ ও পর্যালোচনা ভিত্তিক বাংলাদেশের শিক্ষা সংস্কারের একটি দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা প্রণয়ন করে একটি রিপোর্ট ১৯৭৪ সালের ৩০মে সরকারের নিকট দাখিল করেন।

কুদরত-ই-খুদা শিক্ষা কমিশনের মাধ্যমে জাতীয় শিক্ষানীতি ঢেলে সাজানোর উদ্যোগ বঙ্গবন্ধুই নিয়েছিলেন। কমিশন রিপোর্টের অপেক্ষা না করে তিনি কতিপয় জরুরি পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন যেমন :

- মার্চ ৭১ থেকে ডিসেম্বর ৭১ পর্যন্ত সময়কালের ছাত্রদের সকল বকেয়া টিউশন ফি মওকুফ করেন;
- শিক্ষকদের ৯ মাসের বকেয়া বেতন পরিশোধ করেন;
- আর্থিক সংকট থাকা সত্ত্বেও বঙ্গবন্ধু পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত সকল শিক্ষার্থীকে বিনামূল্যে পুস্তক বিতরণ করেন এবং অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষা অবৈতনিক ঘোষণা করেন;
- বঙ্গবন্ধুর যুগান্তকারী পদক্ষেপ হচ্ছে তিনি দেশের সকল প্রাথমিক বিদ্যালয়কে

www.Educationblog24.Com

সরকারিকরণ করেন। এর ফলে ১ লক্ষ ৬৫ হাজার প্রাথমিক শিক্ষকদের চাকরি সরকারি হয়;

- বঙ্গবন্ধুর সরকার ৯০০ কলেজ ভবন ও ৪০০ হাইস্কুল পুনর্নির্মাণ করেন;
- বঙ্গবন্ধুর আরেকটি যুগান্তকারী পদক্ষেপ হচ্ছে জাতীয় সংসদে ১৯৭৩ সালের বিশ্ববিদ্যালয় আইন পাশ করার মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের স্বায়ত্তশাসন প্রদান।'

বঙ্গবন্ধু অফিস-আদালতে বাংলা প্রচলনের কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলেন। সেনাবাহিনীসহ সকল অফিসে বাংলা চালু করা ছিল তাৎপর্যপূর্ণ। বাংলা একাডেমিতে সাঁটলিপি, মুদ্রাক্ষর ও নথি লেখার প্রশিক্ষণ কর্মসূচি চালু করা হয়। জাতিসংঘে বাংলায় ভাষণ দিয়ে তিনি বাংলা ভাষার মর্যাদা বৃদ্ধি করেছিলেন।

কুদরত-ই-খুদা শিক্ষা কমিশনের সারমর্ম নিম্নরূপ

কমিশন প্রস্তাব করেন যে, দেশের জনগণকে জাতীয় কর্মে ও উন্নয়নে গঠনমূলক ভূমিকা রাখার যোগ্য করে তোলার জন্য একটি সার্বজনীন শিক্ষা পদ্ধতি গড়ে তুলতে হবে। . . . এজন্য অন্তত আট বছরের বুনিয়াদী শিক্ষা প্রয়োজন। এ কারণে প্রথম থেকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষাকে প্রাথমিক শিক্ষারূপে গণ্য করে . . . প্রথম থেকে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত যে অবৈতনিক শিক্ষা চালু আছে তাকে ১৯৮০ সালের মধ্যে বাধ্যতামূলক করতে হবে এবং ১৯৮৩ সালের মধ্যে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত এক অভিন্ন ধরনের অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষা প্রবর্তন করতে হবে। প্রয়োজন মতো দরিদ্র পরিবারের সন্তানদের জন্য নৈশ স্কুল চালু করতে হবে . . . মাধ্যমিক স্তর প্রসঙ্গে কমিশনের প্রধান সুপারিশ হল দেশের বাস্তব অবস্থা এবং শিক্ষার্থীদের পরিবেশ ও জীবন পদ্ধতি বিবেচনা করে এই স্তরের শিক্ষায় শিক্ষার্থীদের ভবিষ্যৎ কর্মসংস্থানের সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত করা প্রয়োজন। নবম থেকে দ্বাদশ শ্রেণীর মধ্যে (১৪-১৭ বছর বয়সের) প্রায় সাড়ে চার লাখ শিক্ষার্থী প্রতিবছর পড়াশুনা ত্যাগ করে, কিন্তু জীবিকা অর্জনের সহায়ক কোন শিক্ষা তারা পায় না। কাজেই মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষাকে অধিকাংশ শিক্ষার্থীর জন্য উচ্চ শিক্ষার প্রস্তুতিপর্ব হিসেবে বিবেচনা করা প্রয়োজন। প্রারম্ভিক বৃত্তিমূলক শিক্ষা মোটামুটি একাদশ শ্রেণী পর্যন্ত এবং সাধারণ শিক্ষা দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত বিস্তৃত হবে। এই উদ্দেশ্যে নবম শ্রেণী থেকে শিক্ষাক্রম মূলতঃ দু'ভাগে বিভক্ত হবেঃ বৃত্তিমূলক শিক্ষা ও সাধারণ শিক্ষা। উভয় ধারাতেই নবম ও দশম শ্রেণীতে কয়েকটি বিষয় অবশ্য পাঠ্য থাকবে, এ ছাড়া অন্য কতকগুলো বিষয় শিক্ষার্থীরা স্বনির্বাচিত ধারায় বেছে নেবে। বৃত্তিমূলক ধারায় মাধ্যমিক শিক্ষা হবে তিন বছরের, সাধারণ ধারায় হবে চার বছরের . . .

কিন্তু দুর্ভাগ্য এই যে, ড. কুদরত-ই-খুদা শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট বাস্তবায়নের পূর্বেই বঙ্গবন্ধু নিহত হন।

অর্থনৈতিক সংস্কার

বঙ্গবন্ধু সরকার শাসনভার গ্রহণের পরপরই নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী কিছু ইতিবাচক পদক্ষেপ গ্রহণ করে। আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি যে, সরকার যত দ্রুত

www.Educationblog24.Com

প্রধান প্রধান শিল্প, ব্যাংক বীমা প্রতিষ্ঠান এবং বৈদেশিক বাণিজ্যেরও প্রায় ৮০% রাষ্ট্রায়ত্ত করে। ভূমি মালিকানার সর্বোচ্চ সিলিং ১০০ বিঘা এবং ২৫ বিঘা পর্যন্ত জমির খাজনা মওকুফ করা হয়। দীর্ঘমেয়াদি উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নের উদ্দেশ্যে সরকার ১৯৭২ সালের জানুয়ারি মাসে একটি পরিকল্পনা কমিশন গঠন করে। ১৯৭৩ সালের ১ জুলাই থেকে প্রথম পাঁচশালা পরিকল্পনা (১৯৭৩-৭৮) কার্যকর হয়। প্রথম পাঁচশালা পরিকল্পনায় যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশ পুনর্গঠনের বিষয়টি গুরুত্ব লাভ করেছিল। এর দীর্ঘমেয়াদী লক্ষ্য ছিল বৈষম্যহীন সমৃদ্ধ এক বাংলাদেশ গড়ে তোলা। প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার লক্ষ্যসমূহ বিশ্লেষণ করলে আমরা ঐ কমিশনের চেয়ারম্যান প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের অর্থনৈতিক উন্নয়ন দর্শন সম্পর্কে ধারণা লাভ করব। প্রথম পঞ্চবার্ষিকীর লক্ষ্য ছিল নিম্নরূপ :

১. পরিকল্পনার প্রধান লক্ষ্য হবে দারিদ্র্য হ্রাস। আর লক্ষ্য অর্জনের কৌশল হিসেবে বলা হয়েছিল: কর্মের সুযোগ বৃদ্ধি, এবং সমতা-ভিত্তিক বণ্টন নিশ্চিত করার জন্য কার্যকর আর্থিক ও দ্রব্যমূল্য সংশ্লিষ্ট নীতিমালা।

২. অর্থনীতির প্রতিটি খাতে বিশেষত কৃষি ও শিল্পের পুনর্গঠন ও উৎপাদন বৃদ্ধি।

৩. অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির হার ৩% থেকে ৫.৫%-এ উন্নীত করা। আর আনুষ্ঠানিক খাতসমূহে কর্মসংস্থান বৃদ্ধির পাশাপাশি উন্নয়নে স্বেচ্ছাশ্রমের বিকাশ। মানব শক্তি ও অর্থনৈতিক সম্পদের সর্বোচ্চ বিকাশের লক্ষ্যে উন্নয়নমুখী স্থানীয় সরকার কাঠামো শক্তিশালী করা।

৪. নিত্য প্রয়োজনীয় ভোগ্য পণ্য (বিশেষ করে খাদ্য, বস্ত্র, ভোজ্য তেল, কেরোসিন, চিনি) উৎপাদন বৃদ্ধি এবং এসবের বাজার মূল্য দরিদ্র জনগোষ্ঠীর হাতের নাগালে রাখা এবং স্থিতিশীল করা (কর্মসংস্থান ও আয় বৃদ্ধির সাথে সামঞ্জস্য রেখে)।

৫. বণ্টন নীতিমালা (পুনর্বণ্টনমূলক আর্থিক নীতিকৌশল) এমন রাখা যাতে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর আয় বৃদ্ধির হার গড় আয় বৃদ্ধির হারের চেয়ে বেশি হয় (এবং উচ্চ আয়ের মানুষদের এক্ষেত্রে ত্যাগ স্বীকার করতে হবে)।

৬. অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে রাষ্ট্রের ভূমিকা তার ব্যবস্থাপনা ও সাংগঠনিক যোগ্যতা-দক্ষতার ভিত্তিতে নিরূপণ করা; গ্রাম-শহরে স্ব-কর্মসংস্থান সুযোগ বৃদ্ধি করা' অর্থনীতির প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর জনকল্যাণকামী পরিবর্তন সাধন করা।

৭. বৈদেশিক সাহায্যের ওপর নির্ভরশীলতা হ্রাস করা। স্ব-নির্ভরতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে অভ্যন্তরীণ সম্পদের সর্বোচ্চ সমাবেশ নিশ্চিত করা। বৈদেশিক মুদ্রার আহরণ বৃদ্ধির লক্ষ্যে রপ্তানি কর্মকাণ্ড সম্প্রসারণ ও বহুমুখী করা এবং আমদানি কাঠামো পুনর্বিন্যাস করা। বিশেষ করে সার, সিমেন্ট এবং স্টিলের উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে বিদেশ নির্ভরতা ভিত্তিক অনিশ্চয়তা হ্রাস করা।

৮. কৃষির প্রাতিষ্ঠানিক ও প্রযুক্তিগত পরিবর্তন নিশ্চিত করা; খাদ্য উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করা।

৯. জনসংখ্যা বৃদ্ধি হ্রাসে রাজনৈতিক নেতৃত্বের কমিটমেন্ট এবং সামাজিক চেতনা

www.Educationblog24.com

www.Educationblog24.Com

বিকাশ প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করা।

১০. শিক্ষা, স্বাস্থ্য, গ্রামীণ গৃহায়ন, পানি সরবরাহ ইত্যাদি খাতে উন্নয়ন বরাদ্দ বৃদ্ধির মাধ্যমে মানুষের সাধারণ সক্ষমতা ও কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি করা।

বঙ্গবন্ধু পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করতে পারেননি। প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা বাস্তবায়নের মাঝপথে গভীর ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে মুক্তিযুদ্ধের অর্জন পরিকল্পিতভাবে বিনষ্টের লক্ষ্যে বঙ্গবন্ধুকে পরিবার-পরিজনসহ হত্যা করা হয়। কিন্তু বঙ্গবন্ধু জীবিত থাকলে কি হতো? সে প্রশ্ন ড. আবুল বারকাতেরও। তাঁর প্রশ্ন: 'বঙ্গবন্ধু বেঁচে থাকলে বাংলাদেশ উন্নয়ন দৌড়ে কোথায় দাঁড়াতো?' ড. বারকাত এই প্রশ্নের একটা উত্তরও কল্পনা করেছেন: 'বঙ্গবন্ধু জীবিত থাকলে এবং সেই সাথে গণতন্ত্র-জাতীয়তাবাদ-ধর্মনিরপেক্ষতা-সমাজতন্ত্র সংশ্লিষ্ট চার -দর্শনের ভিত্তিতে পরিকল্পিতভাবে অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রবণতা যদি বহাল থাকতো তাহলে ... মোট জাতীয় আয়, মাথাপিছু জাতীয় আয় এবং মাথাপিছু প্রকৃত আয়ের যে পরিবর্তন ঘটতে পারতো তা জাতীয়তাবাদী নেতৃত্বের আজকের মালয়েশিয়াকে ছাড়িয়ে যেতো।'

যা হোক, যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশকে অর্থনৈতিকভাবে শক্তিশালী করার লক্ষ্যে বঙ্গবন্ধু নিম্নরূপ ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলেন:

১. প্রথম পাঁচশালা (১৯৭৩-৭৮) পরিকল্পনায় বিদেশী সাহায্যের ওপর নির্ভরশীলতা ৬২% থেকে ১৯৭৭-৭৮ এর মধ্যে ২৭%-এ কমিয়ে আনার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেন;

২. তিনি নতুন চারটি করপোরেশন গঠন করেন, যেমন:
   (ক) বাংলাদেশ জুট করপোরেশন
   (খ) বাংলাদেশ সুগার করপোরেশন
   (গ) বাংলাদেশ টেক্সটাইল করপোরেশন এবং
   (ঘ) বাংলাদেশ গ্যাস অ্যান্ড অয়েল করপোরেশন।

৩. বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশ শিল্প ঋণ সংস্থা ও বাংলাদেশ শিল্প ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করেন; এবং বিভিন্ন ব্যাংকের ১০৫০টি নতুন শাখা স্থাপন করেন;

৪. বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করে এর ৩৩৫টি শাখা স্থাপন করেন;

৫. স্বাধীন বাংলাদেশের জন্য নতুন মুদ্রা চালু করেন;

৬. তিনি ১৯৭৪ সালে বাংলাদেশের জন্য সাহায্যদাতা গোষ্ঠী গঠন করতে সক্ষম হয়েছিলেন;

৭. গ্রাম বাংলার উন্নয়নের লক্ষ্যে বঙ্গবন্ধু সমন্বিত পল্লী উন্নয়ন কর্মসূচি (IRDP)-এর উপর গুরুত্ব আরোপ করেন এবং বগুড়ায় পল্লী উন্নয়ন একাডেমী প্রতিষ্ঠা করেন।

৮. বঙ্গবন্ধু ঘোড়াশাল সারকারখানা, আশুগঞ্জ কমপ্লেক্সের প্রাথমিক কাজ ও অন্যান্য নতুন শিল্পস্থাপন, বন্ধ শিল্পকলকারখানা চালুকরণসহ অন্যান্য সমস্যা মোকাবিলা করে একটি সুষ্ঠু পরিকল্পনার মাধ্যমে অর্থনৈতিক অবকাঠামো তৈরি করে দেশকে ধীরে ধীরে একটি সমৃদ্ধশালী রাষ্ট্রে পরিণত করার জোর প্রয়াস গ্রহণ করেন।

সরকারি কর্মচারী ও শ্রমিকদের কল্যাণার্থে ব্যবস্থা গ্রহণ

বঙ্গবন্ধুর শাসনভার গ্রহণের সময় রাষ্ট্রীয় কোষাগারে যে অর্থ ছিল তা দিয়ে প্রশাসনিক কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বেতন দেয়া সম্ভব ছিল না। কিন্তু তবুও সদ্য স্বাধীন

www.Educationblog24.Com

দেশের মানুষের আকাঙ্ক্ষার পরিপূরক হিসেবে বঙ্গবন্ধু সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জন্য নতুন বেতন কমিশন গঠন করে ১০ স্তর বিশিষ্ট নতুন বেতন স্কেল বাস্তবায়ন করেন। তিনি শ্রমিকদের জন্যও নতুন বেতন কাঠামো ঘোষণা করেছিলেন। শ্রমিকদের অবস্থার উন্নয়নের জন্য বঙ্গবন্ধু আন্তরিক ছিলেন। ১৯৭২ সালের ১ মে তিনি মে দিবসে শ্রমিকদের মজুরির হার বৃদ্ধির ঘোষণা দেন।

যোগাযোগ ও অবকাঠামোগত উন্নয়নের পদক্ষেপ গ্রহণ

(ক) সড়ক ও রেল যোগাযোগের ক্ষেত্রে গৃহীত পদক্ষেপ

মুক্তিযুদ্ধের সময় বাংলাদেশের যোগাযোগ ব্যবস্থা প্রায় ধ্বংস হয়েছিল। বঙ্গবন্ধু যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নের দিকেও গুরুত্ব দেন। তিনি ১৯৭৪ সালের মধ্যে মুক্তিযুদ্ধের সময় ধ্বংসপ্রাপ্ত সকল ব্রিজ-সেতু পুনর্নির্মাণ করেন। এবং অতিরিক্ত ৯৭টি নতুন সড়ক সেতু নির্মাণ করেন। ঢাকা-আরিচা রুটের বড় বড় সড়ক সেতুগুলো বঙ্গবন্ধুর শাসনামলে নির্মিত হয়। সেসময় ধ্বংসপ্রাপ্ত রেল সেতুগুলোও চালু করা হয়। যমুনা নদীর উপর সেতু নির্মাণের পরিকল্পনা গ্রহণ করা ছিল বঙ্গবন্ধুর এক বৈপ্লবিক প্রয়াস। তাঁর উদ্যোগে গঠিত কমিশন ১৯৭৪ সালের ৪ নভেম্বর যমুনা সেতুর প্রাথমিক সম্ভাব্যতা রিপোর্ট প্রণয়ন করে (দ্রষ্টব্য, *ইত্তেফাক*: ২২.১.১৯৭৫)।

(খ) বিমান যোগাযোগের ক্ষেত্রে উন্নয়ন

বঙ্গবন্ধুর সময়ে ১৯৭২ সালের ৭ মার্চের মধ্যে ঢাকা-চট্টগ্রাম, ঢাকা-সিলেট, ঢাকা-যশোর ও ঢাকা-কুমিল্লা রুটে বিমান চালুর ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। আন্তর্জাতিক রুটেও একটি বোয়িং সংযোজিত হয় এবং ১৯৭৩ সালের ১৮ জুন ঢাকা-লন্ডন রুটে বিমানের প্রথম ফ্লাইট চালু হয়। কুর্মিটোলার আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর নির্মাণের কাজ শুরু হয় বঙ্গবন্ধুর শাসনামলে।

(গ) সমুদ্র ও নৌপরিবহন ক্ষেত্রে উন্নয়ন

বঙ্গবন্ধুর নির্দেশে বাংলাদেশ শিপিং করপোরেশন গঠিত হয়। এই শিপিং করপোরেশন ১৯৭৪ সালের ডিসেম্বরের মধ্যেই কোষ্টারসহ ১৪টি সমুদ্রগামী জাহাজ সংগ্রহ করে।

(ঘ) বিদ্যুৎ ব্যবস্থার উন্নয়ন

মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন সময়ে সারা দেশে বিদ্যুৎ সাব স্টেশনগুলো ধ্বংস প্রাপ্ত হয়েছিল। অনেক স্থানে বিদ্যুৎ লাইন বিচ্ছিন্ন ও বিদ্যুৎ পোলগুলো বিনষ্ট হয়েছিল। বঙ্গবন্ধুর সরকার দায়িত্ব গ্রহণের সময় গোডাউনগুলোতে বিদ্যুৎ খুঁটি ও তার কিছুই মজুদ ছিল না। এগুলো ছিল আমদানিযোগ্য পণ্য। এমনি পরিস্থিতিতে বঙ্গবন্ধুর সরকার বিদ্যুৎ উৎপাদন ও বিতরণের ক্ষেত্রে কৃতিত্ব অর্জন করেন। তিনি ৫০০০ বিদ্যুৎ পোল আমদানি করেন এবং ১৯৭২ সালের ডিসেম্বর মাসের মধ্যে ১৫০০ কিমি বিদ্যুৎ লাইন স্থাপন করেন এবং বিদ্যুতের উৎপাদন ১৯৭২ সালে জানুয়ারিতে উৎপাদিত ২০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ থেকে ডিসেম্বরে ৫০০ মেগাওয়াটে উন্নীত হয়। বঙ্গবন্ধুর নির্দেশে ১৯৭৩ সালে দেশব্যাপী পল্লী বিদ্যুৎ কর্মসূচি সম্প্রসারণের লক্ষ্যে একটি মাস্টার প্ল্যান তৈরি করা হয়

www.Educationblog24.com

www.Educationblog24.Com

এবং এমনকি সংবিধানের ১৬ অনুচ্ছেদে পল্লী বিদ্যুতায়নের প্রতিশ্রুতি সন্নিবেশিত হয়।

(ঙ) টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন

মুক্তিযুদ্ধের সময় বাংলাদেশে টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থা ধ্বংস প্রাপ্ত হয়েছিল। বঙ্গবন্ধুর সরকার ১৯৭৪ সালের ডিসেম্বর মাসের মধ্যেই ৫৫,০০০ টেলিফোন চালুর ব্যবস্থা করেন। বহির্বিশ্বের সাথে টেলিযোগাযোগ স্থাপনের জন্য বঙ্গবন্ধু পাবর্ত্য চট্টগ্রামে উপগ্রহ ভূ-উপকেন্দ্র স্থাপনের কাজ সমাপ্ত করেন।

১৯৭৩ সালের সাধারণ নির্বাচন

বাংলাদেশ সংবিধান কার্যকর হবার পর (১৬.১২.৭২) গণপরিষদ ভেঙে দেয়া হয় এবং সরকার ১৯৭৩ সালের ৭ মার্চ সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠান ঘোষণা জারি করেন। নির্বাচনের তারিখ ঘোষিত হওয়ার পর প্রাথমিক প্রতিক্রিয়ায় ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (ভাসানী)-এর সভাপতি মওলানা ভাসানী নির্বাচনের মাধ্যমে সরকার উৎখাতের আহ্বান জানান (৩১.১২.১৯৭২)। জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (জাসদ) জন্মলগ্ন থেকেই সরকার বিরোধী কর্মকাণ্ড শুরু করে। ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (মোজাফ্ফর) ও বাংলাদেশ কমিউনিস্ট পার্টি সরকারের প্রতি নমনীয় মনোভাব প্রদর্শন করে। ডানপন্থী রাজনৈতিক দলগুলোর তৎপরতার সেসময় নিষিদ্ধ ছিল। নির্বাচনে জাতীয় সংসদের মহিলা আসনসহ ৩১৫টি আসনের মধ্যে আওয়ামী লীগ ৩০৬, জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (জাসদ) ২টি, বাংলাদেশ জাতীয় লীগ ১টি এবং স্বতন্ত্র সদস্যরা ৬টি আসনে জয়লাভ করেন।

আদমশুমারি অনুষ্ঠান

বঙ্গবন্ধু যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশে আর্থিক সংকট ও নানান ব্যস্ততার মাঝেও ১৯৭৪ সালের ৮ জুন বাংলাদেশের প্রথম আদমশুমারি সম্পন্ন করেন।

সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে গৃহীত পদক্ষেপ

(ক) সরকার গঠনের তিনদিনের মধ্যেই (১৫.১.১৯৭২) বঙ্গবন্ধু এক সরকারি আদেশের মাধ্যমে দেশে মদ, জুয়া, হাউজি ও ঘোড়া দৌড় নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন। তিনি একই সাথে ঢাকা রেসকোর্স ময়দানকে সোহরাওয়ার্দী উদ্যান হিসেবে ঘোষণা করেন।

(খ) বঙ্গবন্ধু ২৪.৫.১৯৭২ তারিখে বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামকে সপরিবারে ঢাকায় আনেন;

(গ) ১৯৭৪ সালের ডিসেম্বরের মধ্যে বঙ্গবন্ধু ৯টি বন্ধু রাষ্ট্রের সাথে বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক চুক্তি সম্পাদন করেন;

(ঘ) তিনি ঢাকায় শিল্পকলা একাডেমী প্রতিষ্ঠা করেন;

(ঙ) ১৯৭৫ সালের ৬ মার্চ বঙ্গবন্ধু ঢাকার রামপুরায় বাংলাদেশ টেলিভিশনের স্থায়ী নতুন ভবন উদ্বোধন করেন;

(চ) 'ধর্মনিরপেক্ষতা মানে ধর্মহীনতা নয়'—এই আদর্শে বিশ্বাসী বঙ্গবন্ধু ইসলাম সম্পর্কে গবেষণার লক্ষ্যে ২০.৩.৭৫ তারিখে ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠার জন্য এক অধ্যাদেশ জারি করেন। তিনি মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড পুনর্গঠন করেন।

www.Educationblog24.Com

বাংলাদেশের তবলীগ জামাতের কেন্দ্র কাকরাইল মসজিদ সম্প্রসারণের ব্যবস্থা করেন। টংগীতে তবলীগের বিশ্ব ইজতেমার স্থান করে দেন।

(ছ) ১৫.১২.৭৪ তারিখে বঙ্গবন্ধু দুঃস্থ শিল্পী সংস্কৃতিসেবীদের কল্যাণার্থে সরকারিভাবে 'বঙ্গবন্ধু সংস্কৃতিসেবী কল্যাণ ফাউন্ডেশন' প্রতিষ্ঠা করেন।

(জ) ৭.৮.৭৫ তারিখে দুঃস্থ ক্রীড়াবিদদের কল্যাণার্থে 'বঙ্গবন্ধু ক্রীড়াসেবী কল্যাণ ফাউন্ডেশন' গঠিত হয়।

নারীদের কল্যাণে গৃহীত ব্যবস্থা

বঙ্গবন্ধু দুস্থ মহিলাদের কল্যাণের জন্য ১৯৭২ সালে নারী পুনর্বাসন বোর্ড প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯৭৪ সালে এই বোর্ডের কার্যক্রমকে সম্প্রসারিত করে 'নারী পুনর্বাসন ও কল্যাণ ফাউন্ডেশন' সৃষ্টি করেন। চাকরির সকল ক্ষেত্রে নারীর জন্য তিনি ১০ ভাগ কোটা সংরক্ষণের ব্যবস্থা করেন। নারীর ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে তিনি ড. নীলিমা ইব্রাহীমকে বাংলা একাডেমীর মহাপরিচালক হিসেবে নিয়োগ দেন এবং মিসেস বদরুনেসা আহমেদ ও বেগম নূরজাহান মুরশিদকে মন্ত্রিসভায় অন্তর্ভুক্ত করেন।

প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা সুদৃঢ়করণে পদক্ষেপ গ্রহণ

(ক) সদ্য স্বাধীন বাংলাদেশের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা সুদৃঢ় করার দিকেও বঙ্গবন্ধুর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ছিল। তাঁর সরকারের আর্থিক সীমাবদ্ধতা থাকা সত্ত্বেও তিনি বাংলাদেশের সেনাবাহিনীকে আধুনিক ও শক্তিশালী করার চেষ্টা করেন। ৬.৩.১৯৭২ তারিখে তিনি বিডিআর গঠনের আদেশ জারি করেন। বঙ্গবন্ধু ৮.৪.১৯৭২ তারিখে পদাতিক বাহিনী, নৌবাহিনী ও বিমান বাহিনী গঠনের লক্ষ্যে একটি অধ্যাদেশ জারি করেন। ১১.৩.১৯৭৪ তারিখে তিনি কুমিল্লায় বাংলাদেশের প্রথম সামরিক একাডেমী উদ্বোধন করেন। বঙ্গবন্ধু যুগোশ্লাভিয়া থেকে ক্ষুদ্র অস্ত্রশস্ত্র ও সাঁজোয়া বাহিনীর জন্য ভারী অস্ত্র সংগ্রহ করেন। সোভিয়েট ইউনিয়ন থেকে সংগ্রহ করেন মিগ বিমান, হেলিকপ্টার ও পরিবহন বিমান। তিনি ফ্রান্স ও যুক্তরাজ্য থেকে বিমান বাহিনীর জন্য হেলিকপ্টার ক্রয় করেন। তাঁর একান্ত ব্যক্তিগত উদ্যোগে মিশর থেকে সংগৃহীত হয় সাঁজোয়া গাড়ি বা ট্যাংক (যা পরবর্তীকালে তাঁকে হত্যা করতে খুনিরা ব্যবহার করে)। সেনাবাহিনীর জন্য পোশাক ও যন্ত্রপাতি ক্রয়ের জন্য বঙ্গবন্ধু সরকার গারতের কাছ থেকে ৩০ কোটি টাকা অনুদান হিসেবে লাভ করে। উন্নত প্রশিক্ষণ লাভের জন্য বঙ্গবন্ধু সামরিক অফিসারদেরকে বিদেশে প্রেরণ করেন।

বঙ্গবন্ধু পাকিস্তান থেকে প্রত্যাবর্তনকারী ৩০ হাজারের অধিক সামরিক কর্মকর্তা ও জওয়ানদের বাংলাদেশ সেনাবাহিনীতে পুনর্বাসিত করেন।

(খ) বাংলাদেশের আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতির নিয়ন্ত্রণ ও উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের স্বার্থে বঙ্গবন্ধু প্যারা মিলিশিয়া বাহিনী হিসেবে জাতীয় রক্ষী বাহিনী গঠন করেন। রক্ষীবাহিনীর সদস্য সংখ্যা ছিল সেনাবাহিনীর ৬ ভাগের ১ ভাগ। মুক্তিযোদ্ধাদের ফেরত দেয়া অস্ত্রে তাদেরকে সজ্জিত করা হয়েছিল।

www.Educationblog24.com

www.Educationblog24.Com

পররাষ্ট্রনীতিতে সাফল্য অর্জন

বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতি প্রণয়নের ক্ষেত্রে স্বাধীন-স্বকীয়তার পরিচয় দেন। তিনি কোন পরাশক্তির চোখরাঙানি কিংবা পার্শ্ববর্তী কোন দেশের সন্তুষ্টি বিধানকে প্রাধান্য দিয়ে পররাষ্ট্রনীতি নির্ধারণ করেননি। তাঁর পররাষ্ট্রনীতির মূল কথা ছিল শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থান এবং সকলের প্রতি বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা ও জোটনিরপেক্ষ পররাষ্ট্রনীতি অনুসরণ করা। বঙ্গবন্ধু যখনই কোন আন্তর্জাতিক ফোরাম (জাতিসংঘ, জোটনিরপেক্ষ শীর্ষ সম্মেলন, কমনওয়েলথ রাষ্ট্রপ্রধান সম্মেলন, ইসলামিক সম্মেলন সংস্থার শীর্ষ বৈঠক ইত্যাদি) কিংবা দেশে গেছেন, তিনি বলিষ্ঠ কণ্ঠে তাঁর জোট নিরপেক্ষ পররাষ্ট্রনীতি ঘোষণা করেছেন। ১৯৭৪ সালের ২৫ সেপ্টেম্বর বঙ্গবন্ধু জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে বাংলা ভাষায় যে ঐতিহাসিক ভাষণ দেন, তাতে বঙ্গবন্ধুর পররাষ্ট্রনীতির মূল বৈশিষ্ট্য খুঁজে পাওয়া যায়। বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন,

> বাংলাদেশ প্রথম হইতেই শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থান ও সকলের প্রতি বন্ধুত্ব, এই নীতিমালার উপর ভিত্তি করিয়া জোটনিরপেক্ষ পররাষ্ট্রনীতি গ্রহণ করিয়াছে। কেবলমাত্র শান্তিপূর্ণ পরিবেশেই কষ্টলব্ধ জাতীয় স্বাধীনতার ফলভোগ করিতে আমাদেরকে সক্ষম করিয়া তুলিবে এবং সক্ষম করিয়া তুলিবে দারিদ্র্য, ক্ষুধা, রোগ, অশিক্ষা ও বেকারত্বের বিরুদ্ধে লড়াই করিবার জন্য আমাদের সকল শক্তি ও সম্পদকে সমাবেশ ও কেন্দ্রীভূত করিতে। এই ধারণা হইতে জন্ম নিয়াছে শান্তির প্রতি আমাদের প্রতিশ্রুতি। এইজন্য সমঝোতার অগ্রগতি, উত্তেজনা প্রশমন, অস্ত্র সীমিতকরণ এবং শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থান নীতির সম্প্রসারণের লক্ষ্যে এশিয়া, আফ্রিকা, ইউরোপ, ল্যাটিন আমেরিকা তথা বিশ্বের যে কোন অংশে যে কোন প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হউক না কেন আমরা তাহাকে স্বাগত জানাই।'

পররাষ্ট্র নীতিতে বঙ্গবন্ধু সাফল্য অর্জন করেন। যেমন:

(ক) সরকার প্রধান হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণের মাত্র ৩৫ দিনের মধ্যেই (১৪.৩.১৯৭২) তিনি বাংলাদেশে অবস্থানরত ভারতীয় সৈন্যবাহিনীকে তাদের দেশে ফেরত পাঠাতে সক্ষম হয়েছিলেন।

(খ) বঙ্গবন্ধুর কূটনৈতিক উদ্যোগের ফলে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র ৪.৪.৭২ তারিখে বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রদান করে;

(গ) বঙ্গবন্ধুর সরকার ১০.৫.১৯৭২ তারিখে আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল সংস্থার সদস্যপদ লাভ করে।

(ঘ) ১৯৭৩ সালের ২৩ মে মাসে ঢাকায় বিশ্ব শান্তি পরিষদের উদ্যোগে এশিয়া শান্তি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় এবং বঙ্গবন্ধু 'জুলিও কুরী' পদক লাভ করেন।

(ঙ) ১৭.৯.৭৪ তারিখে বাংলাদেশ জাতিসংঘের সদস্য পদ লাভ করে।

(চ) ২৫.৯.৭৪ তারিখে বঙ্গবন্ধু জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের অধিবেশনে বাংলা ভাষায় ভাষণ দান করে বাঙালির মাতৃভাষার মর্যাদাকে বিশ্বের দরবারে উন্নত করেন।

(ছ) বঙ্গবন্ধুর দক্ষ কূটনৈতিক উদ্যোগের ফলে বাংলাদেশ পর্যায়ক্রমে ১২১টি দেশের

www.Educationblog24.Com

স্বীকৃতি লাভ করে। তাছাড়া বাংলাদেশ কমনওয়েলথের সদস্য ও ইসলামি পররাষ্ট্র সম্মেলনের সদস্যপদসহ ১৪টি আন্তর্জাতিক সংগঠনের সদস্যপদ লাভ করে।

মুক্তিযুদ্ধের স্মারক সংরক্ষণ

বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের শহীদদের স্মরণে সাভার ও মেহেরপুরে স্মৃতিসৌধ নির্মাণ প্রকল্প অনুমোদন করেন (৯.৩.১৯৭২)। ১৬.১২.৭২ তারিখে সাভারে জাতীয় স্মৃতিসৌধের এবং ২২.১২.৭২ তারিখে ঢাকার মিরপুরে শহীদ বুদ্ধিজীবী স্মৃতি স্তম্ভের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন।

মুক্তিযোদ্ধাদের কল্যাণে গৃহীত ব্যবস্থা এবং মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন

বঙ্গবন্ধু প্রতিটি শহীদ পরিবারকে আর্থিক অনুদান প্রদানের ব্যবস্থা করেন। মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য তিনি গঠন করেন মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্ট। ১৫.১.৭৩ তারিখে বঙ্গবন্ধুর নির্দেশে মুক্তিযুদ্ধে বিশেষ অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ বীর মুক্তিযোদ্ধাদের রাষ্ট্রীয় বিশেষ খেতাব প্রদানের তালিকা সরকারি গেজেট বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে প্রকাশ করা হয়। বঙ্গবন্ধু ৭ জন বীর মুক্তিযোদ্ধাকে বীর শ্রেষ্ঠ, ৬৮ জনকে বীর উত্তম, ১৭৫ জন মুক্তিযোদ্ধাকে বীর বিক্রম এবং ৪২৬ জন মুক্তিযোদ্ধাকে বীর প্রতীক পদক প্রদান করেন। এছাড়াও মুক্তিযুদ্ধে বিশেষ অবদান রাখার জন্য মুক্তিযুদ্ধের প্রধান সেনাপতি কর্ণেল (অব:) আতাউল গণি ওসমানীকে জেলারেল এবং চিফ অব স্টাফ কর্ণেল (অব:) আব্দুর রবকে মেজর জেনারেল পদে ভূষিত করেন।

বঙ্গবন্ধু সরকারের কিছু সমালোচিত পদক্ষেপ

(ক) বিশেষ ক্ষমতা আইন, ১৯৭৪

১৯৭৪ সালের ফেব্রুয়ারি সরকার বিশেষ ক্ষমতা আইন নামে একটি আইন প্রণয়ন করে। এই আইনে নিবর্তনমূলক আইনের বিধান রাখা হয়। অর্থাৎ সরকার যে কোনো ব্যক্তিকে 'ক্ষতিকর কার্য থেকে বিরত রাখার জন্য আটক রাখতে পারবে। গ্রেপ্তারকৃত ব্যক্তিকে যথাসম্ভব শীঘ্র গ্রেপ্তার কারণ অবহিত করা, ও আইনজীবীর মাধ্যমে আত্মপক্ষ সমর্থনের অধিকার দেয়া হয়। এই আইনের ১৫ ধারা বলে ক্ষতিকর ধবংসাত্মক কাজ, ১৬ নং ধারা বলে ক্ষতিকর রিপোর্ট প্রকাশ, ১৭ ও ১৮ নং ধারা বলে কোনো দলিল তৈরি, মুদ্রণ বা প্রকাশনা এবং 'কতিপয় বিষয় প্রকাশনা থেকে যে কোন ব্যক্তিকে বা সংবাদ মাধ্যমকে নিয়ন্ত্রণে রাখার ব্যবস্থা করা হয়। ১৯ ও ২০ নং ধারা বলে শান্তি ও নিরাপত্তার জন্য হুমকিস্বরূপ কোনো সংগঠনকে নিয়ন্ত্রণ করার বিধান করা হয়। ২৪ নং ধারা বলে সাক্ষ্য আইন জারির ক্ষমতা, ২৫ নং ধারার মাধ্যমে মজুদদারি, কালোবাজারি, চোরাচালানি, ভেজাল দেয়া, মুদ্রা বা স্ট্যাম্প জাল করা ইত্যাদি বিষয় নিয়ন্ত্রণ ও অপরাধীকে সাজা প্রদানের বিধান করা হয়। বিশেষ ক্ষমতা আইনে সমাজবিরোধী তৎপরতা রোধের জন্য করা হয়েছিল। এ আইন অদ্যাবধি কোন সরকারই বাতিল করেনি বা করার উদ্যোগ গ্রহণ করেনি।

(খ) রক্ষীবাহিনী গঠন

মুক্তিযুদ্ধের সময় দেশের পুলিশ বাহিনী ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়েছিল। বঙ্গবন্ধু সরকার ক্ষমতা গ্রহণের সময় দেশের আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের জন্য উপযুক্ত নিরাপত্তা

www.Educationblog24.com

www.Educationblog24.Com

বাহিনী ছিল না। সেনাবাহিনীও তখন সুসংগঠিত ছিল না। বেসামরিক কর্তৃপক্ষকে সাহায্য করার জন্য সেনাবাহিনীর সাহায্য লাভের সুযোগ ছিল না। এমনি অবস্থায় ষড়যন্ত্রকারীরা দেশে নৈরাজ্যকর অবস্থা সৃষ্টি করলে সরকার জাতীয় মিলিশিয়া বাহিনী গঠনের চিন্তাভাবনা করতে থাকে। উদ্দেশ্য ছিল এই বাহিনী পুলিশকে সক্রিয়ভাবে সাহায্য করবে। প্রয়োজনবোধে সেনাবাহিনীকেও সাহায্য করবে। তবে এই বাহিনী থাকবে রাজনৈতিক কর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রণে। ১৯৭২ সালের ৭ মার্চ 'জাতীয় রক্ষীবাহিনী আদেশ' প্রণয়ন করা হয় (রাষ্ট্রপতির আদেশ নং ২১, ১৯৭২) তবে তা ১ ফেব্রুয়ারি থেকে কার্যকর করা হয়। এই আইনের ১৮ অনুচ্ছেদে বলা হয় যে, 'সুনির্দিষ্ট' কর্তৃপক্ষ প্রয়োজনবোধে এই বাহিনীকে অভ্যন্তরীণ শান্তি শৃঙ্খলার কাজে বেসামরিক কর্তৃপক্ষকে সাহায্য করার জন্য নিয়োগ করতে পারবে। সরকার আহ্বান করলে এই বাহিনী সশস্ত্র বাহিনীকে সাহায্য করবে এবং সরকার নির্দেশিত অন্যান্য দায়িত্ব পালন করবে।' ঐ আইনে ১৬ নং অনুচ্ছেদে বাহিনীর পরিচালক ও অফিসারদের মধ্যে দায়িত্ব বণ্টন করা হয়। ১৭ নং অনুচ্ছেদে সরকারকে রক্ষীবাহিনীর জন্য 'আইন প্রণয়ন, রক্ষণাবেক্ষণ, প্রশাসন, হুকুমদান, নিয়ন্ত্রণ কিংবা শৃঙ্খলা বিধানের' ক্ষমতা দেয়া হয়। ৮নং অনুচ্ছেদে বিধান রাখা হয় যে,'ফৌজদারী দণ্ডবিধি বা অন্য যে কোন আইনের পরিপন্থী না হলে রক্ষীবাহিনীর যে কোন সদস্য বা অফিসার ৮নং অনুচ্ছেদ বলে বিনা ওয়ারেন্টে (১) যে কোন আইনের পরিপন্থী অপরাধে লিপ্ত থাকার সন্দেহবশত যে কোন ব্যক্তিকে গ্রেফতার, (২) যে কোন ব্যক্তি, স্থান, যানবাহন, নৌযান ইত্যাদি তল্লাশ বা আইন শৃঙ্খলা বিরোধী কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে, এমন যেকোন সামগ্রী বাজেয়াপ্ত করতে পারবেন . . .'। রক্ষীবাহিনীর মূল্যায়ন প্রসঙ্গে মওদুদ আহমদ লিখেছেন:

> যাই হোক জাতীয় রক্ষীবাহিনী কোন ভালো কাজই করেনি, একথা ঠিক নয়। বিপুল পরিমাণে বেআইনী অস্ত্র এরা উদ্ধার করেছে এবং আটক করেছে প্রচুর পরিমাণে চোরাচালানকৃত পণ্য। কালোবাজারী এবং অবৈধ গুদামজাতকারী রক্ষীবাহিনীর নাম শুনেই আতঙ্কবোধ করতো।

বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করার পর রক্ষীবাহিনী ভেঙে দেয়া হয়।

(গ) বাকশাল গঠন

আমরা সংবিধানের চতুর্থ সংশোধনী আলোচনা প্রসঙ্গে ইতিপূর্বে উল্লেখ করেছি যে, উক্ত সংশোধনীর মাধ্যমে দেশের রাষ্ট্রপতিকে প্রয়োজনমতো দেশে একমাত্র 'জাতীয় রাজনৈতিক দল' গঠনের ক্ষমতা দেয়া হয়। উক্ত দলের নামকরণ, কর্মসূচি প্রণয়ন ইত্যাদি ক্ষমতাও রাষ্ট্রপতির হাতে অর্পণ করা হয়। এভাবে ক্ষমতাপ্রাপ্ত হয়ে বঙ্গবন্ধু ১৯৭৫ সালের ২৪ ফেব্রুয়ারি 'বাংলাদেশ কৃষক শ্রমিক আওয়ামী লীগ' (বাকশাল) নামক একটি একক জাতীয় দল গঠনের কথা ঘোষণা করেন। তিনি এর চেয়ারম্যান এবং বিলুপ্ত আওয়ামী লীগ দলীয় সকল সংসদ সদস্য ও সকল মন্ত্রী এর সদস্য বলে গণ্য হন। রাষ্ট্রপতি ১৯৭৫ সালের ৬ জুন বাকশালের গঠনতন্ত্র ঘোষণা করেন। গঠনতন্ত্র অনুযায়ী জাতীয় দলের ১৫ সদস্যবিশিষ্ট কার্যনির্বাহী কমিটি এবং ১১৫ সদস্য বিশিষ্ট

www.Educationblog24.Com

কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্যগণের নামও ঘোষণা করা হয়। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কার্যনির্বাহী কমিটি ও কেন্দ্রীয় কমিটি উভয়েরই সভাপতি এবং ক্যাপ্টেন মনসুর আলী দলের সেক্রেটারি জেনারেল মনোনীত হন। কেন্দ্রীয় কমিটিতে উপরাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী, স্পিকার, ডেপুটি স্পিকার, মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী, সশস্ত্রবাহিনীর তিন প্রধান, তিনজন উপাচার্য, তিনজন সংবাদ সম্পাদক, রক্ষী বাহিনীর প্রধান, বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর, চিকিৎসক ও সংসদ সদস্য অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। গঠনতন্ত্র অনুসারে বাকশালের ৫টি অঙ্গসংগঠন ছিল (১) জাতীয় কৃষক লীগ, (২) জাতীয় শ্রমিক লীগ, (৩) জাতীয় মহিলা লীগ, (৪) জাতীয় যুবলীগ, ও (৫) জাতীয় ছাত্রলীগ। চেয়ারম্যানকে অন্যান্য ক্ষেত্রেও অঙ্গসংগঠন ও সংস্থা ইত্যাদি গঠন করার ক্ষমতা প্রদান করা হয়। এসব অঙ্গসংগঠন কার্যনির্বাহী কমিটির প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে কাজ করবে মর্মে স্থির হয়। ১৯৭৫ সালের ১৯ জুন বাকশাল কেন্দ্রীয় কমিটির প্রথম সভায় রাষ্ট্রপতি এক নতুন প্রশাসন ব্যবস্থা প্রবর্তন করার কথা ঘোষণা করেন। এই নতুন ব্যবস্থায় বাংলাদেশের মহকুমাগুলোকে জেলায় রূপান্তরিত করে ৬০টি নতুন জেলা গঠন করে প্রতিটি জেলায় একজন গভর্নর নিয়োগের ও এক একটি প্রশাসনিক পরিষদ গঠনের বিধান করা হয়। জেলা গভর্নর হবেন পরিষদের প্রধান। এ ব্যবস্থা ১৯৭৫ সালের ১ সেপ্টেম্বর থেকে কার্যকর হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট বঙ্গবন্ধুকে হত্যার কারণে বাকশাল কর্মসূচি কার্যকর হতে পারেনি। তাই এর ভাল-মন্দ মূল্যায়ন করা সম্ভব নয়। তবে বাকশাল প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তার পক্ষে বঙ্গবন্ধু যে যুক্তি উপস্থাপন করেন তা এখানে সংক্ষেপে উল্লেখ করা যেতে পারে।

> ১৯৭৫ সালের ২৫ জানুয়ারি জাতীয় সংসদে সংবিধানের চতুর্থ সংশোধনী গ্রহণের প্রাক্কালে প্রদত্ত ভাষণে বঙ্গবন্ধু দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে বলেন যে,'দেশের অর্থনৈতিক মুক্তি, শোষণহীন সমাজব্যবস্থা এবং শোষিতের সমাজতন্ত্র ও গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার' মহৎ লক্ষ্যেই সংবিধানে সংশোধনী আনা অপরিহার্য হয়ে পড়েছিলো। তিনি বলেন দেশে বর্তমানে যে নৈরাজ্যকর অবস্থা চলছে তা আর চলতে দেয়া যায় না। তিনি সংসদকে লক্ষ্য করে বলেন, প্রধানমন্ত্রী হিসেবে সকল নির্বাহী ও প্রশাসনিক ক্ষমতা তার নিজের হাতে কেন্দ্রীভূত থাকা সত্ত্বেও জনগণের জানমালের পূর্ণ নিরাপত্তা ও সকল শোষণ-অবিচার-নির্যাতন দূরীকরণের অপরিহার্য প্রয়োজনেই সংবিধানে মৌলিক পরিবর্তন আনা অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়েছিলো। বঙ্গবন্ধু একটি দ্বিতীয় বিপ্লবের মাধ্যমে দেশের মানুষের ওপর সামগ্রিক শোষণ অপসারণের দৃঢ় প্রত্যয় ঘোষণা করেন।

বাকশাল অর্থ কেবল একটি একক রাজনৈতিক দল প্রতিষ্ঠা নয়। বাকশাল গঠনের মাধ্যমে কিছু সুনির্দিষ্ট সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক কর্মসূচি বঙ্গবন্ধু ঘোষণা করেছিলেন। ১৯৭৫ সালের ২৬ মার্চ সোহরাওয়ার্দী ময়দানে আয়োজিত বিশাল জনসভায় বঙ্গবন্ধু যে দীর্ঘ ভাষণ দেন তাতে বাকশাল কর্মসূচির বিস্তারিত ব্যাখ্যা ছিল। বঙ্গবন্ধুর ভাষণের গুরুত্বপূর্ণ অংশগুলো নিম্নে উল্লেখ করা হলো :

(১) 'কেন সিস্টেম পরিবর্তন করলাম? সিস্টেম পরিবর্তন করেছি দুঃখী মানুষের মুখে হাসি ফোটাবার জন্য। সিস্টেম পরিবর্তন করেছি শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনবার জন্য।'

(২) 'হ্যাঁ, প্রেসিডেন্সিয়াল ফরম অব গভর্নমেন্ট করেছি। জনগণ প্রেসিডেন্ট নির্বাচন

www.Educationblog24.Com

করবে। পার্লামেন্ট থাকবে। পার্লামেন্টের নির্বাচনে একজন, দুইজন, তিনজনকে নমিনেশন দেওয়া হবে। জনগণ বাছবে কে ভালো কে মন্দ। আমরা চাই শোষিতের গণতন্ত্র, আমরা চাই না শোষকের গণতন্ত্র। এটা পরিষ্কার'।

(৩) (আমাদের লক্ষ্য) : 'এক নম্বর হলো দুর্নীতিবাজ খতম করা। দুই নম্বর হলো, কলে-কারখানায়, ক্ষেতে খামারে প্রোডাকশন বাড়ানো। তিন নম্বর হলো, পপুলেশন প্লানিং। চার নম্বর হলো, জাতীয় ঐক্য।

(৪) 'জাতীয় ঐক্য গড়বার জন্য একদল করা হয়েছে। যারা বাংলাদেশ ভালবাসে, এর আদর্শে বিশ্বাস করে, চারটি রাষ্ট্রীয় আর্দশ মানে, সৎ পথে চলে তারা সকলেই এই দলের সদস্য হতে পারবে। যারা বিদেশি এজেন্ট, যারা বহিঃশত্রুর কাছ থেকে পয়সা নেয়, এতে তাদের স্থান নেই। সরকারি কর্মচারীগণও এই দলের সদস্য হতে পারবে। কারণ, তারাও এই জাতির একটা অংশ। তাদেরও অধিকার থাকবে এই দলের সদস্য হওয়ার। এই জন্য সকলে যে যেখানে আছি, একতাবদ্ধ হয়ে দেশের কাজে লাগতে হবে।'

(৫) 'এই জাতীয় দলের আপাতত পাঁচটা ব্রাঞ্চ হবে। একটা শ্রমিক ভাইদের অঙ্গদল, কৃষক ভাইদের একটা, যুবক ভাইদের একটা, ছাত্রদের একটা এবং মহিলাদের একটা। এই পাঁচটা অঙ্গদল মিলে কৃষক শ্রমিক আওয়ামী লীগ।

(৬) 'যে নতুন সিস্টেমে যেতে চাচ্ছি আমি, তাতে গ্রামে গ্রামে বহুমুখী কো-অপারেটিভ হবে। ভুল করবেন না। আমি আপনাদের জমি নেব না। ভয় পাবেন না যে, জমি নিয়ে যাব। তা নয়। পাঁচ বৎসরের প্ল্যানে বাংলাদেশের ৬৫ হাজার গ্রামে একটি করে কো-অপারেটিভ হবে। প্রত্যেকটি গ্রামে এই কো-অপারেটিভ। এর জমি মালিকের থাকবে। কিন্তু তার ফসলের অংশ সবাই পাবে। প্রত্যেকটি বেকার, প্রত্যেকটি মানুষ, যে মানুষ কাজ করতে পারে, তাকে এই কো-অপারেটিভের সদস্য হতে হবে। এগুলি বহুমুখী কো-অপারেটিভ হবে। পয়সা যাবে তাদের কাছে, ফার্টিলাইজার যাবে তাদের কাছে, টেস্ট রিলিফ যাবে তাদের কাছে, ওয়ার্কস প্রোগ্রাম যাবে তাদের কাছে। আস্তে আস্তে ইউনিয়ন কাউন্সিলে যাঁরা টাউট আছেন, তাদেরকে বিদায় দেওয়া হবে। তা না হলে দেশকে বাঁচানো যাবে না। এই জন্যেই ভিলেজ কো-অপারেটিভ হবে। আমি ঘোষণা করছি আজকে যে, পাঁচ বৎসরের প্ল্যানে প্রত্যেকটি গ্রামে পাঁচ শত থেকে এক হাজার ফ্যামিলি পর্যন্ত নিয়ে কম্পালসারি কো অপারেটিভ হবে। আপনার জমির ফসল আপনি নেবেন, অংশ যাবে কো-অপারেটিভের হাতে, অংশ যাবে গভর্নমেন্টের হাতে।

দ্বিতীয়ত থানায় থানায় একটি করে কাউন্সিল হবে। এই কাউন্সিলে রাজনৈতিক কর্মী বা সরকারি কর্মচারি যে-ই হন, একজন তার চেয়ারম্যান হবেন। এই থানা কাউন্সিলে থাকবে বিভিন্ন ডিপার্টমেন্টের সরকারি কর্মচারী, তার মধ্যে আমরা কৃষক শ্রমিক আওয়ামী লীগের প্রতিনিধি থাকবে, যুব প্রতিনিধি থাকবে,

www.Educationblog24.Com

কৃষক প্রতিনিধি থাকবে। তারাই থানাকে চালাবে।

আর, জেলা থাকবে না, সমস্ত মহকুমা জেলা হয়ে যাবে। সেই মহকুমায় একটি করে অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ কাউন্সিল হবে। তার চেয়ারম্যান থাকবে। সব কর্মচারী এক সঙ্গে তার মধ্যে থাকবে। এর মধ্যে পিপল্‌স রিপ্রেজেন্টেশন থাকবে। পার্টি রিপ্রেজেন্টশন থাকবে। সেখানে তারা সরকার চালাবে। এইভাবে আমি একটা সিস্টেম চিন্তা করেছি এবং করব বলে ইনশাআল্লাহ আমি ঠিক করেছি। আমি আপনাদের সাহায্য ও সহানুভূতি চাই।'

(৭) আর একটা কথা বলতে চাই। বাংলাদেশের বিচার ইংরেজ আমলের বিচার। আল্লাহর মর্জি যদি সিভিল কোর্টে কেস পড়ে, সেই মামলা শেষ হতে লাগে ২০ বছর। আমি যদি উকিল হই, আমার জামাইকে উকিল বানিয়ে কেস দিয়ে যাই। ওই মামলার ফয়সালা হয় না। আর যদি ক্রিমিনাল কেস হয়, তিন বছর, চার বছরের আগে শেষ হয় না। এই বিচার বিভাগকে নতুন করে গড়তে হবে। থানায় ট্রাইবুনাল করবার চেষ্টা করছি। সেখানে যাতে মানুষ এক বছর, দেড় বছরের মধ্যে বিচার পায়, তার বন্দোবস্ত করছি। আশা করি সেটা হবে।'

বঙ্গবন্ধু এই কথাগুলোই হলো বাকশাল কর্মসূচি। এগুলো বাস্তবায়ন করা গেলে ফল ভাল হতো না, মন্দ হতো তা' এখন বলা সম্ভব নয়। কারণ বাকশাল কর্মসূচি তো আলোর মুখ দেখেনি। দেখতে দেয়া হয়নি। বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করে বাকশাল কর্মসূচির অকাল মৃত্যু ঘটানো হয়েছে। তাহলে প্রশ্ন উঠে আসে: বাকশাল কর্মসূচি কাদের স্বার্থে আঘাত হানতো? মওদুদ আহমদ সে প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন :

> সমাজের অত্যন্ত প্রভাবশালী একটা অংশ এতে আতঙ্কিত বোধ করে। প্রকৃত পক্ষে শেখ মুজিবের ব্যাপক কর্মসূচিতে সমাজের প্রতিটি প্রভাবশালী শ্রেণীরই ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার আশঙ্কা বিদ্যমান ছিল। গ্রামীণ নেতৃত্বের ধ্বজাধারী গ্রামীণ এলিট শ্রেণী, সমবায় ব্যবস্থাধীনে জমির মালিকানা হারাবার ভয়ে আতঙ্কিত হয়ে পড়েন, আমলারাও তাদের উপর স্থাপিত একক রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণকে মেনে নিতে পারেননি। সেনাবাহিনীকে তাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে জাতীয় রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে নিয়োজিত করা হয়। বিচারবিভাগকে নির্বাহী বিভাগের অধঃস্তন করে তোলায় তা বিচারক এবং আইনজীবীদের মধ্যে ক্ষোভের সঞ্চার করে। সর্বোপরি আওয়ামী লীগ সেই দলের পক্ষ থেকে নির্বাচিত সংসদ সদস্যরাও সাবেক দলীয় প্রতিষ্ঠানের অপমৃত্যু ঘটায় নিদারুণ অস্বস্তির শিকার হল।'

বঙ্গবন্ধুর বাকশাল কর্মসূচির বাস্তবায়িত না হলেও বাকশাল কর্মসূচি ঘোষিত হওয়ার পরবর্তী কয়েক মাসে দেশের অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে শুভ পরিবর্তন লক্ষ্য করা গেছে। যেমন :

> ১৯৭৫ সালের জুন মাস নাগাদ দেশের অর্থনীতিতে মোটামুটি একটা স্থিতিশীলতার প্রভাব পরিলক্ষিত হতে থাকে ... মুদ্রা সরবরাহ ১৯৭৪ সালের ডিসেম্বর মাসের ৯৩৭.৭৬ কোটি টাকা থেকে হ্রাস পেয়ে ১৯৭৫ সালের জুন মাসে ৮১৪.৩৩ কোটি টাকায় নেমে আসে এবং একই সময়ের ব্যবধানে বৈদেশিক মুদ্রার মজুদ ১১১.৪৯ কোটি টাকা থেকে ৩৫০.৮০ কোটি টাকায় উন্নীত হয়। খাদ্য শস্যের মজুদ পরিস্থিতি

www.Educationblog24.Com

অনুকূলে চলে আসায় চালের মূল্যে নিম্নমুখী প্রবণতা পরিলক্ষিত হতে থাকে। আরো কতিপয় নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যসামগ্রীর মূল্যও নিয়ন্ত্রণে চলে আসতে থাকে। জুন মাস নাগাদ চালের দাম জানুয়ারী মাসে সের প্রতি ৮ টাকা থেকে কমে ৫.৫০ টাকায়, লংক্লথ গজপ্রতি ১৩ টাকা থেকে ১১.৫০ টাকায়, সরিষার তেল সের প্রতি ৪১.৬৮ টাকা থেকে ৩০.৩৭ টাকায়, আলু সের প্রতি ২.০৫ টাকা থেকে ১.৫০ টাকায়, রুই মাছ ১৪.১৪ টাকা থেকে ১০ টাকায় এবং কেরোসিন তেল ১.৪০ টাকা থেকে ১.২০ টাকায় নেমে আসে।

এতে করে জীবনযাত্রার ব্যয় ভারেও উন্নতির প্রভাব পরিলক্ষিত হতে থাকে। ঢাকা শহরে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর জীবনযাত্রার ব্যয়সূচক জানুয়ারী মাসের ৪৫৮.৫ থেকে এপ্রিল মাসে ৪১৬.৯ এ এবং খাদ্যমূল্য সূচক একই সময়ে ৫৪৬.৩ থেকে ৪৫৯.০-এ হ্রাস পায়।

পরিস্থিতির উন্নতি চক্রান্তকারীদের ভীতসন্ত্রস্ত করে। তারা আর কাল বিলম্ব না করে ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করে।

(ঘ) ১৯৭৪ সালের দুর্ভিক্ষ

বঙ্গবন্ধু সরকারকে আরেকটি সমালোচনার সম্মুখীন হতে হয় ১৯৭৪ সালের দুর্ভিক্ষ নিয়ে। উক্ত দুর্ভিক্ষের জন্য উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত খাদ্য ঘাটতি, মুক্তিযুদ্ধের সময় সৃষ্ট খাদ্য ঘাটতি, ১৯৭২-৭৪ সময়ের খরা, বন্যা ও দেশী-বিদেশী চক্রান্ত কতটা দায়ী তা বিবেচনায় না নিয়ে একতরফাভাবে বঙ্গবন্ধু সরকারকে দায়ী করে অপপ্রচার চালানোর একটা প্রবণতা চলে আসছে। পাকিস্তান আমলে জনসংখ্যা বৃদ্ধির পাশাপাশি খাদ্য ঘাটতি অব্যাহত ভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছিল। খাদ্য ঘাটতি ১৯৫০ সালের ৫ লাখ টন থেকে বেড়ে ষাটের দশকের শেষের দিকে প্রায় ১৫ লাখ টনে উন্নীত হয়। ১৯৬৮, ১৯৬৯ এবং ১৯৭০ সালে বাংলাদেশে যে ভয়াবহ বন্যা হয় তার ফলে ১৯৭০ সালে খাদ্য ঘাটতির পরিমাণ ২২ লক্ষ টনে পৌঁছায়। ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের সময় কৃষি কাজ ব্যাহত হওয়া ও বন্যায় ১৪ হাজার বর্গমাইল এলাকা ক্ষতিগ্রস্ত হলে খাদ্য ঘাটতি কমপক্ষে ৪০ লক্ষ টনে দাঁড়ায়। এমতাবস্থায় ১৯৭২ সালের খরায় আউশ ধানের ব্যাপক ক্ষতিসাধন, ১৯৭৩ সালের ডিসেম্বরে বরিশাল, পটুয়াখালী ও খুলনায় ব্যাপক জলোচ্ছ্বাসে মাঠের ফসল নষ্ট হয়ে যাওয়া, ১৯৭৪ সালের ডবল বন্যায় (এপ্রিল মাসে সিলেটে এবং জুলাই-আগস্টে সারা দেশে) প্রায় ১ কোটি টন ফসল নষ্ট হওয়ার ফলেই ১৯৭৪ সালে দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। সেসময় আন্তর্জাতিকভাবে যথেষ্ট পরিমাণ খাদ্যসাহায্য পাওয়া যায়নি। উপরন্তু দেশের যোগাযোগ ব্যবস্থা সেসময় খারাপ থাকায় খাদ্য পরিবহনেও সমস্যা দেখা দিয়েছিল। তাছাড়া মজুদদারি ও চোরাচালান খাদ্য সংকট ভয়াবহ করে তোলে। ১৯৭৪ সালের মাঝামাঝি থেকে পরিস্থিতি খারাপ হতে থাকে। জুন মাসে যেখানে প্রতি সের মোটা চাউলের মূল্য ছিল ৩.৯০ টাকা, আগস্ট মাসে তা' হয় ৪.৭৮ টাকা, সেপ্টেম্বরে ৬ টাকা এবং অক্টোবর মাসে ৭.১৬ টাকায় উন্নীত হয়। সরকার পরিস্থিতি মোকাবিলা করার জন্য সারাদেশে ৫,৭০০টি লঙ্গরখানা চালু করেছিল। কিন্তু এতৎসত্ত্বেও উক্ত দুর্ভিক্ষে সরকারি হিসাব মতে ২৭,৫০০ জন লোকের মৃত্যু ঘটেছিল।

www.Educationblog24.com

www.Educationblog24.Com

বেসরকারি হিসেব মত তা তিনগুণেরও বেশি ছিল। ১৯৭৪ সালের নভেম্বর মাসেই পরিস্থিতি অনুকূলে চলে আসে।

(ঙ) ভারত-বাংলাদেশ মৈত্রী চুক্তি ১৯৭২

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে ভারতে অবদানের কথা অস্বীকার করার উপায় নেই। ভারত-বাংলাদেশ যৌথ বাহিনীর সম্মিলিত আক্রমণের কাছেই পাকিস্তান বাহিনী পরাজিত হয়ে আত্মসমর্পণ করে। সেই ভারতীয় বাহিনীকে ১৯৭২ সালের ১২ মার্চ বাংলাদেশ থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে প্রত্যাহার করা হয়। এটি বঙ্গবন্ধুর বড় কৃতিত্ব। এরপর ১৭ মার্চ (১৯৭২) ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী বাংলাদেশ সফরে আসেন। এ সফরের সময় (১৯ মার্চ) তিনি ও বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নবায়নযোগ্য একটি ২৫ বছর মেয়াদি মৈত্রী, সহযোগিতা ও শান্তি চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন। এর মাধ্যমে 'বন্ধুত্ব, রক্ত ও আত্মদানের মধ্য দিয়ে দু'দেশের গড়ে ওঠা সম্পর্ক আনুষ্ঠানিক ভিত্তি অর্জন করে। চুক্তিতে ১০টি মৌলিক উদ্দেশ্য ও ১২টি অনুচ্ছেদ ছিল। চুক্তির ভিত্তি ছিল উভয় দেশের সাধারণ আদর্শ, যথা শান্তি, গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা ও জাতীয়তাবাদ। চুক্তির প্রস্তাবনায় 'সম্ভাব্য সকল রকমের পারস্পরিক সহযোগিতার ভিত্তিতে' উভয় দেশের সীমান্তকে চিরন্তন শান্তি ও বন্ধুত্বের প্রতীক হিসেবে' চিহ্নিত করার দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করা হয়। চুক্তির শর্তগুলো ছিল নিম্নরূপ:

(১) 'উভয় দেশ নিজ নিজ স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব ও ভৌগোলিক অখণ্ডতা বজায় রেখে একে অপরের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করা থেকে বিরত থাকবে';

(২) 'উভয় পক্ষ সারা বিশ্বের উপনিবেশবাদ ও বর্ণবৈষম্যবাদ বিরোধী ও জাতীয় মুক্তির জন্য সংগ্রামরত জনসমষ্টির সাথে একাত্মতা ঘোষণা করে তাদের সর্বতোভাবে সমর্থন প্রদান করবে';

(৩) 'উভয়পক্ষ তাদের জোটনিরপেক্ষ ও শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের নীতিতে অটল থাকবে';

(৪) 'যেকোন আন্তর্জাতিক সমস্যায় উভয়পক্ষের স্বার্থে তারা পরস্পরের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ ও মতবিনিময় করবেন';

(৫) 'উভয়পক্ষ প্রধান প্রধান অর্থনৈতিক, বৈজ্ঞানিক এবং কারিগরি ক্ষেত্রে এবং দুই দেশের মধ্যে বাণিজ্য পরিবহন ও যোগাযোগ ক্ষেত্রে যোগাযোগ বৃদ্ধি করবে এবং পরস্পরের স্বার্থ রক্ষা করবে';

(৬) 'বন্যা নিয়ন্ত্রণ, নদীসমতল উন্নয়ন, জলবিদ্যুৎ, বিদ্যুৎ ও সেচব্যবস্থা উন্নয়নে যৌথ সমীক্ষা চালাবে';

(৭) 'উভয়পক্ষ সাহিত্য, শিল্পকলা, শিক্ষা ও সংস্কৃতি, ক্রীড়া ও স্বাস্থ্য বিষয়ে সম্পর্ক অব্যাহতভাবে ভাল রাখবে';

(৮) 'কোন এক পক্ষ অপরপক্ষের সঙ্গে বিবাদরত কোনো শক্তির সাথে সামরিক মৈত্রী স্থাপন থেকে বিরত থাকবেন, একে অপরের ওপর কোন আগ্রাসনমূলক তৎপরতা পরিচালনা করবেন না এবং নিজ ভূখণ্ডে এমন কোনো সামরিক

www.Educationblog24.Com

আয়োজনে ব্যস্ত থাকবেন না যা অপর পক্ষের জন্য সামরিক ক্ষতি বা নিরাপত্তার উপর হুমকী হয়ে দাঁড়াতে পারে';

(৯) 'উভয় পক্ষ অপর পক্ষের সঙ্গে সশস্ত্র সংগ্রামে যে কোন তৃতীয় পক্ষকে সহযোগিতা দানে বিরত থাকবে'। 'কোন কারণে এক পক্ষ অন্য আরেক পক্ষ দ্বারা আক্রান্ত হলে বা আক্রান্ত হবার হুমকীর সম্মুখীন হলে উভয় পক্ষ তাৎক্ষণিকভাবে পারস্পরিক মতবিনিময়ের জন্য আলোচনায় বসে তাদের শান্তি ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য সেই আক্রমণ বা হুমকী নিরসনে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন';

(১০) 'কোন পক্ষ এই চুক্তির পরিপন্থী হয় এমন কোনো বিষয়ে কোনো এক বা একাধিক দেশের সঙ্গে প্রকাশ্যে বা গোপনে যে কোনো রকমের প্রতিশ্রুতি প্রদান থেকে বিরত থাকবেন'।

আলোচ্য চুক্তিকে বঙ্গবন্ধুর সমালোচকরা 'গোলামির চুক্তি' বলে সমালোচনা করে। কিন্তু চুক্তির ধারাগুলো পর্যালোচনা করলেই দেখা যাবে যে, বঙ্গবন্ধুর ঐ চুক্তির মাধ্যমে বাংলাদেশের মর্যাদা সামান্যতমও কমাননি। চুক্তিটি 'গোলামির' হয়ে থাকলে ১৯৭৫-১৯৯৬ সময়কালে যারা ক্ষমতায় ছিলেন তারা তা বাতিল করতে পারতেন।

অতএব বলা যায়, বঙ্গবন্ধু সরকার সম্পর্কে বিরোধীপক্ষ যে সকল বিষয় নিয়ে উচ্চবাচ্য করেন, সমালোচনা করেন সে বিষয়গুলো কোনটিই সমালোচনা করার মতো নয়।

মূল্যায়ন

বাংলাদেশের স্থপতি ও জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাঙালি জাতিকে কেবল একটি স্বাধীন-সার্বভৌম রাষ্ট্রই উপহার দেননি, তিনি মাত্র তিন বছর সময়কালের মধ্যে যুদ্ধবিধ্বস্ত পোড়ামাটির এক সদ্য স্বাধীন রাষ্ট্রের শত সমস্যা জয় করে তাকে শক্ত ভিত্তির উপর দাঁড় করান। বাংলাদেশের নিরঙ্কুশ সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে তিনি সর্বপ্রথম বাংলাদেশ থেকে ভারতীয় সৈন্য ফেরত পাঠান। মাত্র তিন মাস সময়ের মধ্যে মিত্রবাহিনী প্রত্যাহার ছিল ইতিহাসে বিরল। তিনি প্রশাসনিক ব্যবস্থা পুনর্গঠন করেন, দেশকে স্বাভাবিক করেন, সংবিধান প্রণয়ন করেন, এক কোটি শরণার্থীকে পুনর্বাসন করেন, যোগাযোগ ব্যবস্থা ও সকল অবকাঠামোগত উন্নয়ন সাধন করেন, শিক্ষা ব্যবস্থার সম্প্রসারণ ঘটান, মদ-জুয়া-ঘোড়া দৌড়সহ সমস্ত ইসলাম বিরোধী কর্মকাণ্ড কার্যকরভাবে নিষিদ্ধ করেন, নারী পুনর্বাসন সংস্থা গঠন করেন, মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্ট গঠন ও বীর মুক্তিযোদ্ধাদের বিভিন্ন খেতাবে ভূষিত করেন, কৃষির উন্নতি ঘটান, শিল্প-কল-কারখানা, ব্যাংক-বীমা জাতীয়করণ করে সচল করার মাধ্যমে হাজার হাজার শ্রমিক কর্মচারীর কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করেন, প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে সুদৃঢ় করেন, ১২১টি দেশের স্বীকৃতি অর্জন করেন, বাংলাদেশকে জাতিসংঘ, কমনওয়েলথ, জোট নিরপেক্ষ ও ইসলামী ব্লকের সদস্য করার মাধ্যমে পররাষ্ট্রনীতিতে সফলতা অর্জন করেন এবং এভাবে বাংলাদেশকে বিশ্বের দরবারে একটি মর্যাদাসম্পন্ন দেশ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেন। তাঁর কৃতিত্বের মূল্যায়ন প্রসঙ্গে ১৯৭২ সালের জুন মাসে লন্ডনের *সানডে*

www.Educationblog24.Com

টাইমস পত্রিকায় নিম্নরূপ মন্তব্য করা হয়:

> যে পরিস্থিতিতে শেখ মুজিব দেশের শাসনভার গ্রহণ করেন, সে পরিস্থিতি তিনি যেভাবে আয়ত্তে এনেছেন, তা নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয়। এ ব্যাপারে সকল বিদেশীর তিনি প্রশংসা কুড়িয়েছেন . . . এটা সত্যই একটা অলৌকিক ঘটনা যে স্বাধীনতার পর অন্তত পাঁচ লাখ লোকও নিহত হ'লো না, এখন পর্যন্তকেউ অনাহারে মারা যায়নি এবং সরকার দিব্যি কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন এবং এসব কিছুই শেখের জন্য সম্ভব হয়েছে।

সোনার বাংলা প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন বঙ্গবন্ধু দেখেছিলেন, আমরা যদি নিষ্ঠার সাথে কাজ করি, দলীয় স্বার্থকে জলাঞ্জলি দিয়ে দেশের স্বার্থ সবকিছুর উর্ধ্বে স্থান দিই তাহলে বঙ্গবন্ধুর সে স্বপ্ন বাস্তবায়ন সম্ভব।

ঘ. সপরিবারে বঙ্গবন্ধু হত্যা ও আদর্শিক পটপরিবর্তন

১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট বঙ্গবন্ধুকে সপরিবারে নির্মমভাবে হত্যা করা কেবলমাত্র একজন বা কিছু ব্যক্তিকেই হত্যা করা ছিল না, সে হত্যাকাণ্ডটির উদ্দেশ্য ছিল একটি আদর্শকে হত্যা করা। বঙ্গবন্ধুকে হত্যার উদ্দেশ্য ছিল মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে শুধু সংবিধান থেকে নয়, বাঙালির মন থেকে মুছে ফেলা। স্বভাবত:ই হত্যাকাণ্ডটি ছিল সুপরিকল্পিত। বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ডের সুদূর প্রসারি প্রভাব ছিল। নিম্নে তা' আলোচনা করা হ'লো :

বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করার পর থেকে ১৯৯৬ সালে আওয়ামী লীগের সরকার গঠন পর্যন্ত একুশ বছরে মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস ঐতিহ্যই বিকৃত করা হয়নি বরং মুক্তিযুদ্ধের চেতনার মূলে কুঠারাঘাত করা হয়।

১৯৭৫ থেকে ১৯৯৬ পর্যন্ত একুশ বছরে মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীনতা সংগ্রামের সুবিস্তৃত পটভূমি, তেইশ বছর ব্যাপী পাকিস্তানী ঔপনিবেশিক শাসন ও শোষণের বিরুদ্ধে সংঘটিত বিভিন্ন আন্দোলন সংগ্রাম, রাজনীতিবিদ, ছাত্র-শিক্ষক, কৃষক-শ্রমিক, বিভিন্ন পেশাজীবী শ্রেণি মানুষ প্রমুখের অপরিসীম আত্মত্যাগ, সর্বোপরি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের অনন্য অবদান, মুক্তিযুদ্ধের সংগঠন ও পরিচালনাকারী মুজিবনগর সরকারের গৌরবময় ভূমিকা, শত-সহস্র বীর মুক্তিযোদ্ধার আত্মত্যাগ, তিরিশ লক্ষ শহীদের জীবনদান, চারলক্ষ নারীর সম্ভ্রম হানি প্রভৃতি সবকিছুই অস্বীকার করে মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসকে বিকৃত করা হয়েছিল। সে সময় মুক্তিযুদ্ধের একজন সেক্টর কমান্ডারকে স্বাধীনতার ঘোষক হিসেবে প্রচার করা হয় এবং একথা প্রমাণ করার চেষ্টা করা হয় যে তাঁর ঘোষণাতেই হঠাৎ করেই ২৭শে মার্চ (১৯৭১) থেকে মুক্তিযুদ্ধ শুরু হয়। এই গোষ্ঠী মুক্তিযুদ্ধের গৌরবময় ইতিহাসকে মাত্র নয় মাসের ঘটনার মধ্যে সীমাবদ্ধ করে। ইতিহাস বিকৃত করা ছাড়াও ১৯৭৫ থেকে ১৯৯৬ পর্যন্ত একুশ বছরে মুক্তিযুদ্ধের বিরোধী শক্তি সংগঠিত হয় এবং পুনর্বাসিত হয়।

১৯৭২ সালের সংবিধান প্রণয়নের সময় সংবিধান প্রণেতাগণ একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধকে 'জাতীয় মুক্তির জন্য ঐতিহাসিক সংগ্রাম' এই অভিধায় অভিহিত

www.Educationblog24.Com

করেছিলেন। কিন্তু বঙ্গবন্ধুকে হত্যার পর সেই অভিপ্রায়কে পরিবর্তন করে 'জাতীয় স্বাধীনতার ঐতিহাসিক যুদ্ধ'- অভিধায়ে পরিবর্তন করে। একাজটি করেন জিয়াউর রহমান। তিনি সামরিক বিধির মাধ্যমে মুক্তিযুদ্ধের চেতনার প্রতীক- ১৯৭২-এর সংবিধানের চার মূলনীতি, যথা জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতা-এর আমূল পরিবর্তন সাধন করেন। বাঙালি জাতীয়তাবাদকে বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদে পরিবর্তন করা হয়। ধর্ম নিরপেক্ষতার স্থলে 'সর্বশক্তিমান আল্লাহর উপর পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস' কথাগুলো সংযোজন করা হয়। সমাজতন্ত্রের স্থলে 'অর্থনৈতিক ও সামাজিক ন্যায়বিচার' কথাগুলো প্রতিস্থাপিত হয়। এভাবে সংবিধান সংশোধনের মাধ্যমে জিয়াউর রহমান-মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকেই বিনষ্ট করেন। তাঁর সময়ে সাম্প্রদায়িক শক্তির উত্থান ঘটে। বঙ্গবন্ধু ধর্মভিত্তিক রাজনীতি নিষিদ্ধ করেছিলেন, জিয়াউর রহমান সে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করে নেন। ফলে জামায়াতে ইসলামীসহ অন্যান্য ধর্মভিত্তিক দলগুলো আত্মপ্রকাশ করার সুযোগ পায় এবং আরো অসংখ্য ধর্মভিত্তি রাজনৈতিক দল ও জোটের উন্মেষ ঘটতে থাকে। এভাবে জিয়াউর রহমান সংবিধানে নিষিদ্ধ মুক্তিযুদ্ধ বিরোধী দল জামায়াতে ইসলামী, মুসলিম লীগ প্রভৃতি দলকে বাংলাদেশে রাজনীতি করার অধিকার প্রদান করার মাধ্যমে, শাহ আজিজুর রহমানের মতো কুখ্যাত দালালকে প্রধানমন্ত্রী বানিয়ে, আব্দুল আলীম ও মওলানা মান্নানের মতো যুদ্ধাপরাধীদেরকে মন্ত্রিসভায় স্থান দিয়ে এবং সর্বোপরি ধর্মভিত্তিক বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদের ধুয়া তুলে মুক্তিযুদ্ধের অবমূল্যায়ন করেছেন। জেনারেল জিয়া ইনডেমনিটির মতো অমানবিক আইন সংবিধানে সন্নিবেশিত করে বঙ্গবন্ধুর হত্যাকারীদের বিচারের হাত থেকে রক্ষার ব্যবস্থা করেছেন। জিয়াউর রহমান একাত্তরের ঘাতক দালাল যুদ্ধাপরাধীদেরকে রাজনৈতিক ও সামাজিকভাবে পুনর্বাসিত করা ও তাদের রাষ্ট্রীয় মর্যাদা প্রদানের সকল ব্যবস্থা করে দিয়েছেন।

বঙ্গবন্ধুর সরকার (১৯৭২-৭৫) যুদ্ধাপরাধীদের বিচার করার জন্য ২৪.১.১৯৭২ তারিখে 'বাংলাদেশ দালাল (বিশেষ ট্রাইবুনাল) অধ্যাদেশ ১৯৭২' জারী করেন। তাঁর আমলে বিচার কার্য শুরুও হয়। ২৪.১.৭২ থেকে ৩০.১১.৭৩ পর্যন্ত ৩৭,৪৭১ জন দালালকে গ্রেফতার করা হয়। তারমধ্যে ৭৫২ জন দালাল দণ্ডিত হয়। ৩০.১১.৭৩ তারিখে বঙ্গবন্ধু সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করলেও তিনি 'ধর্ষণ, খুন, খুনের চেষ্টা, ঘরবাড়ি অথবা জাহাজে অগ্নিসংযোগের দায়ে দণ্ডিত ও অভিযুক্ত ব্যক্তিদের ক্ষমা করেননি। ক্ষমার অযোগ্য এরকম ১১ হাজার ব্যক্তি আটক ছিল। কিন্তু জিয়াউর রহমান ১৯৭৫ সালে ৩১শে ডিসেম্বর দালাল আইন বাতিল করেন। বঙ্গবন্ধুর সময় যাদের নাগরিকত্ব বাতিল করা হয়েছিল জিয়া তাদের নাগরিকত্ব ফিরিয়ে দেওয়ার সুযোগ করে দেন। একাত্তরের ঘাতক দালালদের ভোটার হওয়ার সুযোগও তিনি দেন। এভাবে জিয়ার শাসনামলে মুক্তিযুদ্ধের সকল চেতনার বিনাশ ঘটে। জিয়াউর রহমানের মৃত্যুর পর জেনারেল এরশাদ এবং পরে বেগম খালেদা জিয়া একই পথ অনুসরণ করেছেন।

www.Educationblog24.Com

এরশাদ সংবিধানের অষ্টম সংশোধনীর মাধ্যমে ইসলামকে রাষ্ট্রধর্ম হিসেবে ঘোষণা করেন, যা জিয়াউর রহমানের পঞ্চম সংশোধনীর ধারাবাহিকতা মাত্র। সংবিধানের অষ্টম সংশোধনী এদেশে সংখ্যালঘু ধর্মীয় সম্প্রদায়কে দ্বিতীয় শ্রেণির নাগরিকে পরিণত করেছে। অষ্টম সংশোধনী মুক্তিযুদ্ধের যৌক্তিকতা ও বাস্তবতাকে সরাসরি আঘাত করেছে।

বেগম খালেদা জিয়া জামায়াতে ইসলামীর সমর্থনে ১৯৯১-এর নির্বাচনের মাধ্যমে সরকার গঠন করতে সমর্থ হন। জামায়াতকে খুশী রাখতে স্বভাবত:ই বেগম খালেদা জিয়া এরশাদের ৮ম সংশোধনীসহ মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বিরোধী সকল রাষ্ট্রীয় নীতি অব্যাহত রাখেন। খালেদা জিয়ার দল - বিএনপির সমর্থনে জামায়াতে ইসলামীর শক্তি বৃদ্ধি পায়। ১৯৯১ সালের নির্বাচনে জামায়াত জাতীয় সংসদে ১৮টি আসন লাভ করতে সমর্থ হয়। এই ফলাফল লাভের পর ২৯.১২.৯১ তারিখে পাকিস্তানী নাগরিক গোলাম আযমকে তাদের দলের আমীর হিসেবে মনোনীত করে। ২০০১ সালের নির্বাচনের মাধ্যমে পুনরায় ক্ষমতায় এসে বেগম খালেদা জিয়া দুই যুদ্ধাপরাধী মতিউর রহমান নিজামী ও আলী আহসান মুজাহিদকে মন্ত্রিসভায় অন্তর্ভুক্ত করে মুক্তিযোদ্ধাদেরকে অপমানিত করেন। ২০০১ সালের পর বাংলাদেশে মৌলবাদীদের উত্থান ঘটে।

১৯৭৫ থেকে ১৯৯৬ পর্যন্ত একুশ বছর ব্যাপী ক্রমাগত মিথ্যাচার ও বিভ্রান্তিকর অপপ্রচারের ফলে সেসময়ের প্রজন্ম বিভ্রান্ত হয়। সে দীর্ঘসময়ে বঙ্গবন্ধুর নাম মিডিয়াতে প্রায় নিষিদ্ধ ছিল। পত্র-পত্রিকায় ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়াতে বঙ্গবন্ধুর অবদান নিয়ে সামান্যই আলোচনা হ'তো। ২৬শে মার্চ ও ১৬ই ডিসেম্বর মুক্তিযুদ্ধ ও বঙ্গবন্ধু যেভাবে উপস্থাপিত হওয়ার কথা, তা হয়নি। বরং বিভিন্ন ইসলামী দল ও জোটের নেত্রীবৃন্দ, সরকারি, আধাসরকারি, বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে অবস্থানকারী মুক্তিযুদ্ধবিরোধী ব্যক্তিবর্গ অধিকাংশ সংবাদপত্রের সাংবাদিকবৃন্দ, বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ডানপন্থি শিক্ষকবৃন্দ, বিভিন্ন সভা সমিতির আলোচনা সভায়, পত্রিকায় বিবৃতি প্রদান করে ও কলাম লিখে মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস বিকৃত করেন। ফলে সেসময়কার তরুণ প্রজন্মের মনে মুক্তিযুদ্ধের কোন চেতনা সৃষ্টি হয়নি। তাদের চেতনা থেকে ধর্মনিরপেক্ষতা, সমাজতন্ত্র ও বাঙালি জাতীয়তাবাদ নির্বাসিত হয়। তারা বেড়ে উঠে বিকৃত ইতিহাস শুনে শুনে। বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করা না হলে, আর কয়েকবছর বঙ্গবন্ধুর শাসন অক্ষুন্ন থাকলে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা সুদৃঢ় হতো, দেশ উন্নত হতো এবং সমাজে ও রাষ্ট্রে অসাম্প্রদায়িকতা সুদৃঢ় হতো।

www.Educationblog24.Com

সহায়ক গ্রন্থ

আবু সাঈদ, *আওয়ামী লীগের শাসনামল*, ঢাকা : আগামী প্রকাশনী, ১৯৯৫ ।

আবুল মাল আব্দুল মুহিত, *বাংলাদেশ : জাতি রাষ্ট্রের উদ্ভব*, ঢাকা : সাহিত্য প্রকাশনী ২০০০ ।

এইচ.টি. ইমাম, *বাংলাদেশ সরকার*, ১৯৭২-৭৫, ঢাকা ২০১৩

আবুল মাল আব্দুল মুহিত (সম্পাদিত), *এই দেশ এই ঢাকা: প্রবন্ধ বক্তৃতা, বাণী নিউজ, ও সাক্ষাৎকার, শেখ মুজিবুর রহমান*, ঢাকা : বঙ্গবন্ধু ললিতকলা একাডেমি, ২০০৮ ।

মওদুদ আহমদ, বাংলাদেশ : *শেখ মুজিবুর রহমানের শাসনামল*, ঢাকা ১৯৯৪ ।

শাহরিয়ার কবির, *শেখ মুজিব ও মুক্তিযুদ্ধ*, ঢাকা, সময় প্রকাশন ১৯৯৭ ।

মুনতাসীর মামুন সম্পাদিত, *বঙ্গবন্ধু কোষ*, ঢাকা ২০১২ ।

www.Educationblog24.com

www.Educationblog24.Com

পরিশিষ্ট-১
বর্তমান পাঠক্রম

www.Educationblog24.com

www.Educationblog24.Com

ভূমিকা : স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের ইতিহাস-পরিধি ও পরিচিতি

প্রথম অধ্যায়

দেশ ও জনগোষ্ঠির পরিচয়

ক) ভূ-প্রকৃতির বৈশিষ্ট্য ও প্রভাব, খ) নৃতাত্ত্বিক গঠন গ) ভাষা, ঘ) সংস্কৃতির সমন্বয়বাদিতা ও ধর্মীয় সহনশীলতা, ঙ) অভিন্ন বাংলার পরিপ্রেক্ষিতে তৎকালীন পূর্ববঙ্গের ও বর্তমান বাংলাদেশের স্বকীয় সত্তা।

দ্বিতীয় অধ্যায়

অখণ্ড বাংলা গঠনের প্রয়াস ও উপমহাদেশের বিভক্তি, ১৯৪৭

ক) ঔপনিবেশিক শাসন আমলের সাম্প্রদায়িকতার উদ্ভব ও বিস্তার
খ) লাহোর প্রস্তাব, ১৯৪০ গ) অখণ্ড স্বাধীন বাংলা রাষ্ট্র গঠনের উদ্যোগ, ১৯৪৭ ও পরিণতি ঘ) পাকিস্তান সৃষ্টি, ১৯৪৭

তৃতীয় অধ্যায়

পাকিস্তান রাষ্ট্রীয় কাঠামো ও বৈষম্য

ক) কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক কাঠামো, খ) সামরিক ও বেসামরিক আমলাতান্ত্রিক প্রভাব, গ) অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বৈষম্য

চতুর্থ অধ্যায়

ভাষা আন্দোলন ও বাঙালির আত্মপরিচয় প্রতিষ্ঠা

ক) মুসলিম লীগের শাসন ও গণতান্ত্রিক রাজনীতির সংগ্রাম খ) আওয়ামী লীগের প্রতিষ্ঠা, ১৯৪৯ গ) ভাষা আন্দোলন: পটভূমি ও ঘটনা প্রবাহ ঘ) হক-ভাসানী-সোহরাওয়ার্দীর যুক্তফ্রন্ট, ১৯৫৪ সালের নির্বাচন ও পরিণতি

পঞ্চম অধ্যায়

সামরিক শাসন : আইয়ুব খান ও ইয়াহিয়া খানের শাসনামল (১৯৫৮-৭১)

ক) সামরিক শাসনের সংজ্ঞা ও বৈশিষ্ট্য, খ) আইয়ুব খানের ক্ষমতা দখল ও শাসনের বৈশিষ্ট্য (রাজনৈতিক নিপীড়ন, মৌলিক গণতন্ত্র, ধর্মের রাজনৈতিক ব্যবহার), গ) আইয়ুব খানের পতন ও ইয়াহিয়া খানের শাসন (এক ইউনিট বিলুপ্তিকরণ, সার্বজনীন ভোটাধিকার, এলএফও (Legal Framework Order)

ষষ্ঠ অধ্যায়

জাতীয়তাবাদের বিকাশ ও স্বাধিকার আন্দোলন

ক) সাংস্কৃতিক আগ্রাসনের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ ও বাঙালি সাংস্কৃতির উজ্জীবন
খ) শেখ মুজিবুর রহমান ও ছয় দফা আন্দোলন গ) ছয় দফা আন্দোলনের প্রতিক্রিয়া, গুরুত্ব ও তাৎপর্য ঘ) আগরতলা মামলা।

www.Educationblog24.com

www.Educationblog24.Com

সপ্তম অধ্যায়

১৯৬৯-এর গণঅভ্যুত্থান ও ১১ দফা আন্দোলন

ক) পটভূমি খ) আন্দোলনের কর্মসূচী, গুরুত্ব ও পরিণতি

অষ্টম অধ্যায়

১৯৭০ এর নির্বাচন, অসযোগ আন্দোলন ও বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতা ঘোষণা

ক) নির্বাচনের ফলাফল এবং তা মেনে নিতে কেন্দ্রের অস্বীকৃতি খ) অসহযোগ আন্দোলন, বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণ, অপারেশন সার্চলাইট গ) বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতা ঘোষণা ও গ্রেফতার।

নবম অধ্যায়

মুক্তিযুদ্ধ ১৯৭১

ক) গণহত্যা, নারী নির্যাতন, শরণার্থী, খ) বাংলাদেশ সরকার গঠন ও স্বাধীনতার ঘোষণা পত্র, গ) স্বত:স্ফূর্ত প্রাথমিক প্রতিরোধ ও সংগঠিত প্রতিরোধ (মুক্তিফৌজ, মুক্তিবাহিনী, গেরিলা ও সম্মুখ যুদ্ধ, ঘ) মুক্তিযুদ্ধের প্রচার মাধ্যম (স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র, বিদেশী প্রচার মাধ্যম ও জনমত গঠন) ঙ) ছাত্র, নারী ও সাধারণ মানুষের অবদান (গণযুদ্ধ), চ) মুক্তিযুদ্ধে বৃহৎশক্তি সমূহের ভূমিকা, ছ) দখলদার বাহিনী, শান্তিকমিটি, আলবদর, আলশামস, রাজাকার বাহিনী, রাজনৈতিক দল ও দেশীয় অন্যান্য সহযোগীদের স্বাধীনতাবিরোধী কর্মকাণ্ড ও বুদ্ধিজীবী হত্যা। জ) পাকিস্তানে বন্দি অবস্থায় বঙ্গবন্ধুর বিচার ও বিশ্ব প্রতিক্রিয়া ঝ) প্রবাসী বাঙালি, বিশ্বের বিভিন্ন দেশের নাগরিক সমাজের ভূমিকা, ঞ) মুক্তিযুদ্ধে ভারতের অবদান ট) যৌথ বাহিনী গঠন ও বিজয় ঠ) স্বাধীনতা সংগ্রামে বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্ব

দশম অধ্যায়

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের শাসনকাল ১৯৭২-১৯৭৫

ক) স্বদেশ প্রত্যাবর্তন, খ) সংবিধান প্রণয়ন গ) যুদ্ধ বিধ্বস্ত দেশ পুনর্গঠন, ঘ) সপরিবারে বঙ্গবন্ধু হত্যা ও আদর্শিক পট পরিবর্তন।

www.Educationblog24.com

www.Educationblog24.Com

পরিশিষ্ট-২
প্রস্তাবিত মূল পাঠক্রম

www.Educationblog24.com

www.Educationblog24.Com

ভূমিকা : স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের ইতিহাস-পরিধি ও পরিচিতি

প্রথম অধ্যায়

দেশ ও জনগোষ্ঠির পরিচয়

ক) ভূ-প্রকৃতির বৈশিষ্ট্য ও প্রভাব, খ) নৃতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য, গ) ভাষা, ঘ) সংস্কৃতির সমন্বয়বাদিতা, ঙ) ধর্মীয় সহনশীলতা, চ) অভিন্ন বাংলার পরিপ্রেক্ষিতে তৎকালীন পূর্ববঙ্গের ও বর্তমান বাংলাদেশের স্বকীয় সত্তা।

দ্বিতীয় অধ্যায়

বাংলার সামাজিক ও রাজনৈতিক বৈশিষ্ট্য

ক) লোকজ সামাজিক সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য, সামাজিক সংস্কারের প্রচেষ্টা, খ) রাজনৈতিক সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্য, বহিরাগত বা ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ, কৈবর্ত্য বিদ্রোহ, ফরায়েজী আন্দোলন, সাঁওতাল বিদ্রোহ, নীল বিদ্রোহ, সশস্ত্র প্রতিরোধ আন্দোলন (১৯০৫-১৯৩০)।

তৃতীয় অধ্যায়

সাম্প্রদায়িক রাজনীতি ও দ্বিজাতি তত্ত্ব : উদ্ভব ও বিকাশ

ক) ঔপনিবেশিক শাসন সঞ্জাত সাম্প্রদায়িকতার উদ্ভব, খ) জাতীয় কংগ্রেস, মুসলিম লীগ ও হিন্দুত্ববাদী সংগঠনসমূহের উদ্ভব, গ) বাম ভাবধারার প্রসার ও প্রভাব, ঘ) মুসলিম লীগের রাজনীতি ও দ্বিজাতিতত্ত্ব, ঙ) পাকিস্তান প্রস্তাব।

চতুর্থ অধ্যায়

১৯৪৭ সালে অখণ্ড বাংলা গঠনের ব্যর্থ প্রয়াস, উপমহাদেশের বিভক্তি ও পূর্ব বাংলার পাকিস্তান প্রাপ্তি

ক) সোহরাওয়ার্দী-শরৎ বসুর প্রস্তাব, খ) প্রয়াস ও পরিণতি, গ) সীমানা চিহ্নিতকরণের ক্ষেত্রে পক্ষপাতিত্ব ও চক্রান্ত, ঘ) পাকিস্তান সৃষ্টি।

পঞ্চম অধ্যায়

পাকিস্তান রাষ্ট্রীয় কাঠামো ও বৈষম্য

১। রাষ্ট্রীয় কাঠামো : ক) কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক কাঠামো, আমলাতান্ত্রিক প্রভাব, খ) সামরিক ও বেসামরিক আমলাতান্ত্রিক প্রভাব, গ) কেন্দ্রে অবাঙালিদের নিয়ন্ত্রণ, ২। অর্থনৈতিক ও সামাজিক বৈষম্য।

ষষ্ঠ অধ্যায়

গণতান্ত্রিক রাজনীতির প্রয়াস ও ভাষা আন্দোলন

ক) বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের উদ্ভব, খ) বিভিন্ন সাংস্কৃতিক ও ছাত্র সংগঠনের উদ্ভব, গ) মুসলিম লীগের অপশাসন ও গণতান্ত্রিক রাজনীতির সংগ্রাম, ঘ) ভাষা আন্দোলন।

www.Educationblog24.com

www.Educationblog24.Com

সপ্তম অধ্যায়

গণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা

ক) মুসলিম লীগের অপশাসনের বিরুদ্ধে ১৯৫৪ সালে যুক্ত ফ্রন্টের নির্বাচন, শাসন ও ব্যর্থতা, খ) ১৯৫৬ সালের সংবিধান ও প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন।

অষ্টম অধ্যায়

সামরিক শাসন : আইয়ুব খান ও ইয়াহিয়া খানের শাসনামল (১৯৫৮-৭১)

ক) সামরিক শাসনের সংজ্ঞা ও বৈশিষ্ট্য, খ) আইয়ুব খানের ক্ষমতা দখল ও শাসনের বৈশিষ্ট্য (রাজনৈতিক নিপীড়ন, মৌলিক গণতন্ত্র, ইসলামীকরণ), গ) আইয়ুব খানের পতন ও ইয়াহিয়া খানের শাসন (এক ইউনিট বিলুপ্তিকরণ, সার্বজনীন ভোটাধিকার, এলএফও নির্বাচন) Legal Framework Order.

নবম অধ্যায়

সংস্কৃতি আগ্রাসন প্রতিরোধ ও অভিঘাত

ক) সাংস্কৃতিক আন্দোলন ও গুরুত্ব, খ) বাঙালি সংস্কৃতির বিরুদ্ধে আগ্রাসন ও ইসলামীকরণের প্রচেষ্টা, গ) বাংলা একাডেমি প্রতিষ্ঠা, ঘ) বর্ণমালা পরিবর্তন উদ্যোগ ও প্রতিরোধ, ঙ) রবীন্দ্রনাথের অবমাননা ও প্রতিরোধ, চ) বিভিন্ন সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের উদ্ভব ও বিকাশ, ছ) বাঙালি সংস্কৃতির উজ্জীবন।

দশম অধ্যায়

জাতীয়তাবাদের বিকাশ ও স্বাধিকার আন্দোলন

ক) জাতীয়তাবাদের সংজ্ঞা ঃ আঞ্চলিক ও উপ-আঞ্চলিক চেতনা

১) শেখ মুজিবুর রহমান ও ছয় দফা আন্দোলন : ক) প্রেক্ষাপট, খ) ছয় দফার বিবরণ গ) পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের প্রতিক্রিয়া, ঘ) পাকিস্তান সরকারের দমন নিপীড়ন, ঙ) ছয় দফার গুরুত্ব ও তাৎপর্য; ২) আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা।

একাদশ অধ্যায়

১৯৬৯-এর গণঅভ্যুত্থান ও ১১ দফা আন্দোলন

দ্বাদশ অধ্যায়

১৯৭০ এর নির্বাচন ও বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতা ঘোষণা

১। ক) বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের ইশতেহার, খ) নির্বাচনের ফলাফল, গ) নির্বাচনের রায় মেনে নিতে কেন্দ্রের অস্বীকৃতি, গ) এ পরিপ্রেক্ষিতে বঙ্গবন্ধু ও কেন্দ্রীয় সরকারের সাথে আলোচনা, ২। অসহযোগ আন্দোলন, ৭ই মার্চের ভাষণ ও প্রতিক্রিয়া, অপারেশন সার্চলাইট, ৩। বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতা ঘোষণা, বঙ্গবন্ধু গ্রেফতার।

www.Educationblog24.com

www.Educationblog24.Com

ত্রয়োদশ অধ্যায়

মুক্তিযুদ্ধ ১৯৭১

ক) গণহত্যা, নারী নির্যাতন, শরণার্থী, খ) বাংলাদেশ সরকার গঠন ও স্বাধীনতার ঘোষণা পত্র, গ) স্বতঃস্ফূর্ত প্রাথমিক প্রতিরোধ ও সংগঠিত প্রতিরোধ (মুক্তিফৌজ, মুক্তিবাহিনী, গেরিলা ও সামরিক যুদ্ধ), ঘ) মুক্তিযুদ্ধের প্রচার (স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র, বিদেশী প্রচার ও জনমত গঠন) ঙ) ছাত্র, নারী ও সাধারণ মানুষের অবদান (গণযুদ্ধ), চ) মুক্তিযুদ্ধে বৃহৎশক্তি ও ইসলামী রাষ্ট্রসমূহের ভূমিকা, ছ) দখলদার বাহিনী, শান্তি কমিটি, আলবদর, আলশামস, রাজাকার বাহিনী, রাজনৈতিক দল ও দালালদের স্বাধীনতা বিরোধী কর্মকাণ্ড ও গণহত্যা, (বুদ্ধিজীবী হত্যা)। জ) প্রবাসী বাঙালি, বিশ্বের বিভিন্ন দেশের নাগরিক সমাজের ভূমিকা ও ভারতের অবদান, ঝ) যৌথ বাহিনী গঠন ও বিজয়।

চতুর্দশ অধ্যায়

বঙ্গবন্ধুর শাসনকাল ১৯৭২-১৯৭৫

ক) স্বদেশ প্রত্যাবর্তন, খ) সংবিধান প্রণয়ন, গ) যুদ্ধ বিধ্বস্ত দেশ পুনর্গঠন, ঘ) সপরিবারে বঙ্গবন্ধু হত্যা ও আদর্শিক পট পরিবর্তন।

www.Educationblog24.com